বর্দ্ধমান পরিক্রমা

সুধীরচন্দ্র দাঁ

বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন : কলিকাতা— ৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
২, রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৯২

মুদ্রাকব :
শ্রী বিপ্লব ভাওযাল
সাবিত্রী-এর পক্ষে
১৭, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

10, Raja Rajkissen Street
Block No, 2 Suite No 32
Calcutta— 700 006

Telephone No— 557783

দক্ষ শিক্ষক ও সুদক্ষ শিক্ষণ-পরিচালক শ্রীসুধীর চন্দ্র দাঁ, এম.এ. বি.এড্ মহাশয় রচিত ''বর্ধমান পরিক্রমা'' বইটির সংকলন ও প্রকাশন অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। সুধীরবাবু বর্ধমান জেলার এক প্রাচীন গ্রামের বংশানুক্রমিক অধিবাসী, সুতরাং বর্ধমান জেলার তথা পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক-অকৃত্রিম।

সুধীরবাবু যেসব বিবরণ দিয়েছেন তার কিছু কিছু সম্পর্কে হয়ত প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ঘটনার বিবরণ পেলেই তো তবে ঐতিহাসিক পণ্ডিত সত্য মিথ্যা নির্ণয় করতে পারেন। সুধীরবাবু জুগিয়েছেন ঐতিহাসিকদের জাবর কাটবার প্রচুর উপাদান।

এই প্রসঙ্গে সুধীরবাবুকে একটা অনুরোধ করি। এ বছর তো ইংরেজ বণিক নগরী কলিকাতার তৃতীয় জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান জমকালো ভাবে হচ্ছে। খাস বাঙালী বণিক প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান নগরের ইতিহাস তো সাড়ে চারশো বছরও ছাড়িয়ে যায়। এখন বর্ধমান শহরের একটি ছোটখাটো ইতিহাস রচনা করলে কেমন হয়?

৩ মার্চ ১৯৯১ — শ্রী সুকুমার সেন

Rarha Gabesana Parsad
Founded by
Dr. Panchanan Mondal

Pallisri Ratan Palli
Santiniketan, Birbhum
West Bengal 731 235

সূচনা

বলাই দেবশর্মার বর্ধমানেব ইতিহাস এবং অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরীর ‘বর্ধমান পরিচিতি’ ব্যতীত বর্ধমান জেলার ইতিহাস নাই। বর্ধমানের ইতিহাস রচনায় জহর সরকার মহাশয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তার ফলাফল এখনও জানতে পারিনি। এই পরিস্থিতিতে বিজয়তোরণ পত্রিকার সম্পাদক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীসুধীর চন্দ্র দাঁ বিরচিত ‘বর্ধমান পবিক্রমা’ মনোযোগ দিয়ে পড়ে চলেছি। অদম্য অধ্যবসায় সহযোগে তিনি বর্ধমানের ইতিহাস রচনা করছেন ও ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ কবছেন।

সভ্যতার আদি যুগ থেকে বর্ধমান রাজের যুগ পর্যন্ত দেখলুম। পর্বে পর্বে তিনি তথ্য বিন্যাস করেছেন। জ্ঞাত ও স্বল্পজ্ঞাত তথ্যগুলি তিনি সমাহরণ ক'রে তাঁর গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গীন রূপ দেবার প্রযত্ন করেছেন। সরেজমিনে তদন্ত ক'বে তিনি ঐতিহাসিক ভূগোলের তথ্যাবলীরও কিছু কিছু সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে, তাঁর এই গ্রন্থখানি প্রামাণ্যরূপেই পরিচিত হবে।

সমগ্র বর্ধমান জেলা পরিক্রমা করে খুঁটিযে সমুদয় তথ্য আহরণ করা কঠিন ব্যাপার। বর্ধমানের নানা সামাজিক পত্রে দীর্ঘকাল ধ'রে প্রকাশিত নানা প্রবন্ধে নানাজনের দৃষ্টিভঙ্গীতে বর্ধমানের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রকীর্ণ নানা অভিমত ব্যক্ত হয়ে আছে। লেখক শ্রী সুধীর চন্দ্র দাঁ সেগুলি সংকলন করে নিলে তাঁর কাজ অনেক সহজ হবে।

শ্রী সুধীর চন্দ্র বিশ্বভারতী বিনয়ভবনের একজন সেরা ছাত্র। তিনি প্রবীন শিক্ষাব্রতী ও আদর্শবাদী সমাজসেবী। তাঁর নিকট আমাদের অনেক প্রত্যাশা। তিনি বর্ধমান পরিক্রমার শেষপর্বে যদি A.L.Basham-এর পরামর্শ মতো ঐতিহাসিক ভূগোলের পরিপেক্ষিতে বর্ধমানের জেলাভিত্তিক ঐতিহাসিক রূপরেখা, পাহাড়ও প্রাচীন ভূসংস্থান, নদনদী বিন্যাস ও সমগ্র বর্ধমান জেলার স্থান নাম ও পরিচয়, সড়ক-যোগাযোগ, নির্দেশিকা ও মানচিত্র ভূষিত ক'রে এই গ্রন্থে যোগ করেন তা হ'লে সোনায় সোহাগা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে লেখক এই তুলনামূলক কাজ ক'রে গ্রন্থখানির সর্বাঙ্গীন রূপ দান করেছেন।

‘বর্ধমান পরিক্রমা’ গ্রন্থাকারে দেখবার জন্যে আমরা উৎসুক হ'য়ে রইলুম। লেখককে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। জেলাবাসীর তরফে এই মহৎ কর্মের জন্য তাঁকে আমাদের আশীর্বাদ জানাই।

পল্লীশ্রী রতনপল্লী,
শান্তিনিকেতন,
২৭.৭.১৯৯১

শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল

গ্রন্থকারের নিবেদন

যুগ ও কালের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে। আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সুরুতে বিদেশীশাসকবর্গই আমাদের ইতিহাস চর্চার হাতে খড়ি দেন। খানিকটা দেশ শাসনের খাতিরে, দেশ ও জাতিকে জানা দরকার বলেই। সেই ইতিহাস আজ পুরাতন কারণ তা ছিল কেবল রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়ার খেলা, তা ছিল কেবল রাজা মহারাজার লড়াই, পুরাতন সাম্রাজ্যের পতন ও নূতন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়। বৃহত্তর মানবসমাজ কিভাবে কোন পরিস্থিতিতে পরিবেশ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম ক'রে বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে—ঔপনিবেশিক ইতিহাস সে কথার বিশ্লেষণ করে না। প্রাচীন কাল থেকে সুরু ক'রে মানবসমাজের এই ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আধুনিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু। History হল (His i.e. man's) story. সেই মানবগোষ্ঠীর সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম ও জীবন প্রবাহকে বাদ দিয়ে যে ইতিহাস তা কেবলই রক্ত মাংস বর্জিত কঙ্কালের দেহ। তাই দীর্ঘদিন আগে বঙ্কিম চন্দ্র আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন, ''বাঙ্গলার ইতিহাস চাই। নইলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না''—। পরবর্তীকালে বাঙলার ইতিহাস রচিত হয়েছে— মনীষী যদুনাথ সরকার, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ বসু, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায় প্রমুখ খ্যাতকীর্ত ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষকবৃন্দ তার পথিকৃৎ। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) ভারতবর্ষকে বর্ণনা করেছেন, 'নৃতত্ত্বের যাদুঘর' (Ethnological museum)। কারণ যুগ যুগ ধ'রে ভারতের বুকে বহু জাতিগোষ্ঠী এসেছে। দ্রাবিড়, আর্য, পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হুন, গুর্জর, তুর্কী, আফগান, মোগল, আবিসিনীয় এবং পরবর্তীকালে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি এদেশে এসেছে। পৃথিবীর এমন একটি দেশও নেই যেখানে এত বিপুল সংখ্যায় এত ভিন্নরকমের জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মিলন-সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণের ফলে উদ্ভূত জাতিকে 'ভারতীয় মহাজাতি' এবং ভারতবর্ষকে ''মহামানবের সাগরতীর'' বলে বর্ণনা করেছেন। দেহের গঠন ও ভাষার বিভিন্নতা অনুসারে ভারতের অধিবাসীদের কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়। সেগুলি হ'ল—নর্ডিক বা আর্য, দ্রাবিড়, নেগ্রিটো, মোঙ্গলীয়, অষ্ট্রালয়েড, ব্র্যাকিসিফেলাস, ভূমধ্যসাগরীয় ও প্রোটোঅষ্ট্রালয়েড জাতিগোষ্ঠী। প্রদেশ ও জেলা স্তরেও আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে উক্ত লক্ষ্মণগুলি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রপরিচালনার বাস্তব প্রয়োজনেই সর্বপ্রথম উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভাবেই আঞ্চলিক তথ্যাবলী সংগ্রহের কাজে মন দেন। প্রশাসনের ভিতকে মজবুত ও সুদূর প্রসারী স্থায়িত্ব আনতেই এই উপমহাদেশের সমাজ, সভ্যতা, বর্ণ-বিন্যাস, জনতত্ত্ব ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইংরেজরা খোঁজ-খবর সুরু করেন। কারণ দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিভিন্ন অঞ্চলের জাতি ও গোষ্ঠীর বর্ণকাঠামো, তাদের বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, পেশা-নেশা, তাদের জীবনদর্শন সম্পর্কে খতিয়ে দেখা অত্যন্ত জরুরী ছিল। Francis Buchanan সর্বপ্রথম বাঙলা ও বিহার প্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা পরিভ্রমণ ক'রে ঐ সব নথিপত্র লিপিবদ্ধ করলেন। এর পরই সরকারীভাবে সুরু হল জনগণনা বা Census Report, প্রস্তুত করা হল District Gazetteer. আর তখন থেকেই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার সুরু। অবশ্য প্রশাসনিক পরিকাঠামো মজবুত করতে ইরেজরাই আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার উপর আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হলেন Block man, Walter Hamilton, W.W. Hunter, K.A.A. Hills প্রমুখ ব্রিটিশ মনীষী বৃন্দ। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ (facts and statistics) ছিল আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার গোড়াপত্তন। এগুলিকে অবশ্য ইতিহাস না বলে পরিসংখ্যান গত দলিল বলাই ভালো। তাতে না ছিল আঞ্চলিক অধিবাসীদের ভাব-ভাবনা ও আবেগ এবং না ছিল জীবনদর্শনের কোন তত্ত্বগত ভাবনা। ছিল শুধুই পরিসংখ্যান ও তথ্য। Hunter সাহেবের Statistical accounts of Bengal (20 Vols)-এর সূত্র ধ'রে দেশীয় ঐতিহাসিকগণ আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতার গণ্ডীকে আরও সঙ্কুচিত ক'রে জেলা পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়। পরিসংখ্যা ও তথ্য তত্ত্বের ভিত্তিতে অনেকটা ইতিহাসাশ্রিত হয়। Hunter-এর Imperial Gazetteers (26 Vols), Oldham-এর Some Historical and Ethnical Aspects of Burdwan Dist, J.C.K. Peterson কৃত Bengal District Gazetteers, walter Hamilton-এর The East Indian Gazetteers of Hindusthan প্রভৃতি ব্রিটিশ গ্রন্থকার দের, গেজেটিয়ারগুলি আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তীকালে দেশীয় ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্বজ্ঞ মনীষী যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, ডি.সি.সরকার, রায় মনোমোহন চক্রবর্তী, রাধাকমল মুখার্জী, ডি.পি.আগরওয়াল, পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ বিদগ্ধগণ বাঙলার ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন দিগন্ত সৃষ্টি ক'রে গেছেন জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে।

কিন্তু জেলাগতভাবে 'নদীয়া', 'হুগলী', 'বীরভূম', 'মেদিনীপুর', 'কুচবিহার', প্রভৃতির ইতিহাস প্রকাশিত হ'লেও আজ পর্যন্ত বর্দ্ধমান জেলার কোন তথ্য, পরিসংখ্যান ও তত্ত্বগত ইতিহাস রচিত হয় নাই। অথচ রাঢ় বঙ্গের বর্দ্ধমান হল কেন্দ্রীয় ভূমি—অতি প্রাচীন জেলা ও জনপদ। বর্দ্ধমানের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক উল্লেখ করেছেন—'রাঢ়বঙ্গে

বৰ্দ্ধমান যেন মধ্যমণি''। ১৯৫৪ খ্রীঅব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের গোলাপবাগ সম্মেলন উপলক্ষ্যে তৎকালীন বৰ্দ্ধমানের কৃতবিদ্য প্রাজ্ঞ বলাই দেবশর্মা 'বৰ্দ্ধমানের ইতিহাস' নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটিই বৰ্দ্ধমান জেলার ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস। পরবর্তীকালে অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় 'বৰ্দ্ধমান পরিচিতি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অনুকূল চন্দ্র সেন বৰ্দ্ধমান জেলা সেটেলমেন্ট আধিকারিক ছিলেন এবং নারায়ণ চৌধুরী সমাজসেবার কাজে নিযুক্ত থাকায় গ্রামজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই দুই ব্যক্তির প্রজ্ঞা ও মনীষার ফসল হ'ল ''বৰ্দ্ধমান পরিচিতি''। এটাই মোটামুটিভাবে বৰ্দ্ধমানের উপর লেখা ইতিহাস ভিত্তিক প্রথম রচনা। আরও প্রকাশিত হয়েছে— ''বৰ্দ্ধমান সম্মিলনীর হীরকজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ'', ''বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের স্মারকগ্রন্থ'', রাখালদাস মুখোপাধ্যায় বিরচিত ''রাজবংশানুচরিত'', আব্দুলগানি খান রচিত কয়েকটি পুস্তিকা ও জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ''বৰ্দ্ধমান জেলার পুরাকীর্তি ও সংস্কৃতি''। এছাড়া দুর্গাপুর, আসানসোল, কালনা ও কাটোয়ার উপর লেখা কিছু কিছু পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে আঞ্চলিক ইতিহাস লেখার তাগিদেই। কিন্তু কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বৰ্দ্ধমান জেলার প্রকাশিত পত্রিকাগুলি ও শারদ সংকলনে প্রতিবৎসর বৰ্দ্ধমান জেলার আঞ্চলিক বহু ইতিহাস ও তথ্য প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে, যা যে কোন জেলার কাছে গর্বের ও বিস্ময়ের বিষয়।

ধৰ্মমঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী দক্ষিণ দামোদরের নিজগ্রাম কৃষ্ণপুর-কুকড়ো থেকে বৰ্দ্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের আশ্রয়ে থেকে কাব্য চর্চা করেন। তিনি ছিলেন বৰ্দ্ধমান রাজের সভাকবি। তিনি লিখেছেন, ''বৰ্দ্ধমান দেশ ভাই সবাকার নাভি''—। আর তাই এই অঞ্চলকেই ধর্মঠাকুর উপাসনার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে বেছে নিয়েছিলেন কবি। শুধু তাই নয়, ধর্মপূজার প্রধান পীঠস্থান বৰ্দ্ধমান জেলা ব'লে নয়, জেলার দক্ষিণাংশ দিয়ে প্রবাহিত নদ দামোদর ধর্মঠাকুরের উপাসকদের কাছেও ছিল পবিত্র, গঙ্গারও অধিক। তাঁদের মতে ''সত্যের গঙ্গা দামোদর'', ''আদ্যের গঙ্গা দামোদর''। বৰ্দ্ধমানের গ্রামাঞ্চলে গ্রামদেবতা ও মেলা, উপকথা ও লোকগাথার মধ্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গ প্রদেশের মধ্যে জেলা বৰ্দ্ধমানের গুরুত্ব প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। সেই ধারাবাহিকতা আজও বজায় রয়েছে। অবশ্য আগে ছিল বৰ্দ্ধমান-ভুক্তি, ভুক্তি অর্থ প্রদেশ। সেকালের সুহ্মভূমি অর্থাৎ দু হাজার বছর আগেকার বৰ্দ্ধমান প্রদেশই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ। সেকালে কোন জেলা বিভাগ ছিল না। প্রায় চতুর্থ শতাব্দীতে বাঙলা প্রদেশ দুটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত ছিল— উত্তর ও দক্ষিণ। সুহ্মভূমি অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গ ও বজ্রভূমি (বাহ্যভূমি) অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ। পরবর্তীকালে দক্ষিণ প্রদেশের (অর্থাৎ সুহ্মভূমির) প্রধান নগর বৰ্দ্ধমানের নামানুসারে এই দেশের নাম হয়েছিল বৰ্দ্ধমানভুক্তি। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন এনগর এখনকার বৰ্দ্ধমান নগরী নয়। জৈনদের প্রাচীনতম শাস্ত্র গ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে ভগবান মহাবীরের 'লাঢ়' (রাঢ়) দেশে ভ্রমণ প্রসঙ্গে ''সুবভভূমি'' (সুহ্মভূমি) ও ''বজ্জভূমির''র উল্লেখ আছে।

''মহাবীরের'' পরিভ্রমণের উক্তভূমি দুটি 'উত্তর রাঢ়' ও 'দক্ষিণ রাঢ়' নামে খ্যাত হয়। সুহ্মভূমি হ'ল দক্ষিণ রাঢ় ও বজ্জভূমি হ'ল 'উত্তর রাঢ়'। পালরাজাদের আমলে এই রাঢ় বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তার সীমারেখা কি ছিল—তা জানা যায় না। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন অজয়ের উত্তরাংশ উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণ রাঢ়। রাঢ় দেশে বসবাসকারী অধিবাসীদের বলা হ'ত 'রেঢ়ে'। দেশবাচক শব্দ জাতি বাচক হয়ে যায়। মুকুন্দ রাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলে বলছেন :

অতিনীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।।

ইতিহাসগ্রাহ্য দলিল পত্রে বর্দ্ধমানভুক্তির প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেল ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মল্লসারুলে প্রাপ্তভূমিদান পত্রে। বর্দ্ধমান জেলার পশ্চিমাংশ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল ভূতত্ত্বের দিক থেকেও খুব প্রাচীন। প্রাগিতিহাস ও প্রত্নইতিহাসের দিক দিয়েও এই অঞ্চলের প্রাচীনত্বের প্রমাণ মিলেছে। দুর্গাপুরের পশ্চিম-দামোদর তীরবর্তী এলাকা, বীরভানুপুর এবং পূর্বে পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও অজয়নদতীরবর্তী মঙ্গলকোট, দক্ষিণ দামোদরের কাইতি, উচালন এবং আসানসোল মহকুমার বরাকর প্রভৃতি এলাকায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন, শিলালিপি, প্রস্তরমূর্তি, তাম্রাশ্মীয় যুগের পুতুল, ফলক, বাসন কোসন, পোড়ামাটির দ্রব্য সামগ্রী, পোড়াচাল, ভাস্কর্য ও প্রত্নসম্পদ থেকে প্রতীয়মান হয় যে এই জেলা খ্রীঃ পূঃ আড়াই হাজার বৎসরেরও পুরাতন, প্রাচীন।

আমি গর্বিত যে এ হেন এক সুপ্রাচীন কীর্তিস্থলের চালচিত্র আমার পিছনে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আনন্দমঠ উপন্যাসের শেষে বলেছেন, 'জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে, বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে''। যুগ যুগ ধ'রে বহমান জীবনতরঙ্গ মানবসাগরতীরে আছড়ে পড়ছে, জন্ম হচ্ছে নব নব তরঙ্গমালার। অতীতের মৃত ফসিল বর্তমানের কলনাদে মুখর ও বাঙ্ময় হ'য়ে ওঠে। আমার ''বর্দ্ধমান পরিক্রমা'' সেই অতীতের লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস। বিগত চল্লিশ বৎসর যাবৎ আমি বর্দ্ধমান জেলার গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে ঘুরেছি সমাজসেবা ও স্বদেশব্রতের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। গ্রাম ও মানুষকে জানার দুনির্বার আকর্ষণ আমাকে বাল্যকাল থেকেই গ্রাম থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছে গ্রামান্তরে, টেনে নিয়ে গিয়েছে জেলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকা বরাকর থেকে দক্ষিণের হুগলি জেলার প্রান্ত রেখা দামুন্যা, আবার পূর্বপ্রান্তে কাটোয়া, কালনার গঙ্গানদীর তীরবর্তী গ্রাম গুলিতে। প্রাচীন এই জেলার রুক্ষ্ম ও পাথুরে লালমাটির খোয়াই কে পিছনে রেখে রক্তিম সূর্যের অস্ত যাওয়া বিস্মিত হয়ে দেখেছি, দরিদ্রের কুটিরে নিশ্চিন্ত অথচ অভাবক্লিষ্ট জীবন অবাক হ'য়ে দেখেছি, দেখেছি— ''শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া।'' দেখেছি কৃষি এলাকায় নয়নাভিরাম সবুজ ধানক্ষেতের বিরামহীন ঢেউ। মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি গভীর মমত্ব বোধ এবং ভালোবাসাই আমাকে ''বর্দ্ধমান পরিক্রমা'' লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস'' গ্রন্থে বলেছেন,

"আমার বাঙলাদেশ ও বাঙালী জাতি প্রাচীন পুঁথির পাতায় নাই, রাজকীয় লিপিমালায় ও নয়; সে দেশ ও জাতি আমার চোখের সম্মুখে ও হৃদয়ের মধ্যে বিস্তৃত ও বিচরমান। প্রাচীন অতীত আজিকার সদ্য বর্তমানের মতই আমার কাছে সত্য ও জীবন্ত। সেই সত্য জীবন্ত অতীতকে আমি ধরিতে চাহিয়াছি এই গ্রন্থে, মৃতের কঙ্কালকে নয়"। আমার বর্দ্ধমান পরিক্রমা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য।

চৈতন্যজীবন কাব্য "চৈতন্য চরিতামৃতের" কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যলীলার বর্ণনায় যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রদর্শন ক'রেছেন তা তুলনাহীন। পূজারীর নৈবেদের মত ভক্তিশ্রদ্ধা মিশ্রিত মন ও মননের এমন নিঃসঙ্কোচ নিরভিমান প্রকাশ একান্তই দুর্লভ। গ্রন্থ রচনাকালে নিজের শক্তি সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি নিজেকে অকিঞ্চিৎকর "ক্ষুদ্রজীব পক্ষীরাঙা টুনি" বলে বর্ণনা করেছেন—

"আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙা টুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি।"

আমার বর্দ্ধমান পরিক্রমা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। বর্দ্ধমান জেলার মত বিশাল, বিরাট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা, তার সুপ্রাচীন প্রতিহ্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপরেখার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার ক্ষমতায় আমিও "ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙা টুনি"। একার পক্ষে একাজ দুঃসাধ্য। কিন্তু তবুও আমার বিগত চল্লিশবছরের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানস্পৃহাকে সম্বল ক'রে সংগৃহীত পুঁথি, পাণ্ডুলিপি, দলিল-দস্তাবেজ, নথিপত্র, পুস্তক ও মন্দির মসজিদের ভাস্কর্য ও সংগ্রহালয়ের বস্তুর ভিত্তিতে যে "বর্দ্ধমান পরিক্রমা" রচনা ক'রেছি— তা হ'ল অতীত বর্দ্ধমান থেকে আধুনিক বর্দ্ধমানের সীমারেখা পর্যন্ত এক বহমান জীবন কাহিনী। গবেষণা পূর্বক নূতন কিছু আবিষ্কার ক'রেছি— এ দাবি আমি করি না। যা ছিল অনাদৃত, লোকচক্ষুর অগোচরে, যা ছিল লুককায়িত দুষ্প্রাপ্য নীরস প্রাচীন গ্রন্থের ভিতর— সে গুলিকেই আমি কালানুক্রমিক সাজিয়ে পারম্পর্য বজায় রেখে ভাব-ভাবনা ও আবেগ দিয়ে বাণীমূর্তি দান ক'রেছি মাত্র।

পাদটীকা কণ্টকিত গ্রন্থের প্রতি বিরাগ সাধারণ পাঠকের— এ সর্বজন বিদিত। তাই আমি পাদটীকা ব্যবহার করি নাই, কারণ সাধারণ পাঠকের কাছে পাদটীকার প্রয়োজনের চাইতে গ্রন্থের সজীবতা ও সরসতা বেশি প্রয়োজন। তাতে গ্রন্থের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটায় না। যারা অনুসন্ধিৎসু ও বিশেষভাবে কৌতূহলী তাদের জন্য প্রতি অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থসূত্রের তালিকা লিপিবদ্ধ ক'রেছি। আমার এই "বর্দ্ধমান পরিক্রমা" রচনায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন অনেকেই, অনেকেই পত্র দিয়ে প্রশংসা করেছেন— তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল পাণ্ডুলিপির অদ্যন্ত পড়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

জ্ঞানতাপস ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রন্থটির পাঠ নীরবে শুনেছেন। তিনি,

কয়েকটি ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে একমত হ'তে পারেন নি, তবু তাঁর অনুরোধেই আমি সেগুলিকে বর্জন না করে গ্রন্থে স্থান দিয়েছি এই জন্য যে সেগুলি আগামী দিনের ঐতিহাসিক ও গবেষকদের ''জাবর কাটার'' খোরাক হয়ে থাকবে। এঁরা উভয়েই দুটি মুখবন্ধ লিখে গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন। গ্রন্থের অবয়ব বৃহৎ হ'লে সাধারণ পাঠকের ধৈর্য থাকে না, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই সংক্ষিপ্তভাবে বলবার কথা বলেছি— কালানুক্রমিক বিবর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস, সমাজও সভ্যতার বিবর্তন, ধর্মপ্রবাহ, মোঘল-পাঠান দ্বন্দ্ব, মারাঠা-আক্রমণ, রাজশক্তির পালা বদল, গ্রাম দেবতা ও মেলা, সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্ব, শিক্ষার বিবর্তন, গ্রাম-গঞ্জ-ব্লক ও শহরের ইতিবৃত্ত, পত্র ও পত্রিকা ও বর্দ্ধমানের সমস্ত গ্রামের নাম এতে লিপিবদ্ধ করেছি। ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধী। আরও নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতত্ত্ব অন্বেষণে ব্যাপৃত আছেন। খনন কার্যের মাধ্যমে আরও অনাবিষ্কৃত তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহালয়ের কিউরেটের শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ সামন্ত তাঁর সংগৃহীত কিছু পুরাতত্ত্বের, ছবি তুলতে দিয়ে আমায় সহযোগিতা করেছেন তাঁর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার ছাত্র শ্রীমান দেবনাথ মৈত্র অশেষ কষ্ট স্বীকার করে ছবিগুলি তুলেছেন।

এই বছর ১৯৯১ খ্রীঃ কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি বলে আমরা উৎসব করেছি, আমাদের কলকাতা, গর্বের কলকাতা। কিন্তু আমাদের বর্দ্ধমান ? প্রাচীন বর্দ্ধমান নগরী কোথায় ছিল ? বাঁকা নদীর তীরে না বল্লুকা নদীর তীরে— যে নদী আজ মরে গেছে। যে প্রাচীন বর্দ্ধমান আজ মাটির তলায় আগামী দিনের গবেষকের কাছে অভিশপ্ত অহল্যার মত মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। আধুনিক বর্দ্ধমান আজকের বর্দ্ধমান নগরী। ইংরেজ বণিক 'জবচার্ণক' কলিকাতার পত্তন করেন, আর ভারতীয় বণিক সঙ্গম রায় ষোড়শ শতকের শেষে বর্দ্ধমান এসেছিলেন, প্রথম বসতি স্থাপন করেছিলেন বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে। এই বর্দ্ধমান রাজবংশই আধুনিক বর্দ্ধমানের স্থপতি। তাহলে এই বর্দ্ধমান নগরীর বয়স কত হ'ল ? চারশ বছর নয় কি ? ডঃ সুকুমার সেন গ্রন্থের মুখবন্ধে কী এই ইঙ্গিতই করেছেন ? তাহলে আমাদেরও কী উচিত নয়— ''বর্দ্ধমান চারশ'' উৎসব পালন করা ? এই গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল ১৯৯১-এর অক্টোবরে, কিন্তু অনিবার্য কারণ বশতঃ এক বছর গড়িয়ে যায়। ইতি মধ্যে ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেন প্রয়াত হয়েছেন। এই গ্রন্থের প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাই তাঁর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।

গ্রন্থের মধ্যে ''বর্দ্ধমান'' বানানটি প্রাচীনত্ব বোঝাতে আমি আগাগোড়াই ব্যবহার করেছি, আধুনিক যুগের কাছাকাছি এসে তাকে ''বর্ধমান'' করেছি। ''বিজয়তোরণ'' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এই গ্রন্থের অনেকগুলি অধ্যায় প্রকাশিত হবার পর পুস্তকাকারে এটি প্রকাশ করতে মনস্থ করি। এই সময় পরম স্নেহভাজন অধ্যাপক শ্রী বৈদ্যনাথ ঘটক মারফত বুক সিণ্ডিকেটের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীবিপ্লব ভাওয়ালের কাছ থেকে

গ্রন্থটি মুদ্রণের আমন্ত্রণ আসে। সুন্দর ও পরিপাটি মুদ্রণের জন্য ও গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য আমি শ্রীবিপ্লব ভাওয়াল ও বুক সিণ্ডিকেটের কর্মীদের কাছে ঋণী রইলাম। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমলব্ধ ফসল "**বর্দ্ধমান পরিক্রমা**" জ্ঞান পিপাসু ও সাধারণ পাঠকদের কাছে সমাদৃত হলে আমি কৃতার্থ ও নিজেকে ধন্য মনে করবো। দেশ-ঋণ পালনের দুরাশা থাকা উচিত নয়। কিন্তু আমার জন্মভূমি বর্দ্ধমানের কাহিনী বলতে পেরে "দেশ-ঋণ" পরিশোধের কণামাত্র ও দান করতে পারবো এ.কথা মনে রেখেই নিবেদন শেষ করছি।

● কালীকৃষ্ণসদন ●
১৯ ডি.এন.মিত্র লেন,
বর্দ্ধমান ৭১৩ ১০১

সুধীরচন্দ্র দাঁ

প্রথম পর্ব

প্রথম অধ্যায়

উৎস ও প্রেক্ষাপট

সূচনা ও পরিসীমা

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গেব বঙ্গ প্রদেশান্তর্গত "বর্দ্ধমান" অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যসম্পন্ন। বর্দ্ধমানের ভৌগোলিক অবস্থান ২২° ৫৬' ও ২৩°৫৩' অক্ষাংশ এবং ৮৬°৪৮' ও ৮৮° ২৫' দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। উত্তর-পূর্বাংশে অজয় ও দক্ষিণ পশ্চিমাংশে দামোদর নদ জেলার মূল সীমারেখা টেনে দিয়েছে। দেখতে ঠিক একটি হাতুড়ির মত— আসানসোল শিল্পাঞ্চল থেকে মানচিত্রের আকৃতি ক্রমশঃ স্থূলকায় হতে হতে কাটোয়া, কালনা ও সদর মহকুমায় স্ফীত হয়ে গেছে। বর্তমানে আসানসোল, দুর্গাপুর, সদর, কালনা, কাটোয়া—মোট পাঁচটি মহকুমা নিয়ে এই বর্দ্ধমান জেলা। ভাগীরথী, অজয়, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, বেহুলা, বাঁকা, কুনুর ও খড়ি নদীর অববাহিকায় অবস্থিত বর্দ্ধমানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রুক্ষ-অনুর্বর, কিন্তু গর্ভে কালো সোনায় ভর্ত্তি —কয়লা, আর দক্ষিণাঞ্চলে সবুজ শস্যক্ষেত। কৃষকজীবনের সম্পদ—আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত প্রতীক। একদিকে শিল্পাঞ্চলের কর্মচঞ্চলতা, প্রাণবন্যা, আর অন্যদিকে সোনালী শস্যের উন্মাদনা বর্দ্ধমানকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে। উত্তরে বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলা ও পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার আংশিক, পূর্বদিকে ভাগীরথী নদী—অপরতীরে নদীয় জেলা, দক্ষিণে হুগলী জেলা, বাঁকুড়া জেলা ও পুরুলিয়ার কিয়দংশ আর পশ্চিমে বিহার রাজ্য। আয়তন ৭০২৪ বর্গ কি.মি, জনসংখ্যা ৪৮ লক্ষের মত।

গুপ্তযুগে তিনটি ভুক্তির অস্তিত্ব ছিল। পুণ্ড্র বর্দ্ধনভুক্তি, বর্দ্ধমানভুক্তি এবং একটি নামহীনভুক্তি। অষ্টম শতকে গৌড়ের রাজধানী ছিল বর্দ্ধমানের চম্পাইনগরী। গৌড় বলতে তখন গোটা রাঢ় দেশকেই বোঝাত। ষোড়শ শতকের রাঢ়কে গৌড় বলত। বর্দ্ধমানভুক্তি বলতে দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ় মণ্ডলের ক্ষেত্র বোঝাত। দক্ষিণে বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যা, হুগলী জেলার নবগ্রাম ও হাওড়া জেলার ভুরশুট এলাকা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। অজয় ও দামোদর মধ্যবর্তী অধিকাংশ অঞ্চল দক্ষিণ রাঢ়ের মধ্যে ছিল। উত্তর রাঢ় মণ্ডল ছিল বর্তমান বর্দ্ধমানের উত্তর সীমানা পর্যন্ত। অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ় মণ্ডলই বর্দ্ধমানের প্রাচীন রূপ। জৈন ধর্মগ্রন্থ 'প্রজ্ঞাপন। সূত্র' এই স্থানটিকে লাঢ় বা রাঢ় দেশ বলেছে। হিউয়েনসাঙের ভ্রমণ বিবরণী থেকে এই বর্দ্ধমানভুক্তির স্বরূপ জানা যায়। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে বর্দ্ধমান অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিস তার বিখ্যাত 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে বর্দ্ধমানের উল্লেখ করেছেন।

জৈন "আচারাঙ্গ" সূত্রে বর্দ্ধমানভুক্তিকে সূহ্ম ভূমি বলা হয়েছে। ভুক্তি অর্থে প্রদেশ। মহাভারতের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার নীলকণ্ঠ সূহ্ম প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলেছেন। ঐতিহাসিক স্মিথ History of India গ্রন্থে অশোকের রাজত্বকে সুদূর বর্দ্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ বর্দ্ধমান যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার বহু নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। গুপ্ত যুগের মুদ্রা, শিলালিপি, মূর্তি প্রভৃতি বহু জিনিষ বর্দ্ধমান জেলার গ্রামাঞ্চল– ভাতাড়, মঙ্গলকোট, আউসগ্রাম, গলসী, মশাগ্রাম প্রভৃতি স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের আমলেও বর্দ্ধমান কোটির উল্লেখ পাওয়া যায়। শশাঙ্কের আমলের অনেক নিদর্শনও বর্দ্ধমানের গ্রামাঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। দশম শতকের ইর্দালিপিতেও বর্দ্ধমান ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীতে অস্তমিত পালরাজ গৌরবসূর্য মহারাজ কান্তিদেব সেই যুগের বর্দ্ধমানপুরীর রাজা ছিলেন। পালবংশের পতনের মুখে সদগোপ বংশজাত ইছাই ঘোষ বর্দ্ধমানে সপরাক্রমে রাজত্ব করেছিলেন। কাঁকসার জঙ্গলে শ্যামারূপার গড়, ইছাই ঘোষের দেউল–খ্যাতির নিদর্শন হয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। অমরারগড়ের প্রাচীন রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভালকিতে রাজত্ব করতেন। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যে সব পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধ সভ্যতার জ্ঞানগরিমায় বর্দ্ধমান সে সময় উদ্ভাসিত ছিল।

সভ্যতা ও ঐতিহ্য

রাঢ়ের মধ্যমণি বর্দ্ধমান তাই প্রাচীন। বঙ্গাব্দ ১৩০৮ সালে দুর্গাপুরের দক্ষিণদিকস্থ দামোদর নদের তীরে একটি প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। বিখ্যাত প্রত্নবিদ্ ননীগোপাল মজুমদার ঐ স্থানের ভূপৃষ্ঠ অনুসন্ধান করে এই প্রাচীন রাঢ়ের সভ্যতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন। এই ঘটনার বিশ বৎসর পরে দুর্গাপুরের সন্নিকটে মৃত্তিকা গর্ভ হতে বহু প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। তা থেকে বলা যায় বর্দ্ধমানের সভ্যতা পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বহির্বিকাশ থাকলেও প্রধানতঃ এটি আত্মনিষ্ঠ। সংস্কৃতি হলো স্বভাবের সংস্কার, জীবন ধারার বিবর্তন। বহমান জীবনস্রোতে যে ভাব-ভাবনা ও ধ্যান ধারণার স্বরূপোলব্ধি–তারই অনুগামী হল এই সংস্কৃতি, এই সভ্যতা। একটি দেশ ও জাতির আত্মানুসন্ধানে এর স্থিতি, আত্মবিস্মরণে এর মৃত্যু। রামায়ণের আদি কবি বাল্মীকি বা নৈমিষারণ্যের মুনিগণ যে স্থানে তপশ্চর্যায় নিযুক্ত ছিলেন, কিম্বা শঙ্করাচার্য যে পর্ণকুটিরে বেদান্ত ব্যখ্যা করেছিলেন, কিম্বা ভগবান তথাগত যে বোধিবৃক্ষের নীচে মোক্ষলাভ করেছিলেন–একি শুধু গল্প বা Story? হিমালয়ের গুপ্ত গুহায় কৌপীন সম্বল ভস্মমাখা সন্ন্যাসীদের ইউরোপ বিদ্রূপ করতে পারে– কিন্তু ভারতের ঐ হলো অন্তরাত্মা, জীবনধর্ম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করতে হলে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি চাই।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির দুটি ধারা— একটি আর্য, অপরটি অনার্য বা আসুরিক। আসুরিক সভ্যতা দেহকেই পরম বস্তু বলে জানে,— তোষণে-পোষণে, ভোজনে-প্রসাধনে আত্মসুখকেই সার বলে মনে করে। এই দেহবাদী আত্মসুখমগ্ন সভ্যতার ভোগবিলাসই ছিল জীবনধর্ম—প্রয়োজনীয়, অতি প্রয়োজনীয় ভোজ্য এবং সুখ সম্ভোগের জন্য চাই—তিলোত্তমা নারী। প্রাচীন ইউরোপ তাই লালসায় নিমগ্ন থেকে বলেছিল—We want food and fairest women.

ভগবান যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপের জীবনধর্ম ছিল তামসিক। অনাচার ও অসামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের অবসান ঘটাতে যীশুকে আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। আর ভারতবর্ষে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে রাজপুত্রকে সিংহাসন ত্যাগ করে বোধিবৃক্ষের তলে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাই ভারতবর্ষের একটি স্বাভাবিক জীবনধারা বহমান স্রোতে কাল থেকে কালান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। সেটি হলো—সহিষ্ণুতা, মৈত্রী ও উদারতা। অপরের বিশিষ্টতাকে ধ্বংস না করে তাকে আত্মলীন করা—

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

ভারতের এই সভ্যতার আদর্শ হল— তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা, ত্যাগ করে ভোগ কর। এই আর্যসভ্যতা বলে, ন বিত্তেন তর্পণীয় মনুষ্যাঃ— ধনের দ্বারা মানুষের তৃপ্তি হতে পারে না। কারণ পার্থিব বিত্ত তো খুবই সামান্য, অল্প। এতে সুখ নাই, তৃপ্তি নাই। নাল্পে সুখমস্তি, সুখ ভূমায়— ভূমৈব সুখম্। আত্মাই ভূমা— আত্মানং বিদ্ধি। বেদ ও উপনিষদের আদর্শে এই রাঢ় বঙ্গ আলোকিত।

ঔপনিষদিক প্রজ্ঞান তাকে দৃশ্যমান করেছে—
শোত্রস্য শোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।

রাঢ় সভ্যতা বৈদিক সাধনা-সম্ভূত, রাঢ় সভ্যতার সংস্কৃতি উপনিষদের রসে পুষ্ট। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পর্যন্ত সেই বেদ ও উপনিষদের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। রাঢ় বর্দ্ধমানও সেই বৈদিক সংস্কৃতির স্রোতোধারায় পরিস্নাত। এরই নাম দেশধর্ম। বর্দ্ধমানের অধিদেবতা, গ্রাম দেবতা-তার অন্তরাত্মা। বর্দ্ধমানের ভূগর্ভে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুরাকীর্তিগুলি সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশধর্মের আন্তঃপ্রকৃতিই তার ভাবভাবনা, কর্ম-সাধনা, আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। গীতায় একেই স্বধর্ম বলা হয়েছে। স্বধর্মের প্রকৃতিই হলো কোন জাতিকে নম্র, কোন জাতিকে হিংস্র, কোন জাতিকে স্নেহপরায়ণ আবার কাউকে উগ্রস্বভাবে পরিণত করা। দেশধর্মের প্রভাবেই কেউ ভক্ত, কেউ জ্ঞানী, কেউ সাধু, আবার কেউ তস্কর।

রাঢ়ভূমির মধ্যমণি এই বৰ্দ্ধমান বিভাগকে স্বধর্ম একটি বিশিষ্টতা দান করেছে। সমগ্র বঙ্গের মধ্যে একমাত্র রাঢ় বৰ্দ্ধমানই সেই সংস্কৃতির অন্তঃসলিলাকে সযত্নে লালন করে চলেছে। অন্য জেলাগুলিতে অল্প বিস্তর বিভিন্ন স্বভাবের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই এখানের অধিবাসীরা একদিকে শ্রমজীবি, কৃষিজীবি, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি অন্যদিকে শিল্পনগরীর কর্মকেন্দ্রিক জীবনচর্যা তাদের রক্ষণশীল, পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু করে তুলেছে। এখানের অধিবাসীদের আচার-আচরণ সহজাত স্বভাবের প্রতিরূপ। যেন গোটা রাঢ় অঞ্চলের ক্ষুদ্র একটি প্রতিচ্ছবি এই রাঢ় বৰ্দ্ধমানে দীপমান, সমুজ্জ্বল। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও বৰ্দ্ধমানের উল্লেখ আছে—তাই বৰ্দ্ধমান অতি প্রাচীন ভূখণ্ড। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব এই রাঢ়ভূমে এসেছিলেন। তার প্রমাণ অজয় নদের তীরে পাণ্ডবেশ্বর পল্লীর উপকণ্ঠে পাণ্ডবেশ্বর মন্দির পঞ্চক।

এই ধরণের একটি গল্প মহাভারতের আদিপর্বে আছে, বিভিন্ন পুরাণেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রজনদের (পৌণ্ড্রের বা বরেন্দ্রের অধিবাসী) অন্ধ্র, শবর, পুলিন্দ ও মোতিব আদিবাসীদের আত্মীয় জন বলা হয়েছে। পুণ্ড্রজন অঙ্গ (বিহার), বঙ্গ (বাংলাদেশ), কলিঙ্গ (উৎকল প্রদেশ) ও সুহ্ম (দক্ষিণবঙ্গ) জনদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। মহাভারতের কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের সঙ্গে বঙ্গদেশের ঘোর যুদ্ধ হয় এবং মহাভারতের এই নায়কগণ বিজয়ী হন। এঁদের মধ্যে ভীমের দিগ্বিজয়ই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভীম মুদ্গরের (বর্তমান মুঙ্গের) রাজাকে নিহত করে বঙ্গরাজকে আক্রমণ করেন ও পরাভূত করেন। অর্থাৎ মহাভারতের নায়ক শ্রী কৃষ্ণ, অর্জুন ও ভীম রাঢ়দেশেও এসেছিলেন ও যুদ্ধবিগ্রহে পরাক্রম দেখিয়েছিলেন। মহাভারতের নায়কগণ পৌণ্ড্রদেশে (বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ), রাঢ় অঞ্চল ও সুহ্মদেশে (বর্তমান মেদিনীপুর ও হুগলী) এসেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এটা কিম্বদন্তী অথবা ঐতিহাসিক—তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চভ্রাতা যে এখানে শিব-আরাধনা করেছিলেন ভাবতে ভালো লাগে এবং পাণ্ডবেশ্বর জায়গাটির নির্জনতা দেখে অজ্ঞাতবাসের উপযুক্ততা খুঁজে পাওয়া যায়। বেহুলা নদী ও গাঙপুর (গাঙুর) আমাদের বেহুলা লখিন্দরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেকে মনে করেন বৰ্দ্ধমানেই চাঁদসদাগর রাজত্ব করতেন। তাই বৰ্দ্ধমানের অনতিদূরে কাঁদরসোনা (কর্ণসুবর্ণ) গ্রাম এবং গাঙুর-বেহুলা নদী— আমাদের মনসামঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্ত্তমান গলসীর কাছে কসবা-চম্পাই নগরে চাঁদসদাগরের প্রাসাদ ছিল। পাণ্ডুরাজার টিবিতে পুরাতন চার হাজার বছরের শিলালিপি, মূর্তি ও খোদাই করা পাথরের জিনিষপত্র পাওয়া গেছে। দুর্গাপুরের কাছে ভরতপুরে ও বীরভানুপুরে দামোদরের গর্ভে বহু মূর্তি ও জিনিষপত্র পাওয়া গেছে এবং বৰ্দ্ধমানের আলমগঞ্জে যে বৃহৎ শিবলিঙ্গটি পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যায় বৰ্দ্ধমানের ঐতিহ্য মহেঞ্জোদড়োর চেয়ে প্রাচীন।

বর্দ্ধমান ভুক্তি

প্রাচ্য বিদ্যার্ণব নগেন্দ্র বসুর অভিমত, বর্দ্ধমান ভূমি পূর্বে একটি ভুক্তি ছিল। এখন যেমন প্রদেশ, তখন তেমনি ভুক্তি। রাঢ় দেশের দুইটি রাষ্ট্রবিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। ষষ্ঠ শতকের মল্লসারুল লিপি, দশম শতকের ইর্দালিপি, লক্ষ্মণসেনের নৈহাটি ও গোবিন্দপুর লিপিতে বর্দ্ধমানভুক্তির পরিচয় পাওয় যায়। ইর্দালিপিতে দেখা যায়, দণ্ডভুক্তি অথাৎ দাঁতন পর্যন্ত বর্দ্ধমানভুক্তির সীমা বিস্তৃত। কিন্তু পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বোধ হয় দক্ষিণে বর্দ্ধমানভুক্তির এত বিস্তার ছিল না। কারণ বরাহ্-মিহির গৌড়ক, বর্দ্ধমান ও তাম্রলিপ্তককে পৃথক পৃথক জনপদ বলে উল্লেখ করেছেন। পাল ও সেন রাজাদের আমলে দণ্ডভুক্তি ছাড়াও বর্দ্ধমানভুক্তির আরও তিনটি বিভাগ ছিল, সেগুলি হল – উত্তররাঢ়, দক্ষিণ রাঢ় ও পশ্চিম খাটিকা। দণ্ডভুক্তি সাধারণতঃ তাম্রলিপ্ত (বর্তমান মেদিনীপুর জেলা) জনপদেরই অর্ন্তভুক্ত বলে অনুমান করা যায়। পশ্চিম খাটিকা বর্ত্তমান হাওড়া ও গঙ্গার পশ্চিম তীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারততীর্থ কবিতায় লিখেছেন,

"কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা"

একথা বর্দ্ধমানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বহু জাতি এই বর্দ্ধমানে এসেছে, তারা সংঘর্ষের পর রাঢ়ের সংস্কৃতির মহাসমুদ্রে লীন হয়েছে। বর্দ্ধমানের সুপ্রাচীনতার অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ আলেকজাণ্ডারের সৈন্য চমুর সঙ্গে গঙ্গারাঢ়ী সৈন্যের সংঘর্ষ। এই বর্দ্ধমানেই গঙ্গারাঢ়ী সৈন্য খুবই পরাক্রমশালী ছিল। গ্রীক বাহিনী বঙ্গদেশ আক্রমণ করতে এসে গঙ্গারাঢ়ী সৈন্যের বলবীর্যের কাছে থমকে যায়। গ্রীক সাহিত্যে বর্দ্ধমান অধিপতি ও তাঁর পরাক্রমশালী গঙ্গারাঢ়ী সৈন্যের উল্লেখ আছে। মেগাস্থিনিস, প্লিনি, দিওদোরাস প্রভৃতি গ্রীক লেখকগণ এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। রোমান মহাকবি ভার্জিল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে তাঁর Georgics গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, তিনি তাঁর জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং রোমসম্রাটের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার গোপুরম দ্বারে গঙ্গারাঢ়ীদিগের অপূর্ব বীরত্বের চিত্র খোদাই করে রাখবেন।

যে সময় গ্রীকবাহিনী বর্দ্ধমানভুক্তির আক্রমণের মনস্থ করেন, সে সময় বিখ্যাত পর্যটক ঐতিহাসিক প্লিনির বিবরণ থেকে জানা যায়, ষাট হাজার পদাতিক, সহস্র অশ্বারোহী, সাতশত হস্তী রাঢ় নরপতির পরাক্রম হিসাবে গণ্য করা যায়। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে পেরিক্লিস বর্দ্ধমানভুক্তির বাণিজ্য সম্পদের বর্ণনা দিয়েছেন– গঙ্গার বন্দর হতে উচ্চ মূল্যের সূক্ষ্ম বস্ত্র, প্রবাল ও নানাবিধ সৌখীন দ্রব্য বিদেশে বাণিজ্য

সম্ভাররূপে প্রেরিত হত। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতকেও বর্দ্ধমানভুক্তির রাঢ় নাম পাওয়া যায়। তখন এই ভুক্তি উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় নামে বিভক্ত ছিল।

উত্তর রাঢ় ছিল বৌদ্ধ প্রভাবিত এবং দক্ষিণ রাঢ়ে ছিল ব্রাহ্মণ্য প্রভাব। উত্তরে ছিল পালবংশের শাসন এবং নিম্নে দক্ষিণে ছিল শূর ও দাসবংশের আধিপত্য। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মল্লসারুলে প্রাপ্ত মহারাজ বিজয়সেনের (রাজত্বকাল ৫০৭ খ্রীঃ অঃ হতে ৫৪৩ খ্রীঃ অঃ) তাম্রশাসন লিপিতে (D. C. Sarkar) বর্দ্ধমানভুক্তির উল্লেখ আছে– 'পুণ্যোত্তরজনপদাধ্যাসিতায়াং সতত ধর্মক্রিয়া বর্দ্ধমানায়াং বর্দ্ধমানভুক্তৌ। (Para 3)

খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতকে বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রশাসনে বর্দ্ধমান ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। "ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড" একখানি প্রাচীন পৌরাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে 'বৰ্দ্ধমান মণ্ডলের' উল্লেখ আছে– তা ২০ যোজন বিস্তৃত। আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' খ্রীষ্টিয় দশম শতকের রচনা। এই গ্রন্থের মতে অজয় নদের দক্ষিণে, শিলাবতীর উত্তরে, গঙ্গার পশ্চিমে, দ্বারকেশী নদের পূর্বে দৈর্ঘ্যে ১১যোজন, প্রস্থে ৮ যোজন–এই বর্দ্ধমান। 'ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে' আছে, দামোদর নদ বর্দ্ধমানের মধ্য দিয়ে বহে চলেছে। অন্যান্য নদীর নাম মুণ্ডেশ্বরী, বকুল ও সরস্বতী। মুণ্ডেশ্বরী খাল ও মুণ্ডেশ্বরী দেবী দক্ষিণ দামোদরের গোপালবেড়া ও কাইতি গ্রামে আজও আছে। বকুল নদী সম্ভবতঃ প্রাচীনকালের বেহুলা বা বল্লুকা নদী ও সরস্বতী সম্ভবতঃ বর্ত্তমানের খড়ি নদী। এই ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে আছে– বর্দ্ধমানভুক্তি বহু নগর ও গ্রাম নিয়ে গঠিত। একসময় বর্দ্ধমান বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে প্লাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধ সহজিয়া বাদ বিভিন্ন 'ধর্মপূজার' মধ্যে এখনও অবশেষ রয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নেড়ানেড়ী– বৌদ্ধ নাঢ় ও নাঢ়ীর হিন্দুরূপ ছাড়া কিছুই নয়। জৈনদের 'বৰ্দ্ধমান'ই এই বৰ্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল। গ্রীক রচনায় যে পোর্টালিস বা Portalis এর উল্লেখ আছে, বিখ্যাত ফরাসী প্রত্নবিদ সেন্ট মার্টিন বর্ত্তমান 'বর্দ্ধমানকেই' পোর্টালিস বর্তমানের পারতালিত বলে উল্লেখ করেছেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এদেশে এসে যে পর্যটন কাহিনী লিখেছেন, তাতে বর্দ্ধমান ও কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ আছে। বর্তমান বর্দ্ধমানের সন্নিকট কাঁদরসোনাই কর্ণসুবর্ণ এবং কেউ কেউ কাঞ্চননগরকে ও কর্ণসুবর্ণ বলে মনে করেন। যদিও মুর্শিদাবাদের 'কানসোনা'কে কর্ণসুবর্ণ বলে ঐতিহাসিকরা মত প্রকাশ করেছেন।

বর্দ্ধমান নামকরণ

মহাবীর বর্দ্ধমান খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান অস্থিক নগরে অবস্থান করে জম্ভীয় গ্রাম বা জৌগ্রামে গিয়ে কৈবল্য লাভ করেছিলেন। অস্থিক নগর সম্ভবতঃ বর্ত্তমানের বর্দ্ধমান নগরের পশ্চিমাংশ, জে. এল. নম্বর ৩০। খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে

বর্দ্ধমানের মল্লসারুলের অধিপতি মহারাজ বিজয়সেনের তাম্রশাসন থেকেও বর্দ্ধমানের প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। বর্দ্ধমানের নামকরণ নিয়ে নানাজনের নানা মত। জৈন তীর্থঙ্কর 'মহাবীর বর্দ্ধমান এখানে এসেছিলেন বলেই এই রাঢ়খণ্ডের নাম 'বর্দ্ধমান' হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে দক্ষিণ দামোদর ও রাঢ় সংস্কৃতির গবেষক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে প্রাচীনকালে অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত কিরাত, নিষাদ, বোড়ো, ডোম প্রভৃতি শুদ্রগণ এই অঞ্চলে বসবাস করতেন। অজয় ও দামোদর উপত্যকার এই প্রাচীনতম ভূখণ্ড সুদূর ছোটনাগপুর সাঁওতাল পরগণার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কালক্রমে বোড়ো ও ডোমেরা এই নগরীর প্রধান বাসিন্দা হলে– লোক বোড়ো-ডোমন বলতে সুরু করল। বোড়ো-ডোমন বা 'বড়ডমন' শব্দটি সংস্কৃতায়িত হয়ে 'বর্দ্ধমানে' রূপান্তরিত হয়। এই নগরীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম ছিল বেয়াবই। উইলফোর্ড সাহেব এই নদীকে বেদবতী বা দেবানন্দ বা দেওনদ বলে উল্লেখ করেছেন। দেওনদ দিয়ে বণিক ধূস দত্ত লাখবদ্বীপ বা লাকুরডি থেকে বাণিজ্য যাত্রা করেছিলেন। অষ্ট্রিক ভাষায় দেওনদের নাম হলো– দামুদা, বর্তমানের দামোদর।

আবার কেউ কেউ মনে করেন দামোদরের শাখানদী বল্লুকার তীবে মেমারীর কাছে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে– বরোঁয়া। বল্লুকা একটি প্রাচীন নদী, তার তীরে অবস্থিত এই বরোঁয়াই পুরাতন বর্দ্ধমান। কোন কারণে বরোঁয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ায় ও নদী বল্লুকা মজে যাওয়ায় বর্তমানের বর্দ্ধমানে নূতন শহরের পত্তন হয়। গ্রীস দেশের প্রাজ্ঞ ভৌগোলিক টলেমি এই বর্দ্ধমানকে 'ব্রডমন' বলে উল্লেখ করেছেন। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের অনুমান গ্রহণ করলে 'ব্রডমন' শব্দটি 'বোড়ো-ডোমন' শব্দেরই অপভ্রংশ রূপান্তর অর্থাৎ 'বোড়ো-ডোমন'-- 'বড়ডমন'-- ব্রড়ডমন--বর্দ্ধমান এই ভাবেই অষ্ট্রিক শব্দ সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়ে 'বর্ধমানে' পরিণতি লাভ করেছে। মহাবীর 'বর্দ্ধমানের' সঙ্গে "বর্দ্ধমান" নামের মিল হয়ত নেহাতই কাকতালীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভৌগোলিক বিবর্তন

নদ-নদী

বর্দ্ধমানের প্রধান নদনদীগুলি হল দামোদর, অজয়, ভাগীরথী, বরাকর, ব্রাহ্মণী, খড়ি, বাঁকা, কুনুর, বেহুলা, মুণ্ডেশ্বরী, দেবখাল, গাঙ্গুর, কানা দামোদর, খড়গেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, শিবা, খুদিয়া, নুনিয়া, বাবলা, তমলা, সিঙ্গারণ, চাঁদা, খণ্ডেশ্বরী, গৌবী, ইলসরা, ঘিয়া, হরিণখালি, কামাখ্যাখাল, সাইনী, পাঠাননালা, ভনওয়ার খাল, কুজি, কামালের খাল, কাঁটাখাল। দামোদর নদী আসানসোলের বরাকরে তিনটি নদীর সংমিশ্রণে নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে। স্থানীয় লোকেদের মুখে মুখে একটি প্রবচন চালু আছে:

ক্ষুদে, নুনে, বরাকর
তিন নিয়ে দামোদর।

অর্থাৎ ক্ষুদে, নুনে ও বরাকর নদী নিয়ে দামোদরের জন্ম। ঐ তিনটি নদী বর্দ্ধমানের বরাকরে মিশে বিরাট দামোদর নদ সৃষ্টি করেছে। বর্দ্ধমানের নদীগুলি খরস্রোতা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অন্তঃসলিলায় পরিণত হয়। নদীগুলি বহুবার খাত পরিবর্তন করে জেলার ভৌগোলিক আকৃতির বিবর্তন ঘটিয়েছে। গঙ্গা, অজয়, বরাকর, দ্বারকেশ্বর ও দামোদর এই পাঁচটি নদী যেমন বহু মানুষের আশ্রয় ছিনিয়ে নিয়ে মর্মান্তিক শোকের ও দুঃখের কারণ হয়েছে, তেমনি নদীগুলির তীরবাসী মানুষ শত লাঞ্ছনা সহ্য করেও নদীকে পূজা করেছে, ভালোবেসেছে। অনেকগুলি নদীর অস্তিত্বই নাই, কিন্তু মঙ্গলকাব্যে বা ঐতিহাসিক বিবরণীতে তাদের-নামোল্লেখ আছে। যেমন কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য থেকে পাওয়া যায়, দামুন্যা গ্রাম রত্নানু নদীর তীরে অবস্থিত। কিন্তু বর্তমানে একটি খাল ছাড়া কোন অস্তিত্ব নেই। আবার জম্ভীয় গ্রাম বা জৌগ্রামে মহাবীর 'বর্দ্ধমান' ঋজুকুলা নদীর তীরে কৈবল্য লাভ করেছিলেন। ঋজুকূলা নদী বর্তমানের জুলকূলা বা কংসনদী। সম্প্রতি জৌগ্রামের জুলকূলা নদীর গর্ভ থেকে জৈন পূজার উপকরণ কয়েকটি 'আয়াগপট্ট' উদ্ধার করেছেন স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীগদাধর কোঙার। মনসামঙ্গলের বেহুলা নদী বর্তমানে মজে গিয়ে একটি খালে পরিণত হয়েছে।

তেমনি রামাই পণ্ডিত বল্লুকা নদীর তীরে বসবাস করতেন, যে নদীটি মেমারী থেকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রগড়ে গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে– সেই বল্লুকা নদীর ক্ষীণ অস্তিত্ব আছে– তা গবেষণার বিষয়। যখন সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধ বন্দর ছিল, তখন বর্দ্ধমানও বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। বড় বড় জাহাজ সপ্তগ্রাম থেকে দামোদর হয়ে বর্দ্ধমানে

আসত। লাকুরডির বণিক ধুস দত্ত তাঁর পিতার শ্রাদ্ধে ইউরোপ হতে বহু নিমন্ত্রিত সাহেব বণিককে জাহাজে করে জলপথে আনিয়েছিলেন। সেই সময় এত অধিক অর্ণবপোত কাঞ্চননগরের নিকট সমবেত হয়েছিল যে লোক পারাপারের জন্য দামোদরে নৌকার খেয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন নৌযানের উপর দিয়ে লোকে দামোদর পার হয়েছিল। বল্লুকা নদীও এই সময় বর্দ্ধমান জেলার একটি বিশাল নদীরূপে প্রবাহিত হত। আজও স্থানে স্থানে তার অবশেষ দেখা যায়। বল্লুকা দামোদর হতে বেরিয়ে উত্তর বাহিনীরূপে সমুদ্রগড়ের নিকট গঙ্গায় গিয়ে পড়ত। নব্বই বছরের কৃষ্ণচন্দ্র রায় নামে একজন স্থানীয় শিক্ষক বলাই দেবশর্ম্মাকে বলেছিলেন, তিনি বাল্যকালে ভল্লুকা নদীকে একটা বড় নদীরূপে দেখেছিলেন। গৌরাঙ্গোত্তর যুগে রামচন্দ্র গোস্বামী যখন ঐ গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বল্লুকা বিশাল নদী ছিল। ঐ বল্লুকার তীরেই প্রথম ধর্মপূজার প্রচলন হয় :—

শিলারূপে রহে বিষ্ণু বল্লুকার তীরে।
ধর্মশীলা নামে তাহা ব্যাপিয়া ব্রহ্মাণ্ড॥
এইরূপে ধর্মশীলা ব্রহ্মাণ্ডেতে হয়,
ধর্মপদ ভাবিয়া ময়ূর ভট্ট কয়॥

—ময়ূরভট্টের "ধর্মমঙ্গল"

মাণিক গাঙ্গূলী ও তাঁর ধর্মমঙ্গলে বল্লুকা নদীর সমর্থন করছেন,—

ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল বল্লুকার তীরে।
মার্কেণ্ডেয় মুনি তথা ধর্মপূজা করে॥

এই বল্লুকার তীরে রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজা করেছিলেন।

এই নদ-নদী গুলির মধ্যে দামোদর অত্যন্ত প্রচীন নদ এবং বাকী অধিকাংশই হ'ল বর্ষাতি নদ-নদী। নদী বিশেষজ্ঞদের মতে দামোদর ভাগীরথীর থেকেও প্রাচীন। বর্তমানে যে খড়ির প্রবাহ র'য়েছে প্রাচীনকালে দামোদর এই প্রবাহ খাতেই কাটোয়ার পথে বইত এবং কালনা, ত্রিবেণী ও উলুবেড়িয়ায় ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হত। দামোদর বহু বার খাত পরিবর্তন ক'রেছে- নূতন প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে পুরাতনের স্মৃতি রেখে গেছে। দমোদরের নিম্ন প্রবাহ পথে এর ঢালের গড় কিলোমিটার প্রতি আট ইঞ্চি এবং এই অসম অনুপাতে ঢালের কারণে দামোদর বার বার তার গতিপথ পালটেছে। বেহুলা, বাঁকা, গাঙ্গুর, খড়গেশ্বরী প্রভৃতি শাখা নদী গুলি দামোদরের মূলধারা থেকে অনেকদিন আগেই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্বকীয় কলেবর ধারণ করেছে। উইলিয়াম উইলকক্সের মতে একদা বর্দ্ধমান অতিক্রম ক'রে চব্বিশ পরগণা ও যশোরের পথে দমোদর বঙ্গোপসাগরে পতিত হ'ত। পরবর্তী কালে ভাগীরথীর দক্ষিণমুখীধারা প্রাচীন দামোদরকে দুভাগে বিভক্ত ক'রে দেয় - পূর্বভাগে যমুনা এবং

পশ্চিম ভাগের নাম গাঙ্গুর - বেহুলা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। দামোদরকে বাঁধ দিয়ে বাঁধার আগে পর্যন্ত তার খাত বহুবার পরিবর্তন হয়েছে। তীব্র স্রোতে বর্ষার সময় দক্ষিণ তীর ভেঙে নদী বারে বারে খাত পরিবর্তন করেছে - তাতে জেলার কয়েকটি এলাকার ভৌগোলিক বিবর্তন ঘটেছে। বিশেষ করে বর্দ্ধমানের দক্ষিণে দামোদরের প্রবাহ পথের পরিবর্তন হয়েছে খুব বেশি। ফান্ ডেন ব্রোকের (১৬৬০) নকশায় দেখা যায় বর্দ্ধমানের দক্ষিণ পথে দামোদরের একটি শাখা সোজা উত্তর-পূর্ববাহী হয়ে আমবোনা (Ambona) কালনার কাছে ভাগীরথীতে পড়েছে। ক্ষেমানন্দ দাসের (কেতকদাসের) মনসামঙ্গলে (আনুমানিক ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ) এই শাখাটিকেই বুঝি 'বাঁকা দামোদর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই বাঁকা নদীর তীরে তীরে যে সব স্থানের নাম কেতকদাস-ক্ষেমানন্দ উল্লেখ করেছেন সেগুলি হলো :– কুঝাটি, গোবিন্দপুর, গঙ্গাপুর, দে-পুর, নেয়দা, কেজুয়া, আদমপুর, গোদাঘাটা, কুকুরঘাটা, হাসনাহাটি, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর ও গহরপুর। এই গহরপুরের পরই বাঁকানদী গঙ্গায় মিশেছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের "বাঙ্গালীর ইতিহাসে" দেখি দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহ পথেই এক সময় সরস্বতীর প্রবাহ পথ ছিল। জাও ডি বারোসেন কৃত নকশার ইঙ্গিত সেই কথা বলে। পরে অবশ্য এই পথ ত্যাগ করে সোজা দক্ষিণবাহী হয়ে রূপনারায়ণ-পত্রঘাটায় প্রবাহপথে কিছুদিন প্রবাহিত হয়েছে। অষ্টম হতে চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যে কোনও সময়ে সরস্বতী তার প্রাচীন খাত পরিবর্তন করে বর্তমান খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। বর্তমান দামোদর নদ কোথাও ক্ষীণকায়, অপ্রশস্ত আবার কোথাও বৃহদায়তন--প্রশস্ত। কোথাও সারাবছরই নৌকা চলে আবার কোথাও কেবল বর্ষাকালেই নৌকোর কারবার। বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দামোদরকে দূর্গাপুর থেকে উত্তর তীর বরাবর হুগলী পর্যন্ত বাঁধ (Embankment) দেওয়া হয়েছে। ডাক পুরুষের বচন–

নদীর ধরে বাস
ভাবনা বারো মাস

একথাটা দামোদরের ক্ষেত্রে এককালে ছিল কঠিন বাস্তব। দক্ষিণ দামোদরের গলসী, খণ্ডঘোষ, রায়না, জামালপুর ও বর্দ্ধমান শহর দামোদরের বন্যায় প্রায়ই ডুবে যেত। বন্যা হত সামান্য বর্ষাতেও এমন কি শুকনো ডাঙাতেও বান আসত ছোটনাগপুরের পাহাড়ে বৃষ্টি হলে। আর সেই দুরন্ত বন্যায় ঘরবাড়ী, খড়ের চালা, কুঁড়ে ঘর, খড়ের গাদা, গবাদি পশু, তৈজসপত্র সব ভেসে যেত। পারাপার সপ্তাহ ধরে বন্ধ থাকত, সে সময় দক্ষিণ দামোদর বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। স্থানীয় ভিত্তিতে আর্ত্তব্যক্তিদের ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হত। দক্ষিণ দামোদরের স্বাধীনতা সংগ্রামী দাশরথি তা, তাঁর দামোদর পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভের শিরোনামে লিখতেন :

ওরে নদ দামোদর
ভেসে গেলো নিয়ে অতান্তর।

এবং মুখ্যতঃ সেই কারণেই "দামোদর বন্যা প্রতিকার সমিতি" এবং "দক্ষিণ দামোদর সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বরাকরে মাইথন-পাঞ্চেত ও দুর্গাপুরে ড্যাম বা ব্যারাজ তৈরী হলে দামোদর সংযত হয়—সেরকম বিধ্বংসী বন্যাও আর হয় না। সেদিনের সর্বগ্রাসী দামোদরের রূদ্রমূর্তি আজকের যুবকদের কাছে গল্পের মত মনে হবে।

দামোদর নদকে সে সময় বলা হত বর্দ্ধমানের 'হোয়াং হো' বা বর্দ্ধমানের দুঃখ। দামোদরের বন্যার জন্য দক্ষিণ দামোদরের তীরবর্তী গ্রামগুলির ঘর-বাড়ি অনেক উঁচু জায়গায় তৈরী করা হত। বছরে ছমাস বর্দ্ধমানের সদরঘাটে কাঠের অস্থায়ী সেতু করে খেয়াঘাটের মালিকরা যাত্রী পারাপারের ব্যবস্থা করতেন। তার উপর দিয়ে বাস, ট্যাক্সী, লরী ও অন্যান্য যানবাহন যেত। এখন সেই দামোদরের বুকে কৃষকসেতু হয়েছে— দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের অধিবাসীদের অনেকদিনের একটি প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাঝি মাল্লাদের জাতি ব্যবসা "নৌকা বাওয়া" বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের সামাজিক বিবর্তন শুরু হয়েছে, নগর সভ্যতা তাদের জীবনধর্মে আঘাত করেছে। জেলার উত্তর প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত অজয় নদীও কাটোয়া, মঙ্গলকোট ও আউসগ্রাম থানাকে অনেক ভেঙে গড়েছে। এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে, এইত নদীর খেলা—।

মাঝিদের ভাটিয়ালি গান এখনও শোনা যায় কালনা ভাগীরথীর বুকে। নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে মরমীগলায় মাঝিদের গঙ্গার গান এখনও পাগল করে। কালনায় গঙ্গা এখন অনেক দুরে সরে গেছে, ওপাড়ে নদীয়াকে সে কোল দিয়েছে। গঙ্গা তীর ভাঙ্গা ঢেউ, আর চর জাগা ভাঁটায়—কত লোককে নিরাশ্রয় করেছে। আবার কতজনকে দিয়েছে আশ্রয়। বর্দ্ধমানের নদীতীরবর্তী অধিবাসীদের সে কাহিনী সাহিত্যে রূপ দিলে জীবনধর্মী উপন্যাস রচিত হত। বর্তমান গ্রন্থের লেখক দক্ষিণ দামোদরের মানুষ ও দামোদরের প্রবাহকে কেন্দ্র ক'রে জীবনধর্মী ছোটগল্পের সংকলন "মনভাস" ও উপন্যাস "চোখের আলোয় দেখেছিলাম" রচনা ক'রেছেন।

বর্দ্ধমানের মাটি ও জমি

পূর্বের বদর্দ্ধমানভুক্তি ছিল উত্তরে বীরভূমের কিয়দংশ এবং দক্ষিণে হুগলী পর্যন্ত। এখন জেলা বদর্দ্ধমান থেকে বীরভূম ও হুগলী বাদ যেয়ে অনেকটা ছোট হয়ে গেছে। পশ্চিমে বরাকর থেকে পানাগড় পর্যন্ত পাথুরে রুক্ষ লাল রাঙা মাটি। ভূপৃষ্ঠের গঠন এখানে উঁচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ো, চড়াই-উৎরাই। বীরভূমে দেখা যায় লাল মোরাং এর মত কাঁকরের স্তূপে ভরা চিত্তরঞ্জন, আসানসোল, বরাকর,

কুলটি, বার্ণপুর, অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ, দুর্গাপুর, কাঁকসা প্রভৃতি অঞ্চল। ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা বর্দ্ধমানের আসানসোল মহকুমায় মাটির তলায় প্রচুর পরিমাণে কয়লা আছে। আছে ল্যাটেরাইট, শিলা, লৌহ খনিজ পদার্থ। গলসী ও উত্তর ব্লকে আছে কেরোসিন। আসানসোল মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল লাল কাঁকুরে মাটির তৈরী ছোট ছোট টিলায় ভর্তি— সেজন্য বর্দ্ধমানকে "রাঙামাটির" দেশ বলে। আর সদর, কালনা ও কাটোয়া মহকুমার মাটি উর্বর পলিমিশ্রিত—কৃষিকার্যের খুব উপযোগী। এখানে জনবসতিও তাই ঘন। এই মাটির জন্যই বর্দ্ধমানে ধান, গম, আলু ও সরিষা প্রচুর পরিমাণে হয়। বর্দ্ধমানকে তাই পশ্চিমবঙ্গের "শস্যভাণ্ডার" বলে। শস্যশ্যামলা জমিই বর্দ্ধমানের ঘরের ছেলেদের গ্রামেই এতদিন বেঁধে রেখেছে। ভূ-সম্পত্তির ঊর্ধ্বসীমা নির্দ্ধারণের আগে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভূমিব্যবস্থার উদ্ভব হয়। আবার ঊর্ধ্বসীমা বা সিলিং প্রথা চালু হবার পর গ্রামের সামাজিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস হতে থাকে। সেই সময় থেকে বহু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সন্তান ভূমি হারিয়ে চাকুরীর উদ্দেশ্যে শহরে পাড়ি দেয়। আর ভাগচাষী নূতন ভূমি আইনের দৌলতে এখন বর্গাদার— অর্থাৎ ভূমি থেকে ভূম্যাধিকারীর উচ্ছেদ হল আর উদ্বৃত্ত জমি পাট্টা পেল ভূমিহীন কৃষক। ফলে বড় বড় ক্ষেতজমি ছোট ছোট হয়ে যায়। কিন্তু ভূস্বামী সহজে জমির মায়া ত্যাগ করতে পারে না। কোর্ট-কাছারী-মামলা-মোকদ্দমা গ্রাম বর্দ্ধমানে সামাজিক জীবনকে জটিল করে তোলে। তাই বুঝি এই জমির মাটিকে লক্ষ করে কবি নজরুল লিখেছিলেন :

এ জমির মাটি ঘরের বেটী সব সমানরে ভাই
কে রাবণ করে হরণ আজ দেখবো রে তাই।
বর্দ্ধমানের চাষীদের কাছে মাটি হল ঘরের বেটী।

জেলার মাটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) গঙ্গা ও দামোদর, অজয় অববাহিকায় পলি, (২) দামোদর-অজয় মধ্যবর্তী উপত্যকায় এঁটেল ও (৩) পশ্চিমাঞ্চলে ল্যাটেরাইট, এসিডের ভাগ ৬৩%।

অরণ্য ও জঙ্গল

জেলা বর্দ্ধমানে কোন পাহাড় বা বেশি অরণ্য নেই। এককালে দুর্গাপুর ঘন জঙ্গলে ভর্তি ছিল। ছোটনাগপুরের জঙ্গলের সঙ্গে এর যোগ ছিল। বিহার থেকে লোকজন এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করত পায়ে হেঁটে, কোন সড়ক বা যান-বাহনের রাস্তা ছিল না। ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় একবার এই গ্রন্থের লেখককে বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে যে অরণ্যের কথা বলা হয়েছে তা উত্তরবঙ্গ থেকে দুর্গাপুরের জঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আনন্দমঠের ভবানীঠাকুর ও দেবীচৌধুরাণীর

বিচরণস্থল ছিল উত্তরবঙ্গের জঙ্গল থেকে দুর্গাপুরের জঙ্গল পর্যন্ত। বর্তমানে দুর্গাপুরের জঙ্গল না থাকলেও দুর্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত কাঁকসা ও আউসগ্রাম অঞ্চলের কিছুটা এখনও ঘন জঙ্গলে ভর্তি। এই এলাকাকে জঙ্গলমহল বলে। এই জঙ্গলে শাল, পিয়াল, পলাশ শিমূল, আম, জাম, বয়ড়া, বাবলা, অর্জুন, আকাশমণি, তাল, খেজুর এখনও দেখা যায়। দুর্গাপুরের জঙ্গল কেটে কেটে সেখানে এখন ন্যাড়া ডাঙ্গা ছাড়া কিছুই নাই। সেই দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর এখন উঁচু-নীচু, চড়াই-উৎরাই আর ছোট ছোট মাটির স্তূপে ভরা। প্রকৃতির নির্ম্মম অঙ্গচ্ছেদে দুর্গাপুর এখন রুক্ষ, উষ্ণ আবহাওয়ার কবলে। এখন জেলার অবস্থা দেখে চিৎকার ক'রে বলতে মন যাচ্ছে :

দাও ফিরে সে অরণ্য
লহ এ নগর।

তৃতীয় অধ্যায়

রাঢ়চর্চ্চা

বাঙালির ছেলে বিজয় সিংহ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "অতীত" কবিতায় লিখেছেন,—

যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত কথা কও কথা কও

পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, দৈত্যরাজ বলির পাঁচ পুত্র ছিলেন— অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম আর পুণ্ড্র। এই পাঁচ রাজপুত্রের নাম অনুসারে পাঁচটি দেশের নাম হয়। অঙ্গ রাজ্য হল বর্তমানের বিহারের কিয়দংশ, কলিঙ্গ হল বর্তমানের উৎকল— উড়িষ্যা, বঙ্গ হল বর্তমান বঙ্গ প্রদেশ বৃহত্তর বৰ্দ্ধমান, পুণ্ড্র হলো বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ এবং সুহ্ম হল দক্ষিণ রাঢ় বর্তমান মেদিনীপুর জেলা। সমগ্র বঙ্গ ছিল ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ। জঙ্গলের মধ্যে বাস করত শবর, কিরাত, নিষাদ, বোড়ো, ডোম, কাহার প্রভৃতি আদিবাসীগণ। এদেশের লাঢ় বা রাঢ় দেশের রাজা ছিলেন সিংহরাজ। বঙ্গদেশের রাজকন্যা যাচ্ছিলেন পাল্কী চড়ে অরণ্যের মধ্য দিয়ে মগধ। জঙ্গলের মধ্যে রাজকন্যার গতিরোধ করলেন সিংহরাজ, অপহরণ করলেন বঙ্গ কন্যাকে এবং অবশেষে তার পাণিগ্রহণ করলেন। কিছুদিন বাদে এদের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন নাম তার সিংহবাহু। সিংহবাহু জঙ্গল কেটে লাঢ় দেশের সীহপুরে (সীপুর বা সুপুরে) বসতি স্থাপন করলেন এবং নূতন নগরীর পত্তন করলেন। এই রাজ্যই 'রাঢ়' নামে পরিচিত। রাঢ়ের একটি অংশের নাম ছিল— 'বৰ্দ্ধমানভুক্তি'। ভুক্তির অর্থ প্রদেশ। বৰ্দ্ধমানভুক্তি বলতে গোটা বৰ্দ্ধমান বিভাগকেই বোঝাত। রাজা সিংহরাজ পরাক্রমী ছিলেন, তাঁর পুত্র যুবরাজ বিজয়সিংহ জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করে লঙ্কাদ্বীপে যান। সেখানে বাহুবলে লঙ্কাদ্বীপ জয় করে সেখানকার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। বিজয়সিংহের নাম থেকেই শ্রীলঙ্কার নাম হয় সিংহল। সত্যেন্দ্রনাথ কাব্যে তা প্রতিফলিত—

"আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নাম রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়"

গঙ্গারিডি-গঙ্গারাঢ়ী

পল্লীকবি কুমুদরঞ্জন রাঢ়ের প্রশস্তি করে বলেছেন, "বৰ্দ্ধমানের সংস্কৃতি রাঢ়ের

সংস্কৃতি/সকল সমাজের সভ্যতাতে ইহার রীতিনীতি/সর্বধর্ম সমন্বয়ে ইহার আদর্শ/প্রভাবিত বাংলা গোটা ভারতবর্ষ।"

৩২৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে মেসিডনের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর যখন পঞ্চনদ অধিকসর করে বিপাশা তীরে উপনীত হয়েছিলেন, তখন তাঁর শিবিরে "প্রাসিই" এবং "গঙ্গারিডয়" নামে দুইটি রাজ্যের সংবাদ এসেছিল। এর কিছুকাল পরে গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র নগরে এসে যে জনপদের বিবরণ দিয়েছেন– তা 'প্রাসিই' এবং এর পূর্বদিকে যে গঙ্গারিডি নামক স্বতন্ত্র রাজ্যের বিবরণ দিয়েছিলেন তা গ্রীক লেখকগণের উল্লেখিত "গঙ্গারিডয়" ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপরোক্ত গ্রীক দূতদের লেখা থেকে জানা যায় এই অংশে দুটি রাজ্য ছিল– ভারতের পূর্ব প্রান্তে প্রাসিই বা প্রাচী আর তার পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তে গঙ্গারিডি। গঙ্গানদীর নিম্ন অঞ্চলে এই রাজ্যের অবস্থিতি বলে এদের অধিবাসীদের গ্রীক পণ্ডিতরা Gangaridium বা গঙ্গারিডিয় বলে অভিহিত করতেন এবং রাজ্যকে বলতেন গঙ্গারিডি। তা বাংলায় অপভ্রংশ হয়ে 'গঙ্গারাঢ়ীতে' রূপান্তরিত হয়। নামটি ছোট আকারের হয়ে শেষকালে শুধুই 'রাঢ়ী' বা 'রাঢ়'তে পরিণত হয়। অবশ্য মূল "রাঢ়" নামটি খ্রীষ্টপূর্ব যুগ থেকে বর্তমান ছিল। স্বয়ং মুকুন্দরাম চোযাড় বীরাড় রাঢ় জাতির উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বৰ্দ্ধমান মহাবীর "লাঢ়" দেশেই চারিকা করেছিলেন। গঙ্গানদীর স্রোত এই রাজ্যকে ছুঁয়ে গিয়েছে বলে– 'গঙ্গারিডি' বলা হত। ভার্জিল তার জার্জিক Georgic গ্রন্থে গঙ্গারাঢ়ীদের বীরত্বের কথা উল্লেখ করেছেন ল্যাটিন ভাষায় :

In foribus pugnam exauro solidoque elephanto Gangaridium faciam, Victorisque arma quirne– Virgil ; Georgics (Latin) এই গঙ্গারাঢ়িগণ সাহসী, পরাক্রমী ও বীর ছিলেন। আগেকার এই গঙ্গারাঢ়ী হল বর্তমানের বৰ্দ্ধমান জেলা।

· গ্রীক সৈন্য যখন গঙ্গারাঢ়ী আক্রমণ করেন, তখন জাতির ক্ষাত্রবীর্যকে অত্যুচ্চ মর্যাদা দান করবার জন্য যে স্থানে গঙ্গারাঢ়ী সৈন্য সমবেত হয়ে বীর বিক্রমে গ্রীকদের প্রতিহত করেছিলেন সেই অজয় নদের তটভূমিতে 'রাঢ়েশ্বর' শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। দুর্গাপুর অরণ্যের পূর্বপ্রান্তে কাঁকসার জঙ্গলে ইছাই ঘোষের সেনপাহাড়ির সন্নিকটে 'রাঢ়েশ্বর' শিবমন্দির শীর্ষ উন্নীত করে এখনও গঙ্গারাঢ়িগণের বলবীর্যের কীর্তি ঘোষণা করছে। রাঢ়েশ্বরের কাছেই আছে ইছাই ঘোষের দেউল।

মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু পরবর্তীকালে লেখকগণ মেগাস্থিনিসের বহু অংশ হুবহু উদ্ধৃত করায় সেই সব টুকরো লেখাই প্রামাণ্য বলে ধরা যায়। ডিওডেরাস মেগাস্থিনিসের অনুসরণে লিখেছেন, 'গঙ্গানদী

গঙ্গারিডয় দেশের পূর্বসীমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পতিত হয়েছে। গঙ্গারিডয় অধিবাসীগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাদের দেশ কখনও কোন বিদেশীয় রাজা কতৃর্ক অধিকৃত হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশের অধিবাসীর গঙ্গারিডয়গণের অসংখ্য এবং দুর্জয় রণহস্তী নিচয়কে ভয় করে'। বাংলার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত তা– এখনকার কালনা, কাটোয়া ও বৰ্দ্ধমান সদর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। অতএব গঙ্গারিডয় যে রাঢ় অঞ্চল এবং এই রাঢ়ের মধ্যমণি বৰ্দ্ধমান এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকে না।

আর একজন ঐতিহাসিক প্লিনি মেগাস্থিনিসের অনুসরণে বর্ণনা দিয়েছেন, "গঙ্গানদীর শেষভাগে 'গঙ্গারিডি কলিঙ্গি' রাজ্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে পড়েছে। এই রাজ্যের রাজধানী Portalis (বা পর্থলিস) সেখানে ৬০,০০০ পদাতিক ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ হস্তী সজ্জিত থেকে এই রাজ্যের অধিপতির দেহ রক্ষা করছে"। প্লিনির এই উক্তি থেকে বোঝা যায় কলিঙ্গ অর্থাৎ উৎকল বা বর্তমান উড়িষ্যা গঙ্গারিডি রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্লিনি অভিহিত পর্থলিস সম্ভবতঃ এখনকার বৰ্দ্ধমান। মহাকবি ভার্জিলের জর্জিক্স কাব্য থেকে জানা যায়, রোমের সঙ্গে গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজাগণ বংশানুক্রমে মগধের প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেশের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কালের কুটিল গর্ভে সে সব ইতিহাস বিলীন হয়ে গেছে।

রাঢ়শব্দের উদ্ভব

রাঢ়বঙ্গের দুটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায় একটি বজ্জভূমি বা উত্তর রাঢ় এবং অপরটি সূক্ষ্মভূমি বা দক্ষিণ রাঢ়। বজ্জভূমি হল বর্দ্ধমান হুগলী সীমান্তের গোতান দামুন্যা গ্রাম থেকে উত্তরে মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার গোকর্ণ গ্রাম পর্যন্ত, বিশেষ করে অজয়, দামোদর ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চল। ষোড়শ শতকের 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে রাঢ় দেশের দক্ষিণসীমা পাওয়া যায় দামোদর নদ :-

"দামোদরোত্তর ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্তিতঃ।"

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন, তাম্রলিপ্ত জনপদের উত্তর সীমা ছিল দামোদর পর্যন্ত। কিন্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য ও লিপি প্রমাণ হতে মনে হয় রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা দামোদরের আরও দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল। নবম-দশম-শতক হতেই রাঢ়ের দুটি স্পষ্ট বিভাগ জানা যায়– উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়। অর্থাৎ প্রাচীন কালের বজ্জভূমি ও সূক্ষ্মভূমি। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে (একাদশ শতকের প্রথম পাদ) উত্তীর লাঢ়ম (উত্তর রাঢ়) এবং তক্কন লাঢ়ম (দক্ষিণ রাঢ়)– নাম দুটি একই সঙ্গে পাওয়া যায়। উত্তর রাঢ়ের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় নবমশতকের

গঙ্গরাজ দেবেন্দ্র বর্ম্মণের একটি লিপিতে। রাজা ভোজবর্ম্মার বেলার লিপিতে উত্তর রাঢ় ও তদন্তর্গত সিদ্ধল গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিদ্ধল গ্রাম বর্তমান গুসকরার সন্নিকট সিধলে। ভুবনেশ্বর লিপিতে ভবদেব ভট্টের জন্মভূমি সিদ্ধল গ্রামের কথা বলা হয়েছে। অনুমান হয় বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমা, সমগ্র বীরভূম জেলা ও বর্তমান বর্দ্ধমান জেলা নিয়ে উত্তর রাঢ়। মোটামুটি ভাবে বলা যায় দামোদর নদী হল উত্তর রাঢ়ের দক্ষিণ সীমা ও দক্ষিণ রাঢ়ের উত্তর সীমা।

দক্ষিণ রাঢ়ের প্রাচীনতম উল্লেখ আছে একাদশ শতাব্দীতে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন লিপিতে। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকে (একাদশ দ্বাদশ শতক) দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায। মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যেও দক্ষিণ রাঢ়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীধর ও কৃষ্ণ মিশ্র দক্ষিণ রাঢ়ের সীমানা ভুরশুট (হাওড়া) ও নবগ্রাম (হুগলী) এবং মুকুন্দরামের দামুন্যা গ্রামের কথা উল্লেখ করেছেন। অতএব স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ, বর্দ্ধমান বীরভূম সম্পূর্ণ ও হুগলীব কিয়দংশ নিয়ে এই রাঢ় বঙ্গ ছিল। অতএব রাঢ় মধ্যে বর্দ্ধমান মধ্যমণি।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে চতুর্বিংশতি জৈন্য তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমান অস্থিক গ্রামে এসেছিলেন। সেই সময় এখানকার অধিবাসীরা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহাব কবেছিলেন। জৈন ধর্মগ্রন্থ 'আচারাঙ্গ সূত্রে' আছে: এ দেশের লোকেরা খুব রূঢ় ছিলেন। তাই থেকে কি রাঢ় কথাটি এসেছে? না, "রাঢ়" নামটি জাতিগত নাম। চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরাম লিখেছেন,

"অতিনীচ কূলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়
কেহনা পরশ করে লোকে বলে রাঢ়"

কারো কারো মতে রাষ্ট্র শব্দ থেকে রাঢ় শব্দটি এসেছে। যেমন ইউরোপ State বা ষ্টেট নামে দেশকে অভিহিত করে, তেমনি প্রশাসনিক শব্দ 'রাষ্ট্র' থেকে রাঢ় শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। শব্দটি বৈদিক। ঋগ্বেদে রাষ্ট্র শব্দের উল্লেখ আছে। দেশের শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক পরাক্রম যেরাজশক্তির দখলে থাকত, সেই রাজশক্তি সার্বভৌম সংস্থাকে 'রাষ্ট্র' বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। 'রাঢ়' শব্দের উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। যেহেতু আর্যসভ্যতার বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন প্রমাণ বা সাক্ষ্য নেই, সেহেতু শব্দের ব্যুৎপত্তি, রূপান্তর ও বিবর্তনের সোপান বেয়ে কিম্বদন্তীকে অনুসরণ করে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছে। আবার ইউরোপ যে অর্থে ষ্টেট বা State শব্দটি প্রয়োগ করে, ভারতবর্ষ ঠিক সেই অর্থে এই 'রাষ্ট্র' শব্দটি প্রয়োগ করে না। এটা আমাদের ধর্ম, স্বভাব। যেমন ইংরাজী National এবং বাংলা 'জাতীয়' শব্দটি সমার্থক নয়, Nation কথাটি ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা ধার করেছি। এর অর্থ হল— একই ভূখন্ডের বা ভৌগোলিক সীমারেখার

মধ্যে অবস্থিত একটি রাষ্ট্রের আধিবাসীদের জাতি বা Nation বলে। কিন্তু আমাদের কাছে Nation বা জাতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অখণ্ড একটি দেশকে 'রাষ্ট্র' বা তার অধিবাসীদের জাতি বলব তখনই যখন দেখব একটি ধারাবাহিক সংস্কৃতি এই দেশ ও অধিবাসীদের ঐক্যের সূত্রে বেঁধে ফেলেছে। আমাদেব 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' একটি নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ও ভারতীয় তত্ত্বের পূর্ণ সমন্বয়। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, জৈন ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত 'লাঢ়' শব্দ বা গঙ্গারিডির সংক্ষিপ্ত অংশ 'রিডি' এবং 'রাষ্ট্র'— এই তিন শব্দের যে কোন একটি থেকে 'রাঢ়' শব্দটি এসেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক বিবর্তন

ধর্ম প্রবাহ

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বাণপ্রস্থে যাবার সময় তাঁর দুই স্ত্রী— মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে ডেকে বলেছিলেন, আমার বযস হয়েছে, এবার সংসার থেকে বিদায় নেব। আমার বিষয় সম্পত্তি তোমাদের জন্য রইল— কে, কি নেবে বলো? কাত্যায়নী ছিলেন বিষয়ভোগিনী। তিনি তাঁর অংশের বিষয়-আশয় বুঝে নিলেন। কিন্তু মৈত্রেয়ী ছিলেন স্বামী অনুগামিনী; তিনি বললেন, যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিম্ কুর্যাম? যে জিনিষ অমৃত দিতে পারে না, আমি সে জিনিষ নিয়ে কি করবো? রাঢ়ের সামাজিকতা ও ধর্মসাধনারও মূল সুর এই। পার্থিব বস্তু তার কাছে তুচ্ছ, সামান্য; বৃহৎ স্বর্গীয় সেই— যে অমৃতের সন্ধান দিতে পারে। বৈদিক ভারতের মানুষ ইতিহাসকে সংরক্ষণ করতে জানতেন না এমন নয়, পার্থিব বস্তুর প্রতি অনীহাই ইতিহাস সংরক্ষণে বাধা দিয়েছে। রাঢ় বর্দ্ধমানের সেই প্রাচীন ইতিহাসও তাই অপার্থিব বলে সংরক্ষণের অভাবে লুপ্তপ্রায়। আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছে কিম্বদন্তী, প্রস্তরপূর্তি, তাম্রশাসন,শিলালিপি ও পুরাকীর্তির গবেষণা করে অন্ধকারে পথ চলার মত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারততীর্থ কবিতায় লিখেছেন,

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক, হূনদল, পাঠান, মোগল এক দেহে হল লীন।

ভারতের আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে বহিরাগতদের এই হল সম্মিলন। কেবল একটি জাতি এদেশে এসে লীন হয়ে যায়নি, কারণ সে এদেশে বাণিজ্য ও প্রভুত্ব বিস্তার করতে এসেছিল। সে ইংরেজ। রাঢ় বর্দ্ধমানের আদি বাসিন্দা অনার্য সম্প্রদায়ভুক্ত কিরাত, নিষাদ, কাহার, শবর, বোড়ো, ডোম প্রভৃতি সকলেই বৈদিক সভ্যতার আলোকে নতুন সমাজ গড়ে তুলেছিল। সে সময় নিশ্চয় একটি সামাজিক বিপ্লব বা ধর্মবিপ্লব ঘটেছিল। তারপর এসেছে নূতন সমাজ, বেদ ও উপনিষদের ধারায় পরিস্নাত হয়েছিল এই রাঢ় বর্দ্ধমান। ভারতবর্ষের সভ্যতার একটি বিশিষ্টতা হল অধ্যাত্মবিভাব বা আধ্যাত্মিকতা।

জৈন ধর্ম প্রবাহ :

খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার অব্দের আগেই ইন্দোমঙ্গলয়েড জাতি এই রাঢ় দেশে

এসে এখানের অষ্ট্রিকভাষী আদি বাসিন্দাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সম্ভবতঃ বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি এখান থেকেই। বহিরাগত ইন্দোমঙ্গোলয়েডদের সভ্যতা ছিল উন্নত। বৈদিক আর্যগণের সংস্পর্শে আসার পূর্ব্ব পর্যন্ত এঁরা কর্মফল ও জন্মান্তর বাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আরাধনার দেবতা ছিলেন শিব ও বিষ্ণু। হিন্দুধর্মে পূজা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এঁরা ছিলেন একদল কৃষিজীবি ও অন্যদল বণিক সম্প্রদায়। ধর্মকৃত্যে ধান, দূর্বা, পান সুপারির ব্যবহার, সিঁথিতে সিঁদুর ও বিবাহে হলুদ ছিল শুদ্ধ। নিষাদীয় অষ্ট্রিক ভাষী আদিবাসীদের সৃষ্টি ছিল কৃষিকার্য, আর মঙ্গোলয়েডগণের সৃষ্টি হল বাণিজ্যের প্রচলন। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে রাঢ় ভূমিতে একটি ধর্মবিপ্লব ঘটেছিল। এই সময়েই আর্য ক্ষত্রিয়গণের দু-একটি পরাক্রমশালী দল (উগ্র প্রভৃতি নামে অভিহিত) জীবন সাধনা ও জীবিকার জন্যই হউক অথবা আর্য প্রতিপত্তি ও আর্য সভ্যতা প্রসারের জন্যই হউক পশ্চিম অঞ্চল হতে ক্রমশঃ পূর্বগামী হয়ে ‘বিজ্জ’ জনপদে আসেন ও গ্রাম স্থাপন করেন এবং গোটা রাঢ় বৰ্দ্ধমানে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ গ্রীক ও রোমান লেখকগণ এদেরই গঙ্গারিডি বলে উল্লেখ করেছেন। সঞ্জীববন্ধুর মতে এই শক্তিশালী জাতি হলেন উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়। তার ফলে অসুর, পিশাচ ও যক্ষ প্রভৃতি দেবতার উদ্ভব হয়েছিল। এই যক্ষ দেবতার ক্রিয়াকলাপ পরবর্তীকালে পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন-তীর্থঙ্কর মহাবীর যখন রাঢ় দেশে (বর্তমান বৰ্দ্ধমানে) আসেন এবং যেখানে অবস্থান করেছিলেন সেই গ্রামের অৰ্দ্ধমাগধী প্রাকৃতে নাম ছিল অট্টিয় গ্রাম। কিন্তু অষ্ট্রিক ভাষায় তা অস্থিক গ্রাম। এই আস্থিক গ্রাম নামটি তাৎপর্য পূর্ণ। অট্রিক জাতি বোড়ো, ডোম, কিরাত মৃতের অস্থি দাহ করতেন না। এক স্থানে স্তূপীকৃত করে রাখতেন। অস্থির স্তূপ থেকে অস্থিক গ্রাম নাম হয়েছিল। শ্মশানে অস্থির স্তূপের সামনে অধিবাসীগণ যক্ষ দেবতার মন্দির নির্মাণ করান। বৰ্দ্ধমানের লোক সেই যক্ষ দেবতার নাম দিয়েছিল শাল্মনি বা শালপাণি। ষোড়শ শতকে বৃন্দাবন দাস দেখেছিলেন এই যক্ষ দেবতাকে মদ্য মাংস সহযোগে পূজা করতে। মহাবীর বৰ্দ্ধমানের এই অস্থিপূর্ণ অস্থিক গ্রামে [বর্তমান তিরিশ সংখ্যার জে এল নম্বরের মূল বৰ্দ্ধমান গ্রাম-বাঁকা নদীর তীরবর্তী নিম্বার্ক অস্ত্যল (অস্থি + অল) থেকে উত্তরে বল্লুকাতীরে বাহির সর্বমঙ্গলা এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বা গ্রাম] মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে এসেছিলেন। এখানকার মানুষ মহাবীরকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। জৈন ‘আচারাঙ্গ সূত্রে’ আছে মহাবীর যখন পথহীন লাঢ় (রাঢ়), বজ্জভূমি ও সুরভো ভূমিতে (সুহ্ম) প্রচারের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন এই সব দেশের লোকেরা তাঁকে নির্যাতন করেন। কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ করে মহাবীরকে তাড়া করে, ছেলেরা ঢিল-পাথর ছুঁড়তে থাকে এবং ‘তু’ ‘তু’ বা ‘চু’ ‘চু’ শব্দ করে পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। ‘ছু’ ‘ছু’ বা ‘তু’ ‘তু’— শব্দ অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর,

এর অর্থ হলো কুকুর। বর্ত্তমানে এই 'তু' 'চু' শব্দ সংস্কৃত কুকুরার্থক বাঙলা দেশজ ধন্যাত্মক শব্দে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অনেক নির্যাতন সহ্য করেও মহাবীর তাঁর অবস্থানের একবর্ষ অতিক্রম করেন, তিনি জম্ভীয় গ্রাম বা জৃভক গ্রাম বা যোগগ্রাম বা জৌগ্রামে যান। সেখানে ঋজুকলা নদীর তীরে তপস্যায় কৈবল্য লাভ করেন। মহাবীরই প্রথম মানুষ রাঢ়ভূমিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে রাঢ়ের ইতিহাস জেগে উঠেছিল।

মহাবীরের পূর্বে চতুর্দশ তীর্থঙ্কর অনন্তনাথ বর্দ্ধমানপুরে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধদীপ বংশে বর্দ্ধমানপুরের উল্লেখ আছে। ডঃ বিমলাচরণ লাহা মহাশয় এই বর্দ্ধমানপুরকেই বর্দ্ধমান নগর বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান বর্দ্ধমান শহরের পশ্চিমাংশ মাটির স্তূপে ভর্তি। সম্ভবতঃ সেখানে জৈন সম্প্রদায়ের অনেক পুরাকীর্তি আত্মগোপন করে আছে। কাঞ্চননগরে প্রাপ্ত 'কঙ্কালেশ্বরী' মূর্তিটি যক্ষিণীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ষষ্ঠ বর্ষে মহাবীর আবার বর্দ্ধমানে আসেন। অষ্টম বর্ষে তিনি আবার ঐ অস্থিক গ্রামে পদার্পণ করেন। এবার বীরভূমির লোহাগড়া বা লোহাগলা গ্রাম থেকে অস্থি গ্রামে ও সেখান থেকে গিয়েছিলেন পুরিমতলা। এটি নবদ্বীপ নগরের প্রাচীনতম অংশ– বর্তমানে পোড়ামাতলা। নবম বর্ষে মহাবীর ও গোশাল রাজগীর থেকে রাঢ় বর্দ্ধমানে আগমন করেন। তখন এই রাঢ় ছিল অনার্য ভূমি। কিন্তু তা হলেও তখনকার বর্দ্ধমানের সভ্যতা ছিল উন্নত ধরনের। বহিরাগত কোন কৌতূহলী মানুষের প্রতি আচরণই তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার সামগ্রিক পরিচয় বহন করে না। মহাবীরের উপর আচরণের কারণ হলো– মহাবীর উলঙ্গ থাকতেন বলে বর্দ্ধমানের মানুষ এই তীর্থঙ্করকে খ্যাপা ভেবে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছিলেন। এটা ছেলেমানুষি ও বাল্যখিল্য সুলভ আচরণ। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে জৈনাচার্য অজ্জককমের আশ্রম ছিল বর্দ্ধমানের মশাগ্রামের নিকট আঝাপুর দেউলিতে। আঝাপুর গ্রামটি খুবই প্রাচীন। অজ্জকের নির্দেশেই মথুরাতে জৈনমন্দির স্থাপিত হয়েছিল। দেউলিতে অষ্টম জিন চন্দ্রপ্রভ (জৈনধর্মাবলম্বীদের জিন বলা হত ও দ্বাবিংশ জিন নৈমিনাথের পূজা হত)। মথুরার সুবিশাল জৈন মন্দির উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকোট উজ্জয়িনীতে পূজা হত ষোড়শ জিন শান্তিনাথের। মহাবীরের সময়কাল থেকেই বীরভূম ও বর্দ্ধমানের নানাস্থানে তান্ত্রিক, আজবিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু জৈন বিহারের কেন্দ্র ছিল। বর্দ্ধমান শহরেও জৈনদের বিহার ও মন্দির ছিল– সেগুলি কালপ্রবাহে অন্যরূপ ধারণ করেছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ

জৈনধর্মের মত বৌদ্ধধর্মও রাঢ় বর্দ্ধমানের সামাজিক বিপ্লব ও বিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। বুদ্ধদেবের জন্ম আনুমানিক খ্রীঃপূর্ব ৫৬৩ অব্দে এবং মহাবীরের

জন্ম ৫৪০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে। সেদিক থেকে বুদ্ধদেব মহাবীরের অগ্রজ; কিন্তু মহাবীর হলেন চতুর্বিংশ তীর্থঙ্কর। তার অর্থ হলো জৈন-ধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। বুদ্ধদেবই বৌদ্ধধর্মের প্রবক্তা, কিন্তু জৈন ধর্মের প্রবক্তা প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথ। মহাবীরের পূর্বে তেইশ জন তীর্থঙ্কর জৈন ধর্ম প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। তবে বলা যায় মহাবীরের আমলেই জৈন ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। জৈন তীর্থঙ্করগণ সাধনার দ্বারা কৈবল্য বা সিদ্ধিলাভ করে 'জিন' বা জিতেন্দ্রিয় নামে বিখ্যাত হতেন। সেজন্যই এই ধর্মকে জৈন ধর্ম ও মহাবীরের শিষ্যদের জৈন বলা হয়। জৈন ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসারের মূল কারণ হল– পঞ্চমহাব্রত; (১) অহিংসা, (২) সত্য, (৩) অচৌর্য (চুরি না করা), (৪) অপরিগ্রহ (বিষয় সম্পত্তির প্রতি অনাসক্ত থাকা) ও (৫) ব্রহ্মচর্য পালন। এগুলি জনসাধারণকে দ্রুত আকৃষ্ট করতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু জনসাধারণ খুব স্বাভাবিকভাবেই নিজ ধর্ম ত্যাগ করে অনায়াসে এই জৈন বা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। মহাবীরকে নিজ ধর্মপ্রচারের জন্য অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। অস্থিক গ্রামে মহাবীরের পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার পিছনে বালখিল্য চাপল্য কাজ করে থাকলেও অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি অর্বাচীনদের অনীহা ও ঈর্ষার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল বুদ্ধদেবের নির্বাণ লাভের পর কয়েক শতাব্দী ধরে এবং তা বিশ্বধর্মে পরিণত হয় সম্রাট অশোকের আমলে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রসারে বৈদিক ধর্মের দিক থেকে প্রচণ্ড বাধা এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের পূজারিণী কবিতায় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়,-- শ্রীমতী যখন দিবাবসানে বৌদ্ধস্তূপে দীপ জ্বালাতে যাচ্ছেন, তখন

"শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা 'একথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রচনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্য রচনা
শূলের উপর মরিবে সে জনা অথবা নির্বাসনে।"

বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে রাজরোষে শ্রীমতীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল,–

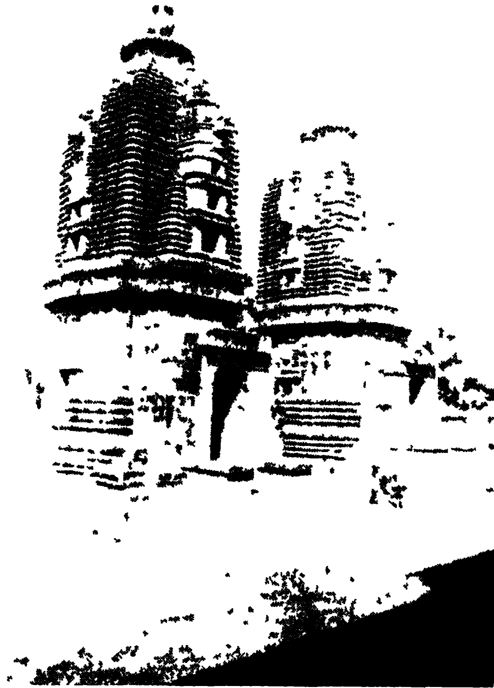
"সেদিন শুভ্র পাষাণ ফলকে পড়িল রক্ত লিখা।
সেদিন শারদস্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপাদমূলে নিভিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।"

বুদ্ধদেব নিজে এই বর্দ্ধমানে এসেছিলেন ধর্মপ্রচারের জন্য। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল অনুমান করেন তিনি যে সূহ্মদেশের শেতক ও দেশক নগরে অবস্থান করেছিলেন

তা বৰ্দ্ধমানের আউসগ্রাম এলাকার অন্তর্গত বর্তমান সুয়াতা ও দেয়াশা গ্রাম হতে পারে। যে অরণ্যে তিনি সাধনা করেছিলেন তার নাম বর্তমান বনপাশ অঞ্চল। শেতক ও দেশক নগরে একটি অরণ্যের পাশে একটি বৃক্ষতলে বসে বুদ্ধদেব জনপদ কল্যাণীসূত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই অরণ্যের পাশে বর্তমান বনপাশ মনে করা অযৌক্তিক নয়। ঐ অঞ্চলে এখনও বুদ্ধেশ্বর শিবঠাকুর রয়েছেন। আর পাওযা গেছে বুদ্ধজীবন সম্পর্কে প্রাদেশিক ছড়া। এর বিস্তৃতি ছিল উখরা অঞ্চলের বর্তমান সিঙ্গারণ নদী থেকে লুপ লাইনের গুসকরা বনপাশ পর্যন্ত।

রাঢ় বৰ্দ্ধমানে শ্রীধর্মদেবতার পূজা রামাই পণ্ডিতের বিধান। খ্রীষ্টিয় দশম শতকের দিক থেকে রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা এতদঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। এই ধর্মপূজা আদিবাসী অধ্যুষিত এইসব অঞ্চলে সম্ভবতঃ বৌদ্ধত্বের অবশেষ রূপে বিদ্যমান। রাঢ় অঞ্চলে এই ধর্মপূজা এখনও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চল রযেছে। ধর্মঠাকুর ও বৌদ্ধদেবতা রাঢ় বৰ্দ্ধমানে এখনও হাড়ি, ডোম, পণ্ডিত (নমঃশূদ্র বা চাঁডাল) দ্বাবা পূজিত হচ্ছেন। বুদ্ধাবির্ভাবের কতদিন পর রাঢ়ে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হযেছিল তা বলা যায না। তবে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন হাজার বছরের ঊর্দ্ধে এর বয়ক্রম। হরিকেল বৰ্দ্ধমানপুরের রাজা কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন অষ্টম শকাব্দে। ভট্ট ভবদেব ও মহারাজ হরিবর্মার সময়ে রাঢ় বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। রাঢ় থেকে বৌদ্ধধর্ম উচ্ছেদেব জন্য ভট্ট ভবদেব বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠাব জন্য যা করেছিলেন, ভট্ট ভবদেব তাই করেছিলেন– বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রবর্তনের জন্য। হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর অনুশাসন, ব্রাহ্মণদের প্রতাপ ও আধিপত্য, সর্বনাশা জাতিভেদ প্রথায় মানুষ ক্রমশঃ বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং বৌদ্ধধর্মেব উদাবতার দিকে সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছিল। সপ্তগ্রামে ৯২২ শকাব্দে শ্রী শ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ নামে এক বাগদী রাজা (রূপ রাজা) এক বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারে হেরুক, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বহু দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৰ্দ্ধমান ভুক্তিতে লুইপাদ ও কাহ্নপাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। "কানু ছাড়া গীত নাই"– পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এই 'কানু' হলো বৌদ্ধ কাহ্নপাদ। ডাহ্নকা নিবাসী কাহ্নপাদের চর্যা রাঢ় বাংলার লোকের মুখে মুখে ছড়ার মত বিকৃত হয়ে এখনো বেঁচে রয়েছে। নাড়েশ্বর শিব অধিষ্ঠিত বৰ্দ্ধমান নাড়ুগ্রামে বোধ হয় ছিলেন লাড়পাদ। সন্নিহিত দ্বারকেশ্বর তীরে বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সপ্তগ্রামের ঐ মহাবিহারে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পঞ্চ মহাশক্তি মহাসমারোহ সহকারে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং তা ১০৮ সিদ্ধাচার্য লুইপাদকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। বৌদ্ধরা অহিংস হলেও লুইপাদ মাছ-মাংস খেতেন, সেজন্য অনেকের ধারণা লুইপাদ ছিলেন বাঙালি। রাঢ়ের অনেকেই বৌদ্ধশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করে বৌদ্ধ পূজা পদ্ধতির প্রচলন করেন। রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা এই প্রকার একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন সুবিখ্যাত বৌদ্ধসন্ন্যাসী ও আচার্য। রাঢ় বৰ্দ্ধমানে কি প্রকার বৌদ্ধ প্রসার ঘটেছিল তার প্রমাণ– 'শূন্যপুরাণ'

সুপ্রাচীন বৌদ্ধকাব্য। এব অন্য নাম ধর্মপূজা বিধান। ধর্মপূজা বিধানেব ও গ্রন্থের লেখক বামাই পণ্ডিত দশম শতাব্দীব লোক, বর্দ্ধমানেব বল্লুকা নদীব তীবে তাব বাস ছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে "ক্যালকাটা বিভিউ" পত্রিকায এ কথা স্বীকাব কবা হয়েছে। অতএব বলা যায হাজাব বছব আগেও বাঢে বৌদ্ধবাদ প্রচিলত ছিল।



বেখ দেউল ববাকব

ধর্মপূজা যে বৌদ্ধপূজা তা বামাই পণ্ডিতই পুবাণে উল্লেখ কবেছেন,—

বাড়ি মোব বল্লুকাব
পূজি শ্রীনৈবাকাব॥
শূন্যমূর্তি ধ্যান করি।
সাকার মূর্তি ভজি॥*
পূর্বমুখে পূজা কবি।
পঞ্চম বেদ পড়ি॥

—ধর্মপূজা বিধান ১৬৫ পৃষ্ঠা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন— চারি চতুর্বেদ (বৈদিক ধর্মে)

এর পর রামাই পণ্ডিতের বেদ পঞ্চম বেদ বলে উল্লেখিত এবং শূন্যমূর্তিধ্যান ও সাকার মূর্তির ভজনা বৌদ্ধবাদ। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের পর বৌদ্ধধর্মাচারণ নানা শাখায় ও বিভিন্ন প্রকরণে বিভক্ত হয়েছিল, ধর্মপূজা তারই একটি শাখা।

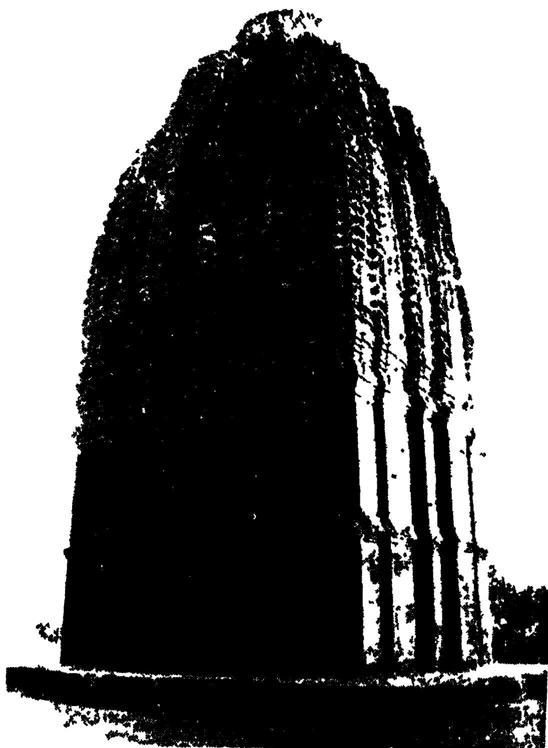
বৌদ্ধধর্ম প্রবাহের অন্যতম লক্ষণ হল– বৌদ্ধবিহার, স্তূপ, দেউল ইত্যাদি। ভবতপুরের স্তূপটিই বাঙলার প্রথম আবিষ্কৃত প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ। বর্দ্ধমান জেলায় বেশ কয়েকটি দেউল বৌদ্ধধর্মানুরক্তির স্মৃতিচিহ্ন হয়ে রয়েছে। শ্যামারূপার গড়ের নিকট অজয় উপত্যকায় ইছাই ঘোষের দেউল। মন্দিরের অভ্যন্তরে কোনও বেদী নেই। শৈব, শাক্ত বা বিষ্ণুমন্দির হলে মূর্তির স্থাপনের জন্য থাকত একটি বেদী। কিন্তু এখানে তা অনুপস্থিত। শূন্যমূর্তিবুদ্ধের কোন রত্নবেদী নেই। লাউসেন ছিলেন বৌদ্ধবাদী এবং ইছাই ঘোষ শাক্তবাদী–ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবক্তা। এই দুই বীরের লড়াই–



বৈদ্যপুরের দেউল

দুই ধর্মমতের লড়াইও বটে। কালনা মহকুমার বৈদ্যপুরের দেউল দুটি রাঢ়ের বৌদ্ধবাদের স্মৃতিচিহ্ন। পাণ্ডুয়ার বিরাট দেউলটিও বৌদ্ধবাদীদের। মুসলমান আমলে এটি মসজিদে

রূপান্তরিত হয়। কিন্তু লক্ষণীয় এর গঠন কারুকার্য মোটেই মুসলিম সংস্কৃতির অনুসারী নয়। পাণ্ডুয়া তখন ছিল বর্দ্ধমান ভুক্তির ভুরশুট পরগণার অন্তর্গত। আজও বর্দ্ধমানেব যত্রতত্র বৌদ্ধদেব-দেবী জনসাধারণের মধ্যে পূজিত হচ্ছেন। বহু ধর্মাচাব— বৌদ্ধধর্মাচাবের রূপান্তর। কাঁকড়া বিছা, দিদিঠাকরুণ, ধর্মরাজ, ওলাইচণ্ডী, নেকড়াইচণ্ডী, শীতলা ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবদেবী বৌদ্ধ ধর্মাচারেবই স্মৃতিচিহ্ন। বৈদিক হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মেব মিলনের ফলেই এদেব উদ্ভব। রাঢ় বর্দ্ধমানে বহুস্তূপ আছে যেগুলি পীরতলা বা পীরের দরগা বলে অভিহিত করা হয, সেগুলি মূলতঃ বৌদ্ধস্তূপ। যেমন উচালনেব শাহ্মীর পীব, একলক্ষ্মী গ্রামেব শা-চাঁদপীব, মুইধাডাব মগদ্দমপীব, পলেমপুবেব পীবপালাম প্রভৃতি। বর্দ্ধমানেব গ্রাম অধিষ্ঠাত্রী গ্রামদেবী সর্বমঙ্গলা অতি প্রাচীন। অনেকে মনে



দেউলে দেউল, মশাগ্রাম

করেন এর বর্তুলাকৃতি মূর্তি প্রমাণ করে যে এটি বৌদ্ধক্রিয়াচারেরই স্মৃতিচিহ্ন। তাছাড়া এই মূর্তি চুনুরীরা প্রথম পূজা করতেন। এখনও দেবীর পূজায় গুগলি ভোগ দেবার

রীতি আছে। গ্রাম বর্দ্ধমানে বর্তুলাকার ধর্মঠাকুর শালগ্রাম শিলা বা প্রস্তর শিলা কোথাও কোথাও নারায়ণ, বিষ্ণু, নামে পূজিত হন। এই ধর্মঠাকুর 'শিবঠাকুর' নামেও পূজিত হচ্ছেন। অনেক মূর্তি আবার শিবলিঙ্গ নয়– বর্তুলাকার, ডিম্বাকার প্রস্তর মূর্তি। এগুলি সবই সম্ভবতঃ বৌদ্ধাচারের প্রশাখা। অনার্যদের স্মৃতিচিহ্ন।

গুপ্ত ও পাল রাজারা হিন্দু ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধবাদী। বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের। সেন রাজারা ছিলেন শৈব ও পরে লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। সেন রাজাদের আমল থেকেই বৌদ্ধপ্রবাহ ভাঁটার টানে গুটিয়ে যেতে থাকে।

শাক্ত, শৈব ধর্ম প্রবাহ

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় অনেকগুলি পাথরের স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গেছে। এই স্ত্রী মূর্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি হল মাতৃমূর্তি। ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্তের মতে (ভাবতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য) এগুলি হল মাতা-পৃথীর মূর্তি। শস্য উৎপাদনী পৃথিবীই তখন ছিলেন মাতৃদেবতা। প্রাণশক্তি ও প্রজনন শক্তির প্রতীক। ঋগ্বেদের মধ্যে বহুস্থলে পিতা-- 'দৌ' এর সঙ্গে মাতা পৃথিবী স্তুতা হয়েছেন। বৈদিক ঋষিগণ উদাত্ত কণ্ঠে মাতা পৃথিবীকে প্রাণদায়িনী, অন্নদায়িনী, স্তন্যদায়িনী বলে স্তব করেছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে একটি সর্বজনীন শিব-শক্তির পরিকল্পনা আমরা পাই। অথর্ব বেদে পৃথিবীকে সন্তান বাৎসল্য মঙ্গলময়ী মাতৃদেবীরূপে বন্দনা করা হয়েছে। আবার কালিকাপুরাণে ইনিই 'জগদ্ধাত্রী' জগৎপালিনী। মার্কেণ্ডেয় পুরাণে ইনিই 'চণ্ডী' বা শাকম্ভরী বলে অভিহিতা হয়েছেন। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ঐ মাতৃমূর্তির কথা ধরলে বলতে হয় শক্তি পূজা ও শাক্ত ধর্ম প্রাক বৈদিক যুগের।

শাক্ত ধর্ম ও শক্তি পূজার মাধ্যমে তন্ত্র সাধনা বর্দ্ধমানের প্রাচীনতম ধর্মাচারণ। দেবী পূরাণে বলা হয়েছে (খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতক) রাঢ়-বরেন্দ্র কামরূপ কামাখ্যা– ভোট্টদেশে (তিব্বত) বামাচারী শাক্তমতে দেবীর পূজা হত। এই উক্তির ফলে ধরে নেওয়া যায় খ্রীষ্টিয় সপ্তম-অষ্টম শতকে বাঢ় বর্দ্ধমানে শক্তি পূজার চল ছিল। এর কিছু পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় গুপ্তোত্তর পর্বে এবং মহাভারতে বর্ণিত জয়দ্রথ– যামল গ্রন্থে (বাঙালীর ইতিহাস– ডঃ নীহাররঞ্জন রায়) এই গ্রন্থে ঈশানকালী, রক্ষাকালী, বীর্যকালী, প্রজ্ঞাকালী প্রভৃতি কালীর নানারূপের সাধনা বর্ণিত আছে। এছাড়াও ঘোরতারা, যোগীনিচক্র, চক্রেশ্বরী প্রভৃতির উল্লেখও এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সব কালীর সাধনমার্গকে অবলম্বন করে বহু তন্ত্র সাহিত্য এই বঙ্গেই রচিত হয়েছে। তাই রাঢ় বর্দ্ধমানকে তন্ত্রভূমি বলা হয়। এখন গবেষকদের কাছে এটি প্রশ্ন, বর্দ্ধমান যদি তন্ত্রভূমি, তবে এই তন্ত্রসাধনা কত দিনের? তন্ত্রকে কেউ কেউ

বলেন বৌদ্ধ পরবর্তী। আবার কেউ কেউ বলেন, তন্ত্রসাধনা বৈদিক ধর্মসম্ভূত। কথিত আছে বশিষ্ঠদেব এই বিদ্যা ও সাধন পদ্ধতি চীন দেশ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্য তন্ত্রসাধনার আর এক নাম চীনাচার। কিন্তু এ প্রশ্নের আজও মীমাংসা হয় নি যে এই বশিষ্ঠই সপ্তর্ষির অন্যতম পৌরাণিক বশিষ্ঠ। প্রাচীন বিদ্যা বিশারদ স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ এবং ইউরোপের গবেষক স্যার জন উডরফ মত প্রকাশ করেছেন যে, তন্ত্র সাধনা বৈদিক যুগের কাল থেকে চলে আসছে। আর্যগণের রাঢ় বর্দ্ধমানে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই তন্ত্রসাধনাও চলে এসেছে এবং কালপ্রবাহে তার রূপান্তর ঘটেছে।

কাঞ্চননগরেব 'কঙ্কালেশ্বরী কালী' তন্ত্রসাধনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৩২০ সালে দামোদরের ভয়াবহ বন্যার পর এই অদ্ভুত কালীমূর্তী দৈবক্রমে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান শহরের পশ্চিমে দামোদর নদের গর্ভে প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট গভীরে এই মূর্তি পাওয়া যায়। প্রস্তরে খোদাই করা কঙ্কালময়ী প্রতিমাটি ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। বিশেষ করে খোদিত মূর্তির মধ্যে নরদেহের শিরা-উপশিরার বিন্যাস এত নিখুঁত তা দেখে শিল্পীর শারীর বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তির পরিচয়ে বিস্মিত হতে হয়। এই মূর্তি দেখে বলা যায় তন্ত্রসাধনা বা শক্তিপূজা বর্দ্ধমানের প্রাচীন ধর্মসাধনা।

"কুব্জিকা তন্ত্রে' পাওয়া যায়, এই রাঢ় বর্দ্ধমানেই ৯টি ডাকার্ণব পীঠ অবস্থিত। উল্লেখ্য যে কর্ণসুবর্ণ, ক্ষীরগ্রাম,বৈদ্যনাথ, বিল্বক, কিরীট, অশ্বতীর্থ, মঙ্গলকোট, উজানী ও অট্টহাসে এখনও সিদ্ধপীঠ আছে। এগুলি প্রাচীন সিদ্ধপীঠ। এই পীঠগুলিতে প্রস্তর নির্মিত দেবী মূর্তি রয়েছে এবং এই দেবীগুলি তন্ত্রোক্ত। এক একটি পীঠে সতীদেহের এক একটি খণ্ডিতঅংশ পতিত হয়েছিল বলে কথিত আছে। উজানীর বর্তমান নাম কোগ্রাম, দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী। অট্টহাসের মহাসিদ্ধপীঠ আজ তান্ত্রিকদের কাছে তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। আর ক্ষীরগ্রামে রয়েছে দেবী যোগাদ্যা— বর্দ্ধমানে এই তিনটি সিদ্ধপীঠেই মেলা ও পূজা হয়। দেবীর সঙ্গে আছেন বিভিন্ন নামে ভৈরব। দেবীদের নিত্য সেবা হয় এবং বিশেষ বার, তিথি ও মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণে বিশেষ যাগ-যজ্ঞের মধ্যে পূজা হয়। দেবীমূর্তি হল চামুণ্ডামূর্তি— ভাস্কর্যেব অপূর্ব নৈপুণ্য শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় বহন করছে। 'শিবচরিতে' পাওয়া যায়, এখানে দেবীর ওষ্ঠাংশ পতিত হয়েছিল। অট্টহাস পীঠের পুস্করিণীতে এই তান্ত্রিক দেবীমূর্তি পাওয়া যায়। রাঢ় বর্দ্ধমানের শক্তি সাধনা ও তন্ত্রসাধনা সাধক-ভাস্করগণের শিল্পসৌকর্যের ও প্রাচীনত্বের প্রমাণ।

রাঢ় বর্দ্ধমানে আজ বহু গ্রামে কালী-করালমূর্তি পূজিতা। বহু মূর্তি প্রাচীন, শত শত বৎসরের কালপ্রবাহ এই তন্ত্রসভ্যতাকে আধুনিক করেছে, কিন্তু প্রাচীন পূজা-আর্চ্চা ও অনুষ্ঠানকে সাগ্রহে বেঁধে রেখেছে। এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে শক্তিপূজা খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছরের প্রাচীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

কালী; বিষ্ণু ও শিবমূর্তি গড়ার জন্য রাঢ় বর্দ্ধমানে তখনকার দিনে বহু ভাস্কর প্রাণপাত করেছিলেন। শাঁকারী গ্রামে প্রাপ্ত বাসুদেব মূর্তির ভাস্কর্য ও শিল্প চাতুর্য সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙলার মূর্তি শিল্প গবেষক মহেন্দ্রনাথ দত্ত এই মূর্তিকে বহু পুরাতন বলে মন্তব্য করেছেন। দক্ষিণ দামোদরের খণ্ডঘোষ ব্লকের অন্তর্গত শাঁকারী একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের কেন্দ্রস্থলে বাসুদেব মূর্তি অধিষ্ঠিত আছে। কিম্বদন্তী যে, এই বাসুদেব মূর্তি দুহাজার বছর আগে গ্রাম পুনরুদ্ধার কল্পে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্দ্ধমানের রাধাবল্লভ বিগ্রহ, দুর্লভ কালীমূর্তি, তেজগঞ্জের কালীমূর্তি প্রভৃতি প্রস্তর শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। আমরা এযাবৎকাল জেনে এসেছি, বাঙালির মধ্যে মৃৎশিল্পের প্রচলন বেশি, কিন্তু বর্দ্ধমানের এই সব প্রাচীন মূর্তিগুলি প্রমাণ করে রাঢ় বর্দ্ধমানের শিল্পীরা ভাস্কর্যেও অশেষ খ্যাতির অধিকারী, ছিলেন। 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'ও 'বীরভূম অনুসন্ধান সমিতি' রাঢ় বঙ্গে বহু প্রস্তর মূর্তি আবিষ্কার করেছেন। তার থেকে বলা যায় বাঙলার ভাস্করশিল্প দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছিল। উত্তর রাঢ়ের দেবগ্রামের দেবকুণ্ড এক বিশাল জলাশয়। এই জলাশয়ের সংস্কার কালে অনেক দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। তার মধ্যে কষ্টিপাথর নির্মিত বাসুদেব বিগ্রহকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাজার বছরের প্রাচীন বলেছেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দে ঐ গ্রামের লালদীঘি পুষ্করিণীতে একটি "মহেশ্বরী" মূর্তি পাওয়া যায়। এছাড়া সেনপাহাড়িতে ইছাই ঘোষের "শ্যামারূপা" দেবীও প্রাচীন। ইছাই ঘোষের ভাঙা প্রাসাদে অষ্টধাতু নির্মিত এই দেবীমূর্তি তন্ত্র সাধনার যুগের। এই সব দেবদেবীর মূর্তি কতদিনের? রাঢ়ে তন্ত্র সাধনার যুগ কখন থেকে শুরু হয়েছিল? তন্ত্রসাধনার যুগ কি বৌদ্ধ পূর্ববর্তী? এই সব প্রশ্নের উত্তরে বহু মত, বহু বিতণ্ডা রয়েছে। অনেক প্রাজ্ঞ বিশেষজ্ঞ মনে করেন— তন্ত্র সাধনা আর্য সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে এসেছে। অনেকে বলেন, বৌদ্ধাচারই তান্ত্রিক সাধনার উৎস। এই প্রশ্নের অবতারণা করার পর এটাই বলা যায়, কোন কোন তান্ত্রিক সাধনা আর্য-ধর্মপ্রসূত, আবার কতকগুলি বৌদ্ধক্রিয়াচারের ফলশ্রুতি। আর্য সংস্কৃতি অর্থাৎ প্রাক বৌদ্ধ যুগে তন্ত্র সাধনার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাবীর যখন বর্দ্ধমানে এসেছিলেন, তখন অস্থিক গ্রামে বর্দ্ধমানের আদিবাসীগণ যক্ষ ও যক্ষিণীর পূজা করতেন। মদ্য ও মাংস ছিল পূজার উপাচার— তান্ত্রিক সাধনারই নামান্তর। কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ তন্ত্র সাধনাকে অসংস্কৃত ধর্মসাধনা বলে উল্লেখ করেছেন। স্যার জন উড্রফের "Sakta Cult" পুস্তক পাঠ করলেই জানা যায়— রুদাচার ও অনাচার সম্বলিত তন্ত্রসাধনাগুলি বৌদ্ধক্রিয়াচার ছাড়া আর কিছুই নয়। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পর বহু গোষ্ঠী নিজ-নিজ পথ ও মত অনুযায়ী তন্ত্রসাধনায় লিপ্ত হয়ে এইভাবে ধর্মাচরণ করতেন— যার মধ্যে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার সমন্বয় ঘটেছিল। বৃন্দাবন দাস তাঁর চৈতন্য ভাগবতে সে কথাই লিখেছেন,—

"ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ
ডাকাচুরি পর গৃহ দহে অনুক্ষণ"

জয়ানন্দও সমাজের এক শ্রেণীর তান্ত্রিক ব্যভিচারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,—

অন্ন যোনি বিচার নাহিক দুই ভাই
শ্চান সন্ধ্যা বিবর্জিত জগাই মাধাই॥
গো-বধ ব্রহ্মবধ, স্ত্রীবধ যত তত।
ছলে বলে গুরু পত্নী হরে শত শত॥
গোমাংস শূকর মাংস করে সুরা পান
ধর্ম কথা না শুনে, না করে গঙ্গাশ্চান॥

তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে ব্যভিচার ও ইতরাচার যে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছিল তাও জয়ানন্দের উক্তি থেকে পাই,—

"শিশু সবে আছাড়িয়া মারে শিলাপাটে।
কত শত গর্ভবতীর কত গর্ভ কাটে॥
উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি মদিরাভক্ষণে।
ঘূর্ণিত লোচন চারু পূর্ণা সত্রাসনে।
দস্যুগণ সঙ্গে থাকি ঘরে অগ্নি দেই।
বুকে বাঁশ দিয়ে কারো সর্বস্ব নেই॥

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতকে বাঙলার সমাজ জীবন যে তমসাচ্ছন্ন হয়েছিল এবং অনাচার ও ব্যভিচার ছিল দেহসর্বস্ব-ভোগসর্বস্ব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তা লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলেও পাই,

ব্রাহ্মণ যবনী গুর্বসূনা নাহি এড়ে।
ব্রাহ্ম বধ, গো বধ, স্ত্রী বধ, শত শত মত।

যদিও পাল-চন্দ্র-কম্বোজ লিপিমালা অথবা সেন-বর্মণ লিপিমালায় কোথাও তান্ত্রিক সাধনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবু পাল রাজগণের আমলে শাক্ত পূজার রূপ কল্পনা বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি থেকে অনুমান করা যায়— কিন্তু এতে তান্ত্রিক ব্যঞ্জনা ছিল না, একথা জোর দিয়ে বলা যায়। জয় পালের গয়া লিপিতে "মহানীল-সরস্বতী" নামে দেবীকে তান্ত্রিক দেবী বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এই শাক্ত ধর্ম শৈব ধর্ম থেকেই উদ্ভুত। শৈব ও শাক্ত— একটি অপরটির পরিপূরক। পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণ করলে দেখা যাবে সকল দেবীমূর্তিই শিবের সঙ্গে যুক্ত— দেবীগুলি শিবেরই বিভিন্ন রূপিনী শক্তি। তাই বলা যায় শৈব-ধর্মের সঙ্গে শাক্ত ধর্মের একটা নিগূঢ় যোগ রয়েছে। শৈব ধর্মেরই চূড়ান্ত পরিণতি হল শাক্ত ধর্ম।

বস্তুতঃ পাল-চন্দ্র-কম্বোজ পর্বে লিঙ্গরূপী শিবের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। খালিমপুর লিপিতে চতুর্মুখ মহাদেবের উল্লেখ আছে। নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপিতে এক সহস্র শিব প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। রামপাল রামাবতীতে শিবের তিনটি মন্দির, একাদশ রুদ্রের একটি এবং সূর্য, স্কন্দ ও গণপতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুপ্ত পরবর্তী যুগে শৈবধর্মের ব্যাপক প্রসার শিব-আরাধনার মধ্য দিয়ে ঘটে যায়। পালবংশের একমুখীলিঙ্গ শিব বাঙলার নানা স্থান থেকে পাওয়া গেছে। মুর্শিদাবাদে প্রাপ্ত (আশুতোষ চিত্রশালা) ধাতব চতুর্মুখ লিঙ্গ শিবমূর্তিটি দশম-একাদশ শতকের বলে মনে হয়। পাহাড়পুর মন্দির গাত্রে চন্দ্রশেখর শিবের একাধিক প্রতিকৃতি আছে। নটরাজ শিবের মূর্তিও বাঙলার নানা স্থানে পাওয়া গেছে, কিন্তু এই মূর্তি দক্ষিণ ভারতের নটরাজ মূর্তি হতে পৃথক।



শিবমন্দির অমরার গড়

পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে শিবঠাকুর রাঢ়বঙ্গের প্রায় প্রতিটি গ্রামে এখন বিভিন্ন নামে পূজিত হচ্ছেন। রুদ্র-যামল গ্রন্থের মতে শিবের ছয়রূপ— ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরাশিব। এর মধ্যে সদাশিবের রূপ কল্পনা মহানির্বাণতন্ত্র ও গরুড় পুরাণ-গ্রন্থে পাওয়া যায়। রাজা তৃতীয় গোপালের রাজত্ব কালে এই ধরণের সদাশিব মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এখন তা কলকাতার চিত্রশালার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। কর্ণাট বংশীয় বাংলার সেন-রাজগণও সদাশিবের ভক্ত ছিলেন।



শিবমন্দির গাত্রে টেরাকোটা কাজ

পৌরাণিক "উমা মহেশ্বর" কাহিনী বাঙালির চিত্ত জয় করেছিল, তাই পালযুগে 'উমা-মহেশ্বর' যুগলমূর্তি পরবর্তীকালে "হর-পার্ব্বতী" নামে রাঢ় বর্দ্ধমানের হৃদয়ে আসন অধিকার করে নেয়। বিশুদ্ধ তন্ত্রসাধনার পূজারী রাঢ়-বাঙালি শিব-উমার ছবি যেমন-- শিবক্রোড়োপবিষ্টা, সুখাসীনা, আলিঙ্গনাবদ্ধা, হাস্য ও লাস্যময়ী উমাই তো শিবশক্তির প্রতীক। শিব-উমার কাহিনীকে বাঙালি আর্দ্রহৃদয়ে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই পর্যন্ত শৈব ও শাক্তের কোন ভেদ নেই-- একে অপরের হাত ধরে রাঢ়-বাঙালির চিত্ত মথিত করেছে।

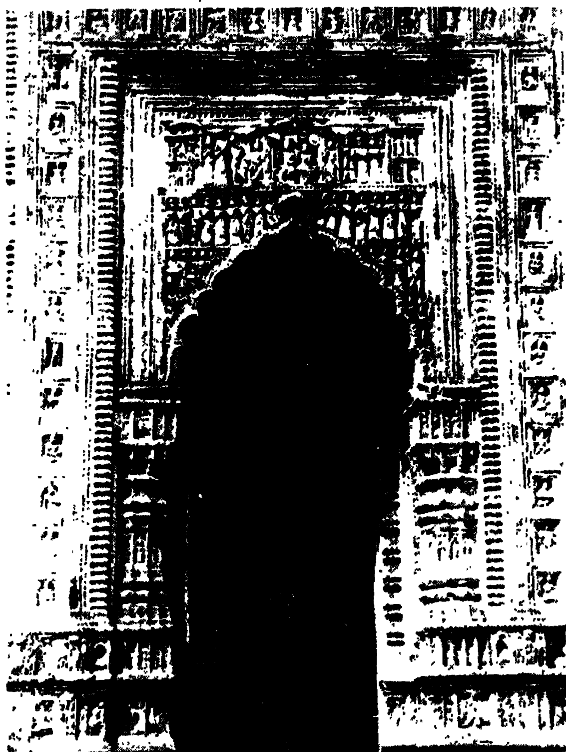
পার্ব্বতী উমা পরবর্তীকালে দুর্গা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 'দুর্গাদেবীর' প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তৈরিত্তিয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদের মধ্যে—

দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ

মার্কেণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারে দুর্গম ভবসাগরে নৌকা স্বরূপ বলে তিনি দুর্গা, আবার দুর্গম নামক অসুর বধ করেছিলেন বলে তিনি 'দুর্গা'। দেবী পুরাণে দুর্গার স্তব আছে—

ত্বং হি দুর্গে মহাবীর্যে দুর্গে দুর্গপরাক্রমে।

অতএব দুর্গের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীই পরে সর্ব্বশক্তিময়ী দেবীরূপে পূজিতা হন।



প্রাচীন শিবমন্দির কালনা

তারপরই রুদ্র ও ভয়ঙ্কর শিব এবং ভীষণা ও ভয়ঙ্করী চণ্ডী, চামুণ্ডা বা কালীমূর্তি। শৈবাগম অনুসারে রুদ্রশিবের পঞ্চরূপ— বামদেব, তৎপুরুষ, সদ্যোজাত,

অঘোর ও ঈশান-পঞ্চব্রহ্মা। এর মধ্যে অন্যতম অঘোররূপের ভক্ত সম্প্রদায় যে পাল-সেন পর্বে ছিলেন তার উল্লেখ পাওয়া যায়। নগ্ন, কুকুর সঙ্গিনী, নরমুণ্ডমালিনী, বিকটহাস্যস্ফুরিতা, লোলজিহ্বা প্রসারিতা কালী মূর্তি তান্ত্রিক সাধকের ধ্যান ও কল্পনার বিষয়।

বাঙলায় চণ্ডী বা দেবী দুর্গার প্রতিমাও বহুল প্রচলিত। কোথাও চতুর্ভুজা, কোথাও তিনি দশভুজা। কোথাও একাকিনী, কোথাও সপরিবারে– সমগুলে আসীনা। কোথাও প্রতিমার পাশে স্বর্ণ গোধিকার মূর্তি, কোথাও কলাগাছ। এই দুটি নিদর্শনই লোকায়ত ধর্মের প্রতিফলন। মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে মুকুন্দরামের 'চণ্ডী ও কালকেতুর' উপাখ্যানে স্বর্ণগোধিকার উল্লেখ আছে–

–"ধরার আঁচলে মোছে লোচনের নীর।।
সুবর্ণ গোধিকা পুনঃ দেখে মহাবীর।।
এমন বিচার বীর মনেতে ভাবিয়া
বান্ধিল গোধিকা বীর জাল দড়ি দিয়া।।
গোধিকা লইয়া বীর চলে নিজ বাসা।
চণ্ডীকার না ঘুচিল বন্ধনের দশা।।

বাঁকুড়া জেলার দেওলি গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তিটি উপরোক্ত ভাবনার দ্যোতক।

বর্দ্ধমানের আউসগ্রাম কাঁকসা-দুর্গাপুরের যে অঞ্চল 'গোপভূমি' নামে খ্যাত সেখানেও শক্তিপূজা ব্যাপক প্রচলিত ছিল। ইছাই ঘোষ গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত সদগোপ হলেও 'শ্যামারূপার' পূজায় তান্ত্রিকতা পুরোমাত্রায় বজায় রেখেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, গোপদের কাছে এই "শ্যামারূপা" হলেন কৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা 'শ্যামরূপা" রাধিকা। আবার কেউ ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এই 'শ্যামরূপা' দেবী কালিকা, নইলে তন্ত্রমতে ইনি কেন পূজিতা হবেন? মদ্য ও মাংস সহযোগে 'শ্যামারূপা' পূজিতা হতেন। এত ছাগ ও মহিষ বলিদান হত যে রক্তে ঢেউ খেলে যেত। তাই এই এলাকার একাংশের নাম 'ঢেউগড়' বা 'ঢেকুর গড়'। 'শ্যামারূপা' কে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে যে শাক্তধর্মের উদ্ভব হয় তা 'সামাঁধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে।

'ভবিষ্য খণ্ড পুরাণে' মহিষমর্দিনী মূর্তির উল্লেখ রয়েছে যা আজ রাঢ় বর্দ্ধমানের প্রত্যেকটি গ্রামে 'দুর্গা' রূপে শারদীয় উৎসবে পূজিতা হন। এঁরা দশভুজা, অষ্টভুজা এবং চতুর্ভুজা। শিব, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিক সহ দুর্গামূর্তি রাঢ় বর্দ্ধমানের প্রত্যেকটি গ্রামে শারদোৎসবে পূজিতা হন।

বাংলার শক্তিপূজায় দশমহাবিদ্যার প্রথম দুটি ছাড়া বিশেষ কোথাও পূজিতা হন না। দশমহাবিদ্যার মূর্তি হল– কালী, তারা, ভৈরবী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা,

ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। বৃহদ্ধর্মপুরাণে আছে বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত দেবী-অঙ্গ পতনে পীঠ সমুহের উৎপত্তি হয়। বৰ্দ্ধমানের অট্টহাস মহাপীঠে দেবীর ওষ্ঠ পতিত হয়েছিল।

তান্ত্রিক সাধনার মূর্তি হলো— উগ্রচণ্ডী, তারা, কালী, চামুণ্ডা, ছিন্নমস্তা। মাতৃমূর্তি সাত প্রকারের— ব্রাহ্মণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রানী, বৈষ্ণবী, বরাহী ও চামুণ্ডী।

এদের মধ্যে রাঢ় বৰ্দ্ধমানে চামুণ্ডাই সব চাইতে প্রিয়। একান্ন পীঠের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান বৰ্দ্ধমানের অট্টহাস গ্রামে দ্বিহস্ত দন্তরার মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। অধুনা বৰ্দ্ধমানের প্রায় প্রতিটি গ্রামে রক্ষাকালী বা চামুণ্ডা মূর্তির পূজা হয় শারোদোৎসবের পর কার্তিক মাসের অমাবস্যায়। কোথাও কোথাও কালীমূর্তির উচ্চতা ১০ ফুট পর্যন্ত। ছোটবৈনানের সিদ্ধেশ্বরী কালী, ক্ষামতা চণ্ডীপুরের চণ্ডী,কাইতির সিদ্ধেশ্বরী রক্ষাকালী, বোঁয়াই চণ্ডীর বসন্তচণ্ডী কালী উচ্চতায় বিরাট। কালী নামটির প্রথম উল্লেখ দেখা যায় 'মুণ্ডক উপনিষদে।' সেখানে কালী আহুতি গ্রহণকর্ত্রী অগ্নিজিহ্বা মাত্র। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্বেও উল্লেখ আছে। সপ্তদশ শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কালীই হলেন শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠা।

পুরাণ, উপ-পুরাণ ও তন্ত্রাদির মধ্যে কালী বা কালিকার বিশেষ বিবর্তনের তাৎপর্য হল— কালীর সঙ্গে শিবের যোগ। কালী শিবরূঢ়া, তাঁর এক পা শিবের বুকে ন্যস্ত। ভক্ত সাধকগণ এই তত্ত্বের নানাবিধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেন, কালী শিবারূঢ়া নন, শবারূঢ়া ; অসুর বিনাসের পর দেবী অসুর-শব পদদলিত করেছেন। কেউ বলেন, আসুরিক প্রবৃত্তি মানুষের অধঃপতনের মূল, দুর্বলতার কারণ। তাই মনের আসুরিক প্রবৃত্তি বিনাশের ও শক্তিলাভের প্রতীক এই কালীমূর্তি। তাঁর আরাধনায় মানুষ, দেশ ও জাতির মঙ্গল। রামপ্রসাদের গানে এই সত্যটি ফুটে উঠেছে—

শিব নয় মায়ের পদতলে।
ওটা মিথ্যা লোকে বলে
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে,
মা দাঁড়ায়ে তার উপর,
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ
শিবরূপ হয় রণস্থলে।।

বৰ্দ্ধমানের সাধক কবি কমলাকান্ত শক্তি সাধক ছিলেন। তিনি কোটালহাটে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে মাতৃসাধনা করতেন। ঐ আসনেই সমাধিস্থ হয়ে দেহরক্ষা করেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গীতাবলীতে শাক্ত দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়—

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

সাধক কবি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেলার মবারকপুরে জন্মগ্রহণ করেন। নীলাম্বর ছিলেন গৃহী সাধক। বর্দ্ধমান রাজ তেজচন্দ্র-দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৪০) একজন মাতৃসাধক কবি ছিলেন। তাঁর একটি উদাহরণ—

উপায় না দেখি আর, আকিঞ্চন ভেবে সার।
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গানামের ভেলা ধরি॥

শাক্ত সাধনার মূলকথা হল, শক্তি জীবদেহে বিরাজ করেন। শক্তি সাধনার ক্ষেত্রে দেহই সর্বোচ্চ আসন। জীবদেহের মধ্যেই সব আছে। মায়ের সাধনাব মধ্য দিয়ে শক্তির সাধনা ও ইহসংসার থেকে মুক্তি। যখন দেহ মন-শক্তি একাত্ম হয়ে যায় তখন ভক্ত ইপ্সিত ফল বা মোক্ষ লাভ করেন।

তান্ত্রিক সাধনার দুটি ধারা— একটি আর্যসংস্কৃতি সম্ভুত ও অন্যটি বৌদ্ধাচারের প্রশাখা। শেষোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের অত্যাচারে বাঙলার মানুষ যখন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন ঠিক তখনই এই ব্যভিচার ও তামসিক আচার ধ্বংস করতে নূতন জীবন-ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, তার নাম বৈষ্ণব ধর্ম

বৈষ্ণব ধর্ম প্রবাহ

বিষ্ণুর যারা উপাসক তাদেরই বৈষ্ণব বলা হয়। বিষ্ণু বা নারায়ণ পৌরাণিক দেবতাদের নায়কস্বরূপ। তাই বলা যায় বৈষ্ণব ধর্মও প্রাচীন। খালিমপুর লিপিতে নন্ন-নারায়ণের এক দেউলের নাম পাওয়া যায়। এই নন্ন-নারায়ণ কৃষ্ণরূপী নারায়ণ। পাল যুগের যত দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বিষ্ণু মূর্তিই সর্বাধিক। বিষ্ণু মূর্তির তিনটি রূপ— আসন, শয়ান ও স্থানক। এর মধ্যে স্থানক মূর্তির ঝোঁকই বাঙলায় প্রবল। বেশির ভাগ বিষ্ণুমূর্তির চারি হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধৃত। প্রথম মহীপালের রাজত্বে ত্রিপুরা জেলার বাঘাউড়া গ্রাম বা স্থানীয় কোন একটি স্থানে বিষ্ণুমূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পাদপীঠে উৎকর্ণ লিপিতে আছে— "নারায়ণ ভট্টারকস্য"। বর্দ্ধমান জেলার চৈতন্যপুর গ্রামে স্থানক-বিষ্ণুর একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সাগর দীঘিতে প্রাপ্ত আসন-বিষ্ণু ও বর্দ্ধমানে প্রাপ্ত স্থানক-বিষ্ণু উভয়ই শ্রীধর বা হৃষিকেশ-বিষ্ণুর প্রতিমা (রাজশাহী চিত্রশালা)।

অবতাররূপী বিষ্ণুর প্রতিমা রাঢ় বাঙলায় অনেক পাওয়া গেছে। দশ অবতাবের মধ্যে প্রধানতঃ বরাহ; নরসিংহ, বামন— এই ত্রিমূর্তিই সমধিক পূজিত হতেন। যেমন সিলিমপুর গ্রামে প্রাপ্ত বরাহমূর্তি, বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বরাহমূর্তি, ঢাকা চিত্রশালার নরসিংহ মূর্তি এবং জোড়া দেউলে প্রাপ্ত বামন মূর্তি উল্লেখযোগ্য। অষ্টমাবতার হলধর বলরাম মূর্তিও অনেক পাওয়া গেছে। বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার বোড়ো-বলরাম গ্রামের বিশাল বলরাম মূর্তির কথাও উল্লেখ্য। যদিও এই মূর্তি পাঁচশত বৎসরের বেশি

পুরাতন নয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল এঁর স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

সেনরাজগণের সময় থেকে রাঢ় বর্দ্ধমানে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপক প্রসারলাভ করে। রাঢ়ের বৈষ্ণব সভ্যতা বাংলার এক অপূর্ব্ব সম্পদ। উত্তর ভারতের ভক্তিমূলক ভাগবত ধর্ম ও দক্ষিণাত্যের রামানুজ, ভল্লভাচার্যের ভাবদর্শন থেকে রাঢ়ের বিষ্ণুভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক। অধ্যাত্ম সাধনা আত্মরসের লোকাতীত ব্যঞ্জনা। গীতায় যাকে বলা হয়েছে— সহজং কর্ম কৌন্তেয়। নিজ ভাব-ভাবনা ও অনুভাব হল এর প্রাণ স্বরূপ। এই ভক্তিরস— ঐশ্বরিক, কিন্তু লৌকিক। বৈষ্ণবাতার ভক্তিপ্রেম দেবতার নৈবেদ্য, কিন্তু তা আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা, বাৎসল্য রসের স্বর্গীয় বস্তু। তাই বৈষ্ণব সাহিত্য আজ বিশ্ব সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। বৈষ্ণব দর্শন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন।

ভগবান যিশুর আবির্ভাবের পর যেমন ইউরোপে এক নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, বাংলায় তেমনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বাঙালির জাতীয় জীবনে নবোন্মেষ ঘটেছিল— একেই বলা হয় রেনেসাঁ। মধ্যযুগীয় বর্ব্বরতা রাঢ়বঙ্গের সমাজ জীবনে উপহার দিয়েছিল— ব্যভিচার, কলুষতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, অত্যাচার, নিপীড়ন। দুর্বলের উপর সবলের পাশবিক অত্যাচার, নারীত্বের অবমাননা ও সতীত্বের লাঞ্ছনা, ভোগ ও লালসা সর্বস্ব প্রবৃত্তি ও তামসিক ক্রিয়াকাণ্ড— মধ্যযুগের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ভগবান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার নারকীয় জীবনের প্রতীক জগাই-মাধাই-এর মানবত্ব লাভ, এবং কাপুরুষ ও অধঃপাতিত জাতির আত্মমুক্তি ঘটেছিল।

তুর্কির আক্রমণে গোটা সমাজে যে কশাঘাতের ক্ষত দেখা দিয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে স্নেহ, প্রেম ভক্তিরসের স্বর্গীয় মন্দাকিনীধারা তাতে প্রলেপের কাজ করেছিল। কলঙ্কিত, ঘৃণ্যময় অমানবিক গহ্বর থেকে বাংলা মুক্তি পেল এক শাশ্বত দর্শনের উন্মেষে— "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই"—। বা " ভেঙেছিস কলসীর কানা, তা বলে কি প্রেম দেব না"। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণভক্তির জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল ভোগ লালসার জীবন-প্রবৃত্তি। রূপ ও সনাতন মুসলমান সুলতানের রাজপদ ত্যাগ করে মানবতার আলোকে অবগাহন করে শিষ্য হয়ে গেলেন, গৌড়ের সুলতান ও নদীয়ার কাজী শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন, প্রভুর আশীর্বাদে ধন্য হলেন। সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদারতা এবং মহাপ্রভুর তেজস্বীতায় দূরীভূত হল অন্ধজাতিতত্ত্বের গোঁড়ামী। পর-ধর্ম পীড়িত জাতি যেন বেঁচে গেল— স্বধর্মাচরণে ও পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধায়।

কবি জয়দেব গোস্বামীর কৃষ্ণভক্তিরসের কাব্য— 'গীতগোবিন্দ' লক্ষ্মণসেনকে আকৃষ্ট করেছিল বৈষ্ণব দর্শনের দিকে।

"স্মরগরল খণ্ডনং
মম শিরসি মণ্ডনং
দেহিপদপল্লব মুদারম্—

'গীতগোবিন্দের' প্রেম-ভক্তিরসে ও মহাপ্রভুর লীলাকীর্ত্তনে 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।' গীতগোবিন্দের ভাষা-ছন্দ, কাব্যরস ও প্রেম ভক্তিরসে সুললিত, মধুর ও ব্যঞ্জনাময়। 'যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে'— কৃষ্ণের এই আকুতি রাঢ় বর্দ্ধমানকে শুদ্ধ ও পবিত্র করল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 'গীতগোবিন্দ' শ্রবণ করে গলদঅশ্রুলোচন হতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেছেন,

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পবম আনন্দ॥

অর্থাৎ চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের কৃষ্ণ বিষয়ক লীলাকাব্যের রস সপার্ষদ মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রায় শতাব্দী পূর্বে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে রাঢ়বঙ্গের ভক্ত-বৈষ্ণবতার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান জেলার কুলীন গ্রামে কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু জন্মগ্রহণ করেন। কুলীন গ্রাম রাঢ়বর্দ্ধমানের বৈষ্ণবতীর্থ, মহাপ্রভু এই গ্রাম সম্পর্কে বলেছিলেন,

কুলীন গ্রামের কথা কহনে না যায়।
শূকর চড়ায় ডোম, সেই কৃষ্ণ গায়॥

মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খান ও তৎপুত্র রামানন্দ বসু চৈতন্যের পরম ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব রামানন্দকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সেই সময় কুলীন গ্রাম বৈষ্ণব ধর্ম চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। হরিধামে মহাপ্রভু একবার কথায় কথায় রামানন্দকে বলেছিলেন—

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর॥

মধ্যযুগের বৈষ্ণব ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চ্চা রাঢ় বর্দ্ধমানকে বিখ্যাত করেছিল। এই সময়ের বৈষ্ণব ধর্ম প্রবাহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়— প্রাক চৈতন্য, চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর পর্ব। মালাধর বসুর 'শ্রী কৃষ্ণবিজয়, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রাক চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য। বলা যায়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব পর্বটিকে সুসজ্জিত করে মাধুর্যমণ্ডিত করার

জন্যই এই কাব্যগুলির প্রস্তুতি ছিল। চৈতন্য যুগে বাসুদেব, কুলীন গ্রামের রামানন্দ, রায়রামানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ (ঝামটপুরের), হুগলীর সপ্তগ্রামের রঘুনাথ দাস, বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী (রূপ-সনাতন-রঘুনাথ ভট্টাচার্য— শ্রীজীব গোস্বামী গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আর চৈতন্যোত্তর যুগে জয়ানন্দ, বৃন্দাবন দাস, নরহরি সরকার (শ্রীখণ্ড), গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস এবং প্রাক চৈতন্যযুগে মালাধর বসু বৈষ্ণব কবিগণ পদাবলী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন

বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য সে সময় রাঢ় বর্দ্ধমানকে প্লাবিত করেছিল। কাটোয়া অজয় ও গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে এবং কালনা, নবদ্বীপ কৃষ্ণভক্তি রসে বিধৌত হয়েছিল। বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীখণ্ড গ্রাম ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর তীর্থক্ষেত্র। বৈষ্ণব কবি শ্রীরসিকানন্দ বলেছেন,

শ্রীখণ্ডের ভাগ্য নাহি ধরে অন্য গ্রাম
নরহরি যাহাতে হইল উপাদান।

এই শ্রীখণ্ড গ্রামেই ঠাকুর শ্রীনরহরির জন্ম। কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মস্থান ঝামটপুর, রামানন্দ বসুর জন্মস্থান কুলীন গ্রাম, বৃন্দাবন দাসের জন্মস্থান দেনুড়, জ্ঞানদাসের জন্মভূমি কাঁদড়া, লোচনদাসের জন্মস্থান কোগ্রাম, জয়ানন্দের মাতৃভূমি আমাইপুর— এই গ্রাম গুলিকে কেন্দ্র করে বর্দ্ধমানে বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্য দর্শন নূতন করে বিপথগামী মানুষকে পথ দেখিয়েছিল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বর্দ্ধমানের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের নব প্রবর্ত্তক হলেও তাঁর ধর্মতত্ত্ব কোন নূতন নয়। শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন প্রেমিক, ভক্ত। তাঁর কাছে উচ্চ-নীচের, কুল-শীলের, ধনী-দরিদ্র, ধর্মী-বিধর্মী, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের কোন ভেদ ছিল না। তিনি প্রেমের বাঁধনে সকলকে বাঁধতেন। তিনি অদ্বৈতের গৃহে পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে আহার করে যেমন তৃপ্ত হতেন, তেমনি দরিদ্র শ্রীধরের ঘরে ভাঙা পাত্রে জলপান করেও তৃপ্ত। যবন হরিদাসকে বিধর্মী বলে ঘৃণা করেননি, আবার গলিত কুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন করতে দ্বিধা করেননি। প্রেম ভক্তি রসে জারিত হরিভক্ত চণ্ডালকে ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করতেন। তাঁর মতে—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সভল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥

তিনি বলতেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনিই তাঁর ভক্ত। এখানে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কুল ও শীলের বিচার নেই। বৃক্ষের মত সহিষ্ণু, তৃণের মত সুনীচ হতে হবে— তবেই মন হবে শুচি, চিত্ত হবে শুদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তদের আটটি উপদেশ দিতেন। রূপ গোস্বামীর পদাবলীতে এই আটটি শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

এই শ্লোকগুলিতে আছে— ঈশ্বর চিত্তের নিকটবর্তী বস্তু, মনের মলিনতা দূর করে তাঁর ভজনা করতে হবে, ঈশ্বর চিন্তার ফলে সংসার-গ্লানি দূর হয়ে যায়, অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করতে হবে, আত্মসমর্পণই প্রেমসেবা, যখন সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয় চিত্ত শুদ্ধি, আর তখনই ঈশ্বর হন প্রাণ সর্বস্ব, বৈষ্ণবের বিনয় ও ক্ষমা বৈষ্ণব ধর্মের ভূষণ। এইভাবে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদময় জীবন সমগ্র রাঢ় বর্দ্ধমানকে এক নূতন চেতনা দান করেছিল।

বৈদিক ধর্ম ও তার পুনঃ প্রবর্তন

খ্রীষ্টপূর্ব হাজার বছর আগে আর্যক্ষত্রিয়গণ জীবিকার ও আর্যসভ্যতা বিকাশের ইচ্ছায় গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চল ধরে রাঢ় বর্দ্ধমানে প্রবেশ করেন ও সেখান থেকে দামোদর-অজয় ভাগীরথী উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েন। সেই সময় বর্দ্ধমানের আদিবাসী বোড়ো, ডোম, শবর, কিরাত, নিষাদ প্রভৃতি অনার্যগণের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আদিবাসীরা আর্যগণের উন্নতসভ্যতা, জীবন-যাপন প্রণালী ও সহিষ্ণুতা দেখে আশ্বস্ত হন। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে আর্য ও অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানে গড়ে ওঠে নূতন সমাজ ব্যবস্থা। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে ঘটে যায় ধর্মবিপ্লব। কিন্তু আর্যগণের সহিষ্ণুতার ফলে অনার্য ধর্মের বহু আচার আচরণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অক্ষত ও অপরিবর্তিত থেকে যায়।

আর্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের মূলকথা হল বৈদিক ধর্মাচরণ ও শ্রৌতসংস্কার। বেদকে ভিত্তি করে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে বলে একে বৈদিক সভ্যতা ও এই সভ্যতার কৃষ্টিকে যারা ধারণ করেছিলেন তাদের বৈদিক ধর্মাবলম্বী বলা হয়। বেদের চারটি পাঠ— ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বেদ বিদ্যায় রাঢ় বর্দ্ধমানের শ্রেষ্ঠত্ব পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি 'ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট প্রকাশ' নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থকার নারায়ণ দেবপাল দেবের সমসাময়িক। গ্রন্থকর্তা নারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ উত্তর রাঢ়বাসী। ধর্মনামে এই বংশের এক ব্যক্তি বৈদিক ক্রিয়াকার্যে পরম পারদর্শী ছিলেন। ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে এর উল্লেখ আছে—

শ্রৌতে বিধৌ সততঃ নির্মলধী প্রসারঃ

—ছান্দোগ্য প্রকাশ ২য় পৃষ্ঠা ৫ম শ্লোক।

নারায়ণ তার পূর্বজগণের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন,

চরিত মহতি যেষামন্বয়ে সোমপীথী
সমজনি পরিতোষশ্চুঙ্গাসাং দেহবন্ধ।
তালভাত স হি বিপ্রসনং তালবটীং
তদিহ ভজতি পূজামুত্তমা যেন রাঢ়া॥

ভট্ট ভবদেবের অবদান

এই বেদ ভারতবর্ষের প্রকৃত সংস্কৃতির পরিচায়ক। রাঢ় বর্দ্ধমানে বেদ বিজ্ঞানের কতখানি প্রচার হয়েছিল ভট্ট ভবদেব তার জ্বলন্ত উদাহরণ। ফণীভূষণ তর্কবাগীশ মনে করেন বর্দ্ধমান জেলার গুসকরার কাছে সিধলে গ্রামে ভট্ট ভবদেব বঙ্গেশ্বর হরিবর্মাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বাংলা থেকে বৌদ্ধধর্ম উচ্ছেদ করে বৈদিক আর্যধর্মকে রাঢ় বর্দ্ধমানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণপাত করেন। ভবদেব পদ্ধতি সর্ব্বভারতীয় বেদপ্রমাণ গ্রন্থ। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের বহুপূর্ব হতেই বৈদিক ধর্ম তার সহজতা ও পূর্ব্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে। বৈদিক ধর্মের ব্যয়-বহুল যাগ-যজ্ঞ, নির্বিচারে শক্তি পূজায় পশুবলি, দুর্ব্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড, অনুষ্ঠান সর্বস্বতা এবং ধর্মীয় কাজে পুরোহিতদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ, দক্ষিণার ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা– প্রভৃতিতে হিন্দুরা অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তা ছাড়া নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি দুর্ব্যবহার ও ঘৃণা, বৌদ্ধধর্মের প্রসারের পথ প্রস্তুত করে দেয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উদারনীতি সমদৃষ্টি ও অহিংসা নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল সর্বাগ্রে। তাই অন্ত্যজ অনার্য সম্প্রদায় ডোম, বোড়ো, কিরাত, কাহারদের মধ্যে বৌদ্ধিক সংস্কার ধর্মানুষ্ঠানে এখনও বেঁচে আছে।

গুপ্ত পাল যুগের আগে থেকেই জেলার অধিকাংশ মানুষ বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হিউয়েন সাং তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বলেছেন, তখন অধিকাংশ লোকই ছিলেন বৌদ্ধ। ভবদেব বেদসম্মত রীতিতে নূতন করে শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে লুপ্তপ্রায় হিন্দু ক্রিয়াচার নির্দিষ্ট করা হয়। ভবদেব বৈদিক প্রথায় পুনরায় 'গ্রাম' প্রথার পত্তন করেন। আর্যসমাজের বর্ণাশ্রম বিন্যাসের পদ্ধতিতে নূতন করে সমাজ বিন্যাস করা হয়। সপ্তগ্রামের বাগদী রাজা রূপরাজার প্রভাব তাঁকে বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেছিল। সপ্তগ্রামের বৌদ্ধবিহারেব পরিবর্ত্তে রাঢ় বর্দ্ধমানে নূতন করে মন্দির নির্মাণ ও তাতে দেবদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আয়োজন সুরু হল। এর প্রবক্তা হলেন ভবদেব ভট্ট। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অগ্রগণ্য পণ্ডিতদের এনে রাঢ়বঙ্গে এক মহতী ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। ভবদেব ভট্ট বহু শাস্ত্রে পণ্ডিত, যোদ্ধা ও রাষ্ট্রবিদ ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রবাহ নিষ্ক্রিয় করে হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আচার্য শংকরের পরই তাঁর নামোল্লেখ করতে হয়। য়ুরোপে মার্টিন লুথারের যে ভূমিকা ছিল ভবদেব ভট্ট ছিলেন তাই। তিনি বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন তাই বেদের নিগূঢ় তত্ত্বকে সহজ ও সরল ব্যাখ্যায় এমনভাবে উপস্থাপিত করতেন যে সমসাময়িক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ তাই বিধির বিধান বলে মানতে ইতঃস্তত করতেন না। মীমাংসা, দর্শন সম্পর্কে তাঁর দুখানি গ্রন্থের মধ্যে একটি হলো 'কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি' ও অন্যখানি 'প্রায়শ্চিত্ত বিবেক' (Bhubaneswar Inscription of Bhatta Bhabadeva– Page 11, 15-34) ভবদেব একাদশ শতকের শেষার্ধে দেহ রাখেন।

রাঢ়ে বেদচর্চার পরিচয় পাওয়া যায় গঙ্গাভোজ বর্ম্মার তাম্রশাসনে (Inscription of Bengal Vol-Page-21)-এই তাম্রশাসনে রামদেব শর্মার নাম রয়েছে। ইনি উত্তর রাঢ়ের অধিবাসী, যজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখাধ্যায়ী ছিলেন (বলাই দেবশর্মাকৃত বৰ্দ্ধমানের ইতিহাস)। বিভিন্ন প্রশস্তি, তাম্রলিপি ও গ্রন্থপত্র হতে প্রমাণ করা যায় রাঢ় বৰ্দ্ধমানে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতক হতেই বেদচর্চার বিশেষ প্রচলন ছিল। তাই বলা যায় আজ থেকে দু হাজার বছর আগে বেদ বিদ্যাই ছিল রাঢ় বৰ্দ্ধমানে জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম পরিচয়। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ লিখেছিলেন, এখানকার লোকেদের অধ্যয়নে ক্লান্তি নেই'— সে সময় অবশ্য অধিকাংশই বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রচর্চ্চায় রাঢ় বৰ্দ্ধমান বাসী যে অক্লান্ত ছিলেন তা জানতে পারা যায়।

রাঢ়ভূমির দক্ষিণ পূর্বপ্রান্তে সাগরদ্বীপে কপিলমুনির আশ্রম। কপিল মুনিব 'সাংখ্যদর্শন' প্রাচীনতম দার্শনিক তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ একথা উল্লেখ করেছেন যে,

সিদ্ধানাং কপিলোমুনেঃ।

উপনিষদে 'কপিলকেই' আদি মহাজ্ঞানীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় 'Science of Religion' শীর্ষক বক্তৃতামালায় বলেছিলেন, জগতের প্রাচীনতম মনোবিজ্ঞান হল এই 'সাংখ্যদর্শন'। অতএব রাঢ়বঙ্গ যে কপিলমুনির 'বিশ্ববিখ্যাত সাংখ্যদর্শন' তত্ত্বের অংশীদার একথা অস্বীকার করবে কে? এবং এই পারম্পর্য কালস্রোতে বহে চলেছে রাঢ় বৰ্দ্ধমানে।

আমাদের দেশের রীতি ও ক্রিয়াই তাই। 'যেনাস্য পিতবো যাতাঃ যেন যাতা পিতামহাঃ'—অর্থাৎ বাপ, পিতামহ যা করেন নাই, পুত্র-পৌত্র তা করবেন না—এটাই স্বাভাবিক। পিতামহ যা করে এসেছেন, পুত্র-পৌত্র তাই করবেন—এটাই রীতি। পিতামহ কপিলমুনির বেদচর্চা রাঢ়বঙ্গ ও বৰ্দ্ধমানকে উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে একাদশ-দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দে রাঢ়ে বেদানুশীলন ও সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট প্রতিপত্তি লক্ষ্য করা যায়। বল্লাল সেন বৈদিক হিন্দুধর্মের সংস্কার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার অন্যতম হোতা হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থে তাঁকে 'বেদায়নৈক' পথিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। (মুরলীধর ঝা সম্পাদিত 'অদ্ভুত সাগর'— ১ম পৃষ্ঠা) মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মহামন্ত্রী ভট্টহলায়ুধ একজন শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ছিলেন। তিনি 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' গ্রন্থে যজুর্বেদের মন্ত্র সমূহের ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়, রাঢ়ীয়গণ প্রাচীনকাল হতেই বেদ চর্চায় পারদর্শী ছিলেন।

প্রাচীনকালে বঙ্গাক্ষরে যে বেদ ও উপনিষদ লিখিত ছিল তার একটি নিদর্শন হল: মানকর গ্রামে প্রাপ্ত একটি লিপি। মানকর বাসী হিতলাল মিশ্রের গ্রন্থাগারে হস্তলিখিত কতকগুলি বৈদিক পুঁথি ছিল। বরোদার সেন্ট্রাল লাসব্রেরীর বৈদিক পুঁথির

তালিকা মালার ৭ম পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে, যে বঙ্গাক্ষরে লিখিত ব্রাহ্মণের একখানি পুঁথি আছে। মাদ্রাজের আদিরা গ্রন্থালয়ে বঙ্গাক্ষরে লিখিত নয়খানি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল ধরে বৈদিক-সংস্কৃতিই রাঢ় দেশবাসীর পণ্ডিতগণের জ্ঞানের আশ্রয় ছিল। পরবর্তীকালে Classic Sanskrit এর স্থান দখল করে। বল্লালসেন ও লক্ষণসেনের আমলে বৈদিক চর্চার প্রধানতম বাহন ছিল সংস্কৃত ভাষা। জয়দেব গোস্বামী, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃত ভাষায় উচ্চাঙ্গের কাব্য সৃষ্টি করেছেন, যে গুলি অমর হয়ে থাকবে চিরকাল। 'গীতগোবিন্দ', 'কোকিল দূতম' কাব্যগুলি রাঢ়ের অলংকার। 'ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড' একখানি প্রাচীন গ্রন্থ– তাতে বর্দ্ধমানের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

বৈদিক যাগযজ্ঞ, অনুষ্ঠানের শেষে মঙ্গলারতি, ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাদান এবং পূজা ও ধর্মানুষ্ঠানে আলপনা দেওয়া, মঙ্গলঘট স্থাপন, নৈবেদ্য ও ভোগ অর্পণ, পরিবারের মঙ্গল কামনা ইত্যাদি বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বর্দ্ধমানে নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হত– কতকগুলি লিপি থেকে তা জানা যায়। এর অনেকগুলি আবার অনার্য সংস্কৃতির অবদান। সিন্ধুনদের তীরে মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতাকে যদি সিন্ধু সভ্যতা নামে অভিহিত করা হয়, তবে দামোদর নদের তীরে ভরতপুরের স্তূপ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এই সভ্যতাকে ঐতিহাসিকদের উচিত দামোদর সভ্যতা নাম দেওয়া। আধুনিককালের ঐতিহাসিকদের আজ অনুসন্ধান করতে হবে যে ভরতপুরে নব্য-প্রস্তর তাম্রাশ্মীয় যুগ থেকে লৌহযুগ পর্যন্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল তার সুরুতে ছিলেন বর্দ্ধমানের আদিবাসী ডোম, বোড়ো, চুয়াড়, কাহার, কিরাত, নিষাদ এবং ঐ সভ্যতার শেষ দিকে এসেছিলেন বেদপন্থী জাতি কিনা? এই বৈদিক উন্নততর সভ্যতা ও ধর্মই দামোদব সভ্যতাকে আলোকিত করেছিল কিনা সে সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন। এখনও বর্দ্ধমানের গ্রামে গ্রামে প্রচুর ডোম ও তাদের অধিষ্ঠাত্রী কালী পূজিত (ডোমের কালী) হন। দক্ষিণ দামোদরের 'ডোম মারা' গ্রাম, মেমারীর কাছে ডেঁয়ে-ময়রা (ডোম মারার কি অপভ্রংশ!) এবং প্রায় প্রতি গাঁয়েই আছে, ডোমপাড়া। কবি কঙ্কনের চণ্ডীতে আছে কিরাত– ব্যাধের কথা, শবরের কথা,

'কিরাত পাড়াতে বসি না মেলে উধার।
হেন বন্ধুজন নাহি যেবা সহে ভার॥

চর্যাগীতিতেও অনেকস্থলে ডোমের কথা আছে–

'নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়ি আ– '

এবং শবরের কথা আছে– উচাঁ উচাঁ পাবত তাহি বসই সবরী বালী'– । বোড়ো-বলরাম গ্রামের বলরাম দেবতা বোড়ো জাতির আদি দেবতা, দক্ষিণ দামোদরের কোনা

বোড়োগ্রাম, বাউড়া ('বোড়াব অপভ্রংশ)– 'প্রভৃতি নাম গুলি প্রমাণ কবে বোড়ো, কিবাত, ডোম ও শবব জাতিই বর্দ্ধমানেব আদিবাসী।



সূর্য/দেহাংশ/উচালন, বর্দ্ধমান ১০ম/১১শ শতক

রাঢ় বর্দ্ধমানে বৈদিক ধর্মেব পুনঃ প্রবর্ত্তন সুরু হয গুপ্ত ও পাল বাজত্বেব অবসানেব পব। বৈদিক হিন্দুধর্ম এখন জৈন, পার্সী, বৌদ্ধ, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতিকে বক্ষে ধাবণ কবে এক মহান ধর্মে পবিণত হয়েছে এই বর্দ্ধমানে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিহাসের পালাবদল

গুপ্ত, পাল ও সেন রাজত্ব

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে রাঢ় বর্দ্ধমানে মৌর্য সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। অশোক রাজ্যবিস্তার কল্পে বাঁকুড়া বর্দ্ধমান হয়ে তাম্রলিপ্ত যান ও বোধিবৃক্ষকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তখন বঙ্গের রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত ও রাঢ়ের রাজধানী ছিল কোডিবরিস বা কোটিবর্ষ বর্দ্ধমান হুগলীর সীমান্ত নদী দামুন্যায় রত্নানু নদী তীরে বর্তমানের কোটশিমুল (জে, এল নং ২০৮)। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত বর্দ্ধমান শাখা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায়। সন্নিহিত কাইতি গ্রামের বাণগড় এলাকায় প্রাক্ মৌর্যযুগের সম্ভবত নন্দবংশের রাজধানী ছিল। নন্দবংশধরগণ বাঙালি ছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মতে এই শূদ্র রাজবংশও গঙ্গারাঢ়ী ছিলেন।

খ্রীষ্টিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দে গুপ্তরাজগণের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই রাঢ় বর্দ্ধমান। এঁদের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত ছিলেন বাঙালি। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে জামালপুর ব্লকের মশাগ্রামে। সম্প্রতি মুইধাবার নিকট ঘুষ্টে গ্রামে গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা ও সিলমোহব পাওয়া গিয়েছে। মশাগ্রামে একটি দেউলও আছে। লিচ্ছবি দৌহিত্র সমুদ্রগুপ্তের সময়ে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে অবস্থিত দামোদর তীরবর্তী পোখনা ছিল রাজধানী। পোখণার রাজা ছিলেন সিংহবর্ম্মাব পুত্র চন্দ্রবর্মা। চন্দ্রবর্মা রাজধানী শিশুনিয়া পাহাড়ে বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজা সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রভর্ম্মাকে পরাজিত করে রাঢ় দখল কবেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ও কুমারগুপ্তেব অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বর্দ্ধমানের বিভিন্ন গ্রামে পাওয়া গেছে।

'তুলাক্ষেত্র বর্দ্ধমান স্তূপ' নামে বর্দ্ধমান নগবে একটি বৌদ্ধস্তূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভবতঃ গুপ্ত বা পাল যুগে। এই স্তূপটির নীচের দিকটি নানা কারুকার্যে শোভিত, ও চারটি স্তরে উন্নীত। এর মেধি, উর্দ্ধ ও অধোমুখ বিকশিত দ্বিদলপত্রের আকৃতি বিশিষ্টরূপে পরিকল্পিত হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দে গুর্জর প্রতিহারগণ আরামবাগের বিক্রমপুর এলাকায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মাদিত্য ও সমাচার দেবও এই রাঢ় বর্দ্ধমানে রাজত্ব করেছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর রাঢ় দেশের নাম হয় গৌড়। অঙ্গদেশও (বিহারের কিয়দংশ) গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিহারে গোপ জাতির পদবী রয়েছে 'গৌড়'। এই শব্দটি জাতিবাচক। রাঢ়বঙ্গে গৌড় নামে বহু শহর আছে– গৌড়বাজার, গৌড়হাটি, গৌড়ি, গৌড়ান, গৌড়ুটি প্রভৃতি।

খ্রীষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতকে বর্দ্ধমানে সামন্ত রাজা হিসাবে বিজয় সেন রাজত্ব করতেন। বর্দ্ধমান সদর মহকুমার গলসী থানার দামোদর সন্নিকটে প্রাচীন মল্লসারুল গ্রামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী খনন কালে সামন্ত রাজা বিজয়সেনের যে তাম্রশাসন লিপি পাওয়া যায় তা থেকে এতথ্য জানা যায়। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার এই লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন। তা থেকে জানা যায়, " 'ভগবান লোকনাথ' (বুদ্ধদেব) ধর্ম ও সাধুজনের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া লিপিখানির আরম্ভ হইয়াছে। এই লিপিখানি মহারাজাধিরাজ গোপালচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এই গোপালচন্দ্র এবং ফরিদপুর তাম্রশাসনের মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে খ্রীষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতকে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল এই লিপিখানির অক্ষর তাহার অনুরূপ। এইরূপ অক্ষর ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান বিষয়াধিপতি মহারাজা বিজয় সেন খ্রীষ্টিয পঞ্চম শতকের শেষভাগ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দের প্রথম ভাগের মধ্যে বৈন্য-গুপ্তের (কুমিল্লায় প্রাপ্ত তৎপ্রদত্ত তাম্রশাসনের তারিখ ১৮৮ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ) পরে গোপচন্দ্রের অধীনে সামন্ত রাজপদে ছিলেন। সম্ভবতঃ বৈন্যগুপ্তের পরে গোপচন্দ্র রাজত্ব করেছিলেন এবং ফরিদপুর হইতে বর্দ্ধমান জেলা পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ তাঁহাব কবতলগত ছিল"। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মতে গোপাল চন্দ্র ও গোপচন্দ্র একই ব্যক্তি নন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গোপচন্দ্র বর্দ্ধমানের গোপভূমিতে রাজত্ব করতেন। গোপচন্দ্রের নাম অনুসারেই আউসগ্রাম-কাঁকসা অঞ্চল সেকালে গোপভূমি নামে খ্যাত হয।

সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ শশাংক বর্দ্ধমান পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত জয় করেছিলেন। তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ ছিল। গড় মান্দারণেব রাঙামাটি বা উচালনেও সাময়িক রাজধানী ছিল। এই শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, কর্ণসুবর্ণ থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে ৭০০ লী বা ১০০ মাইলের কিছু বেশি গিয়ে তিনি উচা প্রদেশে এসেছিলেন। উচা রাজ্য পরিধিতে ৭০০ লী, রাজধানীর পরিধি ২০ লীর কিছু বেশী। এখানকাব মাটি ভালো ও উর্বর। ফল আকারে বড়। গাছ গাছড়া অনেক। দেখবার মত অসংখ্য ফুল। জলবায়ু উষ্ণভাবাপন্ন। লোকজন উগ্রস্বভাবের। আকৃতি দীর্ঘাঙ্গ ও ময়লা রঙের। আলাপে আচারে মধ্য ভারতের লোকজন থেকে আলাদা। অধ্যয়নে ক্লান্তি নেই এবং বেশির ভাগই বৌদ্ধ। উচা প্রদেশে একশোর বেশী বৌদ্ধ মঠ ছিল এবং অসংখ্য গুরুভ্রাতা। সকলেই মহাযানী বৌদ্ধ। এই উচ্চ রাজ্যে দেব মন্দির ছিল পঞ্চাশটি। বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করত বিশৃঙ্খলভাবে। বুদ্ধদেব এখানে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে সপ্তম শতাব্দীর এই উচা প্রদেশ একাদশ শতাব্দের উচ্ছালই হল বর্তমানের উচালন। আর বৌদ্ধমঠের যে দু-চারটির সন্ধান তিনি পেয়েছেন তা হল উচালনের শাহমীর তলা ও একলক্ষীর শাহচাঁদ পীর (শা-চাঁদ-পীর)— চম্পিতলা বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করে এরা বসেছেন। সেই বৌদ্ধ বিহার পালসম্রাট ধর্মপালের সমসাময়িক।

অষ্টম শতাব্দীতে পরাক্রমী মহারাজ কান্তিদেব রাজত্ব করতেন হরিকেলে রাজ্যে। এর রাজধানী ছিল বর্দ্ধমানপুর। এই বর্দ্ধমানপুর সম্ভবতঃ মেমারী থানার বর্তমান বঁরোয়া-হরকলা গ্রামে। এখান থেকে তিনি রাঢ়বঙ্গশাসন করতেন। কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন। মেমারী থানার বর্তমান বোহার গ্রামে তিনি একটি বৌদ্ধ বিহার স্থাপন করেন। কান্তিদেব গুণীজনের সমাদর করতেন, তাই কয়েকজন প্রাজ্ঞ সিদ্ধাচার্য এই রাজ্যের চম্পাই নগরীতে বাস করতেন। দামোদরের তীরে এই চম্পাই (বর্তমান কসবা চম্পাই– গলসী ব্লকে) নগরী ছিল।

অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে রাঢ়বঙ্গে শূরবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। রণশূর, লক্ষ্মীশূর উল্লেখযোগ্য নরপতি ছিলেন। ধর্মপাল গঙ্গাসাগর সঙ্গমে যাবার পথে গোকর্ণতীর্থে এসেছিলেন। গোকর্ণ হলো রত্নানু নদীর তীরে বর্তমান গোতান-দামুন্যা এলাকা। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যে এই চক্রাদিত্য তীর্থের নাম করেছেন। এই সময়ে কম্বোজগণ রাঢ়বঙ্গ অধিকার করলে জৈন ধর্মের হ্রাস পায় ও রাজধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। কম্বোজগণ ছিলেন কিরাতবংশীয়। মুকুন্দরাম এদের উল্লেখ করেছেন– এরা কিরাতবংশীয়।



বরাহ অবতার

দশম শতাব্দীতে মহীপাল বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। পরবর্তী পালরাজ ধর্মপাল উত্তর রাঢ় এবং রণশূর দক্ষিণ রাঢ়ে নিজ নিজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। একাদশ শতাব্দীতে মহীপালেব (৯৮৮-১০৩৮ খ্রীঃ) পুত্র নয়পাল গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণেব সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সুযোগ বুঝে মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষ বা ইছাই ঘোষ ঢেক্করীতে রাজধানী স্থাপন করে একটি স্বাধীন রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা কবেন। ঢেক্কবী অজয় তীববর্তী

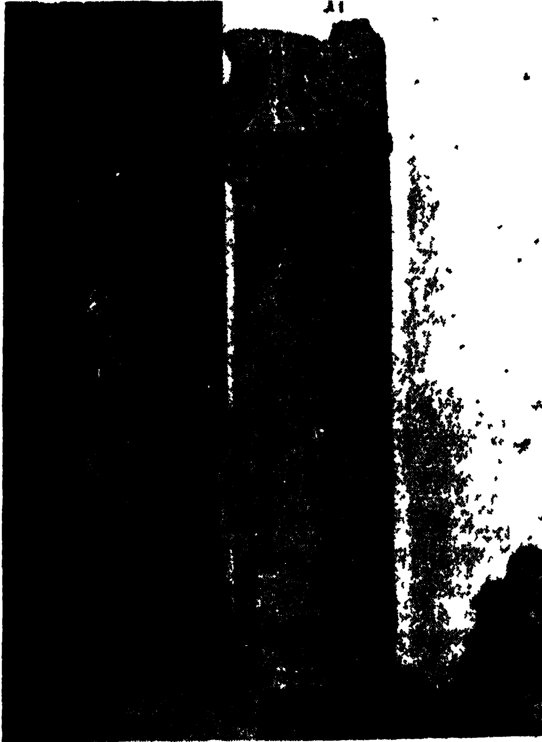


শ্রমণদ স্থানে দণ্ডায়মান ত্রিভূজ বৈশ্রবন মূর্তি

কেন্দুলিব নিকট বর্তমানে গড়জঙ্গল নামে পরিচিত। স্বীয় দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য রামপাল কৈবর্তরাজ দিব্যের বিরুদ্ধে লড়াই এ রাঢ় দেশের সামন্ত রাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন। তিনি ঢেক্করীতে প্রতাপ সিং, কোটাশবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তির জয়সিংহ, অপরমন্দারের লক্ষ্মীশূর, দেবগ্রামের বিক্রম রায়, পদুন্বার সোম, উচ্ছালের ময়গলসীহ, নিদ্রাবলীর বিজয় রাজা, সাংকট গ্রামের চণ্ডার্জুন, কৌশম্বীর গোবর্ধন রাজের কাছে গিয়েছিলেন। বর্তমানে এই প্রত্যেকটি স্থানই আবিষ্কৃত হয়েছে, এগুলি সবই রাঢ়বঙ্গের বর্দ্ধমানে অবস্থিত। (History of

Ancient Bengal– R. C. Majumdar 1971 Page– 188-190 with reference to Dr. Panchanan Mondal.)

সপ্তম শতাব্দীতে বর্ণিত হিউয়েন সাঙের উচা (UCHA) প্রদেশ একাদশ শতাব্দীতে বর্ণিত উচ্ছাল হল দক্ষিণ দামোদরে রায়না থানার অন্তর্গত উচালন। আর ময়গল হলো বর্তমানেব মইগ্রাম বা উচালনের পাশেই ময়ডাঙ্গা (ময়বাডাঙ্গা)। উচালনে আছে উচা রাজ্যেব ঈশ্বরী বা উচ্ছেশ্ববী দেবী ও উচ্ছেশ্ববী পাড়া। আর কোটাবীব হলো বর্দ্ধমানের কোটাগ্রাম এবং সংকট গ্রাম দক্ষিণ দামোদরের শাঁকটিয়া গ্রাম বা শাঁকটে গ্রাম। ঢেক্করির প্রতাপ সিংহ হল অজয়তীরে ঢেকুরগড়, অপর মান্দারণ হল বর্দ্ধমানের গড়মান্দারণের রাজলক্ষ্মীশূর (তখন হুগলীর গড় মান্দারণ বর্দ্ধমান ভুক্তিব অন্তুগর্ত ছিল), নিদ্রাবলীর বিজয় রাজা এখনকার বিজয়গঞ্জ, পদুম্বার সোম এখনকার পদুয়া বা পেন্দোর সোম রাজা,– এই সামন্ত রাজগণের মিলিত শক্তি ছিল বাড়ের পবাক্রম।



মন্দির দরজার দ্বার প্রস্তর নির্মিত

কৈবর্তরাজা দিব্যের বিরুদ্ধে লড়াই এর জন্য সামন্ত রাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন রামপাল। রামপাল (১০৬৯-১১২২ খ্রীঃ) ছিলেন পালবংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। তাঁর সময়ে বর্দ্ধমান ও হুগলী সীমান্তে দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরী উপত্যকায় সামন্ত রাজা বিজয়রাজের নিদ্রাবলী রাজ্য ছিল।

এই রাজ্যের (উচালন) পশ্চিমে সামন্ত ময়গলের রাজ্য, উত্তরে রামপালের সামন্তরাজ চণ্ডার্জুনের সংকট গ্রাম (শাংকটে) বাজ্য অবস্থিত। [H of A. B. R. C. M.– 1971 Page–189-90] নিদ্রাবলী ছিল শাক্তপীঠ। এখনও বর্দ্ধমানের এই অংশে (বর্তমান রায়না থানার দক্ষিণ অংশ) নিদ্রারূপিনী 'দেবীশ্যামার' পীঠমালা গ্রামে গ্রামে ঘন সন্নিবদ্ধ। নিদ্রাবলী-নিলী-নিলে-নলে অপভ্রংশিত হয়েছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এই নলে ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম পরিভ্রমণ করে এই ইতিবৃত্ত সমর্থন করেছেন। এ ছাড়া এখানে বিজয়গঞ্জ, রাজার পোতা বা পোতার পাড় প্রভৃতি স্থান আছে এবং সংলগ্ন স্থানে বিশালকায় কতকগুলি দীঘি আছে।- এসব বাদশাহী সড়কের পার্শ্ববর্তী এলাকা। তারমধ্যে উত্তরে ও দক্ষিণে দুটি বড় দীঘির নাম 'নিলে দীঘি'।

মুসলমানদের আক্রমণের সময় বাদশাহী সড়কের সন্নিহিত পূর্বদিকে অবস্থিত কোটসমা বা কোটসিমূল অঞ্চল থেকে এসে ফকির সেনাগণ নিদ্রাবলী রাজ্য আক্রমণ করেন। কামারহাটির দমদমা থেকে হিন্দুমন্দির ধ্বংসের কাজ সুরু হয়। ফকিরগণ অবশেষে নিদ্রাবলীর অনতিদূরে বসতি স্থাপন করেন, বর্তমানে সেই জায়গা হল ফতেপুর। রামপাল রাজা বিজয়কে খুব ভালবাসতেন এবং তাকে 'কোষেব প্রসাদ' দিয়ে স্ফীত করেছিলেন। রামচরিতকার সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্য সে কথা বলে। বিজয় রাজার অস্ত্র নির্মাণের কারখানা ছিল— আখনা ও লোয়াই তার সাক্ষ্য দেয়। লোয়াইএ এখনও লৌহ আকরিক (Iron-ore) পাওয়া যায়। শশিভূষণ দাসগুপ্তের মানচিত্রে এই এলাকাটিকে বিজয় রাজার রাজ্য বলে দেখানো হয়েছে।

একাদশ শতাব্দীতে মহারাজ বিজয় সেন (১০৯৮ বা ১১৫৮ খ্রীঃ অ) রাঢ়ভূমে রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। সেনগণ বহুদিন যাবৎ উত্তর রাঢ়ে সেনভূমে বসবাস করতেন। সামন্ত সেন পালরাজাদের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হিসাবে রাজত্ব করতেন। তার পুত্র হেমন্ত সেন পালরাজগণের সামন্ত ছিলেন। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায় দমন করে স্বাধীন সার্বভৌম রাজা বলে নিজেকে ঘোষণা করেন।

পালরাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় তিনি শক্তি বৃদ্ধি করেন। দক্ষিণ রাঢ়ের রাজা শূরবংশের রাজকন্যা বিলাস দেবীকে বিবাহ করে বিজয় সেন তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত রাজ্যকে প্রসারিত করেন। মহারাজ বিজয় সেন বীর, বর্ধন, রাঘব প্রমুখ রাজাদের পরাস্ত করেন।



সিংহ/১১ শতক/ধ্বংস প্রাপ্ত

বীর রাজা ছিলেন বর্দ্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার ভালকিকোটা গ্রামের। বর্ধন রাজা ছিলেন কালনা মহকুমার কুসুমগ্রামের। রাঘব রাজা ছিলেন আরামবাগ মহকুমার রঘুবাটি গ্রামের। এখনও এখানে প্রতি বৎসর বিজয়াদশমী তিথিতে রাঘব রাজার রথ চলে। মহারাজ বিজয় সেন আরামবাগের বিক্রমপুরের ধর্মরাজগণকে পরাজিত করেন। ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকট ভুরশুটে বিজয় সেন 'বিজয়পুর' নামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ভুরশুটের দক্ষিণ রাঢ়ি ব্রাহ্মণগণ উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। বিজয়সেন সুশাসক ছিলেন, রাঢ়বঙ্গে মাৎস্যন্যায় দূর করে তিনি সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেন রাজবংশগণ কর্নাট দেশীয় চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দে বল্লাল সেন (রাজ্যারোহণ কাল ১১৫৮ অব্দ) মাতুলবংশের সহযোগে কৌলীন্যপ্রথার সংস্কার করেছিলেন।

বাংলার সামাজিক বিবর্তনে বল্লাল সেন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রচর্চা ও সমাজ সংস্কারে তাঁর কীর্তি রাঢ় বাঙলায় অমর হয়ে আছে। শেষকালে প্রজাগণ তাঁকে রাজর্ষি বল্লাল সেন আখ্যা দিয়েছিলেন।

দ্বাদশ শতাব্দের শেষে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন পিতৃসিংহাসনে বসেন। কিশোর বয়সে তিনি উত্তরবঙ্গের গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করেন। তাঁর নামে বীরভূমের রাজনগর 'লক্ষ্মণ নগর' হয়েছিল। লক্ষ্মণ সেন আঁউশগ্রাম কাঁকসার গোপভূমি অধিকার করে সেন-পাহাড়ী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। লক্ষ্মণ সেন শ্রীক্ষেত্র ও কাশীতে

'সমর জয়স্তম্ভ' স্থাপন করেছিলেন। পূর্ব ভারতের অনেকাংশ তখন গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মগধে সম্বৎসর গণনা করা হত তাঁর রাজ্য শেষের বর্ষ থেকে। লক্ষ্মণ সেন শস্ত্র, শাস্ত্র ও ধর্মচর্চা করতেন সমানভাবে। তাঁর রাজসভায় সভাকবি ছিলেন ধোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতি। তাঁর প্রধানমন্ত্রী হলায়ুধ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যাক্তি ছিলেন। শেষ বয়সে লক্ষ্মণ সেন বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন।



বৰ্দ্ধমান সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত প্রাচীন দেবমূর্তি

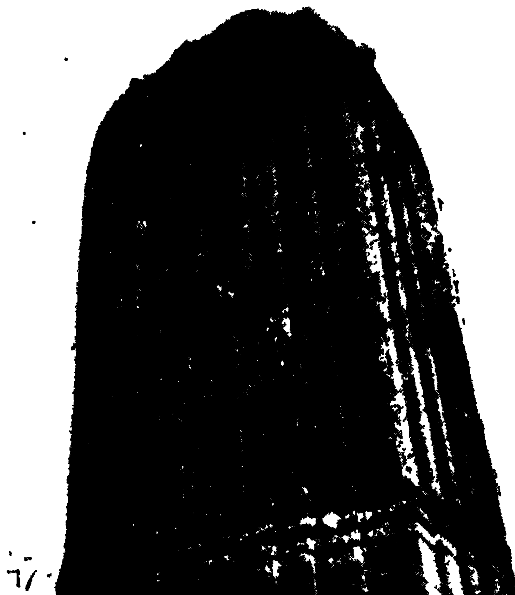
তার আগে তিনি ছিলেন শৈব। কবি জয়দেবের কৃষ্ণপ্রেমের অপূর্ব ভাবোম্মাদনা লক্ষ্মণ সেনকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিতে অনুপ্রাণিত করে। সেন যুগেই বিষ্ণু মূর্তি রাঢ় বর্দ্ধমানের মন্দিরে মন্দিরে সাদরে পূজিত হতে থাকে। শেষ বয়সে রাঢ়ে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব দেখা যায় ও এই সুযোগে তুর্কীরা গৌড় আক্রমণ ও জয় করেন। গৌড় রাজধানী নবদ্বীপ থেকে লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে গেলেও মালদহে কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন ও তার পুত্র বা আত্মীয়জন এখানে সেখানে ক্ষুদ্ররাজা হিসাবে বেশ কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষে চন্দ্র সেন নামে এক রাজা মঙ্গলকোটে রাজত্ব

করেন। [Dr. R. C. Majumdar.] এই হল রাঢ়ের প্রাচীন ও মধ্যযুগে পালা বদলের ঐতিহাসিক বিবর্তন।

গোপভূমি ও গোপরাজত্ব

বৰ্দ্ধমান জেলার দামোদর অজয় উপত্যকার উত্তরাংশকে গোপভূমি বলা হয়। বর্তমানের দুর্গাপুর, কাঁকসা ও আউসগ্রাম ব্লক। আদিমকালে এখানে সদগোপদের বসবাস ছিল। ষষ্ঠ শতকে গোপচন্দ্র গোপভূমিতে রাজত্ব করতেন। গোপভূমি রাঢ় বৰ্দ্ধমানেও বিস্তার লাভ করেছিল একাদশ শতাব্দীতে। তাদের রাজা ছিলেন সোম ঘোষের পুত্র ইচ্ছাই ঘোষ। ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮১০-৫০ খ্রীঃ) এবং পরে মহীপাল (৯৮৮-১০০৮ খ্রীঃ অব্দে) যখন গৌড়ের রাজা, তখন ইছাই ঘোষ গোপভূমিকে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করে গৌড়ে খাজনা পাঠানো বন্ধ করেন। এর আগে সালিয়ানা দিতে না পারার জন্য সোম ঘোষকে গৌড়রাজ বন্দী করেন। তৎপরে নিজ দেশকে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করে পিতৃশত্রুর বিরুদ্ধে ইছাই বিদ্রোহী হলে গৌড়রাজ ময়নার সামন্তরাজ কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনকে সৈন্য দিয়ে পাঠান ইছাইকে দমন করছে। ইছাই তখন ঢেকুরগড়ের গোপবংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান স্বাধীন রাজা, তার সেনাপতি বীর কালু ডোম। কালুডোমের পত্নী লক্ষ্মীডোমও বীরাঙ্গনা ছিলেন। সোম ঘোষ ও ইছাই ঘোষ বৈদিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাদের উপাস্য দেবতা ছিলেন 'শ্যামারূপা'। যে স্থানে এই গোপ নরপতিদের রাজধানী ছিল তার তৎকালীন নাম শ্যামারূপার গড়, বর্তমানে কাঁকসার জঙ্গল। পরবর্তীকালে এই পুরাতন সমগ্র এলাকার নাম ছিল সেন পাহাড়ী। কোন এক সময় সেন বংশের রাজারা পাহাড়ী এলাকার উপরে স্থানীয় রাজধানী সাময়িক ভাবে স্থাপন করেছিলেন বলে জায়গাটির নাম পরবর্তীকালে সেন পাহাড়ী হয়।

ইছাই ঘোষ স্বাধীনতা ঘোষণা করে গৌড়ের অধীনতা অস্বীকাব করলে, গৌড়রাজ কয়েক সহস্র সৈন্য দিয়ে লাউসেন কে ঢেকুরগড়ে পাঠান। ঢেকুরগড়ে ইছাই ঘোষের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষ হয়। ইছাই বা ঈশ্বরীর সেনাপতি কালুডোম ও তার পত্নী লক্ষ্মীদেবী অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে নিহত হন। অসীম শৌর্য দেখিয়ে ইছাই ঘোষও নিহত হন। লাউসেন ছিলেন বৌদ্ধবাদী, আর ইছাই হলেন বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী। যেখানে ইছাই নিহত হয়েছিলেন লাউসেন সেখানে একটি বিরাট দেউল নির্মাণ করান। এটাই এখনকার ইছাই ঘোষের দেউল বলে পরিচিত। ইছাই ঘোষের অধিষ্ঠাত্রী শ্যামারূপা দেবীর পূজায় এত ছাগল ও মহিষ বলিদান হতো, যে বলিদানের পর রক্তের ঢেউ খেলে যেত। তাই এই স্থানের নাম 'ঢেউগড়' বা 'ঢেকুর গড়' হয়। দীর্ঘদিন ধরে এই শ্যামারূপা গোপভূমের সদগোপগণ কর্তৃক পূজিত হয়েছেন। শ্যামারূপার গড় বা ঢেকুর গড় প্রাচীনকালের সাতটি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই সাতটি ভাগ



ইছাই ঘোষের দেউল জঙ্গলমহল

হলো :— ১) ঢেকুর গড়, ২) শ্যামারূপার গড়, ৩) শ্রীহট্টের গড়, ৪) ইছাই গড়, ৫) লাউসেন গড়, ৬) ত্রিহটেটর গড়, ৭) সেন পাহাড়ী গড়—সব মিলে বর্তমানের জঙ্গলগড় বা জঙ্গলমহল।

কিম্বদন্তী, সোম ঘোষ দেবী শ্যামারূপার বরে পুত্র লাভ করলে সেই পুত্রেব নাম ঈশ্বর বা ইছাই (ভগবানের ইচ্ছায় পুত্রলাভ হয়েছে বলে) রাখেন। দেবীর বরলাভ করে ইছাই ঢেকুরের রাজা হন। এই ঢেকুরগড়কে বীর ও বীরাঙ্গনার স্থান বলা হতো। কিম্বদন্তী আছে, গড়ে বীর-মাটির ছোঁয়া লেগে সামান্য ইঁদুরও শক্তিমান হয়ে অন্য স্থানেব শক্তিশালী বিড়ালকে পরাস্ত কবেছিল। এই গড়ে লৌহজীবি চণ্ডালদেব গুহা ছিল। তারা ত্রিসন্ধ্যা ইছাই এর রাজসভায় মাঙ্গলিক শিঙ্গকাড়া বাজাত। শ্যামারূপা মূর্তি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেছেন, ইনি শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা শ্যামারূপা রাধিকা, কারো মতে ইনি দেবী কালিকা, আবার কেউ কেউ বলেছেন ইনি সৃক্ষ্মেশ্বরী অর্থাৎ সৃক্ষ্মের অধিশ্বরী এবং সেই হিসাবে শ্যামারূপা বর্দ্ধমানেব আদিম জনগোষ্ঠীর উপাস্য দেবী। সেই আদিম জনগোষ্ঠীব নাম শামলা বা ধ্বনি সাদৃশ্যে সুম্মা। আদিম 'শামা' দল এবং তাদের অনুরূপা তাই দেবীর নাম 'শ্যামারূপা'। এই শামা দল যুদ্ধবিগ্রহ ও শিকারে গেলে অমঙ্গল হলে শ্যামারূপা যেতে নিষেধ করতেন— এই দেবতাদের বিধিনিষেধ সংস্কার 'শ্যামা' দল মেনে চলত। শ্যামাদলের যে ধর্ম তাকেই শ্যামাধর্ম বলে। জঙ্গলমহল এলাকার কাছেই পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে যেসব প্রত্নরাজি

আবিষ্কৃত হযেছে তা থেকে এই এলাকাব নব্যপ্রস্তব-তাম্রাশ্মীয় যুগেব আদিম শিকাবী, কৃষিজীবি ও যাযাবব সভ্যতাব নিদর্শন মিলেছে। গোপভূমিব জীবন চর্যাব আদিম ধাবা তাকেই সমর্থন কবে। এই গোপভূমিতেই বাঢ় বর্দ্ধমানেব পাবম্পর্য ও ঐতিহাসিক



শ্যামা রূপাব মন্দিব

পবিবর্তনেব ধাবাবাহিকতা বজায় বযেছে। এখানে গুপ্ত, পাল, সেন ও গোপ বাজাগণেব খণ্ডছিন্ন, বিক্ষিপ্ত চিহ্ন ছড়িযে বযেছে। ষষ্ঠ শতকে গোপচন্দ্র থেকে একাদশ শতকেব ইছাই ঘোষ পর্যন্ত গোপভূমিতে গোযালাদেব বাজত্ব চলেছিল। প্রায পাঁচ শতাব্দী ধবে গোপশক্তি ক্ষাত্রবীর্যেব পবাকাষ্ঠা দেখিযেছিলেন। সদগোপদেব অস্ত্র ও লাঠিব তেজ ক্ষত্রিযেব ঈর্ষাব বিষয—সে আজ উপকথা।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত বাজাগণ

সঞ্জীব বন্ধু তাব উগ্রক্ষত্রিয পবিচিতি গ্রন্থে দেখিযেছেন যে গ্রীকগণ বর্ণিত বলবীর্য সম্পন্ন গঙ্গাবিডিই জাতি হলো বর্তমান বর্দ্ধমান হুগলী হাওড়া-বীবভূম ও বাকুড়ায় বসবাসকাবী উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়। তাঁবা গোষ্ঠীগতভাবে অঙ্গ (বিহাব) অতিক্রম কবে বজ্জভূমিতে (বাঢ়বঙ্গ) প্রবেশ কবেন খ্রীষ্টপূর্ব একহাজাব অব্দে। এই আর্য ক্ষত্রিয গোষ্ঠী গঙ্গাব তীববর্তী অঞ্চলে প্রথম সপ্তগ্রামে এসে বসবাস কবেন ও বাজ্যস্থাপন কবেন। এখান থেকে এই আর্য গোষ্ঠী বাঢ় বর্দ্ধমানে ছড়িয়ে পড়ে বৈদিক প্রথায গ্রাম পত্তন কবেন। লক্ষ্যণীয বাঢবঙ্গেব এত 'গ্রাম' তাকেই সমর্থন কবে। যেমন—আদিসপ্তগ্রাম, জৌগ্রাম, নবগ্রাম, মশাগ্রাম, নাসিগ্রাম, বিল্বগ্রাম, মাজিগ্রাম প্রভৃতি।

বঙ্গের গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের সামন্ত রাজা হিসাবে বহু উগ্রক্ষত্রিয় রাজা বৰ্দ্ধমান, কালনা ও কাটোয়া মহকুমাতে রাজত্ব করেছিলেন। এইসব সামন্তরাজন্যগণ ছিলেন বীর, সাহসী স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টবক্তা।

উক্ত সামন্ত রাজাদের মধ্যে খেঞে পরগণার (মাজিগ্রাম, ভাল্যগ্রাম, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি) রাজা রাজ্যেশ্বর দত্ত, বাজারের রাজা রাজ্যধর রায়, ক্ষীরগ্রামের রাজা শাকম্ভর দত্ত ও হরি দত্ত প্রভৃতি উল্লখযোগ্য। J. R. A. S. (1950) হতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত নরপতির নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন জয়দাম, রুদ্রদাম, বীরদাম, যশোদাম– বর্তমানে উগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের দাঁ গোষ্ঠীরাই পূর্বতন দাম গোষ্ঠী। মুইধাড়া, সেরপুর, মাদানগর, পাঁইটা প্রভৃতি এলাকায় এদের রাজত্ব ছিল।

খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকে মহারাজ শ্রীগুপ্ত রাঢ় অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানী ছিল সাতসইকা পরগণায় মুর্শিদাবাদের রাঙামাটি বা কং৷সুবর্ণতে। এই বংশেরই প্রতাপশালী নরপতি সমুদ্রগুপ্ত তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন সমুদ্রগড়ে। সমুদ্রগুপ্তের নামানুযায়ী সমুদ্রগড় নামকরণ যুক্তিপূর্ণ।

মঙ্গলকোটের রাজা গজপতি কোঙার, রাজাবীর যশ, বারবক সিং পরগণায় রাজত্ব করেছিলেন (Coins of India P. P. 67-68)। শূর রাজগণের প্রধান রাজপাট ছিল গড়মান্দারণ। এই বংশের আদি শূর ও তদীয় পুত্র ভু-শূর শুটরায দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে তোলেন, ঘুঙুর ও দেবপুর অঞ্চলের রাজা নীল বন্ধু। ইন্দ্রপ্রস্থেব (বর্তমান ইঁদুবডাঙ্গা) রাজা অকিন চাঁদ গুই, উড়াগ্রামের রাজা বাঘ বায ও শাঁকট গ্রামের রাজা ব্রহ্ম গোহ, এতদঞ্চলে সামন্ত রাজা ছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুসলমানদের আগমন

পাঠান রাজত্বের সূচনা

মহারাজ লক্ষ্মণসেন (১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) ষাট বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর শেষ জীবনে দিল্লীর সুলতান কুতুবদ্দীন আইবকের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদবীন বখতিয়ার খলজী অতর্কিতে লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে লক্ষ্মণসেন আত্মরক্ষার উপায় নাই দেখে পুরীর জগন্নাথ ক্ষেত্রে অথবা পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান (১২০১-১২০২ খ্রীঃ)। বাকী জীবন তিনি সেখানেই কিছুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

সেই সময় কাঁকসা এলাকায় গোপভূমে সদগোপ রাজারা রাজত্ব করতেন। ইছাই ঘোষ এই সদগোপদেরই অন্যতম পরাক্রমী রাজা ছিলেন সেনপাহাড়িতে। লাউসেনের কাছে তিনি পরাজিত হলেও গোপরাষ্ট্রের অন্য রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। বখতিয়ার খলজি ও তার পরবর্তী দিল্লীর সুলতানের সেনাপতিগণ গোপভূমি আক্রমণ ও জয় করলে সমগ্র বর্দ্ধমান মুসলমান শাসনাধীনে চলে যায়। ফলে রাঢ় বর্দ্ধমানে বৈদিক-জৈন-শাক্ত—বৈষ্ণব ধর্মের পর ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে।

সে সময় বর্দ্ধমানে গোপভূমি ছাড়াও দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে সামন্ত রাজারা রাজত্ব করতেন। পাঠান সৈন্যরা একে একে সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ে ছোট ছোট সামন্ত রাজাদের পরাস্ত করেন। দক্ষিণ দামোদরের নিত্রাবলীর সামন্ত রাজাকে ফকির সেনারা পিছন দিক থেফে (কামারহাটি) আক্রমণ করেন ও এই অঞ্চল তার পরেই পাঠানদের দখলে চলে আসে। পাঠান সেনারা বর্দ্ধমান দখল করার পর মন্দির ও বৌদ্ধ স্তূপগুলি ভেঙে ফেলে রাতারাতি সে সব জায়গায় মসজিদ বানিয়ে ফেলে। দক্ষিণ দামোদরের উচালনে বিরাট একটি স্তূপের উপর পীর ও মসজিদ আছে—নাম শাহমীর। এর স্থাপত্য হিন্দুসভ্যতার বলে মনে । একলক্ষ্মী গ্রামে তেমনি শাহচাঁদপীর। মন্তেশ্বরের কাইগ্রামে ছিল 'আদিবরাহের মন্দির'— সেটি ও ধ্বংস করে মসজিদ বানানো হয়। জামালপুর থানায় মশাগ্রাম, আঝাপুর ও জৌগ্রাম এবং মঙ্গলকোট ও কুসুমগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় প্রচুর ভাঙা মন্দির এর সাক্ষ্যবহন করে চলেছে।

ইসলামিক সংস্কৃতি ও সভ্যতা

আকবর বাংলাদেশ অভিযান করেন ১৫৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ ১২০১-১২০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ এই পৌনে চারশ বছর বাঙলা এবং রাঢ় বর্দ্ধমানে

পাঠানদেব বাজত্ব চলেছিল। ফলে মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিব সঙ্গে মুসলিম শিল্প, সাহিত্য ও ভাস্কর্যেব প্রসাব ঘটে। আববী ও ফাবসীতে ভাষা শিক্ষাব জন্য মক্তব, মাদ্রাসাব কেন্দ্র গড়ে ওঠে। মুসলমান ধর্মেব মৌলবী,পীব, পয়গম্বব জেলাব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন। বহু মন্দিব ও বৌদ্ধস্তূপ ভেঙে তাব উপব যেমন মসজিদ নির্মিত হয়, তেমনি আবাব নূতন নূতন মসজিদ, দবগা, মুসলমান ফকিবদেব আবাসকেন্দ্র



দিঘি মসজিদ

তৈবী হয়। বর্দ্ধমান জেলাব মঙ্গলকোট, কুসুমগ্রাম, বেশব, কাসেমনগব, নতনহাট, চুরুলিয়া, আসানসোল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রামে মসজিদ, দবগা ও পযগম্ববদেব আবাসস্থলে মুসলমান সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কাঁকসায় সদগোপ বাজাবা পাঠানদেব কাছে পবাজিত হলে উত্তব বর্দ্ধমান যেমন দুর্গাপুব, বাণীগঞ্জ ও আসানসোল এলাকা পাঠানদেব দখলে চলে যায়। পাঠানদেব আক্রমণে বর্দ্ধমানে মন্দিব ও বৌদ্ধস্তূপগুলিব বহু ক্ষতি হয়। পাঠানবা এগুলি ধ্বংস কবে তাব উপব মসজিদ বানান। কালনা মহকুমাব কাইগ্রামে ছিল হিন্দুদেব 'আদি ববাহেব মন্দিব'। পাঠানবা এটি ধ্বংস কবে বাতাবাতি মসজিদে রূপান্তবিত কবেন। উচালনেব 'শাহমীব' এবং একলক্ষ্মী গ্রামেব 'শাহ-চাঁদপীব' দুটিও বর্তমানে মসজিদেব ধ্বংস বিশেষ বলে অভিহিত হলেও এগুলি প্রকৃতরূপে চম্পিতলাব বৌদ্ধবিহাব। তাব উপব মসজিদেব অল্পকিছু কাবিকুবি কবা হয়েছে মাত্র।

সুলতান হুসেন শাহ

পাঠানদের রাজত্বকালে কয়েকজন মানবদরদী সুলতানের উদারতা ও মহানুভবতায় হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার লাভ ঘটে। যেমন সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) উদারতায় কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, নবদ্বীপ এলাকায় বৈষ্ণব কবিরা স্বচ্ছন্দে কাব্য-সাহিত্য চর্চা ও টোল চতুষ্পাঠি পরিচালনা করতেন। হুসেন শাহ্ হিন্দু ও মুসলমানদের সমান চোখে দেখতেন। তিনি শুধু বিদ্যোৎসাহী ছিলেন না— শিল্প-শিক্ষা ও সংস্কৃতির একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হিন্দু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি বৃত্তি ও আর্থিক সাহায্য করতেন। তাঁর দরবারের দুজন সৈনিক রূপ ও সনাতন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণব হয়েছিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেবার পরও ঐ ভক্ত দুজন সুলতানের রাজদরবারে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। রূপ ও সনাতন গোস্বামীদ্বয়ের প্রচেষ্টায় শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব কবিরা গৌড়ের অন্যতম কবি বলে পরিচিত হয়েছিলেন। মহাকবি দামোদর ঐ কবিদের অন্যতম। হুসেন শাহ্ কবিকে 'যশোরাজ' উপাধি দান করেছিলেন। সুলতানের প্রচেষ্টায় কালনা, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, অগ্রদ্বীপ, সমুদ্রগড়, পাটুলী প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব শাস্ত্র-চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। হুসেন শাহর পুত্র নশরৎ শাহ্ বৈষ্ণব ও হিন্দুশাস্ত্রের কদর জানতেন। তিনি নিজে সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। নসরৎ শাহ্ (১৫১৯-৩৩) নিজে সংস্কৃত থেকে বাংলায় মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। এই সময়ে কালনার বোহারে একটি 'আবাসিক শিক্ষা কেন্দ্র' গড়ে ওঠে। এই শিক্ষা কেন্দ্রে মুসলমান ছাত্রগণ আরবী, ফারসী ও উর্দুভাষা শিক্ষাগ্রহণ করত। বহু দূর দূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসু মুসলমান ছাত্রগণ এখানে পাঠ নিতে আসত। এছাড়া চুরুলিয়া, বল্লভপুর, মঙ্গলকোট, কাসেমনগর প্রভৃতি এলাকাতেও মুসলমান স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের সাথে মসজিদ ও মক্তব গড়ে উঠে এবং মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়।

সুলতান বরবক শাহ (১৪৫৯-৭৪)

আর একজন সুলতান ইলিয়াস শাহ্ রাঢ়বঙ্গ, উড়িষ্যা ও তিরহুত রাজ্য জয় করে সমস্ত রাজ্যকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁর আমলেও বাংলায় শিল্প-সাহিত্য ও স্থাপত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। এই সময় রাঢ় বর্দ্ধমানে কুলীন গ্রামের কবি মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচনা করেন। এই বংশের সুলতান বরবক শাহ্ (১৪৫৯-৭৪) মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। হুসেন শাহী ও ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগণ স্বাধীন সুলতান হিসেবে জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন— তা ইতিহাসে স্মরণীয় অধ্যায়।

চৈতন্যের আবির্ভাব ও কন্টকনগরে সন্ন্যাস গ্রহণ

গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের জীবনের শ্রেষ্ঠতম ঘটনা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের

আবির্ভাব ও বাঙলার জাতীয় জীবনে নবজাগবণ। তখন মধ্যযুগীয় বাংলায় ঘোব অরাজকতা, ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামী ও অধঃপতনে সমাজের সাধারণ ও নিম্নশ্রেণীব মানুষ জর্জরিত। তাদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। অবহেলিত সর্বহারা শ্রমজীবি ও নিম্নবর্ণের হিন্দুরা হচ্ছিল ধর্মান্তরিত। এই যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব হল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের। তিনি প্রেম, ভক্তি ও ভালোবাসার অপার্থিব ভাবধারায় বইয়ে দিলেন নূতন চেতনার জোয়ার। নবদ্বীপের শাসক চাঁদকাজীর রক্তচক্ষু প্রেমের অবতারের কাছে করেছিল নতিস্বীকার।

এমনি এক দিনে

'চলিলেন বৈকণ্ঠ নায়ক গৃহ্ হৈতে
সন্ন্যাস করিয়া জীব উদ্ধারিতে'

১৪৮৬ খ্রীঃ অব্দে ফাল্গুণী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবীর তিনি দ্বিতীয় সন্তান। বাল্যনাম বিশ্বম্ভর, ডাক নাম নিমাই। বাল্যকালে নিমাই ছিলেন দুরন্ত ও দুর্বিনীত। তার দুষ্টুমিতে গোটা নবদ্বীপ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে নিমাইকে জগন্নাথ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করে দেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ ও অলংকার বিদ্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করলে দেশে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ষোল বছর বয়সে লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। গায়ের রং ছিল কাঁচা সোনার মত, তাই তাঁর নাম হয় গৌরাঙ্গ। গৌরাঙ্গদেব বাল্যকাল হতে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত সারা বাংলায় প্রেম ভক্তির বন্যায় প্লাবিত করলেন পাপী-তাপী ও বিপথগামী মানুষের অন্তর। জগাই-মাধাই নামে দুই দস্যু পথের কণ্টক শ্রীচৈতন্যকে বিতাড়িত করার জন্য সংকীর্তনের দলকে আক্রমণ করল। মহাপ্রভু তাদের আক্রমণের বিনিময়ে প্রেমসিক্ত হৃদয়ে তাদের আলিঙ্গন করলেন,

"মেরেছিস কলসীর কানা
তা বলে কি প্রেম দেব না" ·

এই নূতন তত্ত্ব ও দর্শনে দস্যুও হয়ে গেল প্রেমময় ঠাকুরের শিষ্য। আচণ্ডালে ভালবাসা দিয়ে মহাপ্রভু বুঝিয়ে দিলেন,

"কলিকালে যুগধর্ম নামের প্রচার
তথা লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার।"

কিন্তু যাঁকে ভগবান পথের কাঙাল, ভক্তের ভগবান এবং পাপী-তাপী মানুষের উদ্ধারকর্তা হিসেবে গড়তে মনস্থ করেছেন তিনি কি আবদ্ধ থাকতে পারেন সংসার মায়ায়? তাই তিনি সংসার ছেড়ে সন্নাস গ্রহণের মনস্থ করলেন। কলিকালে কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণনামই জীবের মুক্তির একমাত্র পথ, এই উপলব্ধি করে চব্বিশ বছর বয়সে

গৃহে মাতৃস্নেহ, পত্নীপ্রেম ও সংসার বন্ধনকে ছিন্ন ও তুচ্ছ করে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য নিমাই এলেন কাটোয়া বা কণ্টকনগরে:

গঙ্গা হইয়া পার শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।
সেইদিনে আইলেন কণ্টক নগর॥

চৈতন্য চবিতামৃত কাব্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন,

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লা পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।

ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোয়া নামে গ্রাম।
তথা থাকে কেশবভাবতী শুদ্ধ নাম॥



গৌবাঙ্গ মহাপ্রভুব মন্দিব

মাঘ মাসের শুক্লাপক্ষের গভীর রজনীতে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করলেন। মাতা

শচীমাতা ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া জানতেই পারলেন না। তাঁদের স্নেহের ও আদরের গোরাচাঁদ একাকী ছুটে গেলেন কণ্টক নগরের দিকে যার বর্তমান নাম কাটোয়া। তিনি লুটিয়ে পড়লেন মহাসাধক কেশবভারতীর চরণে। কেশব ভারতী বুকে আলিঙ্গন করে স্বগতোক্তি করলেন: স্বয়ং নারায়ণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন? এ রহস্য যে অবোধ্য, সাধক কেশবভারতী উপলব্ধি করলেন, লৌকিক আচারের জন্যই তিনি আজ মহাপ্রভুর গুরু হবার অধিকারী হয়েছেন। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে যেতেই দলে দলে ভক্তদের সমাগম হতে লাগল। কাটোয়ার গঙ্গার তীরে এসে সমবেত হলেন—নিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ। কাটোয়ার আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনে। কাটোয়ার গঙ্গার ঘাটে অগণিত ভক্তের গলদাশ্রুনয়নের আকুতি— কোন মাতার প্রাণের নিধি, কোন সতীর প্রাণ সর্ব্বস্ব তাদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে চলেছেন সন্ন্যাস গ্রহণে? এখানেই হবে তাঁর সন্ন্যাসের দীক্ষা আর তার চাঁচর কেশ হবে মুণ্ডিত।

মহাপ্রভুর আদেশে পরমভক্ত চন্দ্রশেখর কাটোয়ার নিকটবর্তী গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনেন সন্ন্যাসের যাবতীয় উপকরণ। সন্ন্যাস গ্রহণের মুহূর্ত আসন্ন, কিন্তু ক্ষুব হস্তে বিপ্রদাস ক্ষৌরকার অঝোর নয়নে কাঁদছেন—

'ক্ষুর দিতে সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে
হাত নাহি দেয় নাপিত, ক্রন্দনমাত্র করে।'

গুরু হিসেবে গৌরাঙ্গদেব বরণ করলেন কেশবভারতীকে। কেশবভারতী কানে কানে গুরুমন্ত্র দিলেন। কি নাম হবে সন্ন্যাসগ্রহণের পর? কেশবভারতী ধ্যানমগ্ন: তিনি উচ্চারণ করলেন, মানুষকে চৈতন্য দিতে গৌরাঙ্গরূপেই আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য:

এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাটোয়ার গঙ্গা তীরে মস্তক মুণ্ডন করলেন, গুরুমন্ত্র নিলেন। দীক্ষা দিলেন কেশবভারতী। তাই কাটোয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের পঞ্চধামের অন্যতম তীর্থ। কাটোয়া ধন্য, ধন্য বৰ্দ্ধমান। কারণ এই মাটিতেই দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন,

হরের্ণাম, হরের্ণাম, হরের্ণামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।

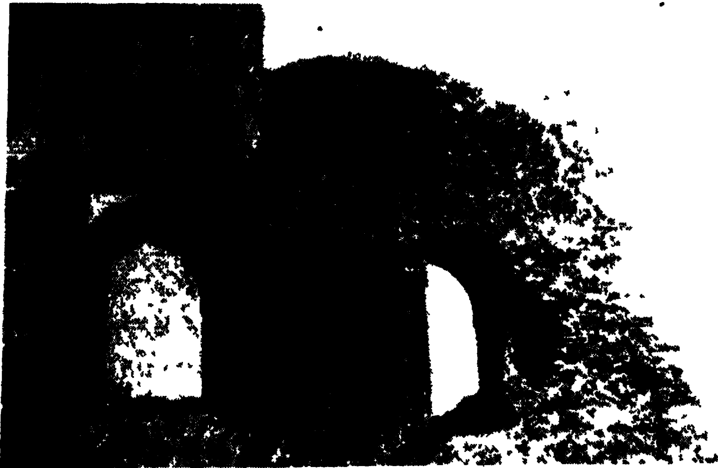
সেইস্থানে এখনও মহাপ্রভুর মন্দির আছে, যেখানে তিনি সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। ২৪ পরগণা জেলার এড়িয়াদহের ভক্ত পার্ষদ গঙ্গাধর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মন্দিরের এলাকার মধ্যে মহাপ্রভুর কেশ মুণ্ডনের স্থান, গঙ্গাধরের সমাধি, ভাগ্যবান

ক্ষৌরকার বিপ্রদাসের সমাধি; এবং কেশবভারতীর সাধনা, সিদ্ধি ও সমাধি স্থান আছে। গঙ্গাধর দাস মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। ইনি প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যান ও তাঁর সঙ্গে পুরীতেই অবস্থান করতেন। প্রভুর লীলাবসানের পর গঙ্গাধর নবদ্বীপে আসেন ও শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করেন। তাদের পরলোক গমনের পর গঙ্গাধর কাটোয়ায় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করান ও গৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়া মহাপ্রভুর পদরেণু লাভে ধন্য,–

'যেইখানে মহাপ্রভুর পড়ে পদধূলি।
সেই মহাপুণ্যধাম, মহাতীর্থ বলি।'

নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ)

পিতা হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। তিনি একজন দক্ষ ও পরাক্রান্তশালী সুশাসক ছিলেন। পানিপথের প্রথম



নসরৎ শার মসজিদ

যুদ্ধের পর তিনি বহু দিল্লীত্যাগী আফগান মুসলমানকে বাংলায় আশ্রয় দেন। তিনি হুসেন শাহের মতই বৈষ্ণবদর্শনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিল্প ও সাহিত্যের ছিলেন তিনি অনুরাগী। চৈতন্য যুগে নবদ্বীপে বৈষ্ণবধর্মের যে তরঙ্গপ্রবাহ উদ্বেলিত করেছিল জনজীবনকে, তা বর্দ্ধমানে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, পাটুলী, অগ্রদ্বীপ, দাঁইহাট, কালনা প্রভৃতি এলাকায় আছড়ে পড়েছিল। জাতীয় জীবনে এসেছিল এক নূতন জাগরণ।

নসরৎ শাহের সময়ে ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অর্থনৈতিক অবস্থাও

বেশ ভাল ছিল। জিনিষপত্র সুলভ মূল্যে ও পর্য্যাপ্ত পাওয়া যেত। জিনিষপত্রের মূল্য নিম্নরূপ ছিল

জিনিষ	টাকা	পরিমাণ
ভাল চাল	এক টাকায়	এক মণ (চল্লিশ সের)
সাধারণ চাল	ঐ	দুই মণ
মুগের ডাল	ঐ	দুই মণ
সঃ তৈল	ঐ	আধ মণ (বিশ সের)
ঘি	ঐ	ষোল সের
দুধ	ঐ	বত্রিশ সের
চিনি	ঐ	এগার সের দশ ছটাক
গুড়	ঐ	উনত্রিশ সের
কাপড়	দুই টাকায়	এক খানা
কম্বল	ঐ	ঐ

জমিদার বাড়িতে দুর্গোৎসবে পঞ্চাশ টাকা ও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে একশত টাকার বেশি খরচ হত না। পুরাতন বংশের ইতিহাসে এই আয় ব্যয় লিপিবদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়।

বিবাহের ব্যয় ছিল নাম মাত্র। শাঁখা শাড়ি ও পুরোহিতের দক্ষিণা এক তঙ্কা। আর দিতে হত বরের আংটি। পাল্কীবাহককে অর্ধমুদ্রা(আট আনা), বাজনদারকে চার আনা (ষোল পয়সা বর্তমানের পঁচিশ পয়সা) দিতে হত। সব নিয়ে মেয়ের বিয়েতে খরচ হত , একশত টাকা মাত্র। বরযাত্রীরা ফলাহারেই তৃপ্ত হতেন। ঘি সুলভ থাকলেও বরযাত্রীদের প্রায়শই লুচি খাওয়ানোর চল ছিল না। চিঁড়া, দই বা ভাতের ব্যবস্থা থাকত। উনবিংশ শতাব্দীতে অভিজাত আহার্য হিসাবে কচুরি লুচির প্রচলন হয়। সেই সময় বর্দ্ধমানের কবি নীলকণ্ঠ গান বেঁধেছিলেন:—

লুচি নন্দিনী ঘৃতে ভাজুনি
কচুরি ভগিনী প্রিয়ে।
যখন লুচির উপর পড়ে ভুড়ো
যেন দেউলেতে সোনার চূড়ো॥

ভুড়ো অর্থাৎ দেশে তৈরী চিনি। কালনার জাপোটে প্রচুর পরিমাণ ভুড়ো চিনি উৎপন্ন হত ও জেলাবাসীর চাহিদা মেটাত। [বৰ্দ্ধমানের ইতিহাস– বলাই দেবশর্ম্মা]

হুসেন শাহের রাজধানী ছিল গৌড়। বর্ত্তমান মালদহের অতিদূরে ১২ মাইল দক্ষিণে হুসেন শাহের রাজধানী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান। ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান। তখন নবদ্বীপের শাসক ছিলেন চাঁদকাজী। হুসেন শাহের রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

পীর খোককড় শাহ

সুলতানী আমলে রাঢ় বর্দ্ধমানে ধর্মপ্রাণ পয়গম্বর খোক্‌কড় শাহের (১৩০০ খ্রীঃ) প্রভাব মুসলিম সভ্যতাকে উচ্চস্থানে বসিয়েছে। কাবুল ও পেশোয়ার মাঝে ছোট্ট একটি জনপদ 'খাকরোহী'। এটি হজরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী গওসুল আজম দাস্তগীরের বংশধর শাহ্ মহম্মদ ওরফে খোককড় সাহের জন্মস্থান। খ্রীষ্টিয় ১৩১৮ অব্দে সুলতানী রাজ্য সারা ভারতবর্ষের মত রাঢ় বর্দ্ধমানেও বিস্তার লাভ করলে মুসলিম সভ্যতার উম্মেষ হয়। তুরস্কের খলিফাগণ হয়ত চেয়েছিলেন ভারতে ইসলামিক শাসন, কিন্তু সকল মানুষকে সমমর্যাদা দেবার কথা যাঁরা ভাবলেন এবং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে যে অভিন্নভাবে নিজের বাঁচার তাগিদেই সমমূল্য দিতে হবে– একথা যারা চিন্তা করলেন, তাঁরা হলেন সুফি মতাবলম্বী ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ। এঁদের মধ্যে সে সময় বিখ্যাত ছিলেন দিল্লীর সাধু সেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়া, সিলেটের শাহ্ জালাল এবং বর্দ্ধমানের 'খোককড় শাহ্'। এই পুণ্যাত্মা পয়গম্বরের নাম এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে সুদূর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান হতে ভক্তবৃন্দ খোককড় সাহের আশিস কামনায় এখনও মোতায়েলীর কাছে পত্র লেখেন। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় ভক্তিভরে এই পীরের সমাধিতে দীপ, ধূপ ও ফুল নিবেদন করেন। বর্দ্ধমান রাজবাড়ি থেকে প্রতি সন্ধ্যায় সন্ধ্যাদীপ ও প্রতি শুক্রবার নিয়মিত শিন্নি, লোবান, গোলাপপানি ও ভোগের ব্যবস্থা থাকত।

জানা যায়, খোককড় শাহ্ নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ দরবেশ আজমীড়ের খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির দরগায় গভীর সাধনায় লিপ্ত হন। অতঃপর সিদ্ধিলাভের পর তিনি সোজা বর্দ্ধমান শহরে চলে আসেন। সুলতানী আমলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তখনকার কবি ও ঐতিহাসিক আবুল হাসান খসরু। খসরু এই দরবেশ সম্পর্কে কয়েকটি কবিতাও রচনা করেন। বর্দ্ধমান শহরের পুরাতনচকে খোক্কড় শাহ্ নিজ আস্তানায় অবস্থান করেন। এই সময় বহু অলৌকিক ক্ষমতা তিনি দেখান ও ভক্তবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খ্রীষ্টিয় ১৩৫০ অব্দ এই পয়গম্বরের প্রয়াণকাল বলে অনুমান করা হয়।

দিলারামে, অবস্থিত খোক্কড় শাহের আস্তানাটি রাজ আমল থেকে সকাল সাতটা হতে দশটা এবং বিকাল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত ভক্তদের দর্শনের জন্য এখনও খোলা থাকে। রাজবাড়ির সর্বদক্ষিণে রাস্তা খুলে দিয়ে ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে।

হজরত বাহারাম সাক্কা ও যোগী জয়পাল

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইসলামিক সভ্যতার আর একটি স্মরণীয় ঘটনা হল. হজরত

পীরবাহ্রামের আবির্ভাব। বাহ্রামের প্রকৃত নাম শাহ্ওয়াদি বায়াত। বায়াত সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ আজার বাইজান, ইরিভান, তেহ্রান ও তাব্রিজ এলাকায় বিভিন্ন কার্যোপলক্ষে বসবাস করতেন। বায়াতগণ তুর্কি বংশসম্ভূত। আকবরের সভাসদ নবরত্নের অন্যতম আবুল ফজল আকবর নামায় এই দরবেশ সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। শাহ্ওয়ার্দি ওরফে বাহ্রাম সাক্কা কাবুলের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত গুরবন্দ, জাহাক ও বামিয়ান জেলা সমূহের শাসনকর্তা ছিলেন। হুমায়ুন যখন শেরশাহের কাছে পরাস্ত হয়ে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় পুত্র আকবরকে নিয়ে কাবুলের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন শাহ্ওয়ার্দি ওরফে বাহ্রাম সাক্কাকে বন্ধুরূপে পেয়ে আল্লার কৃপা লাভ করেন। কাবুলে অনুষ্ঠিত খাত্না উৎসবে বাহ্রামের অপূর্ব ধর্মীয় গীত সকলকে মুগ্ধ করে। অনেকে মনে করেন পরবর্তীকালে হুমায়ুনের সাফল্য ও আকবরের উত্থান এই দরবেশের আশিসেই সম্ভব হয়েছে। রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে বাহ্রাম ক্রমশঃ বিরূপ হয়ে ওঠেন ও ঐশ্বরিক আলোয় প্রভাবিত হন। বাহ্রাম শেখ জানি মুহম্মদ খাবুসানী নিশাপুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবশেষে রাজধর্ম ত্যাগ করে গুরুর নির্দ্দেশে চর্মনির্মিত আধার (মশক) নিজের কাঁধে তুলে নেন ও ভিস্তি (সাক্কা) বা জলবাহকরূপে পরিচিত হন। জেদ্দা থেকে মক্কার পথে পথে পিপাসার্ত পথিকদের জলদান করাই ছিল বাহ্রামের গুরু নির্দ্দেশিত সেবাকার্য। বারো বৎসর জলদান সেবা কার্য পালনের পর গুরুর নির্দেশে তিনি আবার স্বদেশে ফিরে আসেন। বারো বৎসর ধরে জলপূর্ণ ভিস্তি কাঁধে বহন করার জন্য কাঁধে ক্ষতর সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর বাহ্রাম দিল্লী হয়ে আগ্রা আসেন। এখানে জলদানের জন্য একটি কুটির নির্মাণ করান। আজও তার অস্তিত্ব আছে। [Prof Blockman I. A. S. B. Vol– I 40, Page-28] পরে বাহ্রাম বর্দ্ধমানে আসেন ও পুরাতনচকে আশ্রম স্থাপন করেন।

অল্প কয়েকদিন অবস্থান করার পর এখানেই তিনি দেহ রাখেন। হজরত পীর বাঁহ্রাম সুফী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সম্রাট আকবর এই মতাবলম্বীর দরবেশদের দিল্লী, আজমীর ও অন্যান্য স্থানে এইসব সাধকগণের সমাধি ক্ষেত্র ভক্তিভরে জেয়ারত (দর্শন) করতেন। তিনি সেলিম চিস্তি, খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি ও বাহ্রাম সাক্কার পরম ভক্ত ছিলেন। পীরবাহ্রাম কবি ছিলেন, সাধনতত্ত্ব ও জীবনতত্ত্বের কবিতা অপূর্ব সুরে তিনি গাইতেন ও পাঠ করতেন। সাক্কার দেওয়ান বা কবিতার সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কবিতাগুলি ধর্মীয় আদর্শে মণ্ডিত ও উচ্চমার্গের। ভক্ত মুসলমানগণ মনে করেন, এগুলি পাঠ করলে মন ও অন্তর অনির্বচনীয় স্বর্গীয়তায় ভরে যায় ও দুঃখ কষ্ট লাঘব হয়।

যে জায়গায় বাহ্রামের সমাধি হয়, সেখানে যোগী জয়পাল বলে একজন বিখ্যাত সাধুর মঠ ছিল। কথিত আছে উক্ত যোগী পীরবাহ্রামের অলৌকিক প্রতিভায়



পীববাহ্‌বাম ও শেব আফগানেব কবব

মুগ্ধ হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পীরবাহ্‌রাম নিজ পরিচয় গোপন কবে যোগী জয়পালেব কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। যোগী যখন জানতে পারেন তিনি একজন পীব পয়গম্বব, তখন বাহ্‌রামকে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনে আহ্বান জানান। যোগীবর নিজ পবিধেয় বস্ত্রকে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য স্থানে শুকোতে দিয়ে বাহ্‌রামকে তা ফিরিয়ে আনতে বলেন। কবি ও সাধক বাহ্‌রাম নিজের লাঠি দিয়ে বস্ত্রকে গুটিয়ে মাটিতে এনে প্রত্যক্ষ করান। এরপর মুগ্ধ হয়ে হিন্দু যোগীও মুসলমান পীর একসঙ্গে আধ্যাত্মিক মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন। পীরবাহ্‌রামের সমাধিটি সম্রাট আকবর স্মৃতিসৌধের আকারে নির্মাণ করান। এটি সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য সম্রাট বাহ্‌রামবাজার, পুরাতনচক, ফকিরপুর ও মীর্জাপুর মৌজা সমূহ দান করেন ও মাতোয়ালী নিযুক্ত করেন। পীরবাহ্‌রামের দরগার দক্ষিণে রয়েছে সাধক যোগী জয়পালের সমাধি।

সুলতান সুলেমান কররাণী

পাঠানদেব পব কববাণী বংশেব সুলতান সুলেমান কববাণী বাংলাব সিংহাসনে বসেন (১৫৬৫ খ্রীঃ অব্দ)। সুলেমান আকববেব শাসনকর্তৃত্ব ও অধীনতা স্বীকাব কবেন। .কিন্তু তাঁব মৃত্যুব পব (১৫৭২), তাঁব পুত্র দাউদখান সিংহাসনে বসেন ও নিজনামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রাব প্রচলন কবেন। আকবব এই ঔদ্ধত্ব দমন কবাব জন্য সেনাপতি মুনিম খাঁকে বর্দ্ধমানে প্রেবণ কবেন ও বাজমহলেব যুদ্ধে দাউদ পবাস্ত হন (১৫৭৬), আকববেব অপব সেনাপতি টোডবমল বর্দ্ধমান শহবে যুদ্ধেব ঘাঁটি স্থাপন কবেন ও দাউদেব পবিবাববর্গকে বন্দী কবেন। পববর্তীকালে দাযুদেব পুত্র কুট্রিখান দিল্লীব শাহনশাব সঙ্গে চুক্তিমত ব্যাজ্য শাসন কবতে থাকলে আব কোন গোলযোগ দেখা দেয় নাই। কিন্তু বর্দ্ধমানেব পাঠান শাসকগণ প্রাযই দিল্লীব বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা কবলে বাবে বাবে দিল্লীব সেনাপতিকে বর্দ্ধমান ছুটে আসতে হয়।



মাইকাসিস্ট পাথবেব তৈবী দ্বিভজ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি (সিজনা, মন্তেশ্বব)

সপ্তম অধ্যায়

মোগলদের বর্দ্ধমান আগমন

শের আফগান ও নূরজাহান

আকবরের পরে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সম্রাট হন এবং শের আফগানকে দিল্লী থেকে বর্দ্ধমানের জায়গীরদার করে পাঠান। দিল্লীর মোগল বাদশাহের ইতিহাসে একটা ছিন্নপাতা এই বর্দ্ধমানের মাটিতে চাপা পড়ে যায়। জাহাঙ্গীরের সমবয়সী অসীম সাহসী যোদ্ধা ও বীর শের আফগান মোগল দরবারে সেনানীর কাজ করতেন। তাঁর পুরো নাম আলিকুলি ইসতাজুল। পারস্যের অধিবাসী। রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে শাহজাদা সেলিমের (জাহাঙ্গীর) সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে একটা ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হন ও ইস্তাজুল স্বহস্তে সেই ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করেন।

তাই জাহাঙ্গীর এই যোদ্ধাকে শের আফগান উপাধিতে ভূষিত করেন। ইস্তাজুলের প্রকৃত নাম এর আড়ালে হারিয়ে যায়। (Tujuki Jahangir–Rogers & Beveridge Part-I-114 Page) বর্দ্ধমানে জায়গীরদার হয়ে আসার আগেই দিল্লীতে অসামান্যা সুন্দরী মেহেরউন্নিসার সঙ্গে শের আফগানের বিয়ে হয়। অতি সাধারণ ঘরের সন্তান ইসতাজুল পারস্যাধিপতি দ্বিতীয় শাহ্ ইসলামের পার্শ্বচর ছিলেন। কিন্তু কঠোর ভাগ্যবিড়ম্বনায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে তাঁকে ভারতে চলে আসতে হয়। আফগানিস্থান ও পারস্যবাসীদের কাছে ভারত ছিল স্বর্ণখনি। এখানে এলেই ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হন, প্রভূত অর্থার্জনেরও সুযোগ হয়– এই আশা আকাঙ্খা নিয়ে ইস্তাজুল আলিকুলি (পরবর্তীকালে শের আফগান) ভারতে সম্রাট আকবরের রাজদরবারে হাজির হন। ইস্তাজুলের শরীর ছিল সুগঠিত ও সৌম্যদর্শন। তাই আকবর তাঁকে নিজ দরবারে সেনানীর কাজ দিলেন। অতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ইস্তাজুল নিজ কর্মকুশলতায় আকবর ও যুবরাজ সেলিমের (জাহাঙ্গীর) দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিখ্যাত যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এই সময়ই সম্রাট আকবরের আনুকূল্যে সপ্তদশ বর্ষীয়া মেহেরউন্নিসা বা নূরজাহানের সঙ্গে শের আফগানের শাদি হয়।

মেহেরউন্নিসার পিতামহ খাজা মোহাম্মদ শরীফ খোরাসানের তাতার সুলতান বগলার বেগীর মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র মির্জা গিয়াসুদ্দীনও ভাগ্যান্বেষণে ভারতে চলে আসেন। সম্রাট আকবরের দরবারের সুপ্রসিদ্ধ রত্নব্যবসায়ী মালেক মসউদ গিয়াসুদ্দীনকে সঙ্গে করে ভারতে আনেন। পথিমধ্যে গিয়াসুদ্দীনের স্ত্রী একটি অপরূপা কন্যারত্ন প্রসব করেন। মেয়েরা তাঁর নাম রাখেন মেহেরউন্নিসা অর্থাৎ মেয়েদের

চাঁদ। গিয়াসুদ্দীন ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন বলে অতি সহজেই তিনি আকবরের রাজত্বে মনসবদারীর কাজে নিযুক্ত হন এবং অল্পকালের মধ্যেই গিয়াসুদ্দীন নিজ প্রতিভা বলে তিন হাজারী মনসবদার ও কাবুলের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। (১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) [Blockman– আইনী আকবরী ৫০৮ ও ৫০৯ পৃষ্ঠা] পিতামাতার কাছে কৈশোরে মেহের আরবী ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন ও অল্প বয়সেই কবিতা রচনা করতে থাকেন। অসামান্যা রূপলাবণ্যের জন্য মোগল দরবারে নারীকুল-শ্রেষ্ঠা হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে।

জাহাঙ্গীর ও নূরজাহানের প্রণয় কাহিনী রোমাঞ্চকর করতে ঐতিহাসিকগণ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন বলে কেউ কেউ অভিযোগ করেন। তাঁদের মতে রূপসী মেহেরউন্নিসাকে দেখে যুবরাজ সেলিম মোহিত হয়ে যান ও তাঁর প্রেমে পড়েন। দিল্লীতে থাকাকালীন মোগল হারেমে মেহেরউন্নিসার নাচ-গানে ও মজলিসে প্রণয় কক্ষে যুবরাজের সঙ্গে মেহেরের প্রাণ বিনিময় হয়। মেহের ও যুবরাজ সেলিমের প্রণয় কাহিনী আকবরের কানে পৌঁছালে, আকবর শের আফগানের সঙ্গে মেহেরের শাদি দিয়ে দেন ও শের আফগানকে সুদূর এই বর্দ্ধমানের জায়গীরদার করে পাঠান। [Dow's History of India Vol-III Page-19-33]

বর্দ্ধমানে এসে মেহেরউন্নিসা অবশ্য শের আফগানের অঙ্কশায়িনী হয়েই দিন কাটান নি। এখানে তিনি আরবি ও ফারসী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন ও শিক্ষা বিস্তারে শের আফগানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা এবং ইসলামিক নারী সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি স্মরণীয় হয়ে আছে। অন্যান্য নরপতিদের মত শের আফগানও শেষকালে দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সম্রাট জাহাঙ্গীর সেনাপতি কুতুবউদ্দীনকে বর্দ্ধমানে পাঠান তার অবাধ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য। আইনী আকবরী ও তুজুকী (জীবনী) জাহাঙ্গীর পাঠ করলে জানা যায় রাঢ়ের পাঠান শাসকগণ মোগলের প্রাধান্য খর্ব করতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। বীর শের আফগানও বর্দ্ধমানকে স্বাধীনরাজ্য বলে ঘোষণা করে ঐ জোটে যোগ দেন। এই সংবাদ দিল্লীতে জাহাঙ্গীরের কাছে পৌঁছালে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অকৃতজ্ঞ শের আফগানকে শায়েস্তা করতে নিজ ধাত্রী মায়ের পুত্র দুধভাই ও সেনাপতি কুতুবউদ্দীনকে বর্দ্ধমান পাঠান বিরাট সৈন্যবাহিনী দিয়ে। বর্দ্ধমানে কুতুবউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে শের আফগান নিহত হন। এইখানে পীরবাহারামে শের আফগানের যে কবর আছে, তা সেদিনের সাক্ষ্য বহন করছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর মেহেরউন্নিসা শের আফগানের ঔরসজাত কন্যা লায়লী বেগমকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লীতে পিতা গিয়াসুদ্দীনের কাছে চলে আসেন। কিছুদিন পর তিনি রাজমাতা সেলিমা বেগমের সহচরী নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই জাহাঙ্গীরের

সঙ্গে মেহেরউন্নিসার পরিচয় হয়। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত নওরোজ উৎসবে মেহেরের অতুলনীয়া রূপ দেখে জাহাঙ্গীর মুগ্ধ হন ও মেহেরকে শাদি করার প্রস্তাব দেন। অবশেষে বিমাতা সেলিমা বেগমের উদ্যোগে এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় মেহেরের বয়স মাত্র চৌত্রিশ বৎসর। বিবাহের পর জাহাঙ্গীর তাঁর নাম রাখেন নূরজাহান অর্থাৎ জগতের আলো।

অনেকের ধারণা বাদশাহ আকবর নীচকুলোদ্ভবা নূরজাহানকে পুত্রবধূ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বলেই শের আফগানের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল্লী থেকে নূরজাহানকে জাহাঙ্গীরের চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নূবজাহান মোটেই নীচকুলোদ্ভবা ছিলেন না। আকবরের মাতা হামিদা বানু বেগমও নূরজাহান অপেক্ষা বংশমর্যাদায় বড় ছিলেন না। জাহাঙ্গীর যখন নূরজাহানের পাণিগ্রহণ করেন তখন নূরজাহানের বয়স চৌত্রিশ বছর হলেও তাঁকে দেখে ষোড়শী যুবতী বলে মনে হত। নূরজাহান ১৫ বছর (১৬১২-২৭) ধরে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছেন। নূরজাহান বড় যোদ্ধাও ছিলেন– তিনি একসঙ্গে পিস্তলের ছটিগুলিতে ৪টি ব্যাঘ্র নিহত করেন। কবিতা রচনা করেছেন বহু। তিনি উন্নত রুচিসম্পন্না ও বিদুষী মহিলা ছিলেন। ভারত সম্রাজ্ঞী হয়েও তিনি অনাথ আতুরদের কথা ভোলেন নি। তিনি কমপক্ষে পাঁচ হাজার অনাথা বালিকার সুপাত্রে বিয়ে দিয়েছেন। নূরজাহানের বুদ্ধি, রূপ, কর্ম, সাহস ও সর্বোপরি তীক্ষ্ণ রাজনীতি জ্ঞান তাঁকে এক উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শোনা যায়, শের আফগানের স্মৃতি তিনি অতি সহজেই ভুলে যান নি। জাহাঙ্গীর নূরজাহানের বিবাহের প্রস্তাব দিলে সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের বারংবার অনুরোধে ও সেলিমা বেগমের আগ্রহে তাঁর মত পরিবর্তন হয়। রাঢ় বর্দ্ধমান এই ঐতিহাসিক নারীকে অল্প কয়েক বছরের জন্য পেয়ে সত্যই ধন্য। এখানে কুতুবউদ্দীনেরও সমাধি আছে। মর্মরফলকে এই দুই বীরের সম্পর্কে পরিচয় দেওয়া আছে, (পুরাসম্পদ ও ভাস্কর্য দ্রষ্টব্য)।

জাহাঙ্গীরের শেষ সময়ে আবার বাংলায় তথা রাঢ় বর্দ্ধমানে বিদ্রোহ দেখা দিলে ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ খুরম (পরে যিনি দিল্লীশ্বর শাহজাহানরূপে প্রতিভাত হন) গড়ের দুর্গ ও বর্দ্ধমান শহর দখল করেন।

বর্দ্ধমান রাজবংশের পত্তন—আবু রায়

যুবরাজ খুররাম বা শাজাহান বর্দ্ধমান দখল করার পর একজন উপযুক্ত জায়গীরদার বা শাসনকর্তার অনুসন্ধান করছিলেন। এই সময় পাঞ্জাবের লাহোর কোটলির কাপুর ক্ষত্রিয় আবু রায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে বাণিজ্য করবার জন্য বর্দ্ধমান আসেন। মোগল বাদশাহর ঔদার্যে ও আনুকূল্যে বর্দ্ধমানের জায়গীর লাভ করে স্থায়ীভাবে

বর্দ্ধমানেই বসবাস সুরু করেন (১৬৫৭ খ্রীঃ) এই আবুরায়ই বর্দ্ধমান রাজবংশের পত্তন করেন বর্দ্ধমান শহরের কাঞ্চননগর এলাকায় 'বারোদুয়ারী নামে' নিজ বসতবাটী প্রতিষ্ঠা করেন (Imperial Gazette– IX Part– 101-109 Page)।

সঙ্গম রায়

বর্তমান পাকিস্তানের লাহোর শহরের অন্তর্গত কোটলে মহল্লা নিবাসী শ্রীসঙ্গম রায় পুরীধামে জগন্নাথ দেবের দর্শন উপলক্ষে উড়িষ্যা আসেন। সেখান থেকে দিল্লী ফেরার পথে বর্দ্ধমানের বেলেরা বৈকুণ্ঠপুরে কয়েকদিন বসবাস করেন। শিবভক্ত সঙ্গম রায় এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যা আজও বিদ্যমান। যখন শের আফগানের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের দুধভাই কুতুবউদ্দীনের লড়াই হয়, তখন সঙ্গম রায় বাদশাহী সৈন্যদেব খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেন। ফলে সঙ্গম রায় মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহানের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। শাহজাহান তাঁকে চার হাজারী (কোতোয়ালী) মনসবদার নিযুক্ত করেন। সঙ্গম রায় ছিলেন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, খাদ্য ও অর্থের বিনিময়ে মোগলেব সাহচর্য লাভ করেন।

বঙ্কুবিহারী রায়

সঙ্গম রায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী রায় একধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি মোগলের অধীনে বর্দ্ধমান চাকলায় মনসবদারী লাভ করেন। মোগল বাদশাহের সুহৃদ বন্ধুর স্বীকৃতি হিসাবে শাহজাহান সঙ্গম রায়ের পুত্রকে রায়-রায়ান উপাধি দান করেন।

আবুরাম রায়

বঙ্কুরায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবুরাম রায় (১৬৫৭) বর্দ্ধমানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য আসেন। আবুরাম রায় বর্দ্ধমান ফৌজদারের অধীন বর্দ্ধমান শহরের রেকাবি বাজার, মোগলটুলির কতোয়াল ও চৌধুরীপদ লাভ করেন জায়গীব পদ সহ।

বাবুরাম রায় ও ঘনশ্যাম রায়

আবুবামের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাবুরাম রায় শহরের কোতোয়াল ও চৌধুরী পদলাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ঘনশ্যাম রায় উত্তরাধিকার সূত্রে বর্দ্ধমানের কোতোয়ালী পদ লাভ করেন। ঘনশ্যাম রায় শহরবাসীর পানীয় জলের অভাব দূর করার জন্য বিশাল শ্যামসায়র প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যবহারের জন্য সুদৃশ্য বাধাঁনো ঘাট এবং চতুর্দিকে পরিভ্রমণের জন্য রাস্তা নির্মান করান। বর্তমানে এই শ্যামসায়রের

পশ্চিম তীরে বর্দ্ধমান রাজকলেজ, বিজয়চাঁদ হাসপাতাল, পূর্বে রামকৃষ্ণ আশ্রম ও ঈশানীশ্বর, প্রাচীন মেডিকেল কলেজ, হরিসভা এবং সাহিত্য পরিষদ। আর দক্ষিণে হরিসভা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় অবস্থিত।

কৃষ্ণরাম রায়

ঘনশ্যাম রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কৃষ্ণরাম রায় ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের প্রদত্ত ফরমান অনুযায়ী বর্দ্ধমানের জমিদারী ও চৌধুরীপদ উত্তরাধিকারসুত্রে পান। কৃষ্ণরামও বর্দ্ধমান শহরের পশ্চিম প্রান্তে একটি বিশাল দীঘি খনন করান। সে যুগের প্রথা অনুসারে কয়েক হাজার নিযুক্ত শ্রমিককে শ্রমমূল্য বাবদ কড়ি দান করে এই দীঘিটি কাটানো হয়। তখন মুদ্রার প্রচলন হয় নাই— কড়ির বিনিময়ে সাধারণ বাজারে বেচা-কেনা চলত। কৃষ্ণরামের নামানুসারে এই দীঘির নাম রাখা হয় কৃষ্ণসায়র। এই দীঘির উঁচু পাড় কেটে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ি ও উদ্যান করেছে।

কৃষ্ণরাম রায় মোগলদের অধীনস্থ সামন্তরাজা ছিলেন। জনৈক রহিম খান নামক আফগান সর্দারের সাহায্যে চিতুয়া ও বরদার জমিদার রাজা শোভা সিংহ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম রায়কে পরাজিত ও নিহত করেন ও বর্দ্ধমান ভুক্তির বহু এলাকা তাঁরা দখল করেন। [রাজবাটির ক্রিয়াদর্পণ (১৩৫৮)— ৪৬ পৃঃ] মাঘ মাসের অমাবস্যায় কৃষ্ণরাম নিহত হন। বিদ্রোহীরা বর্দ্ধমানের রাজবাটি দখল করেন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎ রায় মোগল সৈন্যদের সহায়তায় ঢাকায় পালিয়ে যান ও ঢাকার নবাবের আশ্রয় নেন। শোভা সিংহ কর্তৃক রাজপরিবারের মহিলারা বন্দী হন। কৃষ্ণরামের কন্যা রাজকুমারী রূপসী সত্যবতী নিজে যুদ্ধ করে শোভাসিংহের হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় নিজের বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকানো ছুরি দিয়ে শোভাসিংহকে হত্যা করেন সত্যবতী। বীরাঙ্গনা সত্যবতী বর্দ্ধমানের নারী সমাজে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বর্দ্ধমান দখল করার পর বিদ্রোহী পাঠানগণ বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেন। বর্দ্ধমানের দক্ষিণ উপকণ্ঠে রহিম খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী পাঠানগণ মোগল সৈন্য আশ্রয়পুষ্ট জগৎরাম রায়কে পরাস্ত করেন। ফলে পাঠানদের হাতে বহু মোগল সৈন্য নিহত হয়। তাই ঐ এলাকাকে 'মোগলমারি' বলে। দিল্লীর বাদশাহ ঔরঙ্গজেব এই বিদ্রোহ দমন করতে তাঁর পৌত্র আজিম উশশানকে বর্দ্ধমানে পাঠান। আজিম উশ-শান যে স্থানে অবস্থান করেছিলেন বাদশাহ্ আলমগীরের নামানুযায়ী সেই স্থান 'আলমগঞ্জ' নামে খ্যাত হয়। আজিম উশ-শান বর্দ্ধমানের উপকণ্ঠে বিদ্রোহী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই আক্রমণে ঢাকা থেকে সেখানকার নবাব জবরদস্ত খানের সৈন্যবাহিনী নিয়ে জগৎরামও বিদ্রোহী বাহিনীকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করেন। বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেব জগতরামের এই সাহসে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে ফরমান দিয়ে

সাহায্য করেন। কিন্তু পরবর্তী ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে পথিমধ্যে ভ্রমণকালে পাঠান বিদ্রোহীদেরই এক আততায়ীর হাতে জগৎরাম নিহত হন।

বীরাঙ্গনা সত্যবতী ও জহরব্রত

বীরাঙ্গনা সত্যবতী সহজেই শোভাসিংহকে রাজঅন্তঃপুরের দখল ছেড়ে দেন নি। তিনি রাজপরিবারের আরও তেরোজন মহিলাকে নিয়ে শোভাসিংহের বিরুদ্ধে লড়াই করে নারী শৌর্যের পরিচয় দেন। শোভাসিংহ নিহত হলে তার সৈন্যদের হাত থেকে নিজেদের ইজ্জত বাঁচাতে রাজকুমারী সত্যবতী সহ আরও তেরোজন মহিলা অন্তঃপুরের পাশেই হীরাচুষে জহরব্রত পালন করেন ও আত্মবলিদান দেন। এই তেরোজনের নাম হলো কুন্দাদেবী, যোতাদেবী, চিমোদেবী, আনন্দদেবী, কিশোরীদেবী, কুঞ্জদেবী, জিতুদেবী, দাসোদেবী, লাজোদেবী, পাতোদেবী, কৃষ্ণাদেবী, লক্ষ্মীদেবী ও মুলুকদেবী।

সত্যবতী সহ চৌদ্দজন বীরাঙ্গনা জহরপানে আত্মদান করেছেন বলে রাজবাটি সংলগ্ন এই এলাকাকে জহরীপটি বলে।

কীর্তিচন্দ্র রায় (১৭০২-১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ)

জগৎরাম রায় হিজরি ১১১১ সালে দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে যে ফরমান পেয়েছিলেন তা রাখালদাস মুখোপাধ্যায় বিরচিত 'রাজবংশানুচরিত' (সন ১৩২১ সাল) গ্রন্থে মূল ফারসীর বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

'আবল জাফর মহাম্মদ মহিঅদ্দিন আলমগীর বাদসাহ গাজী'

মোহরাঙ্কিত।

'কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎকে বর্দ্ধমান ওগয়রহর ৪৯ মৌজার জমিদারী চৌধুরাই দেওয়া গেল ইত্যাদি ৫ জমা দিয়ল আউল। ৪৩ জুলুস' সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণসাগর সরোবরে স্নান করবার সময় জনৈক গুপ্তাঘাতকের ছুরিকাঘাতে সন ১১০৮ সালের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় তিথিতে জগৎরাম রায় নিহত হন। সেই সময় থেকে দীর্ঘদীন ধরে রাজপরিবারে কেউ আর এই কৃষ্ণ সায়রে স্নান করতেন না। পরবর্তীকালে সাধক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আনিয়ে হোমযজ্ঞ করার পর বর্দ্ধমানের সাধারণ মানুষ কৃষ্ণসায়রের জল ব্যবহার করতে সুরু করেন। জগৎরামের স্ত্রীর নাম ছিল ব্রজকিশোরী। তাঁর গর্ভে দুই সন্তান— কীর্তিচন্দ্র রায় ও মিত্ররাম রায়। পিতার মৃত্যুর পর কীর্তিচন্দ্রই জমিদারীর মালিক হন। কীর্তিকে বলা হত বীরবর। তিনি ছিলেন যোদ্ধা ও অসীম সাহসী। তাঁর সেনাপতি ছিলেন বৎসরাম খান্না। কীর্তিচাঁদ মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা চিতুয়া এবং বরদা (ঘাটাল) রাজ্যজয় করেন। এই যুদ্ধে যাবার সময় তাঁর পূর্ব

পুরুষ আবু রায় প্রতিষ্ঠিত কাঞ্চননগরের দেবালয়ে (অবস্থিত বারোদুয়ারী) জনৈক সাধক কীর্তিচন্দকে এই বলে আশীবাদ করেন, যে এই যুদ্ধে তিনি জয়ী হবেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে মহারাজ কীর্তিচন্দ এই সাধুকে নিজের গুরু বলে মান্য করেন ও পাঁচিশ বিঘা নিষ্কর সম্পত্তি দান করেন। থাকার জন্য বিরাট প্রাসাদ ও বিরাট ঠাকুরবাড়ি নির্মাণ করান। এই সাধকই রাজগঞ্জে মহন্ত নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা। এখানে রাজগঞ্জে প্রসিদ্ধ রঘুনাথ জিউ বিগ্রহ আজও পূজিত হন মোহন্তদের দ্বারা। কীর্তিচন্দ এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কীর্তিচন্দ দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে আরও বহু মৌজা জমিদারী হিসেবে পান, তারমধ্যে মহাপীঠস্থান ক্ষীরগ্রাম অন্তভুর্ক্ত ছিল। এই স্থানে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হইয়াছিল, এখানে দেবী যোগাদ্যা ও ক্ষীর খণ্ডক ভৈরব বিরাজমান আছেন। কীর্তিচন্দ্র এইস্থানে দেবীর একটি রত্নবেদী একখানি শিলালিপি গ্রথিত করেন। কিন্তু তাহার অক্ষরগুলি বিনষ্ট হওয়ায় কিছুই পড়তে পারা যায় না।

বর্দ্ধমানের উত্তর পশ্চিমাংশে কয়েকক্রোশ দুরে দীর্ঘনগর ও হাট কীর্তিনগর নামক স্থানে কীর্তিচন্দ সাময়িক বাসোপোযোগী বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করান এবং একটি সুবৃহৎ সরোবর কাটান। তন্মধ্যে বারদ্বারী নামক একটি সুরম্য বিলাস ভবনও প্রস্তুত করান। কীর্তিচন্দ দাঁইহাটে অনেকগুলি শিবমন্দির ও একটি আবাসভবন নির্মাণ করান। এইগ্রামে তিনি হরগৌরী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে ইনি ইন্দ্রানী পরগণার গ্রামদেবতারূপে পূজিতা। কাটোয়ার সন্নিকটে যাজ্ঞেশ্বডিহি নামক বিশাল সরোবর তাঁরই কীর্তি। বীরভূম থেকে অশ্বারোহণে কীর্তিচন্দ বর্দ্ধমান আসার পথে এই স্থানে পিপাসার্ত হয়ে এক রাখাল বালককে একঘটি জল আনতে বলেন। রাখাল বালক পার্শ্ববর্তী গ্রামে বাড়ি বাড়ি সংগ্রহ করে কোনক্রমে এক ঘটি জল আনে। এই অঞ্চলে পানীয় জল এত দুষ্প্রাপ্য দেখে কীর্তিচন্দ এই দিঘি খনন করান। বালকের নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর। তার নামানুযায়ী সরোবরের নাম হয় যাগেশ্বরডি। বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগর নামক ক্ষুদ্রশিল্প নগরী কীর্তিচন্দের স্থাপিত। পরিকল্পিতভাবে তিনি এই নগরীর রাজপথ, সুরম্য অট্টালিকা, বাগান, সরোবর এবং শিল্পীদের আবাসস্থান নির্মাণ করান। এখানকার ছুরি, কাঁচি, ইস্পাতদ্রব্য, কাঁসা বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিল। কীর্তিচন্দ এইসব শিল্পীদের এনে বসান। তৎকালীন সমাচার দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক জয়গোপাল তর্কালংকার বর্দ্ধমানের কীর্তিচন্দকে সম্বোধন করে সংস্কৃত কবিতা উপহার দেন:

ত্বং কীর্তিচন্দ্র মুদিতং গগনে নিশামা।
রোহিনাপি স্বপন্তি সংশয় জাতশঙ্কা
শ্রীকীর্তিচন্দ্র নৃপ কজ্জল লাঞ্ছনেন
প্রেয়াং সমক্ষয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ।

'হে কীর্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হয়েছে।

ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী কীর্তিচন্দের সহায়তায় বর্দ্ধমানের চতুষ্পাঠিতে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন। কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কীর্তিচন্দ। কবি তাঁর কাব্যে একথা উল্লেখ করেছেন :-

অখিলে বিখ্যাতকীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তার রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজঘনরাম রসগান।

কীর্তিচন্দ এই কবিকে 'কবিরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কীর্তিচন্দ এই কবিকে উদ্দেশ্য করে বাউল, ভিখারী, ফকির গান গেয়ে বেড়াত তা নিম্নরূপ :-

রাজা রাজা বল হো
যাগেশ্বরে দিয়ে দীঘি নাম রহিল॥
বন কেটে বসালেন রাজা কাঞ্চননগর
হেদে হে ধার্মিক রাজা দয়ার সাগর॥
বর্দ্ধমানে বাড়ী তোমার, মহারাজ, দীর্ঘনগর হাট।
সাধ করে বাঁধালেন রাজা, মা গঙ্গার হাট॥

কীর্তিচন্দ একজন বীর যোদ্ধা ছিলেন। রাঢ় বঙ্গ ও রাঢ় বর্দ্ধমানের ছোট ছোট বহু রাজ্য তিনি জয় করেন। যেমন চন্দ্রকোণা, বরদা (ঘাটাল), চিতুয়া, কাঞ্চননগর, কামারপাড়া, হাটকীর্তিনগর, অম্বিকা (কালনা), দাঁইহাট প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যগুলিকে জয় করে নিজ শৌর্য বীর্যের পরিচয় দেন। বঙ্গেশ্বর সুজাউদ্দীন কীর্তিচন্দকে খুব খাতির ও সমীহ করতেন। অন্যান্য ছোট ছোট জমিদারগণ তাঁকে এমন ভয় করতেন যে, কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষে না গিয়ে অধীনতা স্বীকার করেছিলেন ও স্বচ্ছন্দে রাজ্য পরিচালনা করতেন। মারাঠা দস্যুদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে তিনি বিষ্ণুপুরাধিপতির সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করেন। ফলে মারাঠাগণ রাঢ় বর্দ্ধমান হতে বিতাড়িত হন। একটি গানে তার পরিচয় আছে—

'জমিদারেরা ছিল দেশে বড়ই অত্যাচারী।
তোমার নামে কাঁপত তারা সদাই থরথরি॥
বর্গীর ভয় হতে রাজা, আমাদের রাখলে যতনেতে।
তোমার সমান দয়াল রাজা, না দেখি ধরাতে॥

বনপাশ কামার পাড়ায় জনৈক কর্মকার ইস্পাতের তরবারি তৈরী করে কীর্তিচন্দকে উপহার দিতে গেলে কীর্তিচন্দ গাঁয়ের তুচ্ছ কামারের নির্মিত বলে তরবারিটি প্রত্যাখান করেন। কিন্তু কর্মকার তাঁর নির্মিত তরবারি দিয়ে রাজপ্রাসাদের সম্মুখের একটি আমগাছকে

দ্বিখণ্ডিত করলে কীর্তিচন্দের চৈতন্য হয় এবং কর্মকারের কাছ থেকে তরবারিটি কিনে নিয়ে এরূপ অস্ত্র প্রস্তুত করতে কীর্তিচন্দ নিষেধ করেন। এই তরবারিটি ছিল তাঁর জীবনের সাথী। কীর্তিচন্দের মায়ের নাম ছিল ব্রজকিশোরী। তিনি মাকে এত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর নাম চিরস্থায়ী করবার জন্য রাণীসায়র খনন করান। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ রাণীসায়রের প্রতিষ্ঠা হয়। সরোবরের দক্ষিণ দিকের ঘাটের সোপানে যে শিলালিপি আছে তাতে তাঁর নাম ও শকাব্দ খোদিত আছে। এই সায়রের পশ্চিম দিকে কীর্তিচন্দের স্ত্রী রাজরাজেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচন্দের মা ব্রজকিশোরী বৃন্দাবন ধামে যান। তথায় মাতৃস্মৃতি বক্ষার্থে রানাপতি ঘাটের পশ্চিমে ইমলিঘাটের সোপান শ্রেণী কীর্তিচন্দ্র নির্মাণ করিয়ে দেন ও তথায় দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দি ভাষায় নিম্নবর্ণিত শিলালিপি খোদিত করান:-

শ্রী রাধাবল্লভ জয়তী

শ্রীবৃন্দাবন অধিকারী, শ্রীব্রজলাল সুত সুন্দর লালজী, শ্রীসম্বৎ ১৭৮৪ নিতি চৈত্র বদি সপ্তমি ইহ্ শুভ ঘাট বন বাও বাংগলা বরদমান চাকলেকে রাজাধিরাজ শ্রীমহারাজ কীর্তিচন্দজী কি মাতা মহা ভাগ্যবতী শ্রীমাতাজীনে শ্রীহরি হরদাস দারগা উস্তাকার শ্রীবৃন্দাবন দাস। মাতা ব্রজকিশোরী মথুরাধাম ও শ্রীক্ষেত্র গেলে সেখানেও প্রস্তর নির্মিত ঘাট ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কীর্তিচন্দ। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রজকিশোরী যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে যান বাংলার সুবাদার মহম্মদ সুজাউদ্দীন খাঁ বঙ্গ ও উড়িষ্যার যাবতীয় চৌকিদার, ঘাটওয়াল ও ফাঁড়িদারদের কীর্তি জননীর রক্ষণাবেক্ষণের যে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, তা নিম্নরূপ:—

মহাম্মদ সা বাদসাহ্গাজি
ফিদবী মামিনল মুল্ক মোহাম্মদ
সুজাউদ্দীন খাঁ বাহাদুর আসাদ জঙ্গ।

মোহরাঙ্কিত।

'বৰ্দ্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দের মাতা পুরুষোত্তমে সমুদ্রস্নান করণার্থে গমন করিতেছেন। অতএব ঘাটোয়াল, চৌকিদার ও ফাঁড়িদারগণ নিজ নিজ সীমা হইতে তাঁহাকে নিরাপদে অপর সীমায় পৌঁছিয়া দিবে এবং পথে তাহার সহিত ১৫ খানি জানানা সওয়ারী, দশখানি মরদানা চৌপালা ও আনুষঙ্গিক লোক গমন করিতেছে। ২৫ রজব, ১১ জুলুস।'

বঙ্গেশ্বরের কাছে কীর্তিচন্দ এমনই সমাদরণীয় ছিলেন। কীর্তিচন্দের পত্নীর নাম রাজরাজেশ্বরী। এই রাজেশ্বরীর গর্ভে চিত্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। কীর্তিচন্দ পিতার মৃত্যু পর ৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন।

কীর্তিচন্দ যে সকল রাজ্য ও জমিদারী যুদ্ধে জয়লাভ করে নিজ রাজ্যভুক্ত করেন তার তালিকা ও বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ নিম্নরূপ:-

রাজার নাম	অধিকৃত রাজ্য বা জমিদারী	বার্ষিক রাজস্ব টাকা
শোভা সিংহ	বরদা (ঘাটাল)	২,৪৫২
	চিতুয়া (মেদিনীপুর)	১৪,১৮৯
রঘুনাথ সিং	চন্দ্রকোণা	৬,০১৪
	বয়রা	৮৮,৭৩৪
কবি ভারতচন্দ্রের পিতা	(ভুরসুট হুগলী)	১,৫৫১
নরেন্দ্রনারায়ণ রায়	মনোহর সাহী	৮৪,৭০৪

কবি, ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় ভুরসুট পরগণার অধিপতি ছিলেন। বৰ্দ্ধমান রাজ কীর্তিচন্দের সঙ্গে বিবাদে নরেন্দ্র সর্বস্বান্ত হন, কীর্তিচন্দ তাঁর রাজ্য জয় করেন। কবির বয়স তখন ১২ বছর। কবি ভুরশুট (হুগলী) থেকে পালিয়ে মাতুলালয়ে চলে যান।

কীর্তিচন্দ বাদশাহ প্রদত্ত ৫৭টি পরগণার মালিক ছিলেন এবং দিল্লীশ্বরকে বার্ষিক ২০, ৪৭, ৫০৬ টাকা রাজস্ব দিতেন। (Fifth report from the select committee of the East India Company).

কীর্তিচন্দের সময়ে (১৭৩৯ খ্রীঃ) মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা (১৭২৭-৩৯ খ্রীঃ) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ ঢাকার নবাব নাজীম ও মেদিনীপুরের রাজা যশোবন্ত সিংহ ঢাকার দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হন। এই সময় সুবে বাংলায় এক টাকায় ৮ মন চাল বিক্রি হত। জিনিষ পত্র সুলভ্য ও সস্তা ছিল। ১৬৬৪-৬৫ খ্রীঃ নবাব শায়েস্তা খাঁর শাসনেও চালের দাম ছিল দু আনা মণ অর্থাৎ টাকায় আটমণ। এসব সুজাউদ্দীন ও কীর্তিচন্দের সুশাসনেরই ফল।

কীর্তিচন্দ জ্ঞানী গুণীর কদর জানতেন। তাঁর রাজসভায় আশ্রিত সভাকবি ছিলেন ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। শিক্ষা প্রসারে কীর্তিচন্দের অবদান অতুলনীয়। রামপ্রসাদ তাঁর 'কালিকামঙ্গল'এ তৎকালীন বৰ্দ্ধমানাধিপতির প্রশস্তি গেয়েছেন:

কল্পতরু ভুল্যভূপ আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশে জনেক
চৌদিকে চৌপাড়িময় পাঠচায় পড়ুয়াচয়
দ্রাবিড় উৎকল কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহোত বাড়ি বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী।

তৎকালীন বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননকে কীর্তিচন্দ খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। তিনি এই পণ্ডিতকে বহু নিষ্কর ভূমি ও ত্রিবেণীতে একটি পুষ্করিণী দান করেন। এছাড়া বহু ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র আতুরকে তিনি অকাতরে বার্ষিক বৃত্তি দিতেন। অম্বিকা কালনার সুপ্রসিদ্ধ বিগ্রহ লালজীর মন্দির পুণ্যবতী ব্রজকিশোরীর স্মৃতি রক্ষার্থে কীর্তিচন্দ নির্মাণ করান ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে। শিলালিপিতে খোদিত আছে:

যৎ পুত্র পৃথিবীতলে সুবিদিত সৎ কীর্তিচন্দ্র কৃতী
সা বাজকুমাবীকা ব্রজকিশোরী কৃষ্ণ ভক্ত্যাথিনী
শাকে সৈকষড়র্ত্তু চন্দ্র গণিতে প্রসাদমেতং দদৌ
রাধাকৃষ্ণায় যুগায সৎকবি সভামধ্যেষু তৎ প্রীতয়ে॥

শকাব্দাঃ ১৬৬১



কীর্তিচন্দ রায়েব সমাধি মন্দির

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে বীরবর কর্মযোগী কীর্তিচন্দের মৃত্যু হয়। দাঁইহাটে গঙ্গার তীরে তাঁকে দাহ করা হয় ও একখণ্ড অস্থি ঐস্থানেই সমাহিত করা হয়। রাজবংশের নিয়ম, প্রথমে শবদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত করে একখণ্ড অস্থি সমাবিষ্ট করা এবং ঐ সমাধিতে প্রতিদিন সন্ধ্যাপ্রদীপ দান করা ও মৃতব্যক্তি যে সব জিনিষ ভালবাসতেন বা খেতেন আহার্য হিসাবে, সেই সব

জিনিষ ঐ সমাধিতে নিবেদন করা। এখনও মহতাবচন্দ বাহাদুরের সমাধিতে চা, তামাক ও বিলাতি সুগন্ধি দ্রব্য দেওয়া হয়, কারণ তিনি এইগুলি ভালবাসতেন ও ব্যবহার করতেন।এই সমাধিকে বলা হয় 'সমাধি সমাজ'। এইরূপ সমাজ দাঁইহাটে ও কালনায় আছে। মহারাজ তেজচন্দ বাহাদুরের মা বিষণকুমারী হতে পরবর্তী রাজবংশের মৃতদের 'সমাধি সমাজ' কালনায় আজও বিদ্যমান। পরবর্তী মহারাজ ও মহারাণীদের অস্থি শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন ধামে সমাহিত করে সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

মোগল পাঠান দ্বন্দ্ব ও তার পরম্পরা

তুজুক-ই-জাহঙ্গীর

বাংলার মোগলদের আগমন ও পাঠানদের সঙ্গে সংঘর্ষ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর (জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী) ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ দুটি গ্রন্থে পাশাপাশি কোন হিন্দু রাজা বা রাজত্বের কোন কাহিনী পাওয়া যায় না। যা তথ্য তা সবই মুসলমান সম্রাট, সুলতান, সুবাদার বা সংশ্লিষ্ট মুসলমান সেনাপতি এবং নবাবের কাহিনী। সম্রাট আকবর ১৫৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা জয় করেন। বাংলার তৎকালীন পাঠান নায়ক সুলেমান কররাণী মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেই রাজ্য পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর (১৫৭২ খ্রীঃ) হতে মোগলদের শিরঃপীড়া সুরু হয়। সুলেমান কররাণীর পুত্র দাউদ খাঁ স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি মোগলদের প্রভুত্ব অস্বীকার করলে আকবর তাঁর পুত্র কুমার সেলিম (জাহাঙ্গীর) ও সেনাপতি মুনিম খাঁকে বিরাট সৈন্যবাহিনী দিয়ে বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন। রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদ খান ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পরাস্ত ও নিহত হন। দায়ুদের পুত্র কতলু বা কুট্রি খাঁ মোঙ্গলকোটে পালিয়ে যান। এদিকে আকবরের অপর সেনাপতি টোডরমল বর্দ্ধমান অবরোধ করে দায়ুদের রাজঅন্তপুর বাসিনী পরিজনদের অবরোধ ও বন্দী করেন। কয়েক বৎসর পর ১৫৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মঙ্গলকোটে পরপর কয়েকটি যুদ্ধে কতলু বা কুট্রি খান পরাস্ত হয়ে মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন ও বশ্যতা স্বীকার করে বেশ কিছুদিন স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করেন। মোঙ্গলকোট এলাকাটি মোগল সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলে এই এলাকার নাম হয়ে যায় 'মোঙ্গল কোট' বা 'মোগল কোট'। কাটোয়া মহকুমার এই এলাকা মঙ্গলকোট, কাশেমনগর, নূতনহাট, কৈচড় প্রভৃতি গ্রামে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য, বহু মসজিদ, দরগা প্রভৃতি সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বর্দ্ধমানে খুররম

কিন্তু মোগলদের সঙ্গে পাঠানদের যেন জাতিগত বিদ্বেষ ছিল। অন্ততঃ রাঢ়ের ইতিহাস সে কথাই বলে। তাই কতলু বা কুট্রি খান বেশ কিছুদিন বর্দ্ধমানে রাজত্ব করার পর বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আকবরের সময়ে টোডরমল, মুনিম খাঁ ছাড়াও পাঠানদের দমন করতে সেনাপতি মানসিংহ ও যুবরাজ সেলিমকে (জাহাঙ্গীর) বাংলায় আসতে হয়েছে। মানসিংহ বাংলার সুবাদার ছিলেন অল্প কয়েক বছরের জন্য ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে আবার সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায়

পাঠান বিদ্রোহ দমন করার জন্য যুবরাজ খুরম (শাহজাহান) কে (১৬২৪-১৬৫৮ খ্রীঃ) বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে। বর্দ্ধমান শহরের সন্নিকটে গড়ের দুর্গের যুদ্ধে শূর বংশীয় পাঠান সর্দ্দারদের যুবরাজ খুরম পরাস্ত করে বর্দ্ধমান শহর দখল করেন। এই সময় বৈকুণ্ঠপুরের অধিবাসী বর্দ্ধমান রাজের পূর্বপুরুষ পাঞ্জাব কোটলির কাপুর ক্ষত্রিয় আবুরায় যুবরাজকে সৈন্যদের খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। পরবর্তীকালে খুরম অর্থাৎ শাহজাহান দিল্লীর মসনদে আরোহণ করার পর বন্ধুত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ আবু রায়কে শহরের রেকাবি বাজার ও মোগলটুলির কোতোয়াল ও চৌধুরী পদ দান করেন। শাহজাহান বাংলায় পাঠানদের কড়াহাতে মোকাবিলা করার জন্য তাঁর চার পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র সুজাকে (১৬২৮ খ্রীঃ) বাংলার সুবাদার করে পাঠান। এই সময় বর্দ্ধমানের শাসনকর্তা ছিলেন মোগলদের অনুগত খলিপা হাকিম। রূপরাম চক্রবর্তীর কাব্যে দেখা যায়:—

রাজমহলের মধ্যে যবে ছিলা সুজা।
পরম কল্যাণে যত আছিল সব প্রজা॥
বর্দ্ধমানে যবে ছিলা খালিপা হাকিম।
তার পরাজয় হৈল দক্ষিণে মহিম॥
সেই হতে গীত গাই আসর ভিতর।
দ্বিজরূপরাম গান শ্রীরামপুরে ঘর॥

কিন্তু হাকিম ও শেষপর্যন্ত অন্যান্য পার্শ্ববর্তী পাঠান সর্দ্দারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মোগলদের হাতে বর্দ্ধমানের দক্ষিণ উপকণ্ঠে পরাজিত হন। ইতিমধ্যে শাহজাহানের মৃত্যু হলে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে চারপুত্রের মধ্যে লড়াই হয়। দিল্লীর পথে পথিমধ্যে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক সুজা নিহত হন। আওরঙ্গজেব মসনদ অধিকার করে তাঁর বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁকে (১৭১৭-২৭ খ্রীঃ) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা ও উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার সুজাউদ্দীন (১৭২৭-১৭৩৯) ১৩ বৎসর ধরে বাংলার শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। সুজাউদ্দীন সুশাসক সুবাদার হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর সময়ে জিনিষপত্রের মূল্য অত্যন্ত সস্তা ও সুলভ ছিল। বঙ্গে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

বাংলার পাঠান সর্দারগণ বারে বারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাতে বর্দ্ধমান শাসনকর্তার সব সময়ে একটি ভূমিকা থাকত। ঢাকা-ময়মান সিংহের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, রায়গঞ্জের কন্দর্প নারায়ণ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য রায় প্রভৃতি বিখ্যাত বারভুঁইঞাগণ মোগলদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। যুবরাজ খুররমকে এই বিদ্রোহ দমন করতে কখনও বর্দ্ধমান, কখনও ঢাকায় ছুটে আসতে হয়েছে। পুত্রের এই কৃতিত্বের জন্য পিতা জাহাঙ্গীর খুররমকে দুর্লভ 'শাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

'Prince Khurram was loaded with honers and presents and having been ennobled with the title of sah' [Rulers and great leaders by Dr. B. P. Saksena Page 155.] জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীঃ) দিল্লীর মসনদে বসে এই বিদ্রোহ দমনে অধিকতর মনোনিবেশ করেন। ১৬৩০ খ্রীঃ হুগলিতে পর্তুগীজেরা বিদ্রোহী হলে শাহজাহান কাসিম খানকে বিদ্রোহ দমন করতে বর্দ্ধমানে পাঠান। তখন হুগলি ছিল বর্দ্ধমানের অন্তর্গত। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে পর্তুগীজরা প্রথম বাংলায় আসে ও হুগলিতে বণিজ্য করার জন্য ছাউনি ফেলে। পর্তুগীজরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উপর বেশি শুল্ক ও বিক্রয় কর আদায় করত এবং না দিলে জুলুম করত। পর্তুগীজদের শায়েস্তা করতে শাহজাহান কাসিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তাছাড়া পর্তুগীজরা মমতাজ মহলের দুই বাঁদীকে অপহরণ করায় এই দ্বিবিধ কারণে কাসিম খান হুগলিতে পর্তুগীজদের অবরোধ করেন। বহু পর্তুগীজ যুদ্ধে নিহত হয় ও অনেককে বন্দী করে আগ্রায় চালান দেওয়া হয়। The Portuguese had Shown much audacity in seizing two Slave girls belonging to Mamtaj Mahal * * * soon after his accession, the emperor appointed Quasim Khan as Governer of Bengal in 1631 and ordered him to take steps to exterminate the infields (Mughal Empire by Iswari Prasad Page- 880.) কাসিম খানের সঙ্গে তাঁর পুত্র ইনায়েৎ উল্লা এবং অপর সেনাপতি বাহাদুর কাম্বু বাংলায় পর্তুগীজদের দমন করার জন্য আসেন। বর্দ্ধমানের শাসনকর্তা শের আফগানের বেগম নূরজাহানের ভাই আসফখানের কন্যা আরজুমন্দ বানুর সঙ্গে যুবরাজ খুরমের (পরে শাহজাহান) শাদি হয় ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে এবং শের আফগানের ঔরসজাত নূরজাহানের কন্যা লায়লী খানের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠপুত্র শাহরিয়ারের শাদি হয়। আসফখানের কন্যা আরজুমন্দ বানুর জন্ম হয় সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্গত জর্জিয়ায়। ইনিই পরে শাহজাহানের প্রেয়সী মমতাজ বেগম নামে খ্যাত হন।

মোগল ও পাঠানের মুসলিম সংস্কৃতি জেলায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। মঙ্গলকোটের অধিবাসী ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত আব্দুল হামিদ খুররমের শিক্ষা গুরু ছিলেন। বর্দ্ধমানে থাকাকালীন খুররম আব্দুল হামিদের কাছে ফারসী শিখতেন। খুরম যখন সম্রাট শাহজান রূপে দিল্লীর মসনদে বসেন তখন গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ মঙ্গলকোটে একটি সুন্দর মসজিদ (দানেশখন্দ মসজিদ) নির্মাণ করেন। শুধু তাই নয়, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে শাহজাহান আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণের আগে খুরম নিজে এই পণ্ডিত গুরু আব্দুল হামিদের আশীর্বাদ নিতে এসেছিলেন নানুর থানার অন্তর্গত

অজয়ের তীরে জাহানাবাদে। আব্দুল হামিদ তখন মঙ্গলকোট থেকে চলে গিয়ে ঐ স্থানে আশ্রম করেছিলেন। লোকে এই বিখ্যাত পণ্ডিতকে আব্দুল হামিদ বাঙালি বলে ডাকতেন। কারণ পাঠান ও মোগলদের থেকে তাঁকে পৃথক করে বাঙালি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর ঐ নামকরণ করেছিলেন– এটা বোঝাতে যে তিনি পাঠান বা মোগল ছিলেন না।

বর্দ্ধমান জেলার ও শহরের বহুস্থানে মোগল পাঠানের সংঘর্ষের স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে গ্রামের নামের মধ্যে। যেমন– মোগলমারি, আলমগঞ্জ, আমিলাবাজার, আলমপুর, কাসেমনগর, মঙ্গলকোট, জাহানাবাদ, খাজা আনোয়ার বেড, করিমপুর, নসরৎপুর ইত্যাদি। শহরের মধ্যে রয়েছে– পীরবাহারাম, ডাঙ্গাপাড়ায় পাঁচজন পাঠান শহীদের মকবেরা, সে যুগের ঘোড়াশহীদ, দো-ঘোড়াশহীদ– তেমনি নাম খোকড়াশহীদ, বর্দ্ধমানের তেঁতুলতলা বাজারে রয়েছে লস্করদীঘি (আগের নাম লস্কর গঞ্জ), শহীদ আনোয়ার বেড়, মিঞাবেড়, আলমগঞ্জ ইত্যাদি।

পাঠান যুগে বর্দ্ধমানের নাম ছিল শরিফাবাদ,শব্দের (মানচিত্রে বিবর্তন দ্রষ্টব্য) অর্থ সম্ভ্রান্ত। অর্থাৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রণী বহু মুসলমান পরিবার বর্দ্ধমান অলঙ্কৃত করেছিলেন। সেই সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতিতে সম্পন্ন ব্যক্তিগণও ছিলেন বর্দ্ধমান আলোকিত করে। জেলার সর্বত্র মোগল ও পাঠান শাসনকর্তাদের দৌলতে শরিফগণ ছড়িয়ে পড়েন। শরিফগণের মধ্যে ছিলেন আরবি ও ফারসী ভাষায় পণ্ডিত, মৌলবী, পীর, ফকির, উকিল, মুফতি (বিচারক) গণ। সে সময় মুসলমান মুফতি (বিচারপতি) গণের উচ্চ প্রশংসা করেছেন অনেকেই। রাজা রামমোহন রায় মুফতিদের (বিচারপতিদের) বিচার নিরপেক্ষ ও উচ্চ শ্রেণীর বলে মন্তব্য করেছেন। 'Questions and Answers on the Judicial system of India were superb.' (History of Political thought by B Majumder Page– 389-90) বহু হিন্দুও সরকারী পদের জন্য ফারসী শিখতেন এবং সুলতান ও বাদশাহের অধীনে কাজ করতেন। ধীরে ধীরে ব্যাপারটি সহজ হয়ে আসে। হিন্দু ও মুসলমানের সহাবস্থানের মধ্যদিয়ে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে।

বহু হিন্দু কারিগর মুসলমান শাসকের নির্দ্দেশে মসজিদ, প্রাসাদ, মকবেরা নির্মাণ করেন, তেমনি বহু মুসলমান শিল্পীও হিন্দুদের মন্দির ও প্রাসাদ নির্মাণ করতে সুরু করেন। প্রসিদ্ধ কবি আমির খসরুর রচনায় ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। সিকান্দার লোদীর সংস্কৃত গ্রন্থেব ফারসী অনুবাদ, নসরৎ শাহ কর্ত্তৃক সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবেদিনের (১৪২০-১৪৭০ খ্রীঃ) মহাভারত ও রাজতরঙ্গিনীর সর্বপ্রথম ফারসী ভাষায় অনুবাদ এই সম্প্রীতির পরিচয় বহন করে।

বর্দ্ধমানে শেরশাহ

বর্দ্ধমান শহরের পুরাতনচক এলাকায় দিল্লীর শাহেন শা শেরশাহ্র 'কালো মসজিদ' টি প্রমাণ করে যে শেরশাহ্ বর্দ্ধমানে এসেছিলেন। হিজরি ৯৫০, ইংরাজী ১৫৩৭ খ্রীঃ এটি নির্মিত হয়। ১৫৩১ খ্রীঃ হুমায়ুন শেরশাহের চুনার দুর্গ আক্রমণ করলে শেরশাহ বাংলায় এই বর্দ্ধমানে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন এবং সাময়িকভাবে হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করে ভিতরে ভিতরে বিহার ও বঙ্গে সৈন্য সংগ্রহ্ করে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। পরে যখন শেরশাহ্ হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন সেই সময় আত্মগোপনের স্বীকৃতি স্বরূপ 'কালো মসজিদ' নির্মাণ করেন। (পুরাসম্পদ ও ভাস্কর্য দ্রষ্টব্য) শাসনকার্যে শেরশাহ্ই প্রথম বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন।

প্রদেশকে কয়েকটি পরগণায়,. আবার পরগণাকে কয়েকটি গ্রামে ভাগ করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন শেরশাহ্। বর্তমান পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তক তিনি। কেন্দ্রে দিওয়ান ই ওজারত (রাজস্বমন্ত্রী), দিওয়ানই তারিজ (সেনামন্ত্রী), দেওয়ান-ই রোয়ালত (পররাষ্ট্রমন্ত্রী), দেওয়ান-ই-ইনসা (দলিল দস্তাবেজ মন্ত্রী) প্রভৃতি শাসনকার্যের শ্রেণীবিভাগ ও তদনুযায়ী মন্ত্রক শেরশাহের অমর কীর্তি। সম্পত্তির জন্য প্রজাদের কবুলিয়তি ও সরকারের দেয় পাট্টা তিনিই প্রবর্তন করেন। বর্দ্ধমানের গ্রামে গ্রামে বহু পুরাতন পরিবারে এই কাগজ আজও দেখতে পাওয়া যায়। জমির উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের একভাগ ছিল খাজনা। যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য পথ শেরশাহ্ সড়ক বা জি. টি. রোড বর্দ্ধমান জেলার মাঝামাঝি চলে গেছে বিহার, উত্তর প্রদেশ হয়ে দিল্লী। শেরশাহের এই মহান কীর্তির জন্য বর্দ্ধমান আজ গর্বিত।

খাজা সৈয়দ আনোয়ার ও খাজা আবুল কাসেম

সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে ঔরঙ্গজেবের পুত্র শাহ্ আলম বাহাদুর শাহ্ উপাধি নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসেন (১৭০৭-১৭১২ খ্রীঃ)। মাত্র ছ বৎসর রাজত্ব করার পর বাহাদুর শাহ্র মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র আজিম উশ-শান তখতে তাউসে বসেন। কিন্তু তিনিও তার আত্মীয় দ্বারা নিহত হলে মাত্র এক বছরের জন্য বাহাদুর শাহের অপর পুত্র জাহানদার শাহ্ সম্রাট হন। অবশেষে জাহানদার শাহকে খুন করে মৃত ভ্রাতা আজম-উশ-শানের পুত্র ফারুক-সিয়ার (১৭১৩-১৭১৯ খ্রীঃ) দিল্লীর মসনদে বসেন। দিল্লীর এই গৃহ্ বিবাদ ও মসনদ দখলের লড়াই নিয়ে যখন ঔরঙ্গজেবদের বংশধরগণ ব্যতিব্যস্ত, সেই সময় বর্দ্ধমানে পাঠান সর্দ্দারগণ পুনরায় মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ঘোষণা করেন। এঁদের নেতৃত্ব দেন পাঠান সর্দ্দার রহিম খান। দিল্লীর শাহেন শা ফারুক সিয়ার বিদ্রোহ দমন করতে বর্দ্ধমান পাঠালেন বিশ্বস্ত সেনাপতি সৈয়দ আনোয়ার ও খাজা আবুল ক্বাসেমকে। পাঠান সর্দ্দার রহিম খানের সঙ্গে মূলকাঠিতে তুমুল যুদ্ধ হল আনোয়ার ও কাসেমের সম্মিলিত মোগলবাহিনীর সঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে পাঠান সর্দার রহিম খাঁ বাংলার পাঠান সর্দারদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শক্তি সুসংহত করে বাংলার সুবাদারী দখল করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এ সংবাদে দিল্লীশ্বর ফারুক সিয়র বিচলিত হন ও বিদ্রোহ দমন করে রহিম খাঁকে চূর্ণ করতে খাজা আনোয়ার ও খাজা আবুল কাসেমকে বর্দ্ধমানে প্রেরণ করেন। বর্দ্ধমানের বীরবর কীর্তিচন্দ তখন উদিত সূর্য, তিনিও মোগল সম্রাটকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। 'মূলকাঠির' যুদ্ধে রহিম খাঁ পরাজয় অনিবার্য জেনে কৌশলের আশ্রয় নেন। হঠাৎ তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধি প্রস্তাব পাঠান। যুদ্ধ থেমে গেল। সৈয়দ আনোয়ার ও আবুল কাসেম ছিলেন সাধু প্রকৃতির। পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে সৈন্য বাহিনীকে নিরস্ত্র করলেন তাঁরা। কিন্তু রহিম খাঁ সেই রাত্রেই গুপ্তঘাতক সঙ্গে নিয়ে শিবিরের মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় আনোয়ার ও কাসেমকে হত্যা করেন। বিশ্বাসঘাতকতার শিকারে নিহত হলেন এই দুই সাধক প্রবর সেনাপতি (১৭২৭ খ্রীঃ), উভয়েই শহীদ হলেন রাঢ় বর্দ্ধমানের মাটিতে। রহিম খাঁ যে স্থানে অবস্থান করেছিলেন, 'ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক' বা মূলকাঠি যে তিনিই সে কথা বোঝাতে স্থানের নাম হয় মূলকাঠি।

এই দুঃসংবাদ দিল্লীর সম্রাট ফারুক সিয়ারের কাছে পৌঁছালে দিল্লীশ্বর আরও প্রচুর সৈন্য সামন্ত নিয়ে বর্দ্ধমানের উত্তর উপকণ্ঠে ছাউনি ফেলেন। পাঠানদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে স্থানীয় জনসাধারণ ও বর্দ্ধমান মহারাজ যুদ্ধে মোগল সৈন্য ও ঢাকার নবাব সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করেন। বর্দ্ধমানের উত্তর উপকণ্ঠে যে স্থানে নবাব সৈন্য ছাউনি ফেলে সেই স্থান নবাবহাট নামে খ্যাত। সৈন্য বাহিনীর খাদ্যদ্রব্য, শাকসব্জি কেনাবেচার জন্য এই অঞ্চলে বিরাট হাট বসে যায়। মোগল বাহিনী, নবাব বাহিনী ও কীর্তিচন্দ বাহিনীর সাঁড়াশি আক্রমণে পাঠান সর্দ্দারগণ পরাস্ত হন ও রহিম খান নিহত হন।

ফারুক সিয়র বর্দ্ধমান শহরের বেড় এলাকায় স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করান সৈয়দ অনোয়ার ও খাজা আবুল কাসেমের প্রতি সম্মান দেখিয়ে। (পুরাসম্পদ ও ভাস্কর্য দ্রষ্টব্য)

চিত্রসেন রায় (১৭৪১ খ্রীঃ-১৭৪৪ খ্রীঃ)

কীর্তিচন্দের পুত্র চিত্রসেন রায়ই সর্বপ্রথম দিল্লীর বাদশাহ মোগল সম্রাট মহম্মদ

শাহ্ কর্তৃক 'রাজা' উপাধি লাভ করেন (১৭৪১ খ্রীঃ)। এই সংক্রান্ত যে ফরমান ও পরোয়ানা দেখা যায় তার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

১৭২৯ খ্রীঃ দেওয়ান সরফরাজ খাঁর মোহর ও কাজি মহম্মদ ওয়ালি স্বাক্ষরিত পরোওয়ানার মর্ম:—

বঙ্গদেশে সুবার এলাকাস্থ মহাল খালেসা শরিফা চাকলে বর্দ্ধমান সরকার সালিমাবাদের ইন্দ্রায়ণ পরগণার পূর্ব জমিদার রামভদ্র চৌধুরী দিগের পরিবর্তে ১১৩৪ সাল হইতে সরকারের প্রাপ্য নজরানা ও বকেয়া রাজস্ব গ্রহণে, কীর্তিচন্দের পুত্র চিত্রসেনকে উক্ত পরগণা প্রদত্ত হইল। সরকারী রাজস্ব যথা-সময়ে রাজধনাগারে প্রদান করেন। সকলের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করতঃ দেশ মধ্যে যাহাতে দস্যু ও তস্করের উপদ্রব না হয় তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইবেন। সন ১০, জুলুস, তারিখ, ১০ রবিয়স, ও সানি"

১৭৩১ খ্রীঃ (মহম্মদ শাহ্ বাদসাহ্ গাজি ফিদবী নসরৎ জঙ্গ এতেমাদতদ্দৌলা উজিরল মোমালেক কমরদ্দিন খাঁ বাহাদুর)। মোহরাঙ্কিত পরওয়ানার মর্ম্ম:—

"যেহেতু বাদশাহের হুজুর হইতে জমিদারী ও রাজা উপাধি পারচা— খেলাত এবং এক জোড়া মুক্তা রাজা চিত্রসেনকে প্রদান করা হইয়াছে। তজ্জন্য বাদশাহকে ধন্যবাদ প্রদান করতঃ তাঁহার চিরানুগত থাকাই কর্তব্য ইত্যাদি। ১৫ সওয়াল ১২ জুলুম"

রাজা চিত্রসেন এইরূপ ১২ খানি ফরমান, সনদ ও পরোয়ানা পেয়েছিলেন। তার মধ্যে মণ্ডল ঘাটের জমিদার জগন্নাথ চৌধুরী দিগের পরিবর্তে মহাল খালেসা শরিফা মোতালেক চাকলে শালগ্রাম চিত্রসেনকে অর্পণ করেন সরফরাজ খাঁ, আর্শার পূর্ব জমিদার গোবিন্দদেবের পরলোকগমনে উক্ত জমিদারী চিত্রসেনকে প্রদান করেন আলীবর্দি খাঁ মহব্বত জঙ্গবাহাদুর, গোয়ালপাড়ার সামিল পরগণে ব্রাহ্মণভূমির জমিদার ত্রিলোচনের অসদ্ব্যবহারে প্রজাগণ উৎপীড়িত হওয়ায় এবং যথাসময়ে সরকারের রাজস্ব পরিশোধ না করে পলায়ন করার বিবরণ সদরের কানুনগো ইন্দ্রজিতের আবেদন পত্রে প্রকাশ হওয়ায় উক্ত পরগণা ত্রিলোচনের পরিবর্তে চাকলে বর্দ্ধমানরাজ চিত্রসেনকে প্রদান করেন আলীবর্দ্দি খাঁ বাহাদুর।

রাজা চিত্রসেনকে যে ফরমানে প্রথম রাজা উপাধি দেওয়া হয়, তার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

১৭৪০ খ্রীঃ কীর্তিচন্দের পরলোক গমনের পর দিল্লীর বাদশাহ্ আবল ফতাহ্ নাসিরুদ্দীন মহম্মদ বাদশাহ গাজি যে ফরমানে রাজা উপাধি দান করেন তার মর্ম্মার্থ:—

"এই শুভ সময়ে ওমদতল মূলক বকসীয়াণ মোমালেক আমিরল ওমরা

সমসামদ্দৌলা খান দৌরাণ খাঁ বাহাদুর মনসুর জঙ্গের নিবেদনানুসারে মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ প্রথম ফরমানে প্রচার হইল যে বঙ্গদেশের সুবার এলাকাস্থ চাকলে বর্দ্ধমান ওগয়রহার জমিদার কীর্তিচন্দ পরলোকগমন করায় তদীয় পুত্র চিত্রসেনকে রাজা উপাধি সহ জমিদারী প্রদত্ত হইল ইত্যাদি। ১০ রমজান ২১ জুলুস।”

চিত্রসেন একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তাঁর প্রশাসন গুণে সুবা বংলার নবাব ও দিল্লীশ্বর বাদশাহ্ খুব প্রীত ছিলেন। তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকটও বর্দ্ধমান মহারাজার খুব সম্মান ছিল। পিতা বর্তমান থাকতেই রাজা চিত্রসেন ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দ্রাণী পরগণা, ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের কাছে রাজা উপাধি লাভ এবং ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মণ্ডলঘাট পরগণার সনদ পেয়েছিলেন। তৎকালে মণ্ডল ঘাট ও আরশা পরগণার বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা রাজস্ব ধার্য ছিল। রাজা চিত্রসেনের ফরমান গুলি থেকে দেখা যায় যে বাদশাহ্ গাজির নির্দেশ অনুযায়ী চোর, ডাকাত ও দস্যু তস্করের উপদ্রব বন্ধ করা ও মাদক দ্রব্য বর্জন করা ছিল জরুরী। এছাড়া কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন ও দুষ্টদের শাস্তি বিধানও ছিল অন্যতম। পথিকগণ যাতে নির্বিঘ্নে পথে যাতায়াত করতে পারেন তার নির্দেশও থাকত এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার পূর্ণ ক্ষমতা বর্দ্ধমান রাজাকে দেওয়া হয়েছিল। আর একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, তা হলো বাংলার সুবা ও দিল্লীর বাদশাহর সঙ্গে কেবল রাজস্ব আদান-প্রদান ছাড়া বর্দ্ধমানরাজের আর কোন সংশ্রবই ছিল না। সুবাদার বা বাদশাহ্ কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। বর্দ্ধমান রাজার রাজত্ব ছিল করদরাজ্যের মত। চিত্রসেন তাঁর বিরাট রাজত্ব বর্দ্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর ও উত্তর সীমান্তে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম এবং পূর্ব প্রান্তে গঙ্গাতীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা স্বাধীন ভাবে করদ রাজ্য হিসেবেই শাসন করতেন এবং তিনিই বিভিন্ন অধস্তন কর্মচারী নিয়োগ করতেন এবং নজরানা আদায় করতেন। চন্দ্রকোনা, বরদা, চিতুয়া, ভুরশুট, রাজগণের কাছ থেকে তৎকালে কোন জমিদার বাদশাহের বিনানুমতিতে অন্য অধঃস্তন প্রজা বা জমিদারের কাছ থেকে নজরানা গ্রহণ করতে পারতেন না। ব্যতিক্রম বর্দ্ধমান মহারাজ রাজা চিত্রসেন। বঙ্গেশ্বরের কোষাগারে বার্ষিক ২২ লক্ষ ৫১ হাজার ৩০৬ টাকা রাজস্ব এবং জায়গীর তহফির বাবদ বার্ষিক ১৯ হাজার ১৬৬ টাকা জমা দিতেন। কীর্তিচন্দের রাজত্বের আয়তনের সঙ্গে চিত্রসেন যোগ করেন বীরভূম, পঞ্চকোট ও বিষ্ণুপুরের কিয়দংশ। ঐ সব রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে চিত্রসেন বিজয়ী হন ও তাঁর রাজ্যকে প্রসারিত ও স্ফীত করেন। চিত্রসেন রাজগড়ে একটি দুর্গ তৈরী করেন। বীরভূমের প্রান্তে কাঁকসা থানার অন্তর্গত অজয় নদীর তীরেও একটি দুর্গ নির্মাণ করান— সেটি সেন পাহাড়ি নামে পরিচিত।

In the Garh Jungles near Senpahari in the Kanksa thana are ruins of a fort said to have been built by Raja Chitra Sen.

– Imperial Gazetteer-Vol IX– 1908

রাজা চিত্রসেনের দুই পত্নী—প্রথম রাণী ছন্দ কুমারী, পিতা ঘাসীরাম সেট তলোয়ার, পিতামহ পরাণ চন্দ সেট তলোয়ার। এই সেট তলোয়ার পরিবার পাঞ্জাব থেকে এসে মুর্শিদাবাদে বসবাস সুরু করেন। দ্বিতীয় রাণী কুমারী ইন্দ্রকুমারী, পিতা ধরমচন্দ মেহেরা। মেহেরা পরিবার কানপুর থেকে এসে অম্বিকা কালনায় বসবাস করেন। এই দুই রাণীই নিঃসন্তান ছিলেন। ১৭৪০ খ্রীঃ রাজা চিত্রসেন অম্বিকাতে শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সেই সময় প্রায়ই বর্গীর দল অতর্কিতে লুণ্ঠন করে চলে যেত। তারা ঝড়ের বেগে আসত , ঝড়ের বেগে চলে যেত। তাই চিত্রসেন বিভিন্নস্থানে গড় নির্মাণ করে দুর্গের ভিতর থেকে মারাঠা বর্গীর উপর আক্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন। গড় সেন পাহাড়ি (কাঁকসা থানায়), গড় তালিত (বর্দ্ধমান উত্তর ব্লকে), শক্তিগড়, অমরার গড়, গড় মান্দারণ (আরামবাগ) তারই স্মৃতি বহন করছে। প্রত্যেক গড়েই দুর্গের প্রাকারে তোপ বসান থাকত।

রাজা চিত্রসেনের অনেকগুলি কামান এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে। তোপগুলির গায়ে ফারসী ভাষায় রাজা চিত্রসেনের নাম খোদাই করা আছে। হাওড়া জেলার বিখ্যাত চিত্রসেনপুর গ্রাম ইনিই স্থাপন করেন। নবদ্বীপ রাজসভা পরিত্যাগ করে গুপ্তিপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বর্দ্ধমান রাজসভা পণ্ডিতের আসন অলংকৃত করেন।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করার পর চিত্রসেন রাস পূর্ণিমার আগের দিন প্রয়াত হন। রীতি অনুসারে দাঁইহাট গ্রামে তাঁর সমাধি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন তাই তাঁর পিতৃব্য মিত্ররামের পুত্র তিলক চন্দই বর্দ্ধমান রাজ সিংহাসনে বসেন।

বর্গীর হাঙ্গামা

কীর্তিচন্দের সময় থেকেই মারাঠা বর্গীর দল রাঢ় বর্দ্ধমানে অতর্কিতে হামলা সুরু করে। বিষ্ণুপুরাধিপতির সঙ্গে একজোটে কীর্তিচন্দ এই মারাঠা দস্যুদের মোকাবিলা করেন ও বর্গীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। কিন্তু ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রসেন রায় সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বর্গীরা আবার হামলা সুরু করে। মারাঠা অধিনায়ক রঘুজি ভোঁসলের অধীন চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী ফৌজ উড়িষ্যা ও বাংলার

বহু এলাকা বার বার হানা দিয়ে বিধ্বস্ত করে। বীরভূম, রাঢ় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট বার বার আক্রান্ত হয়। বর্গীরা সময়ে, অসময়ে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী জনপদ আক্রমণ ও অবাধ লুন্ঠন করত। তাদের আক্রমণে গ্রাম, শহর শ্মশান হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ মারাঠাদস্যুদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ওঠেন। শুধু লুন্ঠন নয়, ব্যাপক নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ ও নারীদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। বর্দ্ধমান আজও যেমন সেদিনও ছিল শস্যভাণ্ডার। তাই পার্ব্বত্য ও অনুর্বর এলাকা মহারাষ্ট্র থেকে হাজারে হাজারে লুটেরা ঘোড়সওয়ার এই বাংলায় ছুটে আসত পঙ্গপালের মত। বর্গীদের অত্যাচারে রাঢ় বর্দ্ধমান শ্মশান হয়ে যায়, ধানের গোলা নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন রাঢ় বর্দ্ধমানেও চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং অনাহারে, অর্ধাহারে বহু লোক মারা যায়। কেউ কেউ খাদ্যের অভাবে পশুর মত গাছের পাতা, মূল, শিকড় খেয়ে জীবন ধারণ করে। উত্তরে রাজমহল হতে দক্ষিণে মেদিনীপুর ও ধলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মারাঠাদের আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত হয়। মারাঠারা খাদ্যদ্রব্য না পেয়ে শেষকালে গৃহস্থ পরিবারের নাক, কান ও হাত কেটে নিত। এই নির্মম ও নিষ্ঠুর আক্রমণে ছেলে, বুড়ো, মহিলা কেউই নিস্তার পেত না। In the begining of the 18th Century the Marathas made their appearance at Katwa and for the next fifty years the District suffered severely at their hands, the inhabitants frequently leaving their villages and seeking a refuge in the swamps. In 1760 the Dist of Burdwan together with Midnapore and Chittagung was ceded to the East India Company by Mirkashem Khan on the deputation of Mirjhafr khan from the Governership of Bengal– Imperial Gazetteer– IX Vol.

গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ জাল পুঁথি হলেও এতে যে চিত্র আছে তা দ্রষ্টব্য :

তবে সব বরগি গ্রাম লুটতে লাগিল
যত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পালায় পুঁথির ভার লইয়া।
সোনার বাহনা পলায় পুঁথির ভার লইয়া।
গন্ধ বণিক পলায় দোকান লইয়া জত
তামা পিতল পলায় কাঁসারি পলায় কত।
শঙ্খ বণিক পলায় করাত লইয়া জত
চতুর্দিকে লোক পলায় কি বলিব কত।

বর্গীর আক্রমণে দেশ ছেড়ে তৈজসপত্র এবং সোনাদানা নিয়ে বহু লোক পালিয়ে যায় গঙ্গার ওপারে। বাংলার নবাব তখন আলীবর্দ্দি খাঁ।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গোটা বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও সেখানে এক স্বাধীন নবাব বংশের উদ্ভব হয়। এই স্বাধীন নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত দেওয়ান মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭১৭ খ্রীঃ—১৭২৭ খ্রীঃ)। মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁর রাজধানী রাজমহল থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। মুর্শিদের নামানুযায়ী রাজধানীর নাম হয় মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদকুলি খাঁ ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দীন (১৭২৭খ্রীঃ-৩৯ খ্রীঃ) বাংলার মসনদে বসেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সরফরাজ খাঁ (১৭৩৯-৪০ খ্রীঃ) বাংলার মসনদে বসেন। অনভিজ্ঞ ও বিলাসপ্রিয় এই তরুণের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সুজাউদ্দীনের অনুগ্রহপুষ্ট বিহারের সহকারী শাসনকর্তা আলিবর্দ্দি খাঁ এক ষড়যন্ত্র করেন এবং গিরিয়ার যুদ্ধে চক্রান্ত করে সরফরাজ খাঁকে (১৭৪০ খ্রীঃ) নিহত করেন ও বাংলার মসনদ দখল করেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) একজন সুদক্ষ প্রজাহিতৈষী নবাব ছিলেন। তিনি বিহারের বিদ্রোহী আফগান ও মারাঠা দস্যুদের প্রতিহত করেন। তাঁর রাজত্বকালে এগারো বছর ধরে বারংবার বর্গীর আক্রমণে বাংলার বুকে নেমে আসে চরম হতাশা ও নৈরাজ্য। আলিবর্দ্দি শেষকালে মারাঠা দস্যুদের এঁটে উঠতে না পেরে কাটোয়া দুর্গে আশ্রয় নেন।

কিছুদিন শক্তি সঞ্চয় করে নবাব আবার কাটোয়ার যুদ্ধে (১৭৪২ খ্রীঃ) মারাঠাদের মুখোমুখী হলেন। সেই যুদ্ধে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত পরাজিত হয়ে সৈন্যদল সহ পঞ্চকোটের দিকে পালিয়ে যান। মুর্শিদাবাদের নবাবকে ছেড়ে দিয়ে মেদিনীপুর, চন্দ্রকোণা ও বিষ্ণুপুরে মারাঠাগণ আবার লুণ্ঠন চালাতে লাগল। শেষকালে ১৭৫১ খ্রীঃ নবাব এদের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। সন্ধির চুক্তি অনুযায়ী নবাবকে কটক শহর ছেড়ে দিতে হয় ও বছরে বারো লাখ টাকা চৌথ দিতে হয়। বর্গীর অত্যাচারের কাহিনী এখনও গ্রাম বাংলার মা বোনের মুখে মুখে গান ও ছড়ায় শুনতে পাওয়া যায়:—

ছেলে ঘুমোল, পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?

'ছেলে ঘুমোল, পাড়া জুড়ুলো'— এই আতঙ্কজনিত ছড়া রাঢ় বর্দ্ধমানের কলঙ্ক। এ অপবাদ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে রাঢ়বাসীদের বলবীর্যই শেষকালে বর্গীর অত্যাচার স্তব্ধ করে দিয়েছিল। চৌথা দেবার চুক্তি হলেও ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পর রাঢ়ের রাজন্যবর্গ এই চৌথা দিতে অস্বীকার করেন। 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' তার উল্লেখ আছে। মারাঠা

নায়ক যখন পত্র দিয়ে হুমকি দেন, চৌথা না দিলে যুদ্ধ করব:—

চৌথাই না দিবে যবে, যুদ্ধ করিব তবে
এই কথা বোল যাইয়া তারে।

তখন রাঢ় বর্দ্ধমানের ক্ষাত্রশক্তি উদ্দীপ্ত হয়ে উত্তর দিয়েছিল:

আমরা যতেক লোক মারিব বর্গীকে
দেশে যেন আইস্তে না পারে
বরগী সব মারিব দেশে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে।

এই সময় বর্গীদের প্রতিরোধে গ্রামে গ্রামে আখড়া গড়ে ওঠে। সেখানে যুবক যুবতীগণ লাঠি, ছোরা ও অসি চালনা শিখত। অবস্থাপন্ন ও জমিদারগণ এই সব আখড়ার খরচ যোগাতেন এবং বেতন দিয়ে প্রশিক্ষণের জন্য কুস্তিগীর ও অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত করতেন। জমিদারগণ বেশীরভাগই বন্দুক ব্যবহার করতেন। বর্দ্ধমানরাজ ঐ সময় বর্গীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য অনেকগুলি উঁচু উঁচু টাওয়ার বা স্তম্ভ নির্মাণ করান। বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে এইরকম টাওয়ারেব ভগ্নাবশেষ আজও সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকেই বর্গীদের প্রতিরোধে বন্দুক ব্যবহৃত হয়।

[Old Fort Willium in Bengal by– C.R. Wilson, Vol I P–157]

গ্রাণ্ট সাহেব তাঁর রাজস্ব বিষয়ক গ্রন্থে লিখছেন: কেবল জনসাধারণ নয়, সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকগণও লাঠি ও তরবারি চালনা শিখতেন। বর্দ্ধমানের বনপাশ কামারপাড়া থেকে এমন অস্ত্র তৈরী হত যে তা য়ুরোপ পর্যন্ত রপ্তানী হত। এখনও অনেক বাড়িতে ইস্পাত নির্মিত প্রাচীন কালের টাঙ্গি, বগি, তরবারি, চামড়ার ঢাল, সড়কি, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্রসস্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান পরিক্রমার লেখকের গ্রামের (মুইধাড়া) বাড়িতে একখানি প্রাচীন তরবারি ও চামড়ার ঢাল আজিও রক্ষিত আছে।

নবম অধ্যায়

ইংরেজদের বর্দ্ধমান আগমন ও কর্তৃত্ব লাভ

তিলকচন্দ বাহাদুর (১৭৩৩ খৃঃ-১৭৭০ খ্রঃ)

চিত্রসেন বায় অপুত্রক ছিলেন, সেজন্য তাঁর পিতৃব্য মিত্ররামের পুত্র তিলক চন্দ বর্দ্ধমান রাজ সিংহাসনে বসেন মাত্র এগারো বৎসর বয়সে। তদানীন্তন ভারত সম্রাট মহম্মদ শাহ্ বাদশাহের নিকট হতে যে ফরমান আসে তার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :—

অতিশুভক্ষণে এই মহামান্য পরম বিশ্বাসপ্রদ ফরমান প্রচার হইল যে, বঙ্গদেশের সুবার অধিকারস্থ বর্দ্ধমান ওগয়হার জমিদার মৃত কীর্তিচন্দের ভাতৃপুত্র তিলকচন্দের নিকট হইতে সরকারের নজরানা স্বরূপ ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা গ্রহণ করত: উক্ত স্থানের জমিদারী ও রাজা উপাধি হুজুর হইতে প্রদত্ত হইল। এই ফরমান প্রচাব হইলে ১ লক্ষ টাকা সরকারের প্রদান করত: অবশিষ্ট টাকা কিস্তি অনুসারে সুবার ধনাগারে প্রদান করিবেন। ইত্যাদি। ৯ জমা দিয়ল, আখেব, ২৪ জুলুস।'



বর্দ্ধমান রাজবাড়ী

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আলমগীর বাদশাহের আজ্ঞানুসারে বঙ্গদেশের সুবার খেদা হতে মহারাজ তিলকচন্দকে একটি হস্তী দেওয়ার ফরমান হয়েছে। ১৭৬৭

খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলকোটের জমিদার শাহ্ হুজ্জতুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারী তালুক ভেদিয়া তিলকচন্দকে প্রদান করার ফরমান রক্ষিত আছে। এছাড়া পরবর্তী দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় শাহ্ আলম বাদশাহ্ তিলকচন্দকে যে ফরমান দেন তাতে দেখা যায়, ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিলকচন্দ রাজা বাহাদুর চার হাজার পদাতিক ও দুহাজার অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ হন এবং চার বছরের মধ্যে তাঁর পদমর্যাদা বেড়ে মহারাজাধিরাজ হয়। [Tilak Chand (1744-1771) was vested with the Title of Maharaja Adhiraj Bahadur–Imperial Gazetteer of India Vol IX 1908] তিনি তখন পাঁচ হাজারী জাত বা মনসবদার হলেন, যাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকত অতিরিক্ত তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও কামান, বন্দুক।

দিল্লীশ্বর মহারাজ তিলকচন্দকে দুর্লভ 'ফিদবী' সম্মানে ভূষিত করেন। তৎকালে 'ফিদবী' কেবলমাত্র মোগলবাদশাহের প্রধান সেনাপতিকে এই সম্বোধনে ভূষিত করা হত। তাছাড়া মোগল বাদশাহ্ তিলকচন্দকে হাওদা সওয়ারীর পরওয়ানাও দান করেন। ইতিপূর্বে বঙ্গের কোন রাজা মহারাজা সম্রাটের অনুমতি ব্যতীত হাতীর পিঠে হাওদা ও তদুপরি আরোহণ করতে পারতেন না। এই সংক্রান্ত বাদশাহের পরোয়ানা ও সনন্দ দুটি নিম্নরূপ :—

মহারাজাধিরাজ সনন্দ :— (বঙ্গানুবাদ মূল ফারসী থেকে)

নজীব উদ্দৌলা বক্সীয়ান মোমালক
মোহরাঙ্কিত

সন ১১৮১ হিজরি ৪ঠা রমজান, বৃহস্পতিবার ৯ জুলুস।

মহামান্য হুকুম প্রচার হইল যে, মহারাজা তিলকচন্দকে পঞ্চহাজারি জাত, তিনহাজার সওয়ার ও মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রদানে কৃতার্থ করা হইল।

১১ রমজান ৯ জুলুস।

'ফিদবীর' সনন্দ :—

সাহ্ আলম বাদশাহ্ গাজী

মোহরাঙ্কিত

ফারসী: আফিদৎ ব জালাদৎ নেসান, ফিদবীখাজ লায়োসল এনায়ত এহসান বতো ফজ্জলাত বেলা নেহায়ত মোবাহিবুদা বেদানন্দ রাজা তিলকচন্দ।

ইংরেজ ষ্টিভেন্স পাদরী প্রথম এদেশে আসেন ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে জানুয়ারী, আর ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় বাণিজ্য করার অনুমতি চান স্যার টমাস রো। ইংরেজরা ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন।

জব চার্ণক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ব্যক্তি ছিলেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পত্তন করে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুললেন।

'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে
পোহালে শর্বরী'

জব চার্ণক কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারী লাভ করলেন ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর পঞ্চাশ বছর ধরে অবাধ বাণিজ্য করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরেজরা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলীবর্দ্দির মৃত্যু হলে তার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসেন। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মীরজাফরকে মসনদের লোভ দেখিয়ে বশীভূত করল। পলাশীর আমবাগানে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন লর্ড ক্লাইভের কামান গর্জে উঠল। বেইমান মীরজাফর ও তার সৈন্যরা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইল, পরাজয় পিছন থেকে এসে বাংলার ললাটে লাঞ্ছনার কালিমা মাখিয়ে দিয়ে গেল। সিরাজদ্দৌলা নিহত হলেন, অস্ত গেল বাংলার ভাগ্যসূর্য। নামে মাত্র নবাব মীরজাফর, আসলে তাকে হতে হল ইংরেজের ভৃত্য। মীরজাফরের অবস্থা হল 'ব্যাধের হাতে পাখি'। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিপতি হল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার। লর্ড ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার জন্য তিলকচন্দকে পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু তিলকচন্দ তার প্রত্যুত্তরে সৈন্য দিয়ে সাহায্য তো করলেনই না বরং নিজে রাজ্যের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত কুঠি ও বাণিজ্য কেন্দ্র একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

Tilak Chand was the Raja of Burdwan at this time. He shut up all the English Factories and stopped their business.

—Unpublished Records of Goverment of Bengal By Rev Long.

ইংরেজদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমের নবাব আসাদউজ্জমান ও তিলকচন্দ একযোগে ইংরেজ ক্যাপ্টেন হগ্ ওয়াটসকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন। বর্দ্ধমান মহারাজার বিরুদ্ধে অতঃপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গেশ্বরের কাছে অভিযোগ করলে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বর্দ্ধমান প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এদিকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরকে গদিচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে মসনদে বসান। মীরকাসিম বর্দ্ধমানের রাজস্ব স্থির করেন একত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশ ছ টাকা। [Fifth report from the select committee of East India Company] মীরকাশিম মসনদে বসেই চুক্তিমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী সত্ত্ব ও নগদ দশ লক্ষ টাকা উপঢৌকন দেন। তিনি বর্দ্ধমান মহারাজার কাছ থেকে প্রাপ্য রাজস্ব যাতে ঠিকমত আদায় হয় তার

ব্যবস্থা করেন। ফলে কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি পায়। নবাব নাসের উল মোলক ইমতাজউদ্দৌলা নসরৎ জঙ্গ মীর মহম্মদ কাশিম খাঁ এই সম্পর্কে পরোয়ানায় উল্লেখ করেন যে উক্ত বর্দ্ধমান পরগণা ইংরাজ কোম্পানীকে প্রদত্ত হল। এর উপসত্ত্বের কিয়দংশ হতে ইংরেজ কোম্পানীর খরচ নির্ব্বাহ ও রাজ্য রক্ষার্থে পাঁচশত ইংরাজ অশ্বারোহী, দু হাজার ইংরেজ পদাতিক ও আট হাজার সিপাহী সৈন্য নিযুক্ত করে কোম্পানী জমিদার ও প্রজাদিগের পূর্বাপর সমুদয় সত্ত্ব বজায় রাখবেন। ১৭৬০ খ্রীঃ ১৬ নভেম্বর এই পরোয়ানা জারি হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রজাদের নিকট হতে রাজস্ব আদায়ের এই পরোয়ানা মতে রাজস্বের হিসাব দিতে মহারাজ তিলকচন্দকে নির্দেশ দিলে মহারাজ তিলকচন্দ্ তদুত্তরে বলেন, মারহাট্টাদের আক্রমণে বর্দ্ধমান বিধ্বস্ত হয়েছে, রাজকোষের অবস্থা শোচনীয়। বিগত কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত রায়রায়ান সমস্ত খাজনা নিয়ে গেছেন। মহারাজ তিলকচন্দ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাজস্বের দেনার যে হিসেব দাখিল করেন তা নিম্নরূপ :

বার্ষিক মালগুজারি—		২৬,৩৭,৯৩৭,
বাদ		
পতিত ও অনাবাদি জমি এবং মারহাটাগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ক্ষতি	৭.৯৩.০৮০,	
সুতা মহলের কর, যাহা নবাব জাফর আলি খাঁ বাহাদুর গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন	১,১৬,৭১১,	
বোয়ালিয়া পরগণা যাহা ইংরাজ কোম্পানী স্বয়ং আদায় করেছেন তার খাজনা	৩৮,৭৫০,	
	৯,৪৮,৫৪১,	১৬,৮৯,৩৯৬,
বকেয়া প্রাপ্য খাজনা বাদ		১৬,৫১,৮৭২,
		৩৩,৪১,২৬৮,
যাহা রায়-রায়ান নিয়ে গেছেন		১৪,৭০,৪৮২,
		১৮,৭০,৭৮৬,
এর মধ্যে রায়-রায়ান স্বয়ং আদায় করেছেন		৯,৬০,৭০০,
		৯,১০,০৮৬,
দরবার খরচ		১,২৫,১৯৯
মোট দেনা		১০,৩৫,২৮৫,

এই বকেয়া টাকা চার কিস্তিতে পরিশোধ করার জন্য অঙ্গীকার করেন তিলকচন্দ্। [Fifth report from the Select Committee of East India Company.] পরবৎসর তিলকচন্দ্ কোম্পানীকে একত্রিশ লক্ষ পচাঁত্তর হাজার চারশত ছয় টাকা রাজস্বের পুরা অংশ দিতে পারেন নি। সেই সময় মারহাটাদের আক্রমণে জেলার অর্থনৈতিক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করে। রাজকোষে শূন্যতার দরুণ বহু টাকা রাজস্ব বাকী পড়ে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান মহারাজের ৭৫টি পরগণার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেয় তেতাল্লিশ লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশত বাহান্ন টাকা রাজস্ব ধার্য হয়। ক্রমাগত রাজস্ব বাকী পড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইতিপূর্বে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমানে রেসিডেন্ট পদ সৃষ্টি করে তাঁর উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দেন।

কিন্তু এদিকে বীরভূম ও মেদিনীপুরের রাজারা কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় বৰ্দ্ধমান মহারাজকে মিত্ররূপে গ্রহণ করা ছাড়া ইংরেজদের আর কোন উপায় ছিল না। তাই বকেয়া আদায়ে বৰ্দ্ধমান মহারাজার উপর খুব একটা চাপ সৃষ্টি করেনি ইংরেজরা। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান মহারাজার বার্ষিক খরচের পরিমাণ ছিল পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একানব্বুই হাজার পাঁচশত টাকা। তিলকচন্দ্ ও তার পূর্বপুরুষগণ ক্রমান্বয়ে চার লক্ষ সাতষট্টি হাজার বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করেছিলেন নিষ্কর হিসেবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই ব্রাহ্মণদের নিষ্কর জমিতে ২৫ লক্ষ টাকা কর ধার্য করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বোর্ডে আপীল করলে মহারাজ কর্তৃক ১৭৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির খাজনা মাফ করা হয়। তৎকালে রাজ্যের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব মহারাজার উপরই ন্যস্ত ছিল। শাসন বিভাগের মধ্যে ছিল থানাজাত ও গ্রাম সরঞ্জামী। থানাজাত তিন অংশে বিভক্ত ছিল— থানাদারী সদর কোতওয়ালী এবং ফাঁড়িদার। থানাদারদের কাজ ছিল চুরি, ডাকাতি হলে জিনিষ পুনরুদ্ধার করে চোর, ডাকাতদের শাস্তি দেওয়া। সদর কোতওয়াল, শহরের শান্তিরক্ষক এবং ফাঁড়িদারগণ ছিলেন স্থলপথের শান্তিরক্ষক। ১৭৬৪-৬৫ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যে ৩৬৯৩ জন থানাদার, কোতওয়াল ও ফাঁড়িদার ছিলেন। এই সব ব্যক্তিগণ চাকুরান জমি ভোগ করতেন। এছাড়া বার্ষিক ৩৬ হাজার ৩ শত ৭১ টাকা খোরাকী বাবদ খরচ হত। কর্মে অবহেলা করলে ঐ সব রাজকর্মীদের পদচ্যুত করা হত। গ্রাম সরঞ্জামী অর্থাৎ পল্লীগ্রামের চৌকিদার— এদের রাত্রে পাহারা দিতে হত। মাঠে শস্য রক্ষার দায়িত্বও এদের হাতে ছিল। গ্রামে গ্রামে গোমস্তাগণ চৌকিদারদের সাহায্যে খাজনা আদায় করতেন।

তিলকচন্দের দুরবস্থা

তিলকচন্দের সময় প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুত্থান, পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়, মারহাট্টা দস্যুগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ ধনরত্ন লুণ্ঠন ও পৈশাচিক অত্যাচার, মোগল সৈন্য কর্তৃক শস্যক্ষেত্র ধ্বংস, রাজ্যমধ্যে দস্যু কর্তৃক

সর্বস্বাপহরণ প্রভৃতি অত্যাচারে বর্দ্ধমানবাসী জর্জরিত হয়ে পড়েন। বকেয়া রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারায় বর্দ্ধমান মহারাজকে ইংরেজ কোম্পানী ও বাংলার নবাব কর্তৃক বারংবার নিগৃহীত হতে হয়েছে। রাজস্ব দিতে না পারলে নবাব-বাদশাহগণ জমিদারদের আবদ্ধ করে জোরপূর্বক তৈজসপত্র বিক্রি ও বাড়ী নিলাম করে রাজস্ব আদায় করতেন। একবার তিলকচন্দ্রকে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব মীরকাশিমের দরবারে হাজির হতে হয়েছিল। বঙ্গেশ্বরের দেওয়ান মানিকচাঁদ দরবারের স্বীয় আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দিলে নবাব বিস্মিত হন। মানিকচাঁদ বলেছিলেন, মহারাজের নিমক (লবণ)ই তাঁকে স্বীয় আসন ত্যাগ করে সম্মান জানাতে বাধ্য করেছে। সেবার এই দেওয়ানের সৌজন্যে রাজস্ব পরিশোধ না করেও তিলকচন্দ জেল হাজত থেকে অব্যাহতি লাভ করেন। রাজবাটির সংলগ্ন মানিকচাঁদের ধ্বংসপ্রায় বাড়ীটি আজও অতীতের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

তিলকচন্দ ব্রজধামে ৺গোপীনাথ জিউর মন্দির, মাতা লক্ষ্মীকুমারীর স্মৃতি রক্ষার্থে অম্বিকায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জিউর মন্দির ও ৺বৈকুণ্ঠনাথ শিব প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া দাইহাটে অনেকগুলি দেবালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

মহারাজ তিলকচন্দের দুইটি পত্নী– জ্যেষ্ঠা রূপকুমারী, কাশীজোড়ার রাজা নরনারায়ণ রায়ের কন্যা। ইহার কোন সন্তান হয় নাই। কনিষ্ঠা বিষণকুমারী উখরা নিবাসী বক্তার সিংহ হণ্ডের ভগিনী। হণ্ডে পরিবার লাহোর থেকে এসেছিলেন। এই বিষণকুমারীর গর্ভেই তেজচন্দ জন্ম লাভ করেন। তিলকচন্দ খুব স্বল্পাহারী ছিলেন– তাঁর খাদ্য ছিল এক ছটাক চাল ও এক খণ্ড মাছের টুকরা। জলযোগ করতেন জোড়া মণ্ডার একখানি ও এক গ্লাস জল। যেদিন তিনি সামান্য কিছু খাদ্য গ্রহণ করতেন সেদিন তিলকের মাতার আনন্দের সীমা থাকত না। এমন কি পুত্র আহার গ্রহণ করেছেন এই আনন্দে দেউড়িতে নহবৎ বসিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতেন রাজমাতা।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

তিলকচন্দের শেষ সময়ে বঙ্গে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সন ১১৭৬ সালে মন্বন্তরে বহু লোক মারা যায় অনাহারে। দেশে জিনিষপত্রের দাম অত্যধিক বেড়ে যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায়। শ্রমিকদের পারিশ্রমিকও বেড়ে যায়। কিন্তু ধনাঢ্য ব্যক্তি ছাড়া শ্রমিক বা মজুর খাটাবে কে? Selections of unpublished Records of Government থেকে যে বাজার দর পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ,

(দুর্ভিক্ষের আগের বাজার দর)

শস্য	দাম	ওজন
বাসমতী চাল	এক টাকায়	৩৫ সের
গম	ঐ	১মণ ১৭ সের
সাধারণ চাল	ঐ	১মণ ১৭ সের
বুট	ঐ	১মণ
ময়দা	ঐ	২৪ সের
সঃ তেল	ঐ	৮ সের

(দুর্ভিক্ষের সময় বাজার দর)

বাসমতী চাল	এক টাকায়	১২ সের
গম	ঐ	১৯ সের ৭ ছটাক
সাধারণ চাল	ঐ	২২ সের
বুট	ঐ	১৫ সের ৬ ছটাক
ময়দা	ঐ	৫ সের
তিল	ঐ	৩ সের ১০ ছটাক

উপরোক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় একটি মন্বন্তরেই জিনিষপত্রের দাম বেড়ে এক লাফে প্রায় তিন গুণ হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নিয়ে দৈনিক দু পণ পনের গণ্ডা কড়ি মজুরি দিত। কিন্তু সর্দ্দারগণ তার থেকে ৫ গণ্ডা করে কড়ি দস্তুরি হিসেবে ভাগ বসাত। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত। Annals of Rural Bengal by Hunter গ্রন্থে দেখা যায়, এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। কৃষকের হালের বলদ কেনার লোক ছিল না। বাবা মা পেটের জ্বালায় নাবালক সন্তানদের বিক্রি করেছেন। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে যারা অনাহারে মারা গেছে, ক্ষুধার্ত মানুষ সেই মরার মাংসকে খাদ্য করেছে। বর্দ্ধমান মহারাজার রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এইরকম অবস্থায় ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে মে ৩৭ বৎসর বয়সে তিলকচন্দের মৃত্যু হয়। তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ার ব্যয়ভারের জন্য নবাবের কাছে হাত পাততে হয়।

তেজচন্দ্ বাহাদুর (১৭৬৪ খ্রীঃ)

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ জানুয়ারী মহারাণী বিষণ কুমারীর গর্ভে তেজচন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তখন বাংলার নবাব মীরজাফর। মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী। প্রথম প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রচুর অর্থ দিয়ে

তুষ্ট করলেও ভিতরে ভিতরে মীরকাশিম ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ সব জানতে পেরেই মীরকাশিমকে গদিচ্যুত করে পুনরায় মীরজাফরকে মসনদে বসান (১৭৬৩-৬৪ খ্রীঃ)। একবছর পর মীরজাফরের মৃত্যু হলে তার নাবালক পুত্র নজমউদ্দৌলা (১৭৬৫-৬৬ খ্রীঃ) ও আরও এক বছর পরে সৈফউদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসেন। সবই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মর্জিমাফিক। বাংলার নবাবগণ তাঁদের হাতের পুতুল। তখন দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯ খ্রীঃ-১৮০৬ খ্রীঃ) মোগল সাম্রাজ্যের ম্রিয়মান অস্তমিত সূর্যের শেষ রশ্মি। এই অবস্থায় ৬ বছরের নাবালক পুত্রকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে রাজমাতা বিষণ কুমারী বর্দ্ধমান এষ্টেট পরিচালনা করতে লাগলেন অসীম দক্ষতায়। যে তিলকচন্দের আমলে রাজকোষ শূন্য ছিল, তা ধীরে ধীরে স্ফীত হতে লাগল। পুত্রের পিতৃপদ প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে সম্রাট শাহ্ আলমের কাছে বিষণ কুমারী দেবী দশ হাজার টাকা নজরানা দিয়ে এলাহাবাদে পত্র পাঠালেন। তখন দিল্লীশ্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রদত্ত মাসিক বৃত্তি গ্রহণ করে নিরুপদ্রবে এলাহাবাদেই বসবাস করছিলেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ আলম বাদশাহের আজ্ঞানুসারে তাঁর প্রধান সেনাপতি সরফতউদ্দৌলা তেজচন্দকে যে ফরমান দান করেন তা নিম্নরূপ:

'সন ১১৮৪ হিজরি ১২ জুলুস ১২ই সওয়াল, মঙ্গলবারে বাদশাহের হুকুম প্রচার হইল যে, মহারাজ তিলকচন্দের পুত্র তেজচন্দকে পঞ্চ হাজারী জাত, তিন হাজার সওয়ার, মহারাজাধিরাজ খেতাব ঝালর দার পাল্কী, তোগ (অর্থাৎ পতাকা) ও নাকারা প্রদানে অনুগৃহীত করা হইল।'

মোহরাঙ্কিতঃ শাহ্ আলম বাদশাহ্ গাজী,
বখসিয়ান মোলক সরফত উদ্দৌলা—

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থগৃধ্নু ওয়ারেন হেষ্টিংস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে বাংলায় আসেন। নাবালক মহারাজ তেজচন্দের রাজধনাগার থেকে কিভাবে অর্থ আত্মসাৎ করা যায়, তার নানারকম কৌশল উদ্ভাবন করতে লাগলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। তিনি দেখলেন রাজমাতা বিষণ কুমারী রাজ্য পরিচালনা করছেন ও তাঁকে সাহায্য করছেন সুযোগ্য রাজদেওয়ান নারায়ণ চৌধুরী। হেষ্টিংস ছলে, বলে ও কৌশলে বিভিন্ন ছুতানাতায় ধনাগার থেকে অর্থ আত্মসাৎ করার ফরমান জারি করতে লাগলেন। তিনি ভেবেছিলেন একজন মহিলা ও অপরজন রাজভৃত্য— এদের দুই ধমক দিয়েই কাজ হাঁসিল করবেন। কিন্তু বিষণ কুমারী মহিলা হলে কি হবে, তিনি বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ ও নির্ভিক ছিলেন। হেষ্টিংস বিষণ কুমারীকে এঁটে উঠতে না পেরে প্রকাশ্যে রাজমাতা ও দেওয়ানের উপর উৎপীড়ন সুরু করলেন। বিষণ কুমারী অনন্যোপায় হয়ে মহারাজ নন্দকুমারের শরণাপন্ন হন ও হেষ্টিংসের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা ও নির্লজ্জ

অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পরামর্শ চাইলেন। মহারাজ নন্দকুমার সমস্ত বিষয়টি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ আকারে কাউন্সিলে উপস্থাপিত করতে পরামর্শ দেন ও এই ব্যাপারে মহারাণীকে নন্দকুমার সক্রিয় সাহায্য করেন। কাউন্সিলের হস্তক্ষেপে হেষ্টিংসের হাত থেকে বিষণ কুমারী পরিত্রাণ পেয়েছিলেন।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তেজচন্দ এগারো বছরে পদার্পণ করলে কাউন্সিল থেকে তাঁকে খেলাত দেবার আদেশ হয়। তা নিম্নরূপ:

'কৌন্সিল সাহেবানের হুকুম হইল যে, ঈশ্বরানুগ্রহে আগামী পরশ্ব ১৪ই মহরম শুক্রবার আপনাকে, রাণীসাহেবাকে এবং রাজকর্মচারীগণকে খেলাত দেওয়া হইবে। অতএব আপনাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করত: বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে, আপনি ঐ তারিখে এখানে উপস্থিত হইয়া সকলের আনন্দ বর্ধন করিবেন। ১২ মহরম সন ১৬ জুলুস।'

মহারাণী বিষণ কুমারী

মহারাণী বিষণ কুমারীর কর্মকুশলতায় শুধু রাজ্যের কোষাগারই পূর্ণ হয়নি, বর্দ্ধমান রাজ্যে শ্রী ও সৌন্দর্য অল্পকালের মধ্যেই ফিরে এসেছিল। বর্দ্ধমান রাজ্যের ৭৫টি পরগণার বার্ষিক রাজস্ব ধার্য হয় ৪০ লক্ষ থেকে ৪৩ লক্ষ টাকা, প্রতি বৎসর রাজস্ব দিয়েছেন, একটি কপর্দকও বাকী রাখেন নি বিষণ কুমারী। মহারাজা তিলকচন্দের বকেয়া রাজস্বও মিটিয়ে দিয়েছেন তিনি। ওয়ারেন হেষ্টিংস সুরু থেকেই বর্দ্ধমান রাজ এষ্টেট থেকে অর্থ আত্মসাতের সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি জানতে পারলেন; মহারাজ তিলকচন্দ প্রচুর জমি লুকিয়ে রেখে তার সত্ত্ব ভোগ করছেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কোন প্রকার উপসত্ত্ব না দিয়ে। এই সব জমি অনুসন্ধানের জন্য হেষ্টিংস মিঃ জন ষ্টোন, মিঃ বোল্ট ও মিঃ ভারলেষ্টককে পর্যায়ক্রমে সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত করেন ও সবশুদ্ধ সাড়ে পাঁচ লক্ষ বিঘা হিসাব বহির্ভূত জমি রাজ এষ্টেট থেকে বের করেন। যখন তেজচন্দ চৌদ্দ বছরের, তখন রাজমাতা পুত্রের হাতে রাজদায়িত্ব অর্পণ করেন রাজপরিবারের নিয়মানুযায়ী। এইসব জমির জন্য দেয় রাজস্ব বেড়ে যায় পাঁচ লক্ষ টাকা। এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোট রাজস্ব স্থির করেন ৪৫ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে মহারাজার খরচ বাবদে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯ শত ৬১ টাকা বাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কে ৩৬ লক্ষ ৪০হাজার ৮ শত ৪৩ টাকা দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তেজচন্দের নাবালক অবস্থায় রাজ্যের দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিচার তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রধান দেওয়ানই করতেন। সে সময় চুপী নিবাসী ব্রজকিশোর রায় রাজ্যের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। এদের বেতন ছিল এক হাজার টাকা মাসিক।

বিচার বিভাগের দলিলের উপরিভাগে ফারসী অক্ষরে মোহারাঙ্কিত থাকত দেওয়ানি, ফৌজদারী, আদালত, জেল বরদমান এবং তার পাশে দেবনাগরী অক্ষরে 'শ্রী মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ বাহাদুর'পক্ষে দেওয়ানই স্বাক্ষর করতেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আঠারো বছর বয়সে তেজচন্দ মায়ের কাছ থেকে রাজকার্য্যের যাবতীয় দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেন। কিন্তু তেজচন্দ শৈশব থেকেই কুসংসর্গে ও নিকৃষ্ট চরিত্রের অনুচর দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে বিলাসপ্রিয় ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে উঠেছিলেন। মা বিষণ কুমারী রাজকার্যে ব্যস্ত থাকতেন বলে খুব সঙ্গত কারণেই পুত্রের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন। তেজচন্দের শৈশবকালীন ইয়ার বন্ধুরা তার পূর্ণ সদব্যবহার করে তেজচন্দকে সবসময় আমোদ প্রমোদে ডুবিয়ে রাখেন। তাই অতি অল্পদিনের মধ্যে ভোগ বিলাসে অজস্র অর্থের অপব্যয় করে রাজকোষ শূন্য করে ফেলেন তেজচন্দ,ফলে কোম্পানীর রাজস্ব আবার বাকী পড়তে থাকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য মুন্সি নবকৃষ্ণকে (পরে ইনি রাজা হয়েছিলেন) বৰ্দ্ধমান রাজ্যের 'ক্রোক সাঁজোয়াল' পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু নবকৃষ্ণও তেজচন্দের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতে পারেন নি। এমন কি রাজ দরবারে ভৃত্য, কর্মচারী, সিপাহী প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের মাসিক বেতন দিতে না পারায় তিনি নিগৃহীত ও বোর্ড কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়ে উক্ত পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তেজচন্দ বাকী খাজনার টাকা দিতে অপারগ বলে কোম্পানীকে জানিয়ে দেন। কিন্তু কোম্পানী সে বক্তব্য অগ্রাহ্য করে অবিলম্বে দেয় বাকী খাজনা পরিশোধ করার নির্দেশ দেন (Bengal Records)। এমন কি কোম্পানী থেকে নির্ধারিত বিষণ কুমারীর জীবিকা নির্বাহ নির্মিত মাসিক বৃত্তি ৪ হাজার টাকা— তাও রাজ এষ্টেট দিতে পারে না। মহারাণী বিষণ কুমারী বৰ্দ্ধমানের তৎকালীন কালেক্টার চার্লস ব্রাউনকে বৃত্তির টাকা না পেয়ে বৰ্দ্ধমান রাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তদুত্তরে কোম্পানী ফারসী ভাষায় যে উত্তর দেন তা রাজবাটিতে রক্ষিত আছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খবরদারি

কোম্পানী কর্ত্তৃক বারংবার বৰ্দ্ধমান রাজের উপর খবরদারিতে তেজচন্দ বিক্ষুব্ধ হন ও সোনামুখীতে ইংরেজ কুঠি বন্ধ করে ইংরেজ কর্মচারীদের বিতাড়িত করেন। কিন্তু উক্ত কুঠির অধ্যক্ষ বোর্ডে অভিযোগ করলে বোর্ড মহারাজকে সর্তক করে কুঠির কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করতে নির্দেশ দেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান রাজ্যের ৪৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৬ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছিল, তার মধ্যে ৩৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ শত ২৫ টাকা কোম্পানীকে রাজস্ব আদায় দেওয়া হয়েছিল, বাকী পড়েছিল ৩ লক্ষ ৩ হাজার ১ শত ৭৫ টাকা। মহারাজ স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন ৬ লক্ষ ২২ হাজার ২ শত ৭১ টাকা। এই টাকা কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করার

নির্দেশ থাকলেও বর্দ্ধমানরাজ এই কিস্তি শোধ তো করেন নি পরের কতকগুলি কিস্তিও বাকী পড়ে যায়। তেজচন্দের বিলাসপ্রিয়তা, অমিতব্যয়িতা ও স্বার্থসম্পন্ন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারীর অসাধুতাই যে রাজধনাগারের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ— সে কথা বোর্ড জানতে পেরে তেজচন্দকে স্বয়ং কলকাতায় তলব করেন এবং নির্দেশ দেন যে তেজচন্দ যদি কুসংসর্গাদি পরিত্যাগ করে রাজকার্যে ও রাজস্ব সঞ্চয়ে মনোযোগী না হন, তবে সমগ্র রাজ্য তাঁর হস্তচ্যুত হবে। এই নির্দেশ পেয়ে তেজচন্দ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন ও কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। প্রতিশ্রুতি দেন, সমুদয় বকেয়া খাজনা পরিশোধ করার চেষ্টা করবেন (Bengal records)। কিন্তু তেজচন্দের প্রতিশ্রুতি মত বকেয়া খাজনা না পাওয়ায় ১৭৮৬ খ্রীঃ ১৬ই মার্চ বোর্ড থেকে এই বলে নোটিশ জারি করা হয় যে, বকেয়া খাজনার দায়ে বর্দ্ধমান রাজের জমিদারী ক্রোক করা হবে। ইতিপূর্বে বোর্ডের আদেশ অনুসারে তেজচন্দকে রাজবাটিতে আবদ্ধ রেখে ধনাগারে অতর্কিতে হানা দিয়ে কতক টাকা আদায় করা হয়েছিল। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার কাগজপত্র প্রস্তুত না করার দায়ে বর্দ্ধমানরাজকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে হয় এবং প্রতি বছরই খাজনা বাকী পড়ায় ঐ বছরই পুনরায় তেজচন্দকে বাটিতে আবদ্ধ রেখে জোরপূর্ব্বক কিছু টাকা আদায় করা হয়। বার বার ইংরেজ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েও তেজচন্দের চৈতন্যোদয় হয় না। অবশেষে বাধ্য হয়ে ১৭৯০ খ্রীঃ ১০মে বোর্ড থেকে আজমতশাহী ও মুজাফরশাহী পরগণা নীলামে বিক্রয় করে বকেয়া খাজনা পরিশোধ করার নির্দেশ জারি করা হয়।

প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিন্যাস

রাজবাটির রেকর্ড থেকে দেখা যায়, রাজকর্মচারীদের অসাধুতায় আদায়ীকৃত রাজস্ব ধনাগারে জমা পড়ত না। চন্দ্রকোণা পরগণার ইজারাদার বর্দ্ধমানরাজের প্রাপ্য ৬০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে শ্রীরামপুরে পালিয়ে যান। এছাড়া ছোট ছোট ইজারা বা গোমস্তাগণ যথাসময়ে রাজস্ব আদায় করত না, করলেও সিংহভাগ টাকা নিজ পকেটস্থ করে অনাদায় দেখাত। তদুপরি তেজচন্দের ইয়ার বন্ধু ও পার্শ্বচরগণের পিছনেও অঢেল টাকা ঢালতে হত। তেজচন্দের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁর হাত থেকে ফৌজদারী ও দেওয়ানি ক্ষমতা চলে যায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই আদেশ বলে তেজচন্দের কারাগারস্থ যাবতীয় বন্দীগণকে বর্দ্ধমানের কালেকটার সাহেবের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। ফলে জেলখানার ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব চলে যায়। কেবল রাজ্যের শান্তিরক্ষার ভার অবশিষ্ট থাকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিলেক্ট কমিটির পঞ্চম রিপোর্টের ১৭ পৃষ্ঠায় আছে:- 'এই জমিদারী (বর্দ্ধমানরাজ) প্রায় ৭৩ মাইল দীর্ঘ ও ৪৫ মাইল প্রস্থ, আয়তন ৩২৮ বর্গমাইল। অধিকাংশ ভূমিই প্রচুর শস্য সম্পদে পূর্ণ ও জনসমাকীর্ণ। মহারাজার পুলিশ বিভাগ সম্বন্ধে বর্দ্ধমানের

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ১৭৮৮ খ্রীঃ ১২ই অক্টোবর তারিখের পত্রে প্রকাশ, 'যে থানাদারগণই পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও রাজ্যের প্রধান শান্তিরক্ষক। তাঁহাদের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গ্রামবাসীগণের শান্তিরক্ষার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগকে গ্রাম সমূহের সংবাদাদি প্রদান করিবার জন্য ২৪০০ পাইক সশস্ত্র পদাতিক নিযুক্ত আছে। ইহারা কেবলমাত্র পুলিশের কার্যই করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন গ্রামসমূহের প্রহরীর কার্যের স্বতন্ত্র জমিদারী-পাইক নিযুক্ত আছে। উক্ত পাইকের সংখ্যা অন্যূন ১৯ সহস্র হইবে। ইহারাও সর্বদাই আবশ্যক মত পুলিশের কার্যের সহায়তা করিয়া থাকে।'

'রাজবংশানুচরিত' গ্রন্থের লেখক রাখালদাস মুখোপাধ্যায় 'তেজচন্দের' আমলে বর্দ্ধমান রাজ্যের এই দুরবস্থার জন্য তেজচন্দকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে তেজচন্দ শুধু কর্তব্য কর্মে শিথিলই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উদ্ধত, দুর্বিনীত ও হটকারী। যে মা বিষণ কুমারী তাঁর নাবালক অবস্থায় সুদক্ষ ও সুচারুরূপে রাজকার্য পরিচালনা করেছেন, কোম্পানীর রাজস্ব এক পয়সাও বাকী রাখেন নি, তাঁকে লালন পালন করেছেন সেই মায়ের মাসিক বৃত্তি পর্যন্ত বন্ধ করেছিলেন তেজচন্দ। রাজকর্মচারীদের সঙ্গে তিনি কখনও সদ্ব্যবহার ও সদাচারণ করতেন না। ইংরেজদের উপর তিনি অতি মাত্রায় ক্ষুব্ধ ছিলেন, ইংরেজ যত বড় উচ্চপদস্থ কর্মচারীই হোন না কেন, তেজচন্দ দু চোখে দেখতে পারতেন না। সবসময় উদ্ধত আচরণ করতেন ফলে তেজচন্দ নির্বান্ধব ছিলেন। দেনার দায়ে একে একে জমিদারী হাতছাড়া হতে থাকে। কোম্পানী শেষকালে তেজচন্দের অপদার্থতায় রাজস্ব আদায়ের সমুদয় ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে বর্দ্ধমান মহারাজার জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। মহারাণী বিষণ কুমারীর বৃত্তির টাকা তেজচন্দ বন্ধ করে দিলে মাতা পুত্রে মনোমালিন্য হয় এবং বিষণ কুমারী লর্ড কর্ণওয়ালিশের কাছে তেজচন্দের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। গভর্ণর জেনারেল কর্ণওয়ালিশ মহারাজার মাসিক বৃত্তি থেকে ঐ টাকা কেটে নেবার জন্য নির্দ্দেশ পাঠান (১৭৯১ খ্রীঃ ২৭শে জুন)।

ঋণগ্রস্ত অবস্থায় তেজচন্দকে কয়েকটি জমিদারী হুগলী ও চব্বিশ পরগণা হারাতে হয়। ঐ সব জেলায় জমিদারবর্গের সৃষ্টি হয় তেজচন্দের বিক্রিত জমিদারী নিয়ে। কীর্তিচন্দ বাহুবলে শোভা সিংহের জমিদারী বরদা ও চিতুয়া জয় করেছিলেন। কিন্তু তেজচন্দের আমলে বকেয়া খাজনার দায়ে ঐ দুটি সম্পদশালী জমিদারীও নীলামে বিক্রয় হয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ সেপ্টেম্বর সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট দেন, তাতে দেখা যায়, 'যদিও বিহার প্রদেশ অপেক্ষা বর্দ্ধমান প্রদেশের আয়তন কম, কিন্তু বর্দ্ধমানের রাজস্ব প্রায় বিহারের তিন চতুর্থাংশ আদায় হয়। বিহার অপেক্ষা বর্দ্ধমানে জমিদারের ক্ষমতা ও স্বাধীনতাও অনেক পরিমাণে বেশী। বর্দ্ধমান প্রদেশের পরিমাণ ফল (আয়তন) ৫ হাজার বর্গমাইল এবং জমির পরিমাণ ৯৫ লক্ষ বিঘা। তন্মধ্যে কেবলমাত্র সাড়ে ২৮ লক্ষ বিঘা জমির রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। যদি

বিঘা প্রতি ২ টাকা হিসাবে খাজনা আদায় করা যায়, তাহা হইলে ৫৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে পারে। তদ্ভিন্ন মালিকের দখলেও ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭ শত ৩৬ বিঘা জমি আছে। তাহারও বিঘা প্রতি ২ টাকা খাজনা আদায় করিলে ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪ শত ৭২ টাকা রাজস্ব আদায় হইতে পারে।' কিন্তু তেজচন্দের অপদার্থতার জন্যই এর অর্ধেক রাজস্বও আদায় হয় না, ফলে কোম্পানীর ঘরে বাকীর অংক বেড়েই চলতে থাকে। অথচ সে সময় বর্দ্ধমানে ধান্য যথেষ্ট উৎপন্ন হত। কলিকাতার কাশীপুর হর্টিকালচারে ১৭৯৩-৯৪ খ্রীঃ যে প্রদর্শনী হয়, তাতে বর্দ্ধমান থেকে ৩৫৯ প্রকার আশু, নেয়ালি ও হৈমন্তিক ধান প্রদর্শিত হয়েছিল। রাজবাড়ির দেওয়ান বনবিহারী কপূর ঐ ধান সংগ্রহ করে প্রদর্শনীতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বন্যা ও বর্দ্ধমানরাজের আর্থিক দুরবস্থা

১৭৯২ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে বর্দ্ধমানের দামোদর নদে ভয়ঙ্কর জল-প্লাবন হয়। ফলে সে বছরও রাজস্ব আদায় খুব কম হয়। কিন্তু কোম্পানী তেজচন্দের আবেদন অগ্রাহ্য করে বেলিয়া পরগণা ও কয়েকটি মহাল বিক্রয় করে রাজস্বের টাকা তুলে নেন। এই সময় মহারাজ তেজচন্দ কোম্পানীকে বার্ষিক ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার ১০৯ টাকা রাজস্ব ও পুলবন্দি অর্থাৎ দামোদরের বাঁধ মেরামত বাবদে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭ শত ২১ টাকা দিবার অঙ্গীকারে দশশালা বন্দোবস্ত করেন। ক্রমাগত বর্দ্ধমান রাজের ক্ষমতা খর্ব হতে থাকল। সামান্য যে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তেজচন্দের হাতে ছিল তাও ১৭৯৩ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কেড়ে নিয়ে নূতন পুলিশবাহিনী সৃষ্টি করে স্থানে স্থানে দারোগা নিযুক্ত করলেন ও তাদের হাতেই প্রদেশের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। দশশালা বন্দোবস্ত করলেও তেজচন্দ কিন্তু রাজস্ব আদায়ে উন্নতি করতে পারেন নি। পুনরায় রাজস্ব বাকী পড়তে থাকে। ৫ থেকে ১০ বৎসর মেয়াদে বহু ব্যক্তিকে খাজনা আদায়ের ইজারা দেওয়া হয়, কিন্তু ইজারাদারগণ আদায়ী রাজস্ব আত্মসাৎ করে অনেকে পালিয়ে যান। কয়েকজনকে তেজচন্দ কারারুদ্ধ করেন। এদিকে কোম্পানী মহারাজকে কোন কিস্তি হতে অব্যাহতি দিতেন না। দশশালা বন্দোবস্তের বহু টাকা বাকী পড়ায় বোর্ড পুনরায় কতকগুলি মহাল বিক্রি করে সমুদয় টাকা আদায়ের নোটিশ জারি করেন। মহারাজ তখন নিরুপায় হয়ে মহারাণী বিষণ কুমারীকে সমস্ত রাজ্য বিক্রয় কোবালা লিখে দিয়ে অব্যাহতি পান। মহারাণী গভর্ণর জেনারেলকে বকেয়া খাজনা পরিশোধ করার জন্য চুক্তি করেন। এবং সাধ্যমত রাজ্যের হাল ফেরাবার চেষ্টা করছে লাগলেন। তিনি নিজ অর্থ থেকেও কিছু রাজস্ব পরিশোধ করেন। কিন্তু তেজচন্দ জোরপূর্ব্বক কোষাগার থেকে টাকা আত্মসাৎ করে ভোগবিলাসে অপরিমিত ব্যয় করতে লাগলেন। রাজকর্মচারীগণ তেজচন্দকে কিছু বলতে সাহস করতেন না। মহারাণী পুত্রকে সংযত করতে না

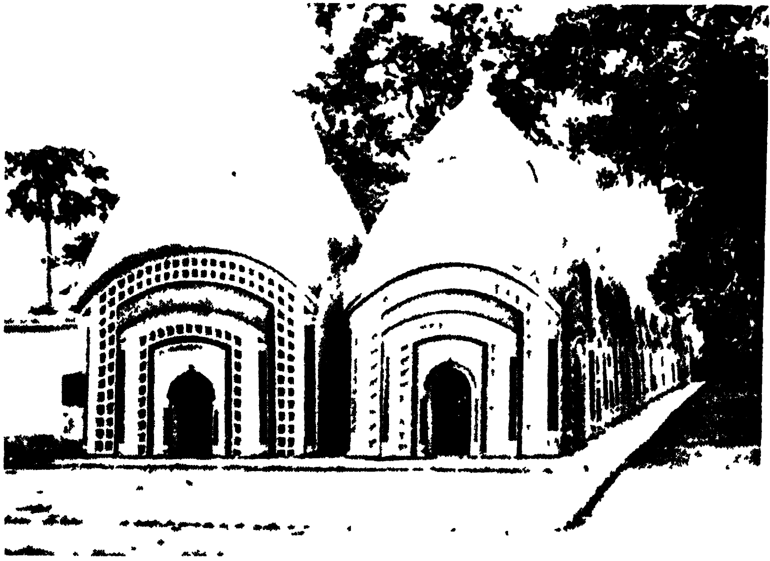
পারায় গভর্ণর জেনারেলের কাছে অভিযোগ করলে গভর্ণর জেনারেল তেজচন্দকে হুগলী জেলায় অন্তরীণ রাখার ব্যবস্থা করেন। এই সময় বাকী খাজনার জন্য বেলিয়া পরগণার বাকী অংশ নিলামে বিক্রয় করা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে কেবল বর্দ্ধমান মহারাজের উপরই রাজস্ব আদায়ের জন্য একে একে পরগণা নিলাম করতেন তাই নয়, বঙ্গদেশের অন্যান্য সকল জমিদারের উপরও একই ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। নিলামে পরগণা কিনে নেওয়ায় অসংখ্য জমিদারের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার দামোদরে প্লাবন হয়। সেজন্য ঐ বৎসর রাজস্ব আদায় না হওযায় খাজনা আবার বাকী পড়ে যায়। এই বৎসর রাজস্ব আদায়ের জন্য দেউড়িমহল ও মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত যাবতীয় জমিদারী নিলাম হয়ে যায়। এই সময় তেজচন্দ হুগলী থেকে এসে বর্দ্ধমানে বসবাস করতে থাকলে রাজকোষের উপর তাঁর পূর্ব্ববৎ আচরণ সুরু হয়। মা বিষণ কুমারী পুত্র তেজচন্দকে ভৎসনা করেন। মাতা পুত্রে পুনরায় মনোমালিন্য সুরু হয়। রাজ্যের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় আকার ধারণ করে। কোম্পানী একটি কিস্তির টাকাও বাকী রাখে না। ক্রমে ক্রমে জমিদারীর অংশ নিলামে বিক্রয় করে রাজস্ব আদায় করতে থাকে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লাট, তেলিনী পাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়রা, ভাস্তারার ছকু সিংহ প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ নিলামে বিস্তর জমিদারী কিনে নেন।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ৯ সেপ্টেম্বর অম্বিকায় বিষণ কুমারীর মৃত্যু হয়। সেখানেই তাঁর সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় (সমাধি দেওয়া হয়)। মায়ের মৃত্যুর পর তেজচন্দ পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং অলৌকিক বলে তাঁর চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন হয়। রাজকার্যে এমন মনোনিবেশ করেন যে অসাধু কর্মচারীরা আর সুবিধে করতে পারে নি, রাজস্ব আদায়ে যে তেজচন্দ অমনোযোগী ছিলেন, সেই তেজচন্দ রাজস্ব আদায় করে ধনাগারের উন্নতি ঘটান। শোনা যায় নাড়িগ্রাম নিবাসী দেওয়ান মানগোবিন্দ ভঞ্জ তাঁকে সমগ্র রাজ্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিলামে পত্তনি দেবার পরামর্শ দান করেন।

কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

তখন লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) জমিদারগণের নিকট রাজস্ব সম্পর্কিত ব্যাপারটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় আনেন। বর্দ্ধমান মহারাজ তেজচন্দ সমগ্র রাজ্যের জমিদারী বিভিন্ন পত্তনীদারকে বন্দোবস্ত করবেন বলে ঘোষণা করেন। বহু ধনবান ব্যক্তি নিলামে পত্তনি গ্রহণ করতে রাজদরবারে উপস্থিত হন ও চড়া জমায় জমিদারীর পত্তনি গ্রহণ করেন। এতে একদিনে বর্দ্ধমান রাজের প্রভূত আয় হয়। আর এই আয় থেকেই বর্দ্ধমান রাজের অবস্থা ফিরে যায়। পত্তনি দেওয়ার ফলে বছর বছর রাজস্ব ঠিকমত আদায় হতে থাকে ও কোম্পানীর কিস্তি পরিশোধ হতে থাকে। আমেরিকার ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জে, আর ম্যাকলেন বলেছেন, রাজার অধীনে যেসব পত্তনিদার ছিলেন তাদের এলাকায় প্রচণ্ড দাপট ছিল। খাজনার

দায়ে পত্তনিদারগণ গরীব চাষীর চুলো, ভাতের হাঁড়ি পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। তবু বলতে হয়, বর্দ্ধমানরাজ নিজে কখনও কোন অত্যাচার করেছেন বলে শোনা যায় নি (যুগান্তর ১৩ ই মার্চ ১৯৮১)। পত্তনিদারগণই এর পর থেকে খাজনা আদায়ে তৎপর হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য তেজচন্দ ঐ বৎসরই বিষ্ণুপুরাধিপতির নিকট হতে উক্ত জমিদারী কিনে নেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা পত্তনি ব্যবস্থা যদি বিষ্ণুপুরাধিপতি গ্রহণ করতেন তবে তাঁর জমিদারী এমনভাবে নিলামে বিকিয়ে যেত না।



১০৯টি শিবমন্দিব নবাবহাট বৰ্দ্ধমান

তেজচন্দ কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। মাতাব মৃত্যুর পব তার আমূল পরিবর্তন হয়। তিনি বহু ব্রাহ্মণকে দেবোত্তর ও ব্রাহ্মণোত্তর নিষ্কর জমি দিয়ে অন্নের সংস্থান করেছিলেন। তিনি যে কত পুষ্করিণী ও দেবমন্দির নির্মাণ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। বর্দ্ধমান হতে অম্বিকা কালনা পর্যন্ত ৪০ মাইল দীর্ঘ বৃক্ষশোভিত প্রশস্ত রাস্তা তাঁরই কীর্তি। স্থানে স্থানে ১০ টি বড়ো সরোবর ও প্রতি সরোবরে একটি করে শিবমন্দির নির্মাণ করান। রাজমাতা বিষণকুমারী বর্দ্ধমানের নবাবহাটে লক্ষাধিক টাকায় একশ নয়টি এবং কালনায় লক্ষাধিক টাকায় একশত আটটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নবাবহাটের শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসেন ও তেজচাঁদ স্বহস্তে তাঁদের পদ প্রক্ষালন করেন ও মাথায় পদরজ

ধারণ করেন। মহারাজ তেজচন্দের পঞ্চম মহিষী কমলকুমারী বিখ্যাত কমল সাগর প্রতিষ্ঠা করেন। জৌগ্রামে একটি সুন্দর শিবমন্দির, কালনায় রাধাকৃষ্ণের মন্দির, বৰ্দ্ধমানে সর্ব্বমঙ্গলা মন্দির, রামেশ্বর ও কমলেশ্বর শিব মন্দির, বৰ্দ্ধমানে শ্রী শ্রীরাধাবল্লভ জিউ , অন্নপূর্ণা দেবী, ছোট দেউড়ির শ্রী শ্রীশ্যামসুন্দর জিউ, তেজগঞ্জের কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুযায়ী বৰ্দ্ধমানের দক্ষিণ অংশের নাম হয় তেজগঞ্জ। তিনি বৰ্দ্ধমান নগরে ১৩টি প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। দামোদরের বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাস্তুকার মিঃ মেরিয়েট সাহেবকে দিয়ে উভয় তীরে সুদৃঢ় বাঁধ তিনি নির্মাণ করান। বৰ্দ্ধমান রাজ্যের পাঁচটি পীঠস্থানের মন্দির নির্মাণ ও দেবদেবীর পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বিস্তর নিষ্কর জমি দান করেন। এগুলি হল :—

১) অট্টহাস—কেতুগ্রাম ব্লকের দক্ষিণডিহি দেবীর অধর-ওষ্ঠ নিপতিত হয়েছিল। তথায় ফুল্লরা ও বিশ্বেশ্বর ভৈরব বিরাজমান আছেন

২) উজানি—গুসকরা ষ্টেশন থেকে ৫ ক্রোশ দূরে কোগ্রামের কাছে দেবীর কনুই পতিত হয়েছিল। তথায় মঙ্গলচণ্ডী ও কপিলাম্বর ভৈরব বিরাজমান আছেন।

৩) বহুলা-কাটোয়া মহাকুমার অন্তর্গত কেতুগ্রামে দেবীর বাম বাহু পতিত হয়েছে। এখানে দেবী বহুলা ও ভীরুক ভৈরব বর্তমান আছে।

৪) কাঞ্চিদেশ-বোলপুর ষ্টেশনের দু ক্রোশ দূরে কোপাই নদীর তীবে দেবীর কঙ্কাল পতিত হয়েছিল। এখানে দেবী বেদগর্ভা ও রুরুভৈরব বর্তমান।

৫) ক্ষীর গ্রাম—মঙ্গলকোট থানার ক্ষীরগ্রামে দেবীর দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়। এখানে দেবী যোগাদ্যা ও ক্ষীরকণ্ঠক ভৈরব বিরাজমান।

দামোদর-বন্যা ও সামাজিক অবস্থা

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে (সন ১২৩০) দামোদরে পুনারায় প্রলয়ঙ্করী বন্যা দেখা দেয়। এরূপ বন্যা ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। এই বন্যা বৰ্দ্ধমানের ইতিহাসে ৩০ সালের বন্যা নামে বিখ্যাত। ২৬শে সেপ্টেম্বর রাত্রে দামোদরের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে বৰ্দ্ধমান শহর প্লাবিত হয়। বহু ঘর বাড়ি জলের তোড়ে ভেসে যায়। তৈজসপত্র, গরু, মহিষ, ছাগ, কুকুর, বিড়াল এবং অসংখ্য মানুষের মৃতদেহ ভাসতে থাকে। বৰ্দ্ধমান শহরেই সাত-আট ফুট জল জমে যায়। বহু মানুষ গাছ, বাড়ির ছাদ ও ভাসমান খড়ের চালে আশ্রয় নেয়। হাজার হাজার লোক গৃহহীন ও অনাথ হয়ে যায়। তেজচন্দ এই সময় বদান্যতা দেখান, আশ্রয়হীনের আশ্রয় ও অন্নহীনের অন্নের ব্যবস্থা করেন। গভর্ণর আমহার্ষ্ট মহারাজের এই সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তেজচন্দের সময়ে বৰ্দ্ধমান ছিল শস্যভাণ্ডার। জিনিষপত্র সুলভে অঢেল পাওয়া যেত। কারও অন্নকষ্ট ছিল না। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দেও টাকায় দু মণ চাল বিক্রি হত।

পুকুর ভরা মাছ, গোলাভরা ধান ও গোয়ালভরা গরু ছিল চাষীর ঘরে। জলবায়ু ভালই ছিল— কেবল মাঝে মাঝে দামোদরের বন্যা ছাড়া। ম্যালেরিয়া, যকৃৎ ও প্লীহার নামও তখন কেউ শোনে নি। লোকের অর্থাৰ্জন হলেই দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করত। গ্রাম ছিল বারো মাসে তের পার্বণে ভর্তি। ঘরে ঘরে দুধ, ঘি, আখের গুড় ছিল পর্যাপ্ত। কাটোয়ায় প্রাপ্ত এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের একটি দুর্গোৎসবে (জনার্দন শর্মার বাটি) যে খরচের বিবরণ পাওয়া যায় তার ব্যয় মাত্র ৮০ টাকা পনের আনা মাত্র। এই খরচে ১৭ মণ চালের ভোগ রান্না হত এবং দু হাজার লোক ভোজন করত। দুর্গাপূজার প্রতিমার দাম ছিল ৫ টাকা, ১৭ মন চালের দাম ছিল ৬ টাকা চার আনা মাত্র। দেড় মন সরিষার তেলের দাম ছিল দু টাকা। পুরোহিতের দক্ষিণা ছিল ৮ টাকা, নাপিতের আট আনা। এখানে লক্ষ্যণীয় প্রতিমার মূল্যের চেয়ে পুরোহিতের মূল্য বেশী ছিল। [রাজবংশানুচরিত—রাখালদাস মুখোপাধ্যায়] তেজচন্দের ৮টি মহিষী ছিলেন। তাঁরমধ্যে কেবল নানকী কুমারীই ছিলেন পুত্রবতী, প্রতাপচন্দের জননী। আট মহিষী হলেন :—

(১) জয় কুমারী, (২) প্রেম কুমারী, (৩) সেতার কুমারী, (৪) তেজ কুমারী, (৫) কমল কুমারী (৬) নানাকী কুমারী, (৭) উজ্জ্বল কুমারী, (৮) বসন্ত কুমারী।

শিক্ষাবিস্তারে তেজচন্দ

মহারাজ তেজচন্দ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমানে একটি ভার্নাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তী সময়ে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহতাব চন্দ এটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এটি আই, এ কলেজ—এ রূপান্তরিত হয়। এই বিদ্যালয় রাজবাটির সন্নিকটে আজ 'বৰ্দ্ধমান রাজকলেজিয়েট স্কুল' নামে বিদ্যমান। মহিষীদের মধ্যে কমল কুমারী বিদুষী ছিলেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ছিলেন, তাই মহারাজ তেজচন্দ কমল কুমারীর নামে বৰ্দ্ধমান রাজবাটির সংলগ্ন 'মহারাণী অধিরাণী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। কমল কুমারী অতীব সুন্দরী ছিলেন। শোনা যায়, কমল কুমারীর বাবা ক্ষেমচাঁদ কাপুর ও স্ত্রী কন্যা সহ জগন্নাথদেব দর্শনে পুরী যাবার পথে কেশবগঞ্জ চটিতে ধর্মশালায় অবস্থান করেছিলেন। সে সময় দৈবক্রমে তেজচন্দ এই অপূর্ব সুন্দরী কন্যাকে দেখে কমলের বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তদবধি প্রেমচাঁদ বৰ্দ্ধমানেই বাস করেন। কমল কুমারীর ভাই পরাণচাঁদ কাপুরকে তেজচন্দ রাজদরবারের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। [গোষ্ঠবিহারী লাল সিংহ হাণ্ডে রচিত— বৰ্দ্ধমান রাজবংশ]

মহারাজ তেজচন্দ পরিণত বয়সে একজন সাধকরূপে পরিচয় লাভ করেন। তাঁর আমলে পরম শ্যামাভক্ত সাধক কমলাকান্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ করলে তেজচন্দ এই শ্যামাসাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্যকে বৰ্দ্ধমান শহরে নিয়ে আসেন ও নিজ পুত্রের

শিক্ষার দায়িত্ব দিয়ে বোরহাটে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করান। তেজচন্দ প্রথম দিকে কমলাকান্তকে মোটেই ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন না। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল কমলাকান্তর জন্যই প্রতাপচন্দ মদ্যপ হন। কারণ প্রতাপচন্দ একমাত্র কমলাকান্তের কাছেই নির্জনে সদুপদেশ গ্রহণ করতেন। পরে কমলাকান্তের অলৌকিক শক্তিতে তেজচন্দ শ্রদ্ধাশীল হন ও বোরহাটে মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। কমলাকান্ত এখানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে কালীপূজা করতেন। এই শ্যামাঠাকুর বর্তমানে কমলাকান্তের কালী নামে এখনও পূজিত হন।

প্রতাপচন্দ বাহাদুর

তেজচন্দের একমাত্র পুত্র প্রতাপচন্দ (জন্ম ১৮৯১ খ্রীঃ ২৪শে অক্টোবর) পঞ্চম মহিষী নানকী কুমারীর গর্ভজাত সন্তান। নানকী কুমারী ছিলেন পাঞ্জাব-বায় ট্যাণ্ডনের কন্যা। প্রসবের তিন দিন পরেই নানকী কুমারী মারা গেলে প্রতাপচন্দ পিতামহী বিষণ কুমারীর কাছে অপত্য স্নেহযত্নে লালিত পালিত হন। সেইজন্য কৈশোর থেকেই আদরে আদরে প্রতাপচন্দ দুর্দ্দান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন সাঁতারে পটু, সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার, অস্ত্রযোদ্ধা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। তেজচন্দ মাতা বিষণ কুমারীর ভয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য প্রতাপচন্দকে শাসন করতে পারতেন না। ফলে প্রতাপচন্দের দুরন্তপনা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। প্রতাপচন্দের যখন বয়স ৭ বছর তখন বিষণ কুমারী মারা যান। সেই সময় থেকেই প্রতাপচন্দ প্রকৃতই মাতৃহীন হন। ফলে যৌবনেই মদ্যপ হয়ে ওঠেন। মহারাণী কমল কুমারী ও তার ভাই পরাণচাঁদ কাপুর প্রতাপচন্দের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। দেওয়ান পরাণচাঁদ তখন রাজ্যের সর্বেসর্বা। তিনি কৌশলে বৰ্দ্ধমান রাজ এষ্টেটকে নিজের দখলে রাখার জন্য নিজের কন্যা বসন্ত কুমারীর সঙ্গে বৃদ্ধ তেজচন্দের বিবাহ দেন।

তেজচন্দ প্রতাপচন্দের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন ইংরাজী শিক্ষক গোলকচাঁদ ঘোষের কাছে। কিন্তু স্নেহের দুলাল প্রতাপচন্দ সব সময় বয়স্যবর্গের সঙ্গে আমোদ প্রমোদেই সময় কাটাতেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তেজচন্দের কাছ থেকে রাজ্যভার গ্রহণ করলে হেষ্টিংস প্রতাপচন্দকে ৪৯৭০ টাকা মূল্যের জিনিষ দিয়ে খেলাত দান করেন। সেই সময় কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রীঃ) চলছিল। কিন্তু প্রতাপচন্দ দেখলেন যে, চিরস্থায়ী নামেই। পত্তনিদারগণ মহালের খাজনা না দিলে তাঁর পক্ষে বার্ষিক রাজস্ব কোম্পানীকে পরিশোধ করা সম্ভব নয়। পত্তনিদারগণ ছুতোনাতায় খাজান বাকী রাখতে লাগলেন। প্রতাপচন্দ ঠিক করলেন, রাজ্যের রাজস্ব বাকী থাকলে যেভাবে কোম্পানী জমিদারী নিলাম করে টাকা আদায় করেন, সেইভাবে পত্তনিদারদের বাকী খাজনার দায়ে যদি মহাল নিলাম করা হয়, তবে গভর্ণমেণ্টকে নিয়মিত রাজস্ব পরিশোধ করা সহজ হবে। এই মর্মে প্রতাপচন্দ গভর্নমেণ্টের কাছে যুক্তি দিয়ে মহাল নিলাম করার ক্ষমতা চাইলেন ও জমিদারী যাতে সত্যসত্যই চিরস্থায়ী

থাকে তাঁর ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানালেন। তদনুযায়ী গভর্ণমেন্ট ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮ম আইন প্রণয়ন করেন (Regulation Act VIII of 1819), এইভাবে সুকৌশলে মহারাজ প্রতাপচন্দ নিজের জমিদারী চিরস্থায়ী করলেন ও বঙ্গের অন্য জমিদারদের বাঁচিয়ে দিলেন। এই আইনের বলে জমিদারগণ বছরে চারবার কিস্তিতে গভর্ণমেন্টকে রাজস্ব দিতে পারবেন, কিন্তু পত্তনিদারগণকে মাসে মাসে খাজনা পরিশোধ করতে হত এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর বাকী খাজনার দায়ে মহারাজা পত্তনিদারদের মহল নিলাম করে খাজনা আদায় করতে পারতেন।

প্রতাপচন্দ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কারও দাম্ভিকতা সহ্য করতে পারতেন না। সেইজন্য গভর্ণর ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ তাঁকে সমীহ করতেন। সৈনিক বিভাগের সিবিল সার্জেন ডাক্তার স্কট, দিনেমারদিগের গভর্ণর মিঃ ওখারেক সাহেব তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। জেলা পর্যায়ের পদস্থ কর্মচারী বা ম্যাজিস্ট্রেটকে তিনি পাত্তা দিতেন না। প্রতাপচন্দ মদ্যপ ছিলেন বলে বাবা তেজচন্দ তাঁকে মোটেই ভালোবাসতেন না বরং মদ্যপানের জন্য ঘৃণা করতেন। কিন্তু প্রতাপচন্দ সাধক কমলাকান্তের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি কমলাকান্তের শ্যামাপূজার জন্য বার্ষিক বৃত্তি নির্ধারিত করে দেন এবং মন্দিরের সামনে নাটমন্দির নির্মাণ করান।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ নভেম্বর দেওয়ান পরাণচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হলে শোনা যায়, প্রতাপচন্দ এই সংবাদে বিমর্ষ হন। তিনি তাঁর বয়স্য নন্দলাল, বসন্তলাল, ও ভৈরবলালবাবুকে নাকি বলেছিলেন, 'পরাণচাঁদের এই পুত্রটি অষ্টমগর্ভের সন্তান, এই বালক নিশ্চয়ই রাজা হবে এবং বৰ্দ্ধমানের রাজসিংহাসনে বসবে। আমার কাল পূর্ণ হয়েছে, শীঘ্রই আমাকে এই সংসার পরিত্যাগ করতে হবে।' এই শিশুই পরবর্তী কালে মহতাবচন্দ বাহাদুর নামে বৰ্দ্ধমান রাজসিংহাসনে বসেন। প্রতাপচন্দ কাঞ্চননগরস্থিত বারদ্বারী বিলাসভবনে অধিক রাত্রি পর্যন্ত বয়স্যদের নিয়ে নর্তকী ও গায়িকার সুললিত নৃত্য গীত পানভোজনের মাধ্যমে উপভোগ করতেন। সন ১২২৭ সালের পৌষ মাসে এইভাবে অধিক রাত্রি পর্যন্ত প্রমোদ উপভোগ করায় প্রতাপচন্দ হঠাৎ অসুস্থ হন। তাকে রাজবাটিতে আনা হয়। প্রতাপচন্দ একটু সুস্থ হলে বয়স্যগণের পীড়াপিড়িতে আবার প্রমোদভবনে পানভোজন ও রাত্রিজাগরণে অসুস্থ হন। এ সময় তাঁর শিরঃপীড়া দেখা দেয়। রাজবৈদ্য মানকর নিবাসী রাজবল্লভ কবিরাজ ঔষধ দিলেও তিনি নাকি বলেছিলেন, মহারাজ আর বেশিদিন বাঁচবেন না। এই অবস্থায় মহারাজের উচিত অম্বিকা কালনায় গিয়ে গঙ্গার তীরে অবস্থান করা। যখন কিছুতেই প্রতাপচন্দের শিরঃপীড়া বন্ধ হয় না, তখন তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতা তেজচন্দকে কিছু না বলেই পালকি যোগে অম্বিকা চলে যান। সেখানে সাময়িকভাবে পীড়ার উপশম হলেও আবার তাঁর প্রচণ্ড জ্বর, শিরঃপীড়া হয়। চোখ ও মুখ রক্তবর্ণ হয়ে জ্বালা করতে থাকে। প্রতাপচন্দ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে থাকেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে

অম্বিকায় গঙ্গার তীরে তাঁর অন্তর্জলি প্রস্তুত করা হয়, যাতে তিনি সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করতে পারেন। ঘাসীরাম পুরোহিত তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। রাজবংশের নিয়মানুযায়ী কোন মহারাজ বা মহারাণী অপুত্রক থাকলে, রাজপুরোহিতই তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। অম্বিকাতে মহারাজ প্রতাপচন্দের সমাধি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রতাপচন্দের দুই স্ত্রী— আনন্দময়ী দেবী ও পেয়ারীদেয়ী দেবী। পেয়ারীদেবী মুর্শিদাবাদ নিবাসী টোডরমল মেহেরার কন্যা। আনন্দকুমারীর পিতা গোপালচন্দ মেহেরা লাহোরের অধিবাসী। মহারাজ অপুত্রক ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। গুজব ছড়িয়ে যায়, মহারাজ তেজচন্দ বাহাদুরের শ্যালক পরাণচন্দ বাবু তাঁর পুত্র চুনীলাল কাপুরকে সিংহাসনে বসাবার জন্য কৌশলে প্রতাপচন্দকে জীবন্মৃত অবস্থায় অম্বিকা কালনায় নিয়ে যান ও সেখানে জোর করে দাহ করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দাহ করার পূর্বে প্রবল ঝড়বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেওয়ায় শবযাত্রীরা পালিয়ে যান। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলে শবযাত্রীরা পূর্বোক্তস্থানে ফিরে গিয়ে দেখেন, লাশ নেই এবং বর্দ্ধমানে অসত্য প্রচার করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে প্রতাপচন্দের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয় অম্বিকার গঙ্গাতীরে। প্রতাপচন্দ গত হয়েছেন শুনে তাঁর স্ত্রী বিধবা বেশে রাজঅন্তঃপুরে ধর্ম কর্ম নিয়ে দিন গুজরাণ কবতে থাকেন।

জাল প্রতাপচন্দ

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের কেশবগঞ্জে একজন সৌম্যদর্শন দীর্ঘকায় সন্নাসী আসেন। তাঁকে অনেকেই মহারাজ প্রতাপচন্দ বলে সন্দেহ করেন। এই সংবাদ প্রচার হলে দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা ছোট মহারাজকে দেখতে কেশবগঞ্জে সন্ন্যাসীর আশ্রমে আসেন। সন্ন্যাসী নিজেকে প্রতাপচন্দ বলে পরিচয় দেন ও অনেক গোপন তথ্য বলতে থাকেন। রাজ্যবাসী দেওয়ান পরাণচন্দ কাপুরের অসদাচরণে এমনিতেই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁর উপর নিজের নাবালক পুত্র চুনীলাল কাপুরকে তেজচন্দের দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করাতে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তাতে বর্দ্ধমানবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। নাবালক পুত্র চুনীলালকে মহতাবচন্দ বাহাদুর হিসেবে সিংহাসনে বসিয়ে পরাণচন্দ রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। এই সব কারণে সন্ন্যাসীকে সকলেই ছোট রাজকুমাররূপে গ্রহণ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ফলে সন্ন্যাসীর খাতির বেড়ে যায়, সন্ন্যাসীও তার সুযোগ গ্রহণ করে প্রচার করলেন, যে তিনি বাস্তবিক মারা যান নি। পরাণচন্দ বাবুরা কৌশলে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেন এবং এই কারণে তিনি মৃত্যুর ভান করেছিলেন ও দুর্যোগের সময় নিরুদ্দেশ হন। বহু তীর্থ ঘুরে তিনি আবার এখানে ফিরে এসেছেন। নাবালক পুত্র মহতাবচন্দ বাহাদুরের হয়ে

দেওয়ান পরাণচন্দ তখন রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন। তিনি এই জাল প্রতাপচন্দের হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষার জন্য জেলা কালেকটার সাহেবকে আবেদন করেন ও সন্ন্যাসীকে বর্দ্ধমান ষ্টেশনের উত্তর পূর্বদিকে বিতাড়িত করেন। সন্ন্যাসী ঐ অঞ্চলেই আশ্রম স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। রাজবাড়ি থেকে সন্ন্যাসীকে 'বাজেপ্রতাপ' আখ্যা দেওযায় ঐ অঞ্চলের নাম হয়ে যায় বাজেপ্রতাপপুর। সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানরাজের প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা রুজু করলেন। অপরদিকে জাল নাম গ্রহণ করায় সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে রাজবাড়ির পক্ষ থেকেও আদালতে মামলা কবা হল। ধনী ব্যক্তি ও বিষ্ণুপুরাধিপতি সন্ন্যাসীকে অর্থ সাহায্য দিয়ে মামলা চালাতে সাহায্য করেছিলেন। সন্ন্যাসীর পক্ষের সাক্ষীগণ তাকে প্রতাপচন্দ এবং বিপক্ষের সাক্ষীগণ সন্ন্যাসীকে কৃষ্ণনগর বাসী শ্যামলাল ব্রহ্মচারীর পুত্র কৃষ্ণলাল বলে সনাক্ত করেন। এই মোকদ্দমার সাত বৎসর পূর্বে মহারাজ তেজচন্দ প্রতাপচন্দের স্ত্রী অর্থাৎ তাঁর পুত্রবধুদের সঙ্গে মোকদ্দমায় আদালতে যে জবানবন্দী দিয়ে ছিলেন তাতেও উল্লেখ ছিল যে প্রতাপচন্দ অম্বিকার গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে মারা যান ও ঘাসীরাম পুরোহিত নিজে প্রতাপচন্দের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এইসব জবানবন্দীর নকল সন্ন্যাসীকে জাল প্রতিপন্ন করতে আদালতে উপস্থাপিত করা হয়। অবশেষে আদালতে সন্ন্যাসী নিজেকে প্রতাপচন্দ বলে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন ও, জালিয়াতির দায়ে সন্ন্যাসীর কারাদণ্ড হয়। মহতাব চন্দের সিংহাসনও নিষ্কণ্টক হয়। কারামুক্তির পর সন্ন্যাসী কলিকাতায় অবশিষ্ট জীবন কাটান। এই মামলা নিয়ে সে সময়ে জনসাধারণের মধ্যে বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি হয়।

দশম অধ্যায়

বৰ্দ্ধমানে রেনেসাঁর প্রতিক্রিয়া

সতীদাহ প্রথা ও রাজা রামমোহন

সতীদাহ্ প্রথা আমাদের সমাজের কলঙ্ক। মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবিত স্ত্রীকে একরকম জোর করে পুড়িয়ে পৈশাচিক নৃত্য করত সেকালের পাষণ্ডগণ। বর্দ্ধমানও তার থেকে পিছিয়ে ছিল না। সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা, বেনারস ও বেরিলি সেকটারে ১৮১৫ খ্রীঃ হ্তে ১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত এই চোদ্দ বছরে বিধবাদের স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হয়েছে বা 'সতী' করা হয়েছে ৮১৩৪ জনকে। তার মধ্যে সবচাইতে বেশী সতীর সংখ্যা কলিকাতা বিভাগে ৫,১১৯ জন। এর মধ্যে কেবল বৰ্দ্ধমানেই সতীর সংখ্যা ৮২৮ অর্থাৎ শতকরা ১৮, নদীয়াতে ৮২৮, কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৫৩৫ জন, ২৪ পরগণায় ৩০৮ জন এবং জঙ্গলমহলে ৩৬৯ জন। অর্থাৎ বর্দ্ধমানে সতী হওয়ার সংখ্যা সর্বাধিক। বর্দ্ধমান শহরের তেজগঞ্জ এলাকায় নূতন কলোনীর কাছে সতীর মাঠ আছে। এই নির্দিষ্টস্থানে যাঁরা সতী হয়েছেন তাদের শ্মশানের উপর এখনও তিনটি সতীর মন্দির ভগ্ন অবস্থায় রয়েছে। আর একটির কেবল বেদীর অংশটুকু আছে, উপরের অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। এই মন্দিরগুলি দেখতে শিব মন্দিরের মত, আকৃতিতে খুবই ছোট। জিজ্ঞাসা করলে, স্থানীয় লোকেরা এককথায় সতীর মাঠ ও সতীর মন্দির দেখিয়ে দেন। লেখক গত ১৭ ডিসেম্বর '৮৯ স্বয়ং ঐ স্থান পরিদর্শন করেছেন। এলাকাটি এতদিন বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। প্রাচীর দেওয়া ঘেরা মাঠটি পরিষ্কার করে এক নবদ্বীপের সাধু গিরিমহারাজ তাঁর এক স্থানীয় শিষ্যকে এখানে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। এই সাধু ঐ মাঠটিতে একটি কুটির নির্মাণ করে কালীমূর্তির পূজা করেন, তিনিই সতীর মন্দিরগুলি পরিষ্কার করেছেন। এছাড়া তেলমারুই রোডে ও রাজগঞ্জে একটি করে সতীর মন্দির আছে।

বর্দ্ধমানের তৎকালীন কার্যকারী জেলাশাসক বা কালেক্টার (Acting Magistrate E. Melony) ই, মেলনি যিনি নিজে অনেক সতীর ঘটনা দেখেছিলেন, তিনি মন্তব্য করেছেন 'I have never met an instance of a Hindu woman, of whatever rank, who could write her name. Women were not better informed than men and not reasoned themselves' উইলিয়াম এভার (William Ever) সতীপ্রথা উচ্ছেদের একজন অন্যতম প্রবক্তা মন্তব্য করেছেন, "Education of Hindu women precludes the possibility of their having themselves any acquaintance whatever with the Shatras" সতী হওয়ার



সতীমন্দির

কারণ– (১) আমাদের মেয়েরা নিরক্ষর ছিলেন, ফলে বাইরের জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিলেন, (২) সতী হওয়ার ঘটনা যত না শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয়, তার চাইতে এই অশিক্ষিত মেয়েদের কাছে পুরুষশাসিত সংসারে প্রথাই ছিল সবচাইতে শিরোধার্য, (৩) বৈধব্য যন্ত্রণা ও সমাজের লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি পেতে। বর্দ্ধমানের জেলা শাসক ই, মেলনি তাঁর রিপোর্টে আরও মন্তব্য করেছেন, "Seeing the performance of the ceremony has convinced me more and more of the truth of what I have advanced and I am persuaded, in my mind, that 99 out of 100 women sacrifice themselves more under the influence of infatuation than from any conviction of their mind" [–How Hindu Burnt their women –V. N. Dutta (Sunday Magazine 24th July) 1988]

সতীদাহ প্রথা রহিত করার জন্য বর্দ্ধমানেও আন্দোলন সুরু হয়। রামমোহন বর্দ্ধমানেও এসেছিলেন। সরকারী অফিসারগণ সতী প্রথার বিরোধী হলেও কোথাও প্রকাশ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়েছেন এমন নজীর পাওয়া যায় না। বঙ্গপ্রদেশের কলকাতা বিভাগের মধ্যে বর্দ্ধমানে 'সতীর' সংখ্যা সবচাইতে বেশী হওয়ার একটা কারণ হচ্ছে—তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা। সম্পত্তির অংশ যাতে বিধবা না পায় তারজন্য বাড়ীর মেয়েরাই সতী হবার জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিত শ্মশানে। পুরুষরা ঐ স্ত্রীকে কাপড় ঢাকা দিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে জ্বলন্ত চিতায় তুলে দিত এবং দেহের সঙ্গে বাঁশ ও কাঠ বেঁধে দিত যাতে পালাতে না পারে।

গ্রামাঞ্চলের সতী হওয়ার ঘটনা সব সময় সরকারী নথীভূক্ত হত না। কারণ থানা, দারগা, চৌকিদার, ফাঁড়িদার, বা দফদারগণ সব সময় সক্রিয় ছিল না। সংবাদ সংগ্রহেও গাফিলতি ছিল। আবার অনেক সময় ফাঁড়িদার থেকে সুরু করে থানাদারগণ একে ধর্মীয় ব্যাপার বলে সমর্থন করত। এই সময়টা বর্দ্ধমান রাজপরিবারও বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মারাঠাদের অত্যাচার, বহিঃ শত্রু আক্রমণ প্রভৃতিতে জেরবার হয়ে পড়লে সমাজের এই নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ক্রিয়াকলাপের দিকে তেমন নজর ছিল না। অবশেষে এই নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদের জন্য লর্ড বেণ্টিক ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ করে আইনের সপ্তদশ ধারা (Regulation on XVII of 1829) প্রবর্তন করেন।

মহতাবচন্দ বাহাদুর (1832-1886)

প্রতাপচন্দের মৃত্যুর পর পুনরায় তেজচন্দ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তেজচন্দকে প্রজারা খুবই ঘৃণা করতেন। কারণ তেজচন্দ ৬০ বৎসর বয়সে পরাণচন্দ বাবুর একাদশ বর্ষীয়া কন্যা বসন্তকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে পরাণচন্দই রাজ্যের সর্বময়কর্তা হয়ে ওঠেন। প্রতাপচন্দের পরলোকগমনের পর তেজচন্দের কোন বংশ না থাকায় পরাণচন্দ নিজপুত্রকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করতে ও নিজ নাবালিকা কন্যা বসন্তকুমারীকে বিবাহ করতে তেজচন্দ্রকে পরামর্শ দেন। বলাবাহুল্য তেজচন্দ পরাণচন্দের ক্রীড়নক হিসাবে তার ইচ্ছা পূরণ করেন। এতে তেজচন্দ সম্পর্কে জনমনে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়। এই দত্তক পুত্রই মহতাবচন্দ বাহাদুর নামে খ্যাত হন। গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৩ খ্রীঃ ১২ নভেম্বর তেজচন্দকে খেলাত ও সম্মানসূচক পত্র উপহার দেন। তেজচন্দ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ ই আগষ্ট ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তখন দত্তকপুত্র বালক মহতাবচন্দ বাহাদুর বর্দ্ধমান রাজের বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার হন। মহারাণী কমলকুমারী ও তাঁর ভ্রাতা পরাণচন্দবাবু ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নাবালক মহতাবচন্দের অভিভাবক ও বর্দ্ধমান রাজ্যের অছি নিযুক্ত হলেন। নাবালক পুত্রের নামে রাজকার্য পরিচালনায় কমলকুমারী খুবই দক্ষতা

দেখিয়েছিলেন। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক কমলকুমারীকে খুবই সম্মান ও সমীহ করতেন। তেজচন্দের পরলোকগমনে কমলকুমারীকে সান্ত্বনা দিয়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে আগষ্ট উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ফোর্ট উইলিয়ম থেকে যে পত্র লেখেন তাতে এই পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাণী কমলকুমারী তদুত্তরে শীঘ্রই মহতাবচন্দকে মহারাজাধিরাজ উপাধি ও খেলাত দান করার জন্য গভর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্ককে অনুরোধ করে পত্র লেখেন। তারপরেই নাবালক মহতাবচন্দকে মহারাজাধিরাজ উপাধি ও খেলাত দান করেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ই অক্টোবর। বালক মহতাবচন্দ বিদূষী মহারাণী কমলকুমারীর তত্ত্বাবধানে লালিত হন। মহারাণী মহতাবকে ইংরাজী শিক্ষায় পারদর্শী করেন। চার্লস এডওয়ার্ড ট্রিবিলিয়ন সাহেব বালক মহতাবের ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি দেখে কতকগুলি ইংরেজী পুস্তক পুরস্কার দিয়েছিলেন। লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক মহতাবকে মহারাজাধিরাজ উপাধি সনন্দ ও খেলাত দেন তা নিম্নরূপ:

জামা, নিমা আস্তিন, পাগড়ি, বদি, গোসওয়ারি, কোমরবন্দ, শিরপেঁচ পোষাক যার মূল্য চারশ পাঁচ টাকা। মোতির মালা ১ ছড়া মূল্য আঠারোশ টাকা, শিরপেঁচ ও তেগা মূল্য দেড় হাজার টাকা। আর কমলকুমারী পেয়েছিলেন শাল একজোড়া মূল্য এগারোশ টাকা, ঢাকাই মলমল মূল্য বেয়াল্লিশ টাকা, গুলবদন একখানি মূল্য আট টাকা। মহতাবচন্দ সাবালক হলে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল পুনরায় যে খেলাত দেন তা নিম্নরূপ:

জেগা শিরপেঁচ, গোসওয়ারী, কলগা, মোতির মালা, পাগড়ি, জামা, নিমা আস্তিন, কোমরবন্দ, বদি, ছাতা, আড়ানি, হস্তী, হাওদা, ঘোড়া, ঢাল, তলওয়ার ও ঝালরদার পাল্কী মোট সতের দফা। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মহতাবচন্দ বাহাদুর পরাণচন্দের কাছ থেকে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে স্বহস্তে রাজ্য পরিচালনা করতে থাকেন। মহতাব বিদ্বান, বিদ্যোৎসাহী, কুশলী ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। তাঁর কর্মকুশলতায় কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর মহতাবচন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহারাজ তেজচন্দের শ্যালক পরাণচন্দ কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর পূর্বনাম চুনীলাল কাপুর। তেজচন্দ দত্তকপুত্র গ্রহণ করার পর রাজ্যাভিষেকের নাম হয় মহতাবচন্দ। যখন চুনীলালের বয়স সাত বছর তখন তাঁকে তেজচন্দ দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। পরাণচন্দের ভগিনী কমলকুমারীর এবং পরাণচন্দের কন্যা বসন্তকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন তেজচন্দ।

সুতরাং পরাণচন্দ ছিলেন শ্যালক ও শ্বশুর এবং এই সূত্রেই নাবালক মহতাবচন্দের আমলে ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা। মহতাবচন্দ প্রথম বিবাহ করেন পাঞ্জাব প্রদেশের প্যারীলাল কাপুরের কন্যা নয়ন কুমারীকে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী, কিন্তু

নয়ন কুমারী একটি কন্যা জন্ম দিয়েই ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই পরলোকগমন করেন। এই কন্যার নাম শ্রীমতী ধনদেয়ী দেবী বিবিজী। মহ্‌তাব দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুন। এই দ্বিতীয়া মহারাণী হলেন অযোধ্যা প্রদেশের কেদারনাথ নন্দের কন্যা নারায়ণ কুমারী দেবী। কেদারনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশগোপাল নন্দে। কন্যার সঙ্গে মহারাজার বিবাহ দিয়ে তিনি এই বর্দ্ধমানেই বসবাস করতে থাকেন। মহ্‌তাবচন্দও নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনিও তেজচন্দের মত শ্যালক বংশগোপাল পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। রাজ্যাভিষেকে তার নাম হয় আফতাবচন্দ। বংশগোপালের নামে বর্দ্ধমান টাউন হল স্থাপিত হয়—বংশগোপাল টাউন হল।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী মহারাণী কমল কুমারী পরলোকগমন করেন। অম্বিকা কালনায় যথারীতি তাঁর সমাধি সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। মহ্‌তাবচন্দ মা কমল কুমারীকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করতেন। কখনও মায়ের আদেশ অমান্য বা লঙ্ঘন করতেন না। যে কোন রাজকার্যে জটিলতা দেখা দিলে তিনি মায়ের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কমল কুমারীও মহ্‌তাবকে নিজপুত্রের অধিক ভালবাসতেন। মহারাণী যা বৃত্তি পেতেন তার সঞ্চিত বিপুল অর্থ মহ্‌তাবকে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই অর্থেই বর্তমান রাজবাড়ি যার নাম 'মহ্‌তাব মঞ্জিল', প্রশস্ত রাজপথ ও মনোরম উদ্যান প্রস্তুত করে বর্দ্ধমান নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। মহারাণী কমল কুমারী যে কেবল রাজকার্যেই দক্ষ ছিলেন তা নয়, গৃহকর্ম ও সংসার প্রতিপালনেও তিনি নিপুণ ছিলেন। গরীব, দুঃখী ও অনাথদের তিনি অকাতরে সাহায্য করতেন। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের বিপদে তিনি ছিলেন অগ্রণী। গৃহকর্মে তিনি মা আনন্দময়ী। পুরাতন ঘি, পুরাতন গুড়, পুরাতন তেঁতুল তিনি সংগ্রহ করে রাখতেন। কারও দরকার পড়লে তৎক্ষণাৎ দান করতেন। কমল কুমারীর নামেই বর্দ্ধমানের পশ্চিমদিকস্থ বৃহৎসাগর 'কমল সায়র' এবং রাজবাটী সংলগ্ন বালিকা বিদ্যালয় 'মহারাণী অধিরাণী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়।

মহ্‌তাবচন্দ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের আদেশে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ছ পাউণ্ড গোলার দশটি তোপ কিনে নেন। এগুলি এখনও রাজবাটির সম্মুখে স্থাপিত আছে।

বর্দ্ধমান রেলষ্টেশনের পত্তন (১৮৫৪ খ্রীঃ-১৮৫৫ খ্রীঃ)

কলকাতার পরেই বর্দ্ধমান পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। কারণ কৃষি ও শিল্পের উদ্যোগ। আসানসোল ও রাণীগঞ্জে ভূগর্ভে সঞ্চিত কয়লা যাকে বলা হয় কালোহীরে বা Black Diamond এবং সদর-কালনা-কাটোয়ার সবুজ শস্যক্ষেত্র

এই শিল্পোদ্যোগকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইংরেজ সরকার রেলপথের ক্রম বিস্তৃতি ঘটিয়েছে নিজেদের স্বার্থে অধিক অর্থ আত্মসাতের তাগিদে। কিন্তু তাতে দেশেরও উপকার হয়েছে, জনগণের যোগাযোগের ব্যবস্থা সুগম হয়েছে। হাওড়া ষ্টেশন থেকে বর্দ্ধমান ও পরে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বিস্তৃতি কালোহীরে আহরণের স্বার্থেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুরদাদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বাঙালিদের মধ্যে স্বনামধন্য ব্যক্তি যিনি Karr Tagore and Co র একজন অংশীদার ছিলেন। এই কোম্পানীই রাণীগঞ্জ এলাকার কয়লাখনিগুলির মালিক ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছেড়ে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট এক হাজার অতিথি যাত্রী নিয়ে ১০৮ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে সাড়ে বারো ঘন্টায় বর্দ্ধমান পৌঁছায়। পরবর্তী ছ মাসের মধ্যে রেলপথ বর্দ্ধমান থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত তৈরী হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী। বঙ্গের তৎকালীন গভর্ণর লর্ড ডালহৌসী হাওড়ায় পতাকা নেড়ে ট্রেন যাত্রার উদ্বোধন করেন। বর্দ্ধমানে ট্রেনটি এসে পৌঁছালে যাত্রীদের নিয়ে শহরবাসী উৎসবে মেতে ওঠেন। 'If the Howrah be the basement of the second rail babe of the Indian subcontinent. Bardhaman is the bolster of its big leap forward. * * * The first train of the East India Railways in this part of the country steamed off on 15th August 1854, and again within 6 months of its inception the Railway was extended up to Ranigang on 3rd February 1855'– Bounteous Bardhaman published by E. Railway on 30. 1. 87. বর্দ্ধমান ষ্টেশনের এই প্রথম দিনটি ছিল উৎসব ও আনন্দোল্লাসে ভরপুর। বর্দ্ধমান রাজবাটি থেকে হাতি, ঘোড়া, ও ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে রাজপরিজনদের অনেকেই গিয়েছিলেন ষ্টেশনে আনন্দোল্লাসে যোগ দিতে। শহরবাসী ভেঙে পড়েন এই উৎসবে যোগ দিতে।

সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫ খ্রীঃ) ও সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭খ্রীঃ)

যাঁরা বলেন, ভারতবাসী বিনা প্রতিবাদে ইংরেজ শাসন মেনে নিয়েছিল তাঁরা অতীত ইতিহাসকে বিকৃত করেন। স্বৈরাচারী ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে, ইংরেজ প্রবর্তিত অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, যে ইংরেজদের শোষণ ও শাসনের প্রতিবাদে এদেশে অশিক্ষিত কৃষক, মজুর, আদিবাসীরাই প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারই পরিণতি হলো নৌবিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং সিপাহী বিদ্রোহ। ইংরেজদের কাছে নীল ব্যবসায় ছিল বেশ লাভজনক। তাই ইংরেজরা চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করত। নীলগাছের চাষ

করে খুব কম দামে চাষীরা নীলগাছ সাহেবদের কাছে বিক্রয় করত। তা থেকে নীল প্রস্তুত করে সাহেবরা ইংলণ্ডে চালান করত বেশ লাভজনক দরে। যে সাহেবরা নীলগাছ কিনত তাদের বলা হত নীলকর ও যেখানে এই নীল প্রস্তুত হত তাকে বলত নীলকুঠি। বর্দ্ধমান জেলা ও বাঁকুড়াতে এরকম নীলকুঠি অনেক ছিল। নীলকর সাহেবরা কৃষকদের যে শুধু কম দামে নীলগাছ কিনে ঠকাত তাই নয়, তাদের উপর জুলুম করে অর্থ আদায় করত। কৃষক পরিবারের মা বোনদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে কখনও কখনও নীলকুঠিতে পাঠাতে হত। এইসব অত্যাচারের প্রতিবাদে অতীষ্ঠ হয়ে নীলচাষীরা বিদ্রোহ করে।

বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, মানভূম, ধলভূম, ছোটনাগপুর ও পালামৌ জেলার বিস্তীর্ণ বনভূমিতে বাস করতেন শান্তিপ্রিয়, সরল এক কৃষিজীবি সম্প্রদায় নাম– সাঁওতাল। কঠোর পরিশ্রম করে তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানীর রাজস্বের অধীনে আসে। জমিদার ও তার দোসর ইংরেজ কোম্পানীর হাত থেকে রেহাই পেতে এইসব আদিবাসীরা নিজ বাসভূমি ত্যাগ করে রাজমহল ও মুর্শিদাবাদের একাংশে বনভূমিতে আশ্রয় নিয়ে কৃষি কার্য সুরু করেন। কিন্তু এখানেও জমিদার ও সাহেবদের অত্যাচারে জর্জরিত হলেন এইসব আদিবাসীগণ। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুন ভাগনা দীঘির মাঠে দশ হাজার সাঁওতাল সমবেত হয়ে স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। 'সিধু ও কানু' নামে দুই ভাই এর নেতৃত্বে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুন বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমে ৫০ হাজারে পৌঁছে। ভাগলপুর থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে তারা স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য বলে ঘোষণা করে। এক একটি স্থানে দশ হাজার করে বিদ্রোহী সাঁওতাল দায়িত্ব নিয়ে বিদ্রোহ পরিচালনা করতে লাগলেন। সাঁওতালরা রেলষ্টেশন, ডাকঘর, থানা, ইউরোপীয়দের বাংলো, নীলকুঠি আক্রমণ করল। কার্যতঃ এই অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের দমনের জন্য ইংরেজ সেনাপতির নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরিত হয় কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে ফিরে আসে।

বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশকে বর্দ্ধমানরাজের সাহায্য

এই সময় বর্দ্ধমানরাজ মহতাবচন্দ সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ গর্ভমেন্টকে বহুভাবে সাহায্য করে ইংরেজদের প্রশংসা অর্জন করেন। ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ারে দেখা যায়:

The title of Maharaj Adhiraj Bahadur was vested to Mahatab

Chand (1832-1879), was assisted the Government in suppressing the Santhal rebellion of 1855, and who was appionted a Member of the Viceroy's Legislative Council– Imperial Gazetteer of India– Vol– IX.

বর্দ্ধমান বিভাগের তৎকালীন কমিশনার মি. জে. এচ. ইয়ং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাঁর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে (বঙ্গানুবাদ) :-

'আমি স্বচক্ষে দেখেছি, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের নিকট সরকার যখনই কোন বিষয়ের জন্য সাহায্য চেয়েছেন, মহারাজ তখনই আনন্দ ও উৎসাহে তা পূরণ করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সৈন্যগণকে উপদ্রুত অঞ্চলে প্রেরণ, তাদের খাদ্যের সুব্যবস্থা, যানবাহন সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় সংবাদ আদান প্রদান করে প্রভূত সাহায্য করেছেন বর্দ্ধমান মহারাজ। এই সময়ে সত্যই তিনি ইংরেজ হিতৈষী ছিলেন'।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ 'সিপাহীবিদ্রোহ' সংঘটিত হলে বর্দ্ধমানেও তার আঁচ লাগে। সে সময়ও মহতাবচন্দ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে যথোচিত সাহায্য করেন। তৎকালীন বর্দ্ধমান ম্যাজিষ্ট্রেট মি. এচ. বি. লফোর্ড যে রিপোর্ট দেন তাতে দেখা যায় : (বঙ্গানুবাদ)

'বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ বাহাদুর সৈন্যগণের ব্যবহারোপযোগী ৮টি হস্তী ও ১৬ খানি গো-শকট দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। বর্দ্ধমান হতে বীরভূম ও বর্দ্ধমান হতে কাটোয়া যাবার সংবাদ আদান প্রদানের জন্য রাস্তায় ৯ জন অশ্বারোহী সওয়ার নিযুক্ত করেছিলেন। ২২শে জুন থেকে ২২শে জুলাই পর্যন্ত, বর্দ্ধমান নগর রক্ষার্থে ২০ জন মানোয়ারি সৈন্য নিযুক্ত করেছিলেন। অকস্মাৎ কোন বিপদ হলে ইংরেজদের নিরাপদে থাকার জন্য রাজবাড়ির একাংশ স্থান সব সময় প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। যে সব ইংরেজদের বন্দুক ছিল না, তাদের বন্দুক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। যখন হাজারিবাগ, পুরুলিয়া, ব্যারাকপুরে সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়, তখন মহারাজা অতিরিক্ত আরও ৫০ জন অবসর প্রাপ্ত ইউরোপীয় সেনা নিয়োগ করেন। রাস্তায় পুলিশ প্রহরীগণের কার্য পর্যবেক্ষণের ও জি, টি, রোডে পানাগড় থেকে চৈতখণ্ড পর্যন্ত ঘোড়ার ডাকের বন্দোবস্ত করেছিলেন'।

—এইচ, বি, লফোর্ড, ম্যাজিষ্ট্রেট।

ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য হেতু গভর্ণর জেনারেল মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর। ভারত সরকারের সেক্রেটারী এইচ, এম, ডুরেণ্ড তার বার্তায় একথা জানান যে ভারতীয়দের

মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন একাধিক্রমে তিন বছর। সদস্যপদের প্রাপ্ত ভাতা এককালীন ত্রিশহাজার টাকা মহারাজ আলিপুরে পশুশালায় দান করেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ দমনে ইংরেজদের সাহায্য করার জন্য মহতাবচন্দ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নিন্দিত হয়েই থাকবেন। কিন্তু দরিদ্র, আতুর ও অনাথ ব্যক্তিদের সাহায্য, দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজার সেবাকার্য ও প্রগতিমূলক বহু কার্যের আড়ালে ব্রিটিশ তোষণ-চরিত্র ঢাকা পড়ে যায়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বাঁচাতে তিনি ধনাগার উন্মুক্ত করে দেন। নগরে ও বাইরে বিভিন্ন স্থানে অন্নসত্র খুলে দেন। জেলার বিভিন্নস্থানে রাজ বাড়ির দেবালয়গুলি থেকে অন্ন-প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। মহতাবের এই অসাধারণ বদান্যতায় বর্দ্ধমানের লক্ষ লক্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। সেবাকার্যের প্রশংসা করে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল জন লরেন্স ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল মহতাবচন্দকে যে পত্র লেখেন তার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

কলিকাতা
২০ এপ্রিল, ১৮৬৭

প্রিয় বন্ধু,

বর্দ্ধমান প্রদেশের নিঃস্ব ও দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদের প্রতি আপনার অননুকরণীয় দয়া ও দাক্ষিণ্যের বিষয় শ্রুত হয়ে আমি অতীব পরিতুষ্ট হয়েছি। এইরূপ ভয়ঙ্কর বিপৎকালে স্বদেশীয় দরিদ্রদের প্রতি আপনার বদ্যান্যতায় সাদর ধন্যবাদ জানাই।

আপনার অকৃত্রিম বন্ধু
জন লরেন্স
গভর্ণর জেনারেল।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব (১৮৬৯ খ্রীঃ)

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবে কত লোক যে মারা যান তার সংখ্যা নেই। কত বড় বড় গ্রাম যে জনশূন্য হয় তার ইয়ত্তা নেই। এর পূর্বে বর্দ্ধমানের জলবায়ু ভালই ছিল। ম্যালেরিয়ার নামগন্ধ ছিল না। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অনেকেই বর্দ্ধমানে এসে সুস্বাস্থ্য নিয়ে ফিরে গেছেন এবং স্বাস্থ্য পবিবর্তনের জন্য অনেকেই সে সময় বর্দ্ধমান আসতেন। কিন্তু হঠাৎ কেন এই কালস্বরূপ মহামারীর আবির্ভাব হল তা বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়। এই ম্যালেরিয়া দেখা দেওয়ার পর থেকেই বর্দ্ধমানের জলবায়ু ও আবহাওয়া

খারাপ হয়ে যায়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ায় যেসব গ্রাম জনশূন্য হয়ে যায় সে স্থান বনজঙ্গলে পূর্ণ হয় এবং নূতন করে ম্যালেরিয়া করাল মূর্তি ধারণ করে। আতঙ্কে বহু লোক বাড়ি, ঘর, দোর ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। ইংরেজ সরকারের সহায়তায় বর্দ্ধমানরাজ মহতাবচন্দই পীড়িত ব্যক্তিদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থাও করেন।

এই সময় মহতাবচন্দ দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করতে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসকের অভাব ছিল। কবিরাজী ঔষধ ছিল সিঙ্কোনার রস, কিন্তু রোগ উপশম সময়সাপেক্ষ। জেলায় প্রচুর সিঙ্কোনা উৎপন্ন হত। ব্রিটিশ সরকার ছ কড়ায় ন কড়ায় এই কাঁচা মাল কিনে বিলতে পাঠাতে লাগলেন। সেখান থেকে কুইনাইনের বড়ি আমদানী হত। সিঙ্কোনা থেকে রস নির্গত করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কুইনাইন তৈরীর যন্ত্রপাতি তখন ভারতে ছিল না। দু পয়সা মণ দরে সিঙ্কোনা কিনে ইংরেজরা বিলেত পাঠাত। সেখান থেকে সিঙ্কোনার রস থেকে কুইনাইনের বড়ি আসত আশী টাকা পাউণ্ডে। কী প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শোষণ চলত ভারতের উপর। এমনি কাঁচামাল আকরিক লোহা কিম্বা তুলা খুব কমদামে কিনে ইংরেজরা বিলেতে পাঠাত। সেখান থেকে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়ে বেশিদামে ভারতে আসত। ব্রিটিশের এই শোষণনীতিকে দাদাভাই নৌরজি বলতেন (Drain theory.) তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে শোষণের পরিমাপ করে বলেছিলেন, ভারত প্রতি বছরে পাঁচশ লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে। আর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন তিলক তাঁর বিখ্যাত কেশরী পত্রিকায় লিখলেন, শাঁকের করাতের মত শোষণে ব্রিটিশের কাছে ভারতকে বছরে চৌত্রিশ কোটি টাকা হারাতে হচ্ছে। কুইনাইন বড়ি এসে দেশের ম্যালেরিয়া কমালো বটে কিন্তু বর্দ্ধমান যেন সেই থেকে ম্যালেরিয়ার আবাদভূমিতে পরিণত হল। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে গাঁয়ের মানুষের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেল। পুষ্টির অভাবেও ক্রমাগত ম্যালেরিয়ার আক্রমণে পীলে সর্বস্ব উদর নিয়ে বড় হতে লাগল পরবর্তী প্রজন্ম। বনজঙ্গল ও পচা জলাতে যে মশককুলের বাস, সেই বাসভূমি নির্মূল করা হল না, শুধু কুইনাইন খাইয়ে রোগের উপশম। এ যেন গোড়া না কেটে শুধু ডালপালা ছাঁটা। অবশ্য ইংরেজরা কোনদিনই সমস্যা নির্মূল করার চেষ্টা করেনি। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বর্দ্ধমান মহারাজ মহতাবচন্দের ভূমিকার প্রশংসা করে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মে বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার ডব্লু. গ্রে যে পত্র দেন তা নিম্নরূপ:

প্রিয় মহারাজা,

গত শীতকালে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় আপনার অসীম বদান্যতায় মহামান্য গভর্ণর জেনারেল অতীব তুষ্ট হয়েছেন।

আপনারই অসাধারণ দানে পীড়িতগণের ঔষধ ও পথ্যের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হয়েছিল বলে সরকারকে কষ্টদায়ক অর্থসংগ্রহ করতে হয় নাই।

—আপনাদের চিরবিশ্বস্ত, ডব্লু, গ্রে।

দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া পীড়িত আর্তদের সেবাকার্যে বৰ্দ্ধমানরাজ মহতাবের প্রশংসা করে লেফটেন্যান্ট গভর্ণর জে, ক্যাম্বেল, বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের জুনিয়ার সেক্রেটারী এ, মেকেঞ্জিও মহতাবকে পত্র দেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ হলে মহতাবচন্দ দশহাজার টাকা সাহায্য দেন। এর প্রশংসা ও ধন্যবাদ দিয়ে বঙ্গের গভর্ণর এসলি ইডেন মহারাজকে পত্র লেখেন। এইসব পত্র রাজবাড়ির রেকর্ডে রক্ষিত আছে। ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্কে কলকাতায় দেশীয় রাজন্যবর্গ যে সম্বৰ্দ্ধনা দিয়েছিলেন তাতে মহতাবচন্দ ছিলেন মধ্যমণি। তিনি দেশীয় রাজাদেব সঙ্গে যুবরাজের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়। ভারতের গভর্ণর জেনারেল দরিদ্রদের অর্থ সাহায্যের জন্য, যে রিলিফ কমিটি করেন তাতে মহতাবচন্দকে সদস্য মনোনীত করা হয়। উক্ত কমিটির সদস্য হয়ে মহতাবচন্দ নিজ ব্যয়ে চুঁচুড়া, কালনা ও বৰ্দ্ধমানের স্থানে স্থানে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করেন। রেকর্ড থেকে দেখা যায় অন্নসত্রের এক একটি পঙক্তিতে এত লোক ভোজন করত যে পরিবেশনকারী একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে গেলে উচ্চস্বরে হাঁক দিলেও শোনা যেত না। কোন খাদ্যের প্রয়োজন হলে বিভিন্ন বর্ণের সাংকেতিক পতাকা তুলে অন্ন ব্যঞ্জনাদি আনার ব্যবস্থা করতেন। শুধু দরিদ্রদের অন্নপরিবেশন নয়, দুর্ভিক্ষ শেষ হলে দরিদ্রদের বস্ত্র ও পাথেয় খরচ দেওয়া হত। এইসব কারণে ভারত গভর্ণমেন্ট মহতাবচন্দকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী 'হিজ হাইনেস' উপাধি ও সম্মান স্বরূপ দশ তোপ দান করেন যা স্বাধীন ভূপতির কাছেও দুর্লভ। এরজন্য ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহামান্য ভাইসরয় মহতাবচন্দকে কলকাতার রাজভবনে বিশেষ সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

মহতাবচন্দের কীর্তি

মহতাবচন্দ বিশাল কীর্তির অধিকারী। জনসাধারণের হিতার্থে তিনি বিপুল অর্থব্যয় করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম বৰ্দ্ধমানশহরে একটি অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই স্কুলটি হলো বৰ্দ্ধমান শহরের মধ্যস্থানে অবস্থিত সি. এম. এস. উচ্চ বিদ্যালয়। পূর্বের নাম চার্চ মিশনারী সোসাইটিজ ইংলিশ স্কুল। এদেশীয় ছেলেদের জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেটি হল বৰ্দ্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল। শ্যামসায়রের তীরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও রাজবাটির মধ্যে রাজন্যবর্গের জন্য অপর একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। কালনায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয়

ও দাতব্য চিকিৎসালয় ও কটক জেলার অন্তর্গত কুজঙ্গ এষ্টেটে এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সুজামুঠা পরগণায় একটি করে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বর্তমান বৰ্দ্ধমান রাজপ্রাসাদের তিনিই স্থপতি। তাঁর নামেই এই প্রাসাদ মহতাবমঞ্জিল। শ্যামসায়র, কৃষ্ণসায়র, রাণীসায়রের চতুঃপার্শ্বে রমণীয় পথ ও উদ্যান তাঁরই সৃষ্টি। পরবর্তীকালে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেই সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। সুপ্রসিদ্ধ দিলখোসবাগ, রমণীয় রাজন্য উদ্যান, পশুশালা, মনোরম সরোবর, পরিখা এবং তীরস্থ নয়নমুগ্ধকর ভবন মহতাবচন্দ বাহাদুরের সৌন্দর্যপ্রিয়তার লক্ষণ। তিনি সৌখিন ও ভ্রমণ বিলাসী ছিলেন, তাই কলিকাতা, ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, দার্জিলিং, খরসান, আগ্রা, কানপুর প্রভৃতি স্থানে রমণীয় প্রাসাদ ও উদ্যান প্রস্তুত করিয়েছিলেন। এই সব জায়গায় নিজ প্রাসাদে তিনি অবসর বিনোদন করতেন।

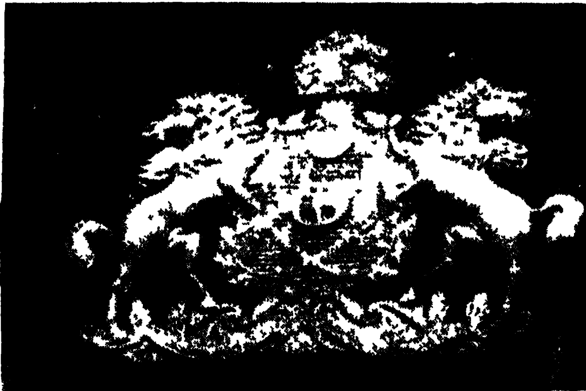
ইংরেজ গভর্ণমেন্টের অনুরোধে শক্তিগড়ে দশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি দীঘি কাটান এতদঞ্চলের জলকষ্ট নিবারণের জন্য। দার্জিলিং, খরসান, বেনারস, কাশী, পুরীধাম, কালনা, চুঁচুড়া ও বৰ্দ্ধমানের বিভিন্ন স্থানে বহু দেবালয় নির্মাণ করেন। মন্দিরগুলি বেশির ভাগই শিবমন্দির। তাঁর হাতিশালায় ছিল এগারোটি হাতি, দুটি উট। তাঁর প্রিয় হাতিটির নাম ছিল 'শেরমাল'। মহতাবচন্দ অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করে নিজ রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করেন। যেমন উড়িষ্যার কটক জেলার রাজা, কুজঙ্গের রাজা মেদিনীপুর জেলার সুজামুঠার রাজা, গোলকেন্দ্রর জমিদারী, দার্জিলিং ও খরসানের বহু নিষ্কর ভূমি তিনি কিনে নিয়েছিলেন।

মহতাবচন্দ মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ণকৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত করে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারত ইংরাজীতে অনুবাদ করে তিনি ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ ও পণ্ডিতগণকে উপঢৌকন দেন। মহতাবচন্দ মার্জিত ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাংলা, ইংরাজী, ফারসী ও হিন্দিভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে ঐসব ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। তাঁর বৰ্দ্ধমান রাজবাড়িতে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ ছাড়াও বেনারস, ইন্দোর, কাশ্মীর, বিজয়নগর, পাতিয়ালা, পান্না প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান নরপতিগণ শুভাগমন করেছেন। মহতাবচন্দের সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত তারকনাথ তর্করত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন, পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন, অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি, কমল কবিভূষণ ভোলানাথ কবিরাজ, বাদ্যবিশারদ, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সঙ্গীতজ্ঞ যদু ভট্ট, তারকনাথ সেন, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি মনীষীগণ বৰ্দ্ধমানরাজ মহতাবচন্দের রাজসভা আলোকিত করতেন। মহতাবচন্দই এই রাজপরিবারের জন্য এক বিশেষ ধরণের টুপি চালু করেন, তা 'মহতাব ক্যাপ' নামে পরিচিত।

মহতাবচন্দের সর্বোচ্চ সম্মান

ইংলণ্ডেশ্বরীর আজ্ঞানুসারে লণ্ডনের 'কলেজ অব আরম্‌স' থেকে মহতাবচন্দেব সদগুণাবলী ও রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সর্বোচ্চ সম্মান 'রাজচিহ্ন সংরক্ষণ' (Armorial Bearings) সনন্দ দেওয়া হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই সনন্দ দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন ইংলণ্ডস্থ কাউন্সেলর এডওয়ার্ড জর্জ ফিটজেলেন হাওয়ার্ড, আরল মার্শেল হেনবী ডিউক অব নর্ফোক, গ্যাথারাইস হার্ডি, চার্লস জর্জ ইয়ং গার্টার, রবার্ট লরী অব ক্লেরেন্স প্রভৃতি পদস্থ ও সম্মানীয় ইংরেজ রাজন্যবর্গ। ঐ সম্মান চিহ্ন (Court of Arms) নিম্নরূপ:

ক) মাঝখানে পুরাকালীন হিন্দুস্থানী ঢাল।
খ) তার নীচে দুইখানি তরবারি প্রসারিত।
গ) উপরে অর্ধচন্দ্র।
ঘ) সর্বোপরি একটি অশ্বের মুখ। তার গলায় নীলবর্ণের ফিতায় আবদ্ধ একখানি পদক ও তন্মধ্যে একটি পদ্মপুষ্প।
ঙ) ঢালের দুই পার্শ্বে মুখোমুখী দাঁড়ানো দুটি ঘোড়া। এদের গলায় নীল ফিতা বাঁধা তাতে ইংরাজী অক্ষরে ল্যাটিন ভাষায় লেখা– Deo Credito Justitiam Colito (অর্থাৎ ঈশ্ববের প্রতি লক্ষ্য বেখে সদ্বিচাব কব) লেখা আছে।



বৰ্দ্ধমান বাজপবিবাবেব এমব্লেম

এই সর্বোচ্চ সম্মান বৰ্দ্ধমান রাজগণ বংশ পরম্পরা ব্যবহার করতে পারবেন। তদবধি মহারাজার প্রাসাদে, মূল্যবান দ্রব্যে, দলিল দস্তাবেজ ও রাজকীয় যাবতীয় কাগজপত্রে সম্মানসূচক এই চিহ্ন ব্যবহৃত হতে থাকে।

স্যার বার্ণার্ড বর্ক কৃত 'পিয়ারেজ ও বেরোনটেজ অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে মহতাবচন্দের ঐ সম্মানসূচক সনন্দ ও বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

একাদশ অধ্যায়

জাতীয় উন্মেষের প্রাক-প্রস্তুতি পর্ব

বৰ্দ্ধমান পৌর প্রতিষ্ঠানের সূচনা

মহতাবচন্দের সময়েই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং বেঙ্গল কাউন্সিল এ্যাক্টের বলে বৰ্দ্ধমান পৌর প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে। তার সূচনা হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল। পৌরপ্রধান মনোনীত হন একজন ইংরেজ। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পৌরপ্রধান পদে কোন ভারতীয় বৰ্দ্ধমানবাসীর পক্ষে এই সম্মানলাভ করা সম্ভব হয় নাই। এই অধিকার অর্জন করতে বৰ্দ্ধমানবাসীকে বেশ আন্দোলন ও সংগ্রাম করতে হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের পূর্বাহ্নেই বৰ্দ্ধমানের এই সংগ্রাম নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের। ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পৌর নাগরিক অধিকার ও নির্বাচন সংক্রান্ত আইন পাশ হল। এই আইন চালু করার জন্য সহস্রাধিক বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্রের প্রথমেই স্বাক্ষর করেছিলেন মহতাবচন্দ। এই আবেদন পত্র সম্পর্কে তৎকালীন পৌরপতি মিঃ ই. এইচ. রাডফ মন্তব্য করেছিলেন,

It is barely a trend of the payers.......The name of Burdwan Maharaj had given weight to.

বৰ্দ্ধমানের নাগরিকদের সংগ্রামের ফলে পৌর নির্বাচন আইন পাশ হয় এবং তদনুযায়ী ১৮৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পৌরসভার প্রথম নির্বাচন হয়। তখন নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা-ছিল কম এবং সরকার মনোনীত সদস্যসংখ্যা ছিল বেশি। ১৯৩১ সালে প্রথম 'বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল' এ্যাক্ট চালু করার পর বৰ্দ্ধমান পৌরসভার কমিশনার সংখ্যা হয় বাইশ। এই প্রথম সমস্ত সদস্য সরাসরি কর দাতাদের দ্বারা নিৰ্ব্বাচিত হন এবং সরকার মনোনীত সদস্য বাতিল হয়ে যায়। জনসাধারণের ভোটে সর্বপ্রথম পৌরপতি নির্বাচিত হন রায়বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু ১৮৮৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। নলিনাক্ষ বসু ছিলেন বৰ্দ্ধমানের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি। তেলমারুই রোড তাঁর নামে নলিনাক্ষ বসু রোড নামে খ্যাত।

এই রাস্তার ধারেই নলিনাক্ষ বসুর বিরাট বাড়ি এখনও রয়েছে। বৰ্দ্ধমানের সাহিত্যসেবী রসঠাকুর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনার নির্বাচিত হলে তিনি এই পদকে 'ময়লা ফেলার কমিশনার' নামে আখ্যা দেন। কারণ তখন কমিশনারদের প্রথম কাজ ছিল রাস্তার জঞ্জাল সাফ করা ও খাটা পায়খানার ময়লা ফেলা। নলিনাক্ষবাবু চেয়ারম্যান থাকা কালে ঘরে ঘরে জল দেবার ব্যবস্থা করেন। শহরে বাবুরা জলের

জন্য এত দরখাস্ত করেছিলেন, যে তাই নিয়ে মলিনাক্ষ বাবু উকিল বারে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতেন। তাই দেখে ইন্দ্রনাথ ছড়া বাঁধলেন:

একি হল উপসর্গ, ঘরে ঘরে সংসর্গ
জল যোগানো হল বুঝ দায়,
রায় বাহাদুর টাক ফুরফুর
গাড়ু, গামছা হাতে করে ভাবছেন উপায়।

কবিতা শুনে উকিলবারে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়।

দাঁইহাট, কাটোয়া ও কালনায় পৌর প্রতিষ্ঠান

এর পাঁচ বছর বাদে কালনা দাঁইহাট, ও কাটোয়াতে পৌর প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে একইসঙ্গে ১৮৬৯ খ্রীঃ ১ এপ্রিল। কাটোয়া ও কালনা ছিল সে সময় বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। গঙ্গাপথে নৌকা ও জাহাজে মালপত্র আমদানী-রপ্তানী হত। ভৌগোলিক অবস্থানে এই দুটি প্রাচীন শহর জেলার মধ্যে সবচাইতে বড় গঞ্জ ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। ইংরেজরা প্রথম থেকেই স্টীমার ব্যবহার করত, তাঁরা নদীপথকে পুরোপুরি কাজে লাগাত। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে গঙ্গায় পলি পড়তে থাকায় বড় বড় জাহাজ আসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন জরুরী হয়ে পড়ে ব্যাণ্ডেল থেকে কাটোয়া-কালনা রেলষ্টেশন তৈরী। বর্দ্ধমান রেলষ্টেশনের পনের বছর পর অর্থাৎ ১৮৭০খ্রীঃ অব্দে কাটোয়া পর্যন্ত রেলষ্টেশনের পত্তন হয় এবং পৌরসভার সূচনা হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১ এপ্রিল। তখন থেকে রেলপথে মাল আমদানী রপ্তানী হতে থাকে।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে আছে যে মহতাবচন্দ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। মহতাবচন্দ মহর্ষির কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়, ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই রবিবার বর্দ্ধমান রাজবাটিতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্মসমাজের পরিচালনার জন্য তিনজন কর্ণধার ঠিক করা হয়। এঁরা হলেন শ্রীধর বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এবং তারকনাথ তর্করত্ন। এই সভায় মহর্ষি উপস্থিত ছিলেন। দেখতে দেখতে ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক বছর বাদে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে স্থাপিত হয় 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ'। সে সময় বাংলায় ব্রাহ্মসমাজে জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল। এই উপলক্ষে বর্দ্ধমান রাজবাটিতে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির পদধূলি পড়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই সময় দক্ষিণ বঙ্গের সহপ্রধান পরিদর্শক (Asst Chief

Inspector of Schools) হয়ে আসেন। তিনি কয়েকবারই রাজামন্ত্রণে রাজবাটিতে এসেছিলেন। কী সমাজ সেবা, কী শিক্ষাবিস্তার, কী শিল্পসংস্কৃতি তথা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মহতাবচন্দকে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে বর্ণনা করেছেন। কবি ঈশ্বরগুপ্তও রাজার আমন্ত্রণে অনেকদিন রাজবাটিতে অবস্থান করেছিলেন। বর্তমান লুপ্তপ্রায় ভবন সর্বমঙ্গলা পাড়ার উইলবাটিতে তিনি অতিথি হিসাবে প্রায় একমাস ছিলেন।

মহতাবচন্দও নিঃসন্তান ছিলেন। তাই মহারাজা তাঁর শ্যালক বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মার্চ্চ দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের নাম হয় কুমার আফতাবচন্দ। মহতাবচন্দ ৫৯ বৎসর বয়সে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে অক্টোবর ভাগলপুরে পরলোক গমন করেন। অম্বিকা কালনায় তাঁর সমাধি সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়। রাজবাড়ির দেওয়ান বনবিহারী কাপুর ও মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ টি, ডি, বর্গ মিলার খুব ধূমধামে শ্রাদ্ধ ও পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করেন। শ্রাদ্ধের দিন প্রায় এক লক্ষ কাঙালি ভোজন করানো হয় এবং তাদের প্রত্যেককে চাউল, বস্ত্র ও অর্ধমুদ্রা বিদায় দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধে ভারতের দেশীয় বাজন্যবর্গ ছাড়াও ইউরোপের বহু গণ্যমান্য, রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত অতিথি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন। এমন সমারোহে আদ্যশ্রাদ্ধ সেই সময় বঙ্গ প্রদেশে আর হয় নাই।

আফতাবচন্দ মাহতাব (১৮৭৯খ্রীঃ-১৮৮৫খ্রীঃ)

মহতাবচন্দ অপুত্রক ছিলেন, তাই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী নারায়ণ কুমারী তাঁর ভ্রাতা লালা বংশগোপাল নন্দের পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের পর তাঁর নাম হয় আফতাবচন্দ মাহতাব। মাহতাবচন্দের শেষ বয়সে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দেওয়ান-ই-রাজ বনবিহারী কাপুরই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। বনবিহারী কাপুর রাজ্যের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ টি, ডি, বর্গ মিলার সাহেবের সহায়তায় সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। যখন আফতাবচন্দের রাজ্যাভিষেক হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ বছর। কিন্তু কুশলী ও সুদক্ষ বনবিহারী কাপুর ও টি, ডি, বর্গ মিলারের কাজে ইংরেজ সরকার এমন সন্তুষ্ট ছিলেন যে আফতাবচন্দ অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকা সত্ত্বেও কোর্ট অব ওয়ার্ডে রাজ্যভার গ্রহণ না করে ঐ দুই দক্ষ কর্ণধারের হাতেই রাজ্যের সমুদয় দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। বনবিহারী খুবই জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁর নামেই বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ রোডের বড়বাজারস্থিত প্রাসাদটির নাম 'বনোবাস কুটির' এবং যুবদের ক্রীড়াসংস্থা 'বনবিহারী এথলেটিক ক্লাব' এখনও আছে।

বনবিহারীর এই জনপ্রিয়তা রাজান্তঃপুরে অনেকের কাছে ঈর্ষার বিষয় হয়ে ওঠে। রাজমাতা নারায়ণ কুমারীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল বনবিহারীর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সহোদর ভাই লালা বংশগোপাল নন্দের হাতে রাজ্যের কর্তৃত্ব অর্পণ করা। কিন্তু কুমার আফতাবচন্দ এমন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন যে রাজমাতা নারায়ণ কুমারীর এই অনুরোধকে মোটেই আমল দেননি। তিনি বুঝেছিলেন বনবিহারীকে বিদায় দিলে, রাজ্য রসাতলে যাবে, প্রজারাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠবেন। এমন কি তৎকালীন গভর্ণর এসলি ইডেন বনবিহারীকে তার বুদ্ধিমত্তা, অমায়িকতা ও কর্মদক্ষতার জন্য যথেষ্ট সমীহ ও শ্রদ্ধা করতেন। একবার ইডেন সাহেব কুমার আফতাবচন্দকে ডেকে বনবিহারী ও মিলার সাহেবের পরামর্শানুযায়ী চলবার জন্য উপদেশও দিয়েছিলেন। তাই কুমার সাহেবও ঐ দুই কুশলীর হাতে রাজ্যভার সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

আফতাবচন্দের রাজ্যাভিষেক

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বরে গভর্ণর এসলি ইডেন, বর্দ্ধমানে এক বিশেষ রাজকীয় অনুষ্ঠানে মহারাজকুমার আফতাবচন্দকে বহুমূল্য রাজ পরিচ্ছদ, ঢাল, তরবারি, রত্নাদি খচিত শিরপেঁচ, মোতির মালা প্রভৃতি খেলাত ও লর্ড রিপণ স্বাক্ষরিত ও মোহরযুক্ত সনন্দ দিয়ে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ওই উপলক্ষে বর্দ্ধমান শহরে কয়েক দিন ধরে উৎসবের বন্যা বয়ে যায়। রাজবাটি, নগরের পথ ও পথের দু পাশের বাড়ি সুসজ্জিত করা হয়। আলোকমালায় ভূষিত নগরী যেন স্বপ্নলোকের প্রাসাদে পরিণত হয়। এছাড়া বহু স্থানে সুদৃশ্য তোরণ ও তদুপরি নহবতের বাদ্য, নৃত্য গীত, নাট্যাভিনয়, ব্রাহ্মণ ও অতিথিদের সমাগম ও আদর আপ্যায়ন, কাঙালি ভোজন, দরিদ্রদের বস্ত্র ও অর্থ বিতরণ— সে এক এলাহি ব্যাপার। ইউরোপ থেকে সাহেব বিবি এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের বাবু-গিন্নির সমাগমে শহরের জেল্লা বেড়ে যায়। বর্দ্ধমানবাসী এই আড়ম্বর ও জাঁকজমক আগে দেখেন নাই। বনবিহারী কপুর সুষ্ঠুভাবে উৎসবের তদারকি করেন। এই উপলক্ষে বিখ্যাত চিত্রকর মি. ক্যাডি দশহাজার টাকা মূল্যের খেলাত দরবারের একটি সুবৃহৎ চিত্র অংকন করেন। সেটি রাজবাটির বারদ্বারী নামক ভবনের সোপানাবলির উপর টাঙানো ছিল।

বিশাল রাজ্য, প্রভূত অর্থ ও দুর্দমনীয় যৌবনের অধিকারী আফতাবচন্দ অন্যান্য রাজাদের মতই বিলাস ব্যসনে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে যৌবনসুলভ যাবতীয় দোষের সমাবেশ ঘটেছিল তাঁকে ঘিরে। বনবিহারী কপুর ও মিলার রাজকুমারকে হিতোপদেশ ও সুপরামর্শ দিলেও তাঁর কানে সে সব কথা প্রবেশ করত না এবং শারীরিক অত্যাচারই তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ ২৪ বৎসর ৭ মাস বয়ঃক্রমে কুমার আফতাবচন্দের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর

আগে লালা লক্ষ্মী নারায়ণ খান্নার নাবালিকা কন্যা বেনদেয়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। যৌবনের উচ্ছ্বাসে গা ভাসিয়ে দিলেও কুমার আফতাব রাজবাড়ির চক্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। তিনি বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ বনবিহারী কাপুরের উপর সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। মৃত্যুর আগে বনবিহারীকে কাছে কাছে রাখতেন ও মনের আবেগে অশ্রুবিসর্জন করে কৃতকর্মের জন্য মনস্তাপ করতেন। তিনি রাজমাতা নারায়ণ কুমারী ও তাঁর পিতা বংশগোপাল নন্দের হাত হতে রাজবংশকে বাঁচাতে মৃত্যুর আগে এক চাঞ্চল্যকর দলিল প্রস্তুত করেন। তাতে তিনি নির্দেশ দেন যে 'আমার (আফতাবচন্দের) মৃত্যুর পর মহারাণী আমার ভ্রাতা অথবা ভ্রাতৃসম্বন্ধীয় কাহাকেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করতে পারবেন না'। কুমার আফতাবচন্দের মৃত্যুর পর নাবালিকা মহারাণী বেনদেয়ীদেবীকে দত্তক পুত্র গ্রহণের ব্যাপারে অশেষ বাধা অতিক্রম করতে হয়। রাজমাতা নারায়ণ কুমারী তাঁর পিতা বংশগোপাল নন্দের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করতে বেনদেয়ী দেবীকে পরামর্শ দিলে নাবালিকা মহারাণী সে প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ কুমার আফতাবচন্দ উইলে তা নিষেধ করেছেন। এ ব্যাপারে উকিল, ব্যারিষ্টার, মামলা, মোকর্দ্দমা প্রভৃতি বহু কিছু ঘটলেও মহারাণী পিতা লালা লক্ষ্মীনারায়ণ খান্নার জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রকে একে একে দত্তক গ্রহণ করার মনস্থ করলে, ঐ তিনটি সন্তানই পরলোকগমন করে। তখন পুত্রনাশের আশংকায় ভীত হয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ রাজবাড়ির কর্তৃত্বের আশা পরিত্যাগ করেন। অবশেষে বনবিহারী কাপুরের পুত্র শ্রীবিজন বিহারী কাপুরকে বেনদেয়ী দেবী ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তাঁর রাজ্যাভিষেকেব নাম হয় বিজয়চন্দ মহতাব। রাজা বনবিহারী কপুরই মহারাজকুমারের অভিভাবক নিযুক্ত হন। আফতাবচন্দের মৃত্যুর পর থেকেই বেনদেয়ী কৃচ্ছ্রসাধনে দিন কাটাতেন। সুখ-ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে বেনদেয়ী দেবী মলিনবসন পরতেন, আমোদ-আহলাদ পরিত্যাগ করে নির্জনে একাকী থাকতেন, যৎসামান্য নিরামিষ শাকান্ন গ্রহণ করতেন। অসুখ-বিসুখে ঔষধ-পথ্য খেতেন না, ফেলে দিতেন এবং অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ১৮৮৮ খ্রীঃ ১৩ মে মাত্র ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমে বেনদেয়ী পরলোকগমন করেন।

শিক্ষাবিস্তার ও দানশীলতায় আফতাবচন্দ

আফতাবচন্দ অত্যন্ত দয়ালু, শিক্ষানুরাগী ও দানশীল ছিলেন। দরিদ্র গ্রামবাসী যে কোন আবেদন করলে আফতাব সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করতেন। মেদিনীপুরে পানীয় জলের অভাব দূর করবার জন্য তিনহাজার টাকা ব্যয়ে একটি পুস্করিণী খনন করান। দশ হাজার টাকায় দার্জিলিং এ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলে বাংলার ইংরেজ সেক্রেটারী মেকেঞ্জি মহারাজকে ধন্যবাদ দিয়ে পত্র লেখেন : (বঙ্গানুবাদ)

সাধারণ হিতার্থে আপনার এতাদৃশ বদান্যতার জন্য স্যার ইডেন আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

দার্জিলিং
২৯ জুলাই ১৮৮১

এ, মেকেঞ্জি
বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী

১৮৮১ খ্রীঃ অম্বিকা কালনায় পরলোকগত মহারাজ মহতাবচন্দ বাহাদুরের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে এক বিরাট সৌধ নির্মাণ করেন। শিলালিপির শ্লোকটি হল:

ভুজযুগ সাগর শশিম শকেশ্বর
বৎসরলব্ধ বিভূতি:
পূজ্যপাদং প্রতি পদ্য পিতামতি
বর্দ্ধিত কীর্ত্তি বিভূতি:
শশিখ বসুক্ষিতি মিতশক ভূপতি
হায়ণ বাহুল মাসি।
নবম দিনে নৃপ মৌলি মুকুট কৃপ
মহতাবচন্দ গুণরাশি।

পৌরসভার জলকল (Water Works)

বন্যা ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে বর্দ্ধমানের জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে যায়। বিশেষতঃ পানীয় জলের অভাবে ও বড় বড় সরোবরের জল ক্রমশ দূষিত হওয়ায় নগরবাসীর কষ্টের সীমা ছিল না। আফতাবচন্দই বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রস্তুত করে শহরবাসীকে সরবরাহের জন্য ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা দান করেন। দামোদর নদের জল পরিশ্রুত করে এই পানীয় জল নগরবাসীকে সরববাহ কবার ব্যবস্থা হয়। লাকুরডিতে এই জলকল স্থাপিত হয়। বর্দ্ধমান রাজস্কুলটিকে তিনি কলেজে পরিণত করেন। বর্দ্ধমানের বালক বালিকাগণ বিনা বেতনে এফ্ এ পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পান। বর্দ্ধমান শ্যামসায়রস্থিত পশ্চিমদিকে নবনির্মিত কলেজ ভবনে উচ্চশিক্ষার পাঠ সুরু হয়। ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত কলেজের এই বিল্ডিং মহারাজকুমারের নামে 'আফতাব বিল্ডিং' নামে খ্যাত এবং পার্শ্ববর্তী গোলাপবাগগামী রাস্তাটি 'আফতাব এভিনিউ' নামে পুরাতন স্মৃতিকেই বক্ষে ধারণ করে আছে। কোর্ট কম্পাউণ্ডে 'আফতাব হাউস' তাঁরই নির্মিত। কলকাতার আলিপুরে যে প্রাসাদ নির্মিত হয়, তা, আফতাব ভিলা নামে খ্যাত। ঐ বছরই তিনি একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য ৯ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আফতাবচন্দ সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহ দানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি ছাত্রকে বার্ষিক ৫০ টাকা করে ১০০ টাকা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিতদেরও বার্ষিক ৫০ টা ও ১০০ টা পুরস্কার ও বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেন

এবং বেঙ্গল গভর্ণমেন্টকে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য এককালীন ৫ হাজার টাকা দান করেন। এছাড়া বৰ্দ্ধমানস্থিত গভর্ণমেন্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে চক্ষুরোগীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্মাণ করে দেন যার মূল্য কয়েক হাজার টাকা।

আফতাবচন্দের পরলোকগমনে বৰ্দ্ধমানে যে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল তা হৃদয় বিদারক। মহারাজার অকাল মৃত্যু রাজ্যবাসীর কাছে ছিল বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই।

অগণিত দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত মানুষ মহারাজকুমারের অনুগ্রহে দিন যাপন করত, তাঁরা এই মৃত্যু সংবাদে কাতারে কাতারে রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ ও পথের দুদিকে সমবেত হয়ে কাঁদতে থাকে। রাজবাড়ির মধ্যে গগনভেদী কান্নার রোল ও সকরুণ বিলাপে আকাশ বাতাস শোকাচ্ছন্ন হয়। মহারাজকুমারের শবযাত্রায় অশ্বারোহী সৈন্য, পদাতিক, অশ্বশকট, হস্তী, উট, চামরধারী অনুচরবৃন্দ, ছত্রধারী ভৃত্য প্রভৃতি হাজার হাজার শোকাভিভূত নরনারী অংশ গ্রহণ করেন। রাজপুরী অন্ধকার করে যেন তিনি অমর লোকে যাত্রা করেন।

বিজয়চন্দ মহতাব (১৮৮৫ খ্রীঃ)

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই মহারাণী বেনদেয়ী দেবী শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বনবিহারী কাপুরের পুত্র বিজনবিহারীকেই দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রাজ্যাভিষেকে তাঁর নাম হয় বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর। যেহেতু রাজকুমার নাবালক, সেহেতু কোর্ট অব ওয়ার্ড রাজা বনবিহারী কপূরকেই মহারাজকুমারের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। রাজা সাহেবের কয়েকজন অতি বিশ্বাসী ও অনুগত রাজকর্মচারী মহারাজার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন। এই দত্তক গ্রহণে রাজমাতা নারায়ণ কুমারী প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন এবং বোর্ডে আবেদন করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন বোর্ডের অস্থায়ী সেক্রেটারী মিঃ সি. ই. বকলেণ্ড তদন্ত করে গভর্ণরকে লেখেন যে এই দত্তক গ্রহণ বৈধ হবে এবং এতে সরকারের কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে অবশ্য বঙ্গের গভর্ণর স্যার স্টুয়ার্ট বেলী স্বয়ং বৰ্দ্ধমানে এসে রাজমাতা ও রাণী বেনদেয়ী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তারপরই বেনদেয়ী বিজনবিহারীকে দত্তক গ্রহণ করেন। যখন বেনদেয়ী বিজনকে দত্তক গ্রহণ করেন তখন রাজকুমারের বয়স ছ বৎসর। এর আগে শ্রীমান বিজন মাতৃহীন হন। তাই শিশুকাল থেকে মহারাণী বেনদেয়ীর স্নেহ ও যত্নে তিনি লালিত পালিত হন। মাতৃবিয়োগজনিত কোন ব্যথা বা বেদনা একদিনের জন্যও বিজনবিহারীকে অনুভব করতে হয় নাই। কিন্তু দত্তক গ্রহণের এক বৎসর পরে বেনদেয়ীর মৃত্যু হলে বালক বিজয়চন্দ আবার

মাতৃহীন হন। তখন তাঁর পিতা বনবিহারী কপুরই অসীম স্নেহ ও যত্নে রাজকুমারের মত মানুষ করতে থাকেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে বিজয়চন্দ স্বর্গীয় আফতাবচন্দ ও মহারাণী বেনদেয়ী দেবীর সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন কালনার অম্বিকায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের আদেশানুসারে বৰ্দ্ধমান রাজ ছয়শত বন্দুকধারী সৈন্য ও উনপঞ্চাশটি কামান রাখবার অধিকার লাভ করেন। বাংলায় সে সময় এত অধিক সৈন্য, বন্দুক ও কামান রাখার অধিকার আর কোন নরপতির ছিল না। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর নিবাসী ঝাণ্ডামল মেহেরোর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সহিত বিজয়চন্দ মাহতাবের শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে ভারতের ও ইউরোপের বহু গণ্যমান্য ও রাজন্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রায় দু লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। সাতদিন ধরে নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। বিশ হাজার গরীব ও দুঃখীকে চাল, বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

বিজয়চন্দের শিক্ষা ও অভিষেক

বনবিহারী কপুর বিজয়চন্দের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। বালক বিজয়চন্দ মেধাবী ছিলেন। অল্পকালের মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বুৎপত্তি লাভ করেন। এছাড়া ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, অস্ত্র চালনা প্রভৃতি শিক্ষালাভ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে অক্টোবর মহারাজ বিজয়চন্দ সাবালকত্ব লাভ করলে কোর্ট অব ওয়ার্ডের নিকট হতে বিশাল বৰ্দ্ধমান রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন। এই রাজসিক অনুষ্ঠানে বৰ্দ্ধমান শহরে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। মহাসমারোহে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও শতাধিক সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ সস্ত্রীক রাজসূয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে পাঁচদিন নাচ-গান ও পানভোজনের ব্যবস্থা হয়। নগরের নানা স্থানে তোরণ নির্মিত হয়েছিল এবং রাজপথের দু পাশে নানা বর্ণের পতাকা ও আলোক মালায় নগর যেন স্বপ্নপুরীতে রূপান্তরিত হয়। ঘোড়দৌড়, রিগেটা, অপূর্ব আতসবাজি, যাত্রা, থিয়েটার, জলসা প্রভৃতি বহুবিধ মনোরঞ্জনকারী ব্যবস্থা ছিল। প্রায় পয়ঁত্রিশ হাজার দরিদ্রকে চাল ও বস্ত্র দান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে ভাইসরয় লর্ড কার্জন দিল্লীতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মহারাজ বিজয়চন্দকে খেতাবযুক্ত সনন্দ প্রদানে সম্মানিত করেন। ঐ সময় দিল্লী ষ্টেশন হতে বড়লাট ভবন পর্যন্ত দীর্ঘপথ শোভাযাত্রা সহকারে মহারাজকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়। আবার ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী বৰ্দ্ধমান নগরে উপরোক্ত রাজসূয় অনুষ্ঠানে খেতাব ও খেলাত প্রদান করেন ভাইসরয়ের সেক্রেটারী ষ্টুয়ার্ট সাহেব। লর্ড কার্জনের সনন্দটি নিম্নরূপ:

Sanand

To

Maharaja Adhiraj Bejoy Chand Mahatab

Zemindar of Burdwan.

I here by confer upon you the title of Maharaj Adhiraj Bahadur as a personal distinction.

Sd/Curzon

Fort William Viceroy & Governor General of India

The 2nd February 1903

খেতাব ও খেলাত দান অনুষ্ঠানে বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটার বাহাদুর, মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ, বর্দ্ধমান রাজকলেজ ও বর্দ্ধমান রাজ চতুস্পাটীর ছাত্রবৃন্দ রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে মহারাজ বিজয়চন্দকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বর্দ্ধমানের ও রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিকদের এই সম্বর্ধনার উত্তরে বিজয়চন্দের বিনয় সম্ভাষণ সকলকে মুগ্ধ করে। বিজয়চন্দ সিংহাসন থেকে নেমে রাজপ্রদত্ত সনন্দখানি নিম্নে উপবিষ্ট পিতা বনবিহারী কপুরের হাতে দিয়ে দু হাতে পদধূলি মাথায় নিলে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। পিতৃভক্তির এই পরিচয়ে সকলে ধন্য ধন্য করতে থাকেন।

সিংহাসনে আরোহণ করেই মহারাজ বিজয়চন্দ Indian People's Famine Trust নামক দুর্ভিক্ষত্রাণ ভাণ্ডারে দশ হাজার টাকা দান করেন, দরিদ্র প্রজাদের বাকী দেড়লক্ষ টাকা খাজনা মুকুব করেন, বর্দ্ধমানের পয়ঃ প্রণালী নির্মাণের জন্য বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে চল্লিশ হাজার টাকা দান করেন। লণ্ডন থেকে ডিউক অব কনট দিল্লী দরবার উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষে এলে ডবলিনের পশুশালার জন্য বিজয়চন্দ ডিউককে একটি হস্তি শাবক উপহার দেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়চন্দ রাজ অতিথিরূপে ইংলণ্ড পরিদর্শনে যান।

ইম্পিরিয়েল গেজেটে পাওয়া যায়:-

Maharaja Aftab Chand (1881-5) died without heirs and his widow adopted the present Maharaj Adhiraj Bejoy Chand Mahatab Bahadur, Son of Raja Ban Behari Kapur. During his minority the estate was administered by the Court of wards, and was managed with conspicuous success by Raja Ban Behari Kapur, first as joint and later as sole manager. The Maharaja on coming of age was

installed in February, 1903, by the Lieutenant Governor of Bengal and Visited England in 1906.

(Imperial Gazetteer of India Vol IX 1908 Page 101)

বিজয়চন্দের অবদান

মহারাজ বিজয়চন্দের আমন্ত্রণে ভারতবর্ষের বড় লাট লর্ড কার্জন বর্দ্ধমান আসেন ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই উপলক্ষ্যে স্মারক হিসাবে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের প্রবেশ পথে বিজয়চন্দ একটি সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করান। এই তোরণটি STAR OF INDIA



বিজয় তোরণ (কার্জন গেট) বৰ্দ্ধমান

যা কার্জন গেট নামে খ্যাত ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর উক্ত তোরণের নাম রাখা হয় বিজয়চাঁদ রোড। প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য বিজয়চন্দকে ব্রিটিশরাজ G.

C. I. E, K. C. S. I, I. O. M, L. L. D. উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্দ্ধমান শহরে ফ্রেজার হাসপাতাল তাঁরই দানে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হলে এই হাসপাতালের নাম হয় বিজয়চন্দ হাসপাতাল। মহারাজ বিজয়চন্দের অবদান টেকনিক্যাল স্কুল, বিজয় চতুস্পাটি, টোলবাড়ি, দিলখুসা, রমনার উদ্যান 'বিজয়ানন্দ বিহার', বহু শিবমন্দির, আঞ্জুমান কাছারির দোতলা এবং সুরম্য টাওয়ার ক্লক যা বেনসন টাওয়ার ক্লকরূপে পরিচিত। বর্দ্ধমানের বাইরে তাঁর অবদান— কলকাতা আলিপুরে বিজয় মঞ্জিল নামে বিশাল প্রাসাদ, আগ্রায় কৈলাস শিবমন্দির, ঢাকা শহরে 'কালীবাড়ি' ও বর্দ্ধমান হাউস যা বর্তমানে বাংলা একাডেমী নামে পরিচিত। মহারাজ বিজয়চন্দ রাজমাতা বেনোদেয়ী দেবী নামে রাধাবল্লভ ঠাকুরবাটির দক্ষিণে একটি সদাব্রতবাটি তৈয়ার করান এবং ঈশানেশ্বরের সন্নিকটে স্বীয় মাতা প্রনবদেবীর উদ্দেশ্যে একটি অতিথিশালা নির্মাণ করান। আগ্রায় মমতাজ ও শাহজাহানের সমাধিক্ষেত্রে বহু মূল্যবান রত্নখচিত দুটি চাদর দান করেন। বর্দ্ধমানের বোরহাট অঞ্চলে মহারাজ বিজয়চন্দ 'বিজয় থিয়েটার' নামে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। পীরবাহারামে অবস্থিত শের আফগান, কুতুবউদ্দীন ও পীরবাহারামের সমাধিগুলি সংস্কার করেন এবং নূরজাহানের লাহোরে অবস্থিত সমাধিটি সুদৃশ্য করে সংস্কার করেন। এছাড়া তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবীর ইচ্ছানুক্রমে নির্মিত হয় হরিসভা বালিকা বিদ্যালয়, বর্দ্ধমান মেডিকেল স্কুল ও ছাত্রাবাস, হরিসভা, সাহিত্য পরিষদ, ডিগ্রী কলেজ প্রভৃতি। তাঁর আমলেই রাজকলেজের ছাত্রাবাসের উদ্বোধন করতে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক এসে বলেছিলেন— Maharaja's mind is bigger than his body. মহারাজার বিরাট বপুর চেয়ে মন আরও বড়। তিনিই বর্দ্ধমান রাজকলেজটিকে ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রীকলেজে পরিণত করেন।

বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের পত্তন (District Board) (১৮৯৬ খ্রীঃ)

বিজয়চন্দের আমলেই বর্দ্ধমান জেলা বোর্ডের পত্তন হয়। শহরবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য যেমন পৌরসভার পত্তন হয়েছিল, তেমনি গ্রামবাসীর স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা জেলা বোর্ড গঠিত হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। কতকগুলি গ্রামকে নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের চাপে গ্রামের মানুষকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক করদাতাগণ ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচিত সদস্যগণ, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করলেন। জেলার গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজনীতির সুত্রপাত হল। ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্টগণ একটি সভায় মিলিত হয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচন করলেন। প্রথম চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন চকদীঘির জমিদার মনিলাল সিংহ। গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জলের ব্যবস্থা

করাই ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ। ইউনিয়ন বোর্ড গ্রামে চৌকিদার, দফাদার ও সেক্রেটারী নিযুক্ত করতেন। দফাদার ও চৌকিদার খাঁকী রঙের পোষাক ও কোমরে পিতলের তকমা ও বেল্ট পরত। ইউনিয়ন বোর্ড গ্রামবাসীদের জমির পরিমাণ অনুযায়ী কর ধার্য করত এবং জমিদারগণ যে খাজনা আদায় করত— তার শিক্ষা সেস ও ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স থেকে চৌকিদার, দফাদার, সেক্রেটারীর মাইনে দেওয়া হত। ইউনিয়ন বোর্ড খোঁয়াড়, দোকান ও ফেরীঘাটের উপর করধার্য করে আয় করত। চৌকিদারদের কাজ ছিল গ্রাম পাহারা দেওয়া ও গ্রামে কোন কিছু ঘটনা ঘটলে ইউনিয়ন বোর্ডে খবর দেওয়া। দফাদারগণ বোর্ডের সঙ্গে থানা পুলিশের যোগাযোগ রক্ষা করত। আর সেক্রেটারী গ্রামে গ্রামে ট্যাক্স আদায় করত। চৌকিদারদের মাইনে মাসিক দু টাকা থেকে সুরু হয়েছিল।

অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (১৯১৫ খ্রীঃ)

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল বর্দ্ধমান শহরে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বিজয়চন্দ মাহতাব এবং মূল সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বর্দ্ধমান রাজবাড়ির বিশাল সরস্বতী প্রাঙ্গনে মূলমণ্ডপ নির্মিত হয়। বিষয় নির্বাচনীর সভা বসেছিল উইলবাটিতে। বর্দ্ধমানের কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক রচিত বন্দনা গীত গেয়ে সভার উদ্বোধন করা হয়। এরপর কবিশেখর কালিদাস রায় রচিত 'অভিনন্দন আবাহন গীত' পরিবেশিত হয়। মহারাজ বিজয়চন্দ মাহতাব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে বলেন, 'প্রাচীন কাল হইতে বর্দ্ধমান রাঢ়ের একটি প্রধান স্থান বলিয়া খ্যাত এবং সেই কারণেই বোধ হয় আমার পূর্বপুরুষগণ বর্দ্ধমানে আসিয়া ধর্ম ও সমাজের উন্নতি কল্পে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন'।

এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, কাসিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রনাথ নন্দী, বিপিনচন্দ পাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, জলধর সেন, হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি দিকপাল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ। বর্দ্ধমানের খ্যাতনামা উকিল সন্তোষ কুমার বসু উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন। সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন মহামহোপাধ্যায় নিজে, দর্শন শাখার সভাপতিত্ব করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ইতিহাস বিভাগের সভাপতি ছিলেন যদুনাথ সরকার এবং বিজ্ঞান শাখার প্রধান ছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্মেলনে যোগদান করতে না পেরে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে পত্র দিয়েছিলেন। বর্দ্ধমানের উকিল সুরেন্দ্রনাথ রায় একটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিলে, তিনি সেটি দেখে বলেন, যে এটি নরসিংহ গুপ্তের মুদ্রা। আর একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তি ছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিত চন্দ্র মিত্র। তিনি বলেন, চৌবেড়িয়ায় (জামালপুরে) তাঁর পৈত্রিক বাড়ি।

তিনদিনের এই সম্মেলনে বঙ্গপ্রদেশের ও প্রদেশের বাইরে থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। বর্দ্ধমানেরও প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। রাত্রে গান, নাট্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গীত সাধক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্রদ্বয় অপূর্ব সঙ্গীত ও বাদ্য পরিবেশন করেন। রাত্রে বিজয়চন্দ রচিত 'চন্দ্রজিৎ' নাট্যাভিনয় সকলকে মুগ্ধ করে। তিনদিনের প্রায় তিন হাজার লোকের যাতায়াতের ঘোড়াগাড়ি, মণ্ডপ, গৃহসজ্জা, আলোক, আসন, আমোদ প্রমোদের এবং আহারের যাবতীয় ব্যয় বহন করেছিলেন বর্দ্ধমান মহারাজ। কালিদাস রায় যে 'অভিনন্দন' পাঠ করেন তার শেষ স্তবক :—

এসো হে মনিষী কবি জানি ঋষি! ও কর পরশে জাগায়ে সুপ্তে,
বাঁচায়ে আবার বাহার মন্ত্রে ভস্মগুপ্তে নিহিত লুপ্তে।
আজিকে কাঙাল বিদুরের ঘরে লভি আতিথ্য নীবার মুষ্টি
ভক্ত, বিরাগী, ভিখারীর দেশে লভিতে হইলে পরমা তুষ্টি।
এস সুধীগণ, মানসমোহন এসো বাঙলার পুণ্যক্ষেত্রে,
চাহ ভারতীর মিলন ভবনে প্রেম ছল ছল উজল নেত্রে।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের অভিনন্দনটিতে ছিল মাটির গন্ধ ও আন্তরিকতায় ভরা। তাঁর শেষ স্তবক :-

শুষ্ক রাঢ়ের কাষ্ঠভাষা প্রাণটা ত তার শাদা
আমাদের এই দীন আয়োজন ধন্য কর দাদা।
মাছের টক আর কলাই ডালে উঠবে কি গো মন,
আমাদের যে নারদ ঋষির মতন নিমন্ত্রণ।
মাঠের নামলা মটরশুটি টাটকা মুড়ি গুড়,
রাজা দিবেন সীতাভোগ ও মোহন মতিচুর।
না পেলেও নিন্দা যেন কর না কো শেষে,
'নরজা' এবং 'কর্জনা' ও 'গর্দান মারির' দেশে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্দ্ধমানবাসীর প্রিয় খাদ্য মাছের টক, কলাই ডাল আর পোস্ত ভাজা এবং গুড়মুড়ি ছিল প্রিয় জলখাবার। কবি আহ্বানগীতিতে তারই উল্লেখ করেছেন। বর্দ্ধমানের মিষ্টান্ন শিল্প সীতাভোগ-মিহিদানার জন্য বিখ্যাত। তারও উল্লেখ আছে। বর্দ্ধমান-কাটোয়া ভায়া ভাতার যাবার রাস্তায় পড়ে নরজা, করজনা মোড়— যেখানে মানুষ মারত বলে গল্প আছে। উল্লেখ্য সে সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সাহিত্যের আকাশে দীপ্ত সূর্য। কিন্তু এই অষ্টমবঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ দেখি না।

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও গণ জাগরণ

ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের অধিবেশন

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় আমাদপুরের মহেশচন্দ্র চৌধুরী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার ঢেউ বর্দ্ধমানে আছড়ে পড়ে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের' অধিবেশন হয় বর্দ্ধমানে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি সভা হয় বর্দ্ধমানে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে। বর্দ্ধমানে কালনা-কাটোয়া থেকে জাতীয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র জেলায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কালনায় মহিষীমর্দিনী তলায রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্দ্ধমানের জননেতা আবুল কাশেম তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। পাঁচজন সাহসী তরুণ গৌরগোবিন্দ গোস্বামী, ননীগোপাল মুখার্জী, সন্তোষ কুমার ব্যানার্জী, বৃন্দাবন মুখার্জী ও বলাই চন্দ্র গাঙ্গুলী বাঘনা পাড়ায় বিদেশী কাপড় ভস্মীভূত করেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী জিনিষ গ্রহণের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, বটুকেশ্বর দত্ত বিপ্লবরাদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন। কাটোয়ার গুণীন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, ফকির চন্দ্র রায়, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল স্বদেশী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং বাব বাব কারাবরণ করেন।। মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। আবুল হায়াত, আব্দুল কাদের, কচিমিঞ, আব্দুস সাত্তার, বিনয় চৌধুরী, নারায়ণ চৌধুরী প্রভৃতি জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। বিজয় ভট্টাচার্য গান্ধীজীর অনুসরণে গঠনমূলক আন্দোলনের সূচনা করে প্রতিষ্ঠা কবেন কলানব গ্রামে শিক্ষা নিকেতন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন— পরিশিষ্ট—৩ দ্রষ্টব্য।

* * *

গান্ধীজির বর্দ্ধমান আগমন

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মে মহাত্মা গান্ধী বর্দ্ধমান শহরে আসেন ও বিজয়চন্দের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কৃষ্ণসায়র স্থিত চাঁদনিতে গান্ধীজির থাকার ব্যবস্থা হয়। বর্দ্ধমানের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি ভামিনীরঞ্জন সেন সেদিন টাউনহলের নাগরিক সম্বর্ধনা সভায়

অভিনন্দন পত্রপাঠ করেন। ইংরেজ সরকারের উকিল সন্তোষকুমার বসু খদ্দরের পোষাক পরে গান্ধীজির পদপ্রান্তে উপবেশন করেন। জনসভায় গান্ধীজির 'রামধুন' সঙ্গীত গীত হচ্ছিল এবং গান্ধীজি নিবিষ্টমনে চরকায় সুতা কেটে চলেছেন। টাউনহলে তিল ধাবণের জায়গা ছিল না। মহাত্মাজী চরকায় সুতা কাটা বন্ধ করে ভাষণ দিলেন : 'আমার দেশের মুচি মেথর আমার ভাই, আত্মীয়, ভগবান। তাদের পায়ের ধূলো মাথায় নেব, কিন্তু সম্রাটের কাছে মাথা নীচু করে দাঁড়াতে রাজি নই।' জনসভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসিন, গোলাম রহমান, কচি মিঞা— এঁরা গান্ধী টুপী পরে মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্যাতীত ভারতীয়দের জন্য সংগ্রাম ও সত্যাগ্রহ করছিলেন গান্ধীজি। ফিনিক্সে গড়ে তুলেছিলেন আশ্রম। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে দেশের সকল স্তরের মানুষকে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বৰ্দ্ধমান ও তার থেকে বাদ যায়নি। গান্ধীজি প্রতিটি জনসভায় স্বয়ম্ভরতার প্রতীক চরকায় সূতা কাটতেন ও রামধুন সঙ্গীতের সময় আত্মমগ্ন হয়ে থাকতেন এবং তারপর ভাষণ দিতেন। গান্ধীজির চরকা কাটা দেখে বৰ্দ্ধমানের গ্রামে গ্রামে চরকা কাটা সুরু হয়ে যায়। বাংলার মেয়েদের মুখে মুখে চরকার ছড়া চরকাকে আরও জনপ্রিয় ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক করে তুলল :—

চরকা আমার সোয়ামী পুত, চরকা আমার নাতি
চরকার দৌলতে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতি।

বৰ্দ্ধমানের চুপী গ্রামের অক্ষয় দত্তের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখলেন চরকার গান :

চরকায় সম্পদ, চরকায় অন্ন;
বাংলার চরকায় ঝলকায় স্বর্ণ
বাংলার মসলিন বোগদাদ রোম চীন
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।
চরকার ঘর ঘর শ্রেষ্ঠির ঘর ঘর;
ঘর ঘর সম্পদ আপনায় নির্ভর
সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই সময় গান গেয়েছিলেন—

না চাওয়ার পথ দিয়ে কে এলে কংস কারার দ্বার ঠেলে
শব শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল ফোটানো পা ফেলে।

জীবন দুলাল সব লালে লাল করলে প্রাণের রঙ ঢেলে
পথের ধূলা দিল ঢেকে সপ্ত কোটি প্রাণ মেলে
শ্রাবন্তীধর এলো নেমে এই ভারতের জেরুজালেমে
মুক্তিপাগল কোন পথিকের প্রেমেরে
ঝাঁপ দিয়ে পড় সেই যমুনায় বন্দেমাতরম বলে

[শ্রীবিজয় ভট্টাচার্যের কাছে প্রাপ্ত)

গান্ধীজিকে ধ্যানের দেবতা করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি লিখলেন:

'দিনে দীপ জ্বালি ওরে ও খেয়ালী! কি লিখিস হিজিবিজি?
নগরের পথে রোল ওঠে শোন 'গান্ধীজি' গান্ধীজি!
বাতায়নে দেখ কিসের কিরণ! নব জ্যোতিষ্ক জাগে!
জন সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন চন্দ্রের অনুরাগে'

গান্ধীজির উদ্দেশ্য ছিল চরকা আন্দোলনের মাধ্যমে দেশবাসীকে আত্মনির্ভর করা ও দিশি কাপড় পরানো এবং অন্যদিকে বিদেশী দ্রব্য ও বস্ত্র বর্জন। বর্দ্ধমানের কালনা, কাটোয়া, দাঁইহাট, পূর্বস্থলী, পাটুলী, সমুদ্রগড় এবং সদর মহকুমার সর্বত্র চরকা কাটার ঢেউ এসে যায়। এমনি কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে চরকা কাটার এমন ধূম পড়ে যায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় বলেছেন,—

'মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁর দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন' (ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণীচন্দ) বিজয়চন্দ মাহ্তাব গান্ধীজির সঙ্গে লোকজন যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন অধুনা লুপ্তপ্রায় সর্বমঙ্গলা পাড়ার উইলবাটিতে। গান্ধীজির বর্দ্ধমান আগমনে জেলায় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে।

সুভাষচন্দ্র বসুর বর্দ্ধমান আগমন

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পৌর নির্বাচন উপলক্ষে সুভাষ চন্দ্র বসু বর্দ্ধমানে আসেন ও নূতন গঞ্জের ঈশ্বরীতলায় কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। বর্দ্ধমান পৌর প্রতিষ্ঠানে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। তখন পৌরপতি ছিলেন গিরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং উপপৌরপতি মহম্মদ আজম। সুভাষচন্দ্র পর বৎসর আবার বর্দ্ধমানে আসেন ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করবার জন্য।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবক বিজয়চন্দ

শুধু যে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করে বিজয়চন্দ

সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন তাই নয়, প্রকৃত পক্ষে বিজয়চন্দ ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবক, দরদী ও মরমী। তিনি একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন, তাঁর রচিত নাটক 'চন্দ্রজিৎ', প্রবন্ধ ইম্প্রেশান, ত্রয়োদশী, গায়ত্রী, ইউরোপ ভ্রমণ, কাব্য বিজয়গীতিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সে সময় বৰ্দ্ধমানে দুটি নাট্যশালা ছিল—একটি কুঠিবাড়ি থিয়েটার (বর্তমান মহাজনটুলিতে) এবং অন্যটি বিজয় থিয়েটার। শেষোক্ত থিয়েটার মহারাজারই অবদান, সেখানে বিজয়চন্দের 'চন্দ্রজিৎ' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। বিজয়চন্দ সম্পর্কে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, 'যিনি এত বড়লোক হইয়াও মাতৃভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহার মত স্বদেশহিতৈষী স্বজাতি বৎসল আর কে হইতে পারে?' মহারাজ বিজয়চন্দ ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তার পরিচয় রয়েছে— Defects of Modern Education of Bengal প্রবন্ধে। বিজয়চন্দের সৃষ্টি দিলখুশ, চিড়িয়াখানা- যেখানে ছিল সিংহ, বাঘ, কুমীর, ভালুক, বাঁদর, বহুবিধ পাখী, সাপ, ময়ূর, হরিণ ইত্যাদি। হাতিশালে হাতিগুলির নাম ছিল দলবাহাদুর, লীলাবতী, যমুনা, পেয়ারী, শাহাজাদী,বদরমুনি, জঙবাহাদুর। দুটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়ার গাড়ি ছিল ষাটটি। তা ছাড়া উলসাল, চ্যাণ্ডলার, ষ্ট্যাণ্ডার্ড, রোলস রয়েস, ফ্যামিলিকার, আলবিয়ান এবং ফোর্ড প্রভৃতি বিখ্যাত গাড়ি। রাসপূর্ণিমা ও দোল উৎসবে বাজি পোড়ানো ও রঙখেলা হত ধূমধামে। রাজপরিবারে নিয়ম ছিল আগে রাধা-বল্লভজী রঙ খেলবেন এবং তারপর দিন তাঁর ভক্ত ও সেবকদের রঙখেলা হবে। সেই থেকে রাজপরিবারের নিয়মটাই বৰ্দ্ধমান শহরবাসীর নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রথম দিন দোল খেলবেন ঠাকুরগণ ও তার পরদিন মানুষের দোল খেলা। এ নিয়ম এখনও চলে আসছে।

প্রতি বছর কার্তিক মাসে মহারাজার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিজয়চন্দ একশ একটি ব্রাহ্মণের পা ধুইয়ে আশীবাদ প্রার্থনা করতেন। প্রত্যেককে এক মালসা চার রকম মিষ্টান্ন, চার রকম নোনতা খাবার, চাররকম ফল ও রৌপ্য মুদ্রা নিজ হস্তে দান করতেন, আর দুপুরে রাজপরিবারের সব কর্ম্মচারীদের ভুরিভোজন করাতেন।

মহারাজ লণ্ডন থেকে ফেরার সময় শীলাপিট নামে একজন ইউরোপীয়ান মহিলাকে প্রাইভেট সেক্রেটারী করে আনেন। এই মহিলাকে বিজয়চন্দ কন্যার অধিক স্নেহ করতেন। মৃত্যুর পূর্বে বিজয়চন্দ উইল করে যান শীলাকে যেন আজীবন মাসে পাঁচশত টাকা পেনসন রাজ এষ্টেট থেকে দেওয়া হয়। কিন্তু শীলা এই পেনশনের অর্থ গরীব দুঃখীদের দান করার নির্দ্দেশ দিয়ে লণ্ডনে ফিরে যান। যাবার সময় মন্তব্য করেন, আমি যোগ্য পিতার যোগ্যকন্যা আমার পেনশনের অর্থ যেন গরীব দুঃখীদের দেওয়া হয়।

তাঁর দুই পুত্র— উদয়চন্দ ও অভয়চন্দ এবং দুই কন্যা— সুধারাণী ও ললিতারাণী।

বিজয়চন্দের শেষ জীবনে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান রাজ এষ্টেটে আবার অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়। দেনার দায়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এ চলে যায় এষ্টেট। মহারাজ পুত্র উদয়চন্দ তখন ম্যানেজার নিযুক্ত হন। সে সময় এম. . ষ্টুয়ার্ট ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলেত থেকে ফিরে বিজয়চন্দ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আবার এষ্টেট নিজের হাতে তুলে নেন। বিজয়চন্দ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট পরলোকগমন করেন।

উদয়চন্দ মাহতাব (১৯০৫ খ্রীঃ-১৯৮৪ খ্রীঃ)

মহারাজ বিজয়চন্দের মৃত্যুর পর তাঁর প্রথম সন্তান উদয়চন্দ মাহতাব সিংহাসনে বসেন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। তখন জেলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন তুঙ্গে। ১৯৪২ এর 'ভারতছাড়ো' আন্দোলনে বর্দ্ধমান জেলায় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দলে দলে কর্মীদের নিয়ে কারাবরণ করছেন। সমগ্র ভারতব্যাপী এই আন্দোলন অগ্নিশিখার মত ছড়িয়ে পড়লে ব্রিটিশ বাধ্য হয়ে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে ভারতের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেন। জহরলাল নেহরু হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী। ১৫ই আগষ্টের পুণ্য প্রভাতে বর্দ্ধমানের ঘরে ঘরে উঠল শত শহীদের রক্তরঞ্জিত তে-রঙা ঝাণ্ডা। নব অরুণোদয়ে দিক্ দিগন্ত কম্পিত হল শিশু, যুবা, বৃদ্ধের কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' ও 'জয়হিন্দ' ধ্বনি। প্রভাত সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়ার আগে রাজপথ জনপথ সঙ্গীত মূর্চ্ছনায় প্লাবিত হল :

১৫ই আগষ্ট পুণ্য দিন
প্রাচীন ভারতে জাগে নবীন।
গাও তিন রঙা পতাকার তলে
নবভারতের ঐকতান।

জাতীয় কংগ্রেস ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হল। সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমান রাজ উদয়চন্দ মাহতাবের বিরাট রাজত্ব চলে গেল সরকারের হাতে। উদয়চন্দ হলেন রাজ্যহীন সাধারণ নাগরিক। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প রাজপরিবারে চালু ছিল। জনৈক ফকিরের অভিশাপগ্রস্ত রাজ এষ্টেট বংশানুক্রমে নাকি কেউ ভোগ করতে পারবে না। হয় বংশধর কেউ থাকবে না কিম্বা রাজ্যভোগ সহ্য হবে না— এই ছিল অভিশাপ। রাজা চিত্রসেনের আমলেই নাকি কোন অজ্ঞাত ত্রুটির জন্য এই এষ্টেট অভিশপ্ত হয় এবং চিত্রসেন অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। তাঁর কোন বংশধর না থাকায় তাঁর পিতৃব্য পুত্র তিলকচন্দ রাজা হন। তিলকচন্দের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর পুত্র তেজচন্দ রাজা হন, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তেজচন্দের পুত্র প্রতাপচন্দ পিতার মৃত্যুর আগেই অকালে মারা যান। আর তারপর থেকেই দত্তক গ্রহণ সুরু

হয়। আবু রায়, বাবু রায়ের বংশ তেজচন্দেই শেষ হয়। বিজয়চন্দের পুত্র উদয়চন্দও রাজ্যভোগ করতে পারলেন না, কারণ জমিদারী প্রথা উঠে গেল। এ ঘটনা অবশ্যই কাকতালীয়।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইনে যখন রাজ্য চলে যায়, তার অব্যবহিত আগেই উদয়চন্দ তাঁর সমস্ত রাজকর্মচারীদের প্রত্যেককে শহর ও শহরের বাইরে চারকাঠা পরিমাণ জায়গা বসতবাটির জন্য দান করেন এবং যে সব রাজকর্মচারী ও রাজপরিবারের আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতি বর্দ্ধমান রাজার দেওয়া বাড়িতে থাকতেন সে সব দালান বাড়ির মালিকানা স্বত্ত্ব দান করেন। বর্দ্ধমানের বহু নাগরিকও সে সময় প্রার্থনা করলে বহুবিধ দানে উপকৃত হন। সর্বশেষে বর্দ্ধমান রাজবাড়ি, দিলখোসা, ভেড়িখানা, আস্তাবল, ঘোড়াশালা, কৃষ্ণসায়র, রমনার বাগান, তারাবাগ, মোহনবাগান, গোলাপবাগ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকা ও সম্পত্তি বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। রাজবাড়ির রাণীমহল মহিলা কলেজকে দান করেন। বর্দ্ধমান রাজবাড়িতেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস ও পড়াশুনা সুরু হয়। পরে গোলাপবাগে পড়াশুনা এবং রাজবাড়িতে কেবল অফিসের কাজ চলতে থাকে।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর উদয়চন্দ কলকাতার আলিপুরের বিজয়মঞ্জিলে বসবাস করতেন। তিনি স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। উদয়চন্দের নাম অনুযায়ী বারোদুয়ারীর পশ্চিমদিকে পল্লীর নাম হয় উদয়পল্লী। এই পল্লী ছিল ডাঙ্গা ও জঙ্গলে ভর্তি। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ছিন্নমূল উদ্বাস্তু ভাই বোনদের বসবাসের জন্য মহারাজ উদয়চন্দ এই জায়গা দান করেন। ধীরে ধীরে এই এলাকায় গড়ে উঠল এক সুন্দর পল্লী। তাঁর নামেই পল্লীর নামকরণ হয়। তিনি টেকনিক্যাল স্কুলটি সাধনপুরে স্থানান্তরিত করেন ও ঐ গৃহে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। উদয়চন্দ গ্রন্থাগারটি তাঁর নামেই। শ্যামসায়রের পূর্বদিকে 'রামকৃষ্ণ আশ্রম' এবং শ্যামসায়রের দক্ষিণ পূর্ব কোণে 'সাহিত্য পরিষদ ' তাঁর দানেই গড়ে উঠেছে। ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় উদয়চন্দ মাহতাবকে সম্মানীয় ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর স্যার উদয়চন্দ মাহতাবের মৃত্যু হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Draft out line of Eighth Five year plan (1990-95), Burdwan-Dist Planning Committee.
2. বর্দ্ধমানের ইতিহাস— বলাই দেবশর্মা
3. বর্দ্ধমান পরিচিতি— অনুকূল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী

4. History of India– Smith
5. History of India– R. C. Majumdar
6. বাঙলার ইতিহাস– রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
7. The Archaeology of India– D. P. Agarwal
8. প্রচিন বাঙলা ও বাঙালী– সুকুমার সেন
9. Inscription of Bengal– Nanigopal Majumdar
10. কবিকঙ্কণ চণ্ডী– মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
11. মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সম্মেলন– স্মারক গ্রন্থ-১৯৭৩
12. Records of Museum of Art Gallery– University of Burdwan
13. বিশ্বকোষ– সঃ নগেন্দ্রনাথ বসু ১৬শ খণ্ড
14. Studies in the Geography of Ancient and Mediaevel India– Dr. D. C. Sircar
15. আচারঙ্গ সুত্র– হীরাকুমারী বোথরা (অনুবাদক)
16. History of Ancient Bengal– Dr. R. C. Majumdar
17. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি– বিনয় ঘোষ
18. Imperial Gazetteers– Vol IX
19. Bengal Dist Gazetteers, Burdwan 1910– J. C. K. Peterson
20. শারদীয় বিজয় তোরণ– '৮১, '৮২, '৮৩, '৮৬, '৮৭ (প্রবন্ধ– ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল)
21. ধর্মমঙ্গল– ময়ূর ভট্ট
22. ধর্মমঙ্গল– ঘনরাম চক্রবর্তী
23. ধর্মমঙ্গল– রূপরাম চক্রবর্তী
24. কবিকঙ্কণ চণ্ডী– সম্পাদক-শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
25. মনসামঙ্গল– ক্ষেমানন্দ দাস
26. Georgic– Virgil
27. বর্দ্ধমান সম্মিলনী– হীরক জয়ন্তী সংখ্যা-১৯৭৪
28. বাঙ্গালীর ইতিহাস– ডঃ নীহাররঞ্জন রায় (দুই পর্ব)
29. Some Hist and Ethnical Aspects of the Burdwan Dist– W. B. Oldham. 1894
30. রাঢ়ের গ্রামদেবতা– ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা
31. Sakta Cult– Sir Jhon Wdroff.
32. চৈতন্য মঙ্গল– লোচন দাস
33. চৈতন্য চরিতামৃত– কৃষ্ণদাস কবিরাজ

34. চৈতন্য ভাগবত– বৃন্দাবন দাস
35. গীত গোবিন্দ– জয়দেব গোস্বামী
36. বৰ্দ্ধমান স্মরণিকা– ১৯৮২
37. ছান্দোগ্য পরিশিষ্ট প্রকাশ–এসিয়াটিক সোসাইটি-নারায়ণ দেব পাল
38. Bhubaneswar Inscription of Bhatta Bhabadeb
39. Science of Religion– Vivekananda
40. অদ্ভুত সাগর– সঃ মুরলীধর ঝা
41. History of Ancient Bengal– Dr. R. C. Majumdar 1971 with reference to Dr. Panchanan Mondal.
42. গৌড়ের ইতিহাস– রজনীকান্ত চক্রবর্তী
43. বাঙলার ইতিহাস– কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
44. পাল পূর্ব যুগের বংশানুচরিত– ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার
45. Rennell's Atlas
46. The Excavation at Pandu Rajar Dhibi– P. C. Dasgupta 1964
47. বৰ্দ্ধমানের পুরাকথা– নগেন্দ্রনাথ বসু
48. গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ১৯০২– হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
49. শ্রীখণ্ডের প্রচীন বৈষ্ণব– গৌরগুনানন্দ ঠাকুর
50. ভারতবর্ষের ইতিহাস-(প্রাচীন ও আধুনিক)– হীরেন মুখোপাধ্যায়
51. রাজবংশানুচরিত– রাখালদাস মুখোপাধ্যায়
52. চন্দ্রজিৎ (নাটক)– বিজয়চন্দ্র মহ্‌তাব
53. সম্বাদ ভাস্কর– রচনা সংকলন (বিবিধ)
54. অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন (স্মরণিকা)– ১৩২১
55. বৰ্দ্ধমান রাজ– আব্দুল গণিখান
56. হজরৎ পীরবাহারাম ও বৰ্দ্ধমানের নূরজাহান–আব্দুল গণিখান
57. Ain-I-Akbari– Prof. Blockman
58. Tujuk-I-Jahangir– Rogers & Beveridge
59. Ancient India as described by Megasthenes and Axxian– J. W. Mecrindle
60. প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা– পরেশ চন্দ্র দাসগুপ্ত
61. Rulers & Great leaders– Dr. B. P. Saksena
62. Mughal Empire– Iswari Prosad
63. History of Political Thought– B. Majumdar
64. Old Fort Willium in Bengal– C. R. Wilson

65. Unpublished records of Government of Bengal– Rev Long
66. Fifth report from the select committee of East India Company
67. Annals of Rural Bengal– W. Hunter
68. যুগান্তর পত্রিকা ১৩ মার্চ ১৯৮১
69. বর্দ্ধমান রাজবংশ– গোষ্ঠবিহারীলাল হাণ্ডে
70. Report of Acting Magistrate– E. Melony
71. How Hindu Burnt their Women– V. N. Dutta (Sunday Magazine– 24th July 1988)
72. Regulation Act XVII of 1829
73. Bounteous Burdwan– E. Rly (30. 1. 87)
74. সার্ধশতবর্ষ স্মরণিকা– বর্দ্ধমান সি. এম. এস হাইস্কুল ১৯৮৪
75. রাজকলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা– ১৯৮১
76. ভারত শিল্পী নন্দলাল– ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল (দু খণ্ড)
77. ঘরোয়া– রাণীচন্দ
78. কাব্য সঞ্চয়ন– সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
79. Statistical Accounts of Bengal– W. Hunter
80. Census Hand Book, Burdwan Dist.– Ashoke Mitra
81. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ– শিবনাথ শাস্ত্রী
82. বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন পর্যায়)– নিখিলেশ পুরকাইত

দ্বিতীয় পর্ব

পুরাসম্পদ ও ভাস্কর্য

বর্দ্ধমানের সংস্কৃতি, রাঢ়ের সংস্কৃতি
সকল সমাজ সভ্যতাতে ইহার রীতিনীতি
সর্বধর্ম সমন্বয় ইহার আদর্শ
প্রভাবিত বাঙলা, গোটা ভারতবর্ষ।

—কুমুদরঞ্জন মল্লিক।

একটি দেশ ও জাতির জীবনেতিহাসের সঙ্গে শিল্প সংস্কৃতির একটা নিবিড় যোগ আছে। মানুষের উদ্ভব, সভ্যতা ও সামাজিক ক্রমবিকাশের আত্মকথা বুকে ধারণ করে বেঁচে থাকে যে শিল্প-সংস্কৃতি তাকেই বলে পুরাতত্ত্ব বা পুরাসম্পদ। এই পুরাসম্পদ অতীতের রূপ বিশ্লেষণই করে না, আগামী দিনের পালাবদলকে ও চিহ্নিত কবে রাখে। ইতিহাস হল বহমান জীবনস্রোতের নিরবচ্ছিন্ন ধারা। সমাজও সভ্যতার পাথরে খোদিত ফসিলের মতই সে রেখে যায় অজস্র প্রমাণ, উদাহরণ, ও অতীতের মূল স্বাক্ষর। ঐতিহাসিককে সেই সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন সম্বন্ধে জানতে উক্ত উদাহরণগুলির উপরই নির্ভর করতে হয়। এগুলি হল কাঠ, পাথর, হাড়, পোড়ামাটির তৈরী নানবিধ সামগ্রী যেগুলি প্রাচীন মানুষ ব্যবহার করত নানা কাজে। পাথরের উপর তৈরী ফসিল, শিলালিপি, মুদ্রা, ধাতুফলক থেকে আমাদের ইতিহাসকে খাড়া করতে হয়। ইতিহাস শুধু রাজামহারাজার যুদ্ধবিগ্রহ, উত্থান পতনের এবং পালাবদলের কাহিনী নয়, ইতিহাস হল সমগ্রভাবে একটি দেশ ও জাতির অঙ্গীভূত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা— বিবর্তন ও প্রগতির কাহিনী। আর ইতিহাস মূলতঃ স্থান-কাল-পাত্রের বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পরিবেশকে বুঝবার ফল।

ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পবস্তুর একটি আত্মিক যোগ আছে। প্রত্যেক শিল্পবস্তুর একটা পার্থিব বা বাস্তব পারিপার্শ্বিকতা আছে,যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে শিল্পীর মনের কথা। লুকিয়ে রয়েছে যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য, সৃজনকালের সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি। তাই শিল্প বস্তু হচ্ছে সংস্কৃতি প্রকাশের 'প্রমাণ পত্র'। জীবনধর্ম, জীবন প্রবাহ তার আচার আচরণ, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা এই শিল্প কলার মধ্যেই আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়। কোন যুগের কোন দেশের এই বিশিষ্ট শিল্প-সৌন্দর্য থেকে সে দেশ বা যুগের তৎকালীন জীবনের বাস্তব চিত্র সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা করা যায়। ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এমনিভাবেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ভাস্কর্য যুগে যুগে ভাববৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে মানবসত্তার

নানা রুচি, পরিচয় ও উপলব্ধি এবং অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচলক্ষ অব্দেও ভারতবর্ষে মানুষ বসবাস করত। এইসময় থেকে খ্রীষ্টপূর্ব আটহাজার বৎসর পর্যন্ত যুগকে বলা হয় প্রাচীন প্রস্তর যুগ। খ্রীষ্টপূর্ব আটহাজার অব্দ থেকে খ্রীঃ পূঃ চারহাজার অব্দ পর্যন্ত যুগকে বলা হয় মধ্য প্রস্তর যুগ এবং খ্রীঃ পূঃ চারহাজার অব্দ থেকে খ্রীঃ পূঃ দেড় হাজার অব্দ পর্যন্ত যুগকে বলা হয় নব্য প্রস্তর যুগ। প্রস্তর যুগের পাথুরে প্রমাণ হলো পাথরের তৈরীসামগ্রী অস্ত্র, পাত্র, অলংকার প্রভৃতি সবই পাথরের তৈরী। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দেড়হাজার বর্ষে আর্যগণ ভারতে আসেন। এর আগে পর্যন্ত যুগকে প্রাগার্য বলা হয়। বলা হয় আর্যরা এসেছিলেন লোহার হাতিয়ার নিয়ে। ভারতে লৌহযুগ সুরু হয় খ্রীঃ পূঃ একহাজার বর্ষ থেকে। বৈদিক যুগের কাল সুরু হল খ্রীঃ পূঃ দেড়হাজার বছর থেকে একহাজার খ্রীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত— সিন্ধু সভ্যতার কাল। এর পর এলো তাম্র প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি। এক এক করে বৈদিক যুগ, মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল, সেন ও মুসলিম সাংস্কৃতিক যুগ। তারপর ইউরোপীয় ভাবধারায় আধুনিক যুগ। জেলা বৰ্দ্ধমানেও বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। উপরোক্ত প্রত্যেকটি যুগের পুরাসম্পদ ও ভাস্কর্য বৰ্দ্ধমানে ছড়িয়ে রয়েছে। পাণ্ডু রাজার ঢিবি। কিম্বা ভরতপুরের স্তূপ, নৈহাটীও মল্লসারুলের তাম্রশাসন এবং অজয়ের গর্ভে পাওয়া পাণ্ডুকের স্তূপের দ্রব্যাদি সবই ইতিহাসের স্বর্ণসম্পদ। নব্য প্রস্তর যুগের মসৃণ পাথরের হাতিয়ার, তাম্র প্রস্তর যুগের অধিবসতি, পোড়ামাটির কাজ, মাটির পাত্র প্রভৃতি পাওয়া গেছে। তাতে বৰ্দ্ধমানের বয়স নব্য প্রস্তর যুগ থেকে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চারহাজার বর্ষ থেকে বৰ্দ্ধমানের বযস ধবলে বর্তমানে বৰ্দ্ধমানের বয়স ছ হাজার বর্ষ। পুরাতাত্ত্বিক গণের মতে মৃৎপাত্র ও পোড়ামাটির মূর্তি, খেলনা, শীলমোহর প্রভৃতি শিল্প বস্তুগুলি প্রাগ মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তোত্তর যুগ পর্যন্ত সময়ের তৈরী। গুপ্ত, পাল ও সেন যুগে গড়ে ওঠে অপূর্ব ভাস্কর্য যা মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য শিল্প বলে খ্যাত। এই ভাস্কর্য দেবমূর্তির অপূর্ব্ব ভাবশুদ্ধি বিলাস বিধৃত হল। ভাস্কর্য ও চিত্রকলাকে এক নূতন ভাবধারায় অভিষিক্ত করে বাংলার শিল্পী প্রবর্তন করলেন এক অভিনব মাধ্যম। পাথর কেটে বা পাথরে খোদাই করে রচিত হল বহু মূর্তি যার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবনারই প্রকাশ ঘটল বহু ভাবে। আবার মুসলমান সংস্কৃতি আগমনের সেই সঙ্গে সঙ্গে পাথরের মন্দির বা গুহার অভ্যন্তরে জীবজন্তু, মানুষ, ফল, ফুল, লতাপাতা, খোদাই করে চলমান জীবনের ইতিহাস গেঁথে রাখার ব্যবস্থা হল। কিন্তু মুসলমান সম্রাটের ধর্মীয় বাধা নিষেধ থাকায় পাথর কেটে এই মূর্তি তৈরী করা বন্ধ হল। তখন মন্দির গাত্রে নূতন ধরণের পোড়ামাটির ভাস্কর্য আরম্ভ হল— হিন্দুদের মন্দিরে দেব-দেবী, নর-নারী, পশু-পাখি লতা প্রভৃতি ছবির কাজ আরম্ভ হল। মুসলমানী মসজিদে সৃষ্টি হল নানা ধরণের নক্সা, অলংকার, লতাপাতার ছবি। মধ্যযুগের শেষের

দিকে পোড়ামাটির ভাস্কর্য-শিল্পের একমাত্র কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। পরবর্তীকালে এসেছে পুঁথির পটের ছবি, পট ও চালচিত্র, কালীঘাটের পট শিল্প। বর্দ্ধমান জেলার পুরাসম্পদ সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে কালানুক্রমিক ভাস্কর্যের যে বিবর্তন উল্লিখিত হল তা মনে রাখতে হবে।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি বা পাণ্ডুকের স্তূপ

বর্দ্ধমান জেলার অজয় উপত্যকায় পাণ্ডুক গ্রামে স্তূপ খনন করাব ফলে বর্দ্ধমানের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষকদের চিন্তার মোড় ঘুরে গেছে। দামোদর উপত্যকায় এবং বরাকব নদীব দুপাশ ঘিরে ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন প্রত্নরাজি ও পুবাসম্পদ মাইথন,



চালাঘর মন্দিব অমরার গড়

কালীমাটি, কল্যাণেশ্বরী, বগুনিয়ায় পাল ও গুপ্তযুগের অনেক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। মাটির তলায় রাঢ় বর্দ্ধমানের শ্যামা ধর্মমিশ্রিত সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যাবে একটি ভগ্ন চৈত্যের আশপাশ ঘুরলে। একথা আজ অনস্বীকার্য যে রাঢ় বর্দ্ধমানে সেকালে

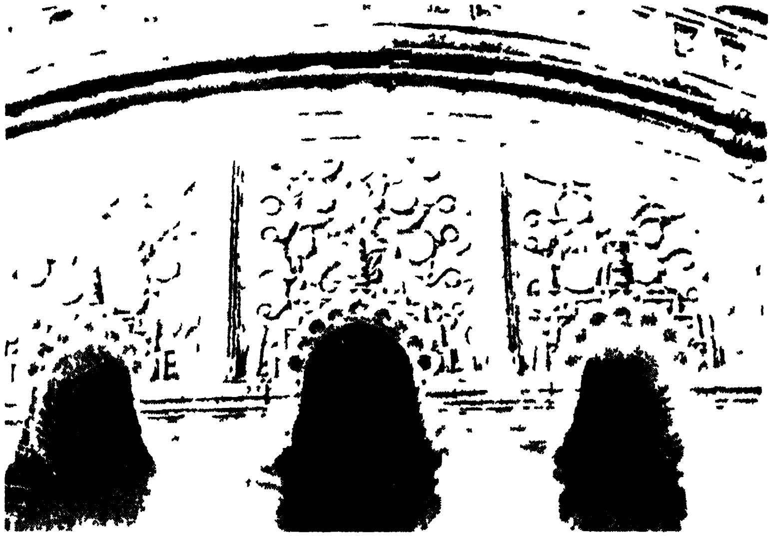
পল্লী ছিল কৃষিভিত্তিক। নব্য প্রস্তর যুগ থেকে তামা ও লোহার ব্যবহার শিখে প্রগতির ধাপে ধাপে বৰ্দ্ধমানের আদি বাসিন্দারা এগিয়ে এসেছে পাদপ্রদীপের সামনে। ধান ও অন্যান্য শস্যের তারাই প্রবর্ত্তন করেছিলেন। নারিকেল, কদলী, তাম্বুল, হরিদ্রা প্রভৃতি চাষও এরা করেছিলেন। তাঁরা পশুপালক ছিলেন এবং হাতিকে পোষ মানিয়েছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব দুই হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মিলেছে এখানে। এই স্তূপকে বলা হয় পাণ্ডুরাজার ঢিবি। এখানে যে সব প্রত্ন সম্পদ পাওয়া গেছে তা উন্নত সভ্যতার। তাঁরা তাম্রের ব্যবহার জানতেন, মাটির বাসন-কোসন তৈরী করতে পারতেন। সুপরিকল্পিতভাবে নগরপত্তন করতে জানতেন। ইঁট ও পাথর দিয়ে বাড়ি, রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী, সদরদরজা ও দুর্গনির্মাণ করতে পারতেন। বাড়ি নির্মাণ করা হত আধপোড়া মাটির ইঁট দিয়ে, নল-উলুখাগড়া বিছিয়ে তার উপর ঢালাই দিয়ে। দেওয়াল মেঝে পলেস্তারা করা হত মসৃণ ল্যাটেরাইট পাথর দিয়ে। পাণ্ডুব ঢিবি খুঁড়ে আরও জানা যায়— যে সে সময়ের মানুষ ধানচাষ ও বাণিজ্য— দুইতেই বেশ পারদর্শী ছিলেন। গবাদি পশুপালন করতেন গৃহে। গরু, মহিষ কুকুর, বিড়াল, অশ্ব, ছাগ, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু ছিল। সুন্দর নক্সাকরা মৃৎনির্মাণ কৌশল তাদের জানা ছিল। মৃতদেহের সমাধি দিতেন পূর্বদিকে মাথা রেখে। ধর্মে ছিলেন শাঁমা সাধক বা মাতৃকা-উপাসক।

যে সব মৃৎপাত্র এই অধিবাসীগণ ব্যবহার করতেন, তার মধ্যে রয়েছে ছোটমাটি, চ্যাপটা— হাঁমুখো বাটি, মুখখোলা কলসী, নলযুক্তবাটি, জলপাত্র সিঙ্গা, ফুলদানি, বেড় দেওয়া বাটি, পাদানির উপর মালা, পাদানির উপর বাটি, সছিদ্র বাটি, বড় জালা, লোটা, উঁচু গলায় বেড় দেওয়া জালা, চাকা, থালা ইত্যাদি। এসব থেকে অনুমান করা হয়েছে— এত বিচিত্র ধরণের বাসন-কোসন আসবাবপত্র রুচি বৈচিত্র্যেরই পরিচায়ক।

ঐ সময়ের গৃহনির্মাণ প্রণালীও উন্নত স্থপতিকর্মের লক্ষণ। ঘরের আকৃতি ছিল— আয়তাকার, চতুষ্কোণ, গোলাকৃতি, যে সব বাড়ি নির্মাণ করা হত, তা বেশিরভাগই কাঠের ও বাঁশের খুঁটি দিয়ে। নল ও উলুখাগরার দেওয়ালে দু দিকে ল্যাটেরাইট দিয়ে পলেস্তারা করা হত। ছাদের টালি হত পোড়ামাটির কাজ করা টেরাকোটা। ঘরের মেঝে চুন, বালি ও মোরাং দিয়ে দুরমুশ করা হত।

খাদ্য ছিল ভাত ও মাংস। হরিণ, শূকর ও নীল গাই এর মাংস এরা খেতেন। তখনকার মানুষ মারা গেলে সমাধি দেওয়া হত। তিন শ্রেণীর মোট তেরোটি সমাধি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ভষ্মাধার রক্ষিত সমাধিও পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, পাণ্ডুরাজার ঢিবি বাণিজ্যভিত্তিক নাগরিক সভ্যতার শেষ চিহ্ন। জৈন শাস্ত্রে



মান্দব গাত্রে টেবাকোটাব কাজ অমবাব গড়

এই অংশেব নাম দেখতে পাওয়া যায় পণিতভূমি বা বণিগভূমি। শ্রমণ মহাবীর ও মঙখাল পুত্র গোপাল এই বণিগভূমিতে ছয় বৎসর একসঙ্গে বসবাস করেছিলেন। এখানকার বণিকগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বাণিজ্যে যেতেন। তারা সমুদ্র যাত্রায় বাণিজ্যতরী ব্যবহার করতেন। খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজাব বছর আগেও এই পাণ্ডুরাজার পোতার বা পণিতভূমিব বণিকগণ বাণিজ্যসম্ভার এদেশ থেকে অন্যদেশে নিয়ে গিয়ে বাণিজ্য করতেন। বাণিজ্যসম্ভারগুলি হল– মশলাপাতি, তূলা, ধান, তূলার বস্ত্র, গজদন্ত, সোনা-রূপা, তামা ও হীরক, খাঁড় চিনি ও তাঁতজাত বস্ত্র। সে সময় বাণিজ্য জাহাজ নদীর মোহনাতেও চলত।

পাণ্ডুরাজার পোতার খননকার্য থেকে একথা অনুমান করা যায় যে তখনকার মানুষ তামার ব্যবহার জানতেন। মধ্যভারতের এবং রাজস্থানের তাম্রাশ্মীয় প্রস্তর যুগের সভ্যতার সঙ্গে এই দেশের নিবিড় যোগ ছিল। ১৯৬৩ খ্রীঃ উৎখননের ফলে জানা

গেছে, যে এঁরা লোহার ব্যবহারও জানতেন। লোহা গলানো ও ঢালাই কৌশল এরা আয়ত্ত করেছিলেন। সীলমোহর ও খোদাইকরা পাত থেকে জানা যায়, অজয় উপত্যকায় দুই হাজার খ্রীষ্টপূর্ব যুগেও বৈদিক পদ্ধতিতে লেখার লিপির প্রচলন ছিল। গবেষকগণ এইসব পুরাসম্পদ বিশ্লেষণ করে জানতে পেরেছেন যে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে তাম্রাশ্মীয় প্রস্তর যুগে জনবসতি ছিল এবং তার সুরু হয়েছিল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ দুহাজার অব্দে। এই সভ্যতা প্রায় পরিবর্তিতভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করেছিল। রেডিও কার্ব্বন পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ভরতপুরের স্তূপ

বর্দ্ধমানের গলসী ব্লকের সন্নিকটে কাকঁসা ব্লকের (বুদবুদথানা) অন্তর্গত দামোদর নদের তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম ভরতপুর। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভরতপুরের ঢিবি খনন করে প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি ও ইষ্টক নির্মিত স্তূপের ধ্বংসাবশেষ থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে এখানে নব্য প্রস্তর তাম্রাশ্মীয় যুগ হতে খ্রীষ্টিয় নবম-দশম শতক পর্যন্ত প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটেছিল। এই সমস্ত প্রাপ্ত প্রত্নরাজি থেকে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময়কার মানুষের জীবিকা ছিল কৃষিকার্য, পশুপক্ষী ও মৎস্য শিকার। অধিবাসীরা পাথর, অনুশিলার অস্ত্রসস্ত্র, তামা ও জীবজন্তুর হাড়ের তৈরী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। অনুমান, ভরতপুরের প্রাচীন এই জনবসতির সঙ্গে দুর্গাপুরের পার্শ্ববর্তী বীরভানুপুরের যাযাবর মানুষের সঙ্গে একদা যোগসূত্র ছিল। বীরভানুপুরের মধ্যবর্তী প্রস্তরযুগের অধিবাসীরা ভরতপুরের নব্য প্রস্তর-তাম্রযুগের অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ ছিল। উভয়ের জীবনযাপন প্রণালী মোটামুটি একই রকম ছিল। ভরতপুরে আবিষ্কৃত নকশাকাটা মৃৎপাত্র ও মহিষদল (কোপাই নদ উপত্যকা) অঞ্চলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র প্রায় সমগোত্রীয়। ভরতপুরের স্তূপ থেকে আরও জানা যায় যে এই সময়কার অধিবাসীরা মাটির ঘরে বাস করত। মুক্ত প্রাঙ্গনে বড় বড় উনানে [হয়তো কয়েকটি পরিবার একই সঙ্গে বা যৌথভাবে রান্নার কাজ করত, যেমন পাঞ্জা হরিয়ানায় আছে যৌথ উনান 'সাঁঝা-চুল্লা'] খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছর আগের সভ্যতার সঙ্গে ভরতপুরের আবিষ্কৃত সভ্যতার একটি মিল দেখা যায়।

তাম্র প্রস্তর যুগের পরবর্তীকাল হচ্ছে লৌহযুগ। উভয় সভ্যতা এখানে পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এই যুগের পোড়ামাটির নিদর্শনগুলি খুব উন্নতমানের ছিল না। যদিও লৌহব্যবহারকারী জনবসতি পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে উত্তর ভারতের মসৃণ কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল সভ্যতার (Culture of North Indian Black polished pottery) সংস্পর্শে এসেছিল। তার প্রমাণ সাম্প্রতিক খননে প্রাপ্ত আবিষ্কৃত

ভাঙ্গা মসৃণ কৃষ্ণবর্ণের কৌলালের টুকরাগুলি। অনুমান, এই সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্বকালে অল্পক্ষণের জন্য ভরতপুরে অনুপ্রবেশ করেছিল।

পরবর্তী কয়েক শতক বর্ষ পরে এখানে যে নূতন সভ্যতা গড়ে ওঠে তা গুপ্ত যুগ থেকে সুরু করে পাল যুগ পর্যন্ত চলে আসে। এই যুগই ইতিহাসে স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশের ক্ষেত্রে ছিল সুবর্ণযুগ। এই সময়েই তাম্রাশ্মীয় যুগের একটি স্তূপ নির্মিত হয়। পঞ্চরথের উপর ইটের গাঁথুনী দিয়ে ভিত্তি গড়ে এই স্তূপ নির্মিত হয়। ১২.৭০ × ১২.৬৫ বর্গ সেঃ মিটার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। স্তরে স্তরে নির্মিত ইটের এই স্তূপটি সুন্দর কারুকার্যে ভরা। স্তূপটির নির্মাণ কার্যে নিকটবর্তী প্রাচীন মন্দিরাদি ও বিহারের ইট ব্যবহৃত হয়েছে। ভূগর্ভে নির্মিত ৩৩টি সোপান সম্বলিত স্তূপটি তারই সাক্ষ্য বহন করছে। স্তূপের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং তা প্রায় ২ ইঞ্চি পরিমাণ পাথর কুচি ও ঘুটিং মিশ্রিত কাদা মাটির মসলার ঢালাই। পঞ্চকোণ বিশিষ্ট স্তূপের উপরের গায়ে স্থানে স্থানে পোড়ামাটির কাজ করা নকল চৈত্যে ভর্তি। এরই গায়ে অনেকগুলি কুলুঙ্গী আছে। বজ্রপদ্মাসনোপবিষ্ট অপূর্ব ভাবমণ্ডিত ধ্যানমগ্ন তথাগত বুদ্ধের মূর্তি প্রত্যেকটি কুলুঙ্গিতে স্থাপিত। এর নির্মাণকাল সম্ভবত খ্রীষ্টিয় নবম-দশম শতাব্দী। এটাই বাংলায় আবিষ্কৃত প্রথম বৌদ্ধস্তূপ।

বিজয় সেনের তাম্রশাসন (ষষ্ঠ শতাব্দী)

বর্দ্ধমান জেলার গলসী থানায় দামোদর তীরবর্তী মল্লসারুল গ্রামে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর খননকালে মহারাজ বিজয় সেনের একটি তাম্রশাসন লিপি পাওয়া যায়। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ননী গোপাল মজুমদার ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় এই লিপি সম্পর্কে লেখেন, 'ভগবান লোকনাথ (বুদ্ধদেব) ধর্ম ও সাধুজনের গুণানুকীর্তন করিয়া লিপিখানির আরম্ভ হইয়াছে। এই লিপিখানি মহারাজাধিরাজ গোপালচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এই গোপালচন্দ্র এবং ফরিদপুরে তাম্রশাসনের মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্র অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। বঙ্গদেশে খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতকে যে অক্ষর প্রচলিত ছিল এই লিপিখানির অক্ষর তাহার অনুরূপ। এইরূপ অক্ষর ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান বিষয়াধিপতি মহারাজা বিজয় সেন খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দের প্রথমভাগের মধ্যে বৈন্যগুপ্তের (কুমিল্লায় প্রাপ্ত তৎপ্রদত্ত তাম্রশাসনের তারিখ ১৮৮ গুপ্তাব্দ অর্থাৎ ৫০৬ খ্রীষ্টাব্দ) পরে গোপচন্দ্রের অধীনে সামন্ত রাজপদে ছিলেন। সম্ভবতঃ বৈন্যগুপ্তের পরে গোপালচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ফরিদপুর হইতে বর্দ্ধমান জেলা পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ তাঁহার করতলগত ছিল।'

আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে উপরোক্ত তথ্য সঠিক নয়। অর্থাৎ গোপালচন্দ্র ও গোপচন্দ্র একই ব্যক্তি নন। মহারাজ বিজয় সেনের রাজত্বকাল ছিল ৫০৭ খ্রীঃ হতে ৫৪৩ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত (D. C. Sarkar)। এই তাম্রশাসনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে এতে বৰ্দ্ধমান ভুক্তির উল্লেখ আছে। যথা: 'পুণ্যোত্তর জনপদাধ্যাসিতায়াং সতত ধর্মক্রিয়া-বৰ্দ্ধমানায়াং বৰ্দ্ধমান ভুক্তৌ'–ইত্যাদি (Para 3), তাম্রশাসনটি ষষ্ঠ শতাব্দীর। তাম্রফলকের লিপির ভাষা সংস্কৃত ও অক্ষর ব্রাহ্মীলিপি। এটি বৰ্দ্ধমান জেলার প্রত্নগৌবব।

তাম্রশাসনে লিখিত বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

মহাবাজ বিজয় সেনস্য॥
ওঁ স্বস্তি।
জয়তি শ্রীলোকনাথ যঃ পুংসাং সুকৃত কর্মফল হেতুঃ। সত্যতপোময় মূর্তির্লোক-দ্বয়-সাধনো ধর্মঃ। ১
তদনু জিতদম্ভ-লোভা জয়ন্তি চিরায় পরহিতার্থাঃ নির্মৎসরাঃ সুচরিতৈঃ পরলোক জিগীষবঃ সন্তঃ॥ ২

পৃথিবীং পৃথুরিব প্রথিত-প্রতাপ-নয়-শৌর্য্যে মহারাজাধিরাজ শ্রীগোপচন্দ্র প্রশাসতি তদনুজ্ঞপ্তায়াং পুণ্যোত্তরজনপদাধ্যাসিতায়াং সতত ধর্মক্রিয়া-বৰ্দ্ধমানায়াং বৰ্দ্ধমানভুক্তৌ পূজ্যান্বৰ্ত্তমানোপস্থিত-কার্ত্তাকৃতিক কুমারামাত্য-চৌরোদ্ধ রণিকে। পরিকৌদ্রঙ্গিকা গ্রহারি-কৌর্ণস্থানিক-ভোগপতি- বিষয়পতি-তদযুক্তক-হিরণ্য সামুদায়িক- পত্তলকাবসথিক-দেবদ্রোণী সম্বন্ধাদীশ্বিধিবৎ সম্পূজ্য বক্কত্তক সম্বন্ধার্দ্ধকরকা- গ্রহারীণ-মহত্তরঃ হিমদত্তঃ নিবৃতবাটকীয়-মহত্তর- সুবর্ণযশাঃ কপিস্থ বাটকা গ্রহারীণ-মহত্তর- ধনস্বামি বটবল্লকা বীথি গ্রহারীণ-মহত্তর ষষ্টি দত্ত-শ্রীদত্তৌ কোড্ডবীরা গ্রহারীণ ভট্টবামনস্বামি গোধগ্রামা গ্রহারীণ-মহিদত্ত মাজদেত্তৌ শাল্মলি বাটকীয়-জীবস্বামি বক্কত্তকীয় খাড়্গি-হরিঃ মধুবাটকীয়-খাড়গি গোইকাঃ খণ্ডজোটিকেয় খাড়গি ভদ্রানন্দি বিন্ধ্যপুরেয় বাহ্নায়ক হরি প্রভুতয়োবীথ্যাধি করণঞ্চ বিজ্ঞাপয়ন্তি। পুজ্যং মহারাজ বিজয়সেনেন বয়মভ্যর্থিতা ইচ্ছেহ্হমেতদ বীথী সম্বন্ধে বেত্রগর্ত্তাগ্রামে যুষ্মভ্যো যথা ন্যায়েনোপক্রীয়াষ্টৌ কুল্যাবাপান মাত্রা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যাভিবৃদ্ধয়ে কল্পান্তর স্থায়িন্যা প্রবৃত্ত্যা পুত্র–পৌত্রান্বয় ভোগ্যত্বেন কৌণ্ডিণ্য সগোত্রায় বাহ্বৃচ-বৎস স্বামিনো পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবৰ্ত্তনায় প্রতিপাবয়িতুমিতি। যতোহস্মাভিরস্যাভ্যর্থ নয়াবধৃতমন্ত্যেযোহনুক্রমঃ উভয়লোক বিজিগীষুভিঃ সাধুভিঃ ক্রিয় মান পুণ্য স্কন্ধযু শ্রীপরম ভট্টারক পাদানাং ধর্ম্মযড্ভা গোপচয়োহ স্মাকমপি পত্তিপালয়তাং কীর্তি শ্রেয়োভ্যাং যোগঃ উত্তঞ্চ। যঃ ক্রিয়াং ধর্ম সংযুক্তাং মনসাপ্য ভিনন্দতি। বৰ্দ্ধতে স যথেষ্টে চ শুক্ল পক্ষ ইবোড্ডরাট। ৩

তৎ সম্পদ্যতামস্যাভিপ্রায় ইত্যম্মিন্মারকৃতৈরনেনে দত্তক দীনা রান্ বীথ্যাং

সম্বিভজ্যাস্মদ্বেত্রগর্ত্তা গ্রামেহ্ ষ্টাভ্যঃ কুল্যবাপেভ্যো যথোচিতং দানং তদ্বীথী সমুদয় এব প্রণাট বোঢ়ব্যমিত্যব চুণ্যাষ্টৌ কুল্যবাপা মহারাজ বিজয়সেন্যোংস্য দত্তোঃ। আননাপি রাজ্ঞাস্মৈ কৌণ্ডিণ্য সগোত্রায় বাহ্বৃচ বৎস স্বামি নে পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্তনায় তাম্রপটেন প্রতিপাদিতাঃ অথ চৈস্বাং চতুর্ষুদিক্ষু সীমাভবন্তি॥ পূর্বস্যাং দিশি গোধগ্রাম সীমা। দক্ষিণ্যাংগোধগ্রামাএব। উত্তরস্যাং বটবল্লকা গ্রহার সীমা। পশ্চিমস্যাং দিশি অর্দ্ধেন আম্র গর্ত্তিকা সীমা। কীলকাশ্চাত্র কমলাঙ্ক মালাঙ্কিতাঃ চতুর্ষুদিক্ষু ন্যস্তা ভবন্ত্যেবমেষাং কৃত সীমাঙ্কানামস্য ব্রাহ্মণস্য পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রবর্তনেনোপভুঞ্জানস্য ন কনচিদেতদ্ধনশজেনান্য তমেন বা স্বল্পাপ্যাবাধা হস্ত প্রক্ষেপো বা কার্যঃ। এবম বধৃতে যোজথ করোতি স বধ্যঃ পঞ্চভির্মহাপাত কৈঃ সোপ পাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদপি চ। নাস্য দেবা ন পিতরো হবিঃ পিণ্ডং সমাপ্নুয়ুঃ। ছিন্ন মস্তক বেতালঃ অপ্রতিষ্ঠঃ পতিষ্যতি॥ ৪

ভূমিদানাপহরণ প্রতিপালন গুণ দোষ ব্যঞ্জকাঃ অর্যাঃ শ্লক ভবন্তি। যষ্টিং বর্ষ সহস্রানি স্বর্গেগ নন্দতি ভূমিদঃ। আক্ষেপ্তা চা নুমন্তা চ তাণ্যেব বসেৎ॥ ৫

আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ প্রবল্ গন্তি পিতামহাঃ ভূমিদোহ্ স্মনুকূলে জাতঃ সঃ নঃ সন্তারয়িষ্যতি॥ ৬

যৎ কিঞ্চিন্ কুরুতে পাপঃ নরো লোভ সমাম্বিতঃ। অপি গোচর্মমাত্রেণ ভূমি দানেন শুধ্যাতি॥ ৭

পূর্ব্ব দত্তাং দ্বিজাতিভ্যো যত্নাদ্রক্ষ যুধিষ্ঠির। ভূমিং ভূমিমতাং শ্রেষ্ঠ দানাচ্ছ্রেয়োহনু পালনং॥ ৮

ইয়াং রাজশতের্দ্দত্তা দীয়তে চ পুনঃ পুনঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্যতদা ফলং॥ ৯

তড়িত্তরঙ্গ বহুল্যাং শ্রিয়ং মত্বা চ মর্ত্ত্যাণাং। ন ধর্মস্থিতয়স্ সম্ভিঃ যুক্তা লোকে বিলোপিতুম॥ ১০

কুল্য ৮। দূতকঃ শুভদত্তো লিখিতং সান্ধি বিগ্রহিকভোগ চন্দ্রেন। তাপিতং পুস্তপাল জয়দাসেন সংবৎ ৩ শ্রাবদি'২০ (+) ৭॥

প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার উক্ত লিপিখানির যে মর্মার্থ উদ্ধার করেছেন, তার কিদংশ প্রদত্ত হলো :

বৰ্দ্ধমান ভুক্তির মহত্তরগণ (মহত্তরগণ-সম্মানার্হ ব্যক্তিগণ) যথা বক্কত্তক বীথি সম্বন্ধ অর্দ্ধকরক অগ্রহারের অগ্রহারীণ হিমদত্ত,নিবৃর্ত বাটকের মহত্তর সুবর্ণ যশঃ, কপিস্থবাটকের মহত্তর ধনস্বামী বটভল্লকের মহত্তর ষষ্টি দত্ত ও শ্রীদত্ত, কোড্ডবীরের মহত্তর বামনস্বামী, গোধাগ্রাম অগ্রহারের মহত্তর মহীদত্ত ও রাজা দত্ত, শাল্মলী বাটকের মহত্তর জীব স্বামী, বক্কত্তক অগ্রহারের মহত্তর খাড়গীহরি, খণ্ডজোটিকার মহত্তর খাড়গীভদ্র নন্দী, বিন্ধ্যপুরী অগ্রহারের মহত্তর বাহনায়ক এবং বীথ্যাধিকরণ (গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ)

একযোগে এই রূপ ঘোষণা করিতেছেন, যে মহারাজা বিজয়সেন, বক্কত্তক বীথি সম্বন্ধ বেত্রগর্ত্তা গ্রামের অষ্টকুল্যা বাপভূমি উপরোক্ত মহত্তরগণের নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্রয় করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত কৌণ্ডিণ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বৎস স্বামীকে প্রদান করিলেন। শাসনোক্তভূমির চতুঃসীমা পূর্ব্ব ও দক্ষিণে গোধগ্রাম উত্তরে বটভল্লুক অগ্রহার এবং পশ্চিমে আম্রগর্ত্তিকা।' প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার অবশেষে লিখেছেন– 'শেষ ছত্রে তাম্রশাসনের তারিখ দেওয়া হইয়াছে, সম্বৎ ৩ শ্রাবণ ২৭। এই তৃতীয় সম্বৎ সম্ভবতঃ মহারাজাধিরাজ গোপচন্দ্রের বঙ্গাব্দ'।

মজুমদার মহাশয় শাসনোক্ত গ্রামগুলির বর্তমান নাম ও অবস্থান নিম্নরূপ ধরেছেন, 'গোধগ্রাম হইল বর্তমান মল্লসারুলের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত গোহগ্রাম, আম্রগর্ত্তিকা হইল মল্লসারুলের দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমান মধ্যবর্তী খাঁড়জুলী গ্রাম, শাল্মলী বাটক হইল বর্ত্তমান সারুল বা মল্লসারুল, অর্দ্ধকরক বর্তমান আধরাগ্রাম, কোড্ডগ্রাম বর্ত্তমান কোড়েগ্রাম, বক্কত্তক বীথী হইল বাক্তাগ্রাম'।

তাম্রশাসনের এই লিপি থেকে খ্রীষ্টিয় ৬ষ্ঠ শতকে বঙ্গের বিশেষ বিশেষ মহত্তরগণের অর্থাৎ সম্মানীয় ব্যক্তিগণের পরিচিতি জানা যায়। আর একটি কথা, লিপি থেকে সম্মানীয় (মহত্তর) ব্যক্তিদের 'অগ্রহারীণ' বা 'অগ্রহার' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। রাজা কর্ত্তৃক কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কে প্রশংসার্হ কার্যের জন্য প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি বা গ্রাম বিশেষ হল 'অগ্রহার'। (An agrahara is an endowment of land or villages by a Raja to a Brahmin or a Kshatriya for his meritorious action– Monior William) মোগল আমলে ভূমিপ্রদত্ত ব্যক্তিদের যেমন 'জায়গীর' বলা হত তেমনি ষষ্ঠ শতকে ভূমি প্রদত্ত ব্যক্তিদের 'অগ্রহার' উপাধি দেওয়া হত। [উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি– সঞ্জীব বন্ধু] 'অগ্রহার উপাধি বর্তমান আগরী নামে খ্যাত। লিপিতে শাসনোক্ত গ্রামগুলিতে বর্তমান কালেও উগ্রক্ষত্রিয় (অপভ্রংশিত আগরী) জন সংখ্যাই বেশি। 'অগ্রহার' দের মধ্যে ব্রাহ্মণও ছিলেন। মল্লসারুল তাম্রফলকের লিপি থেকে একথা জানা যায় যে, সেকালের রাজারা জমির মালিক ছিলেন না। জমির মালিক ছিলেন দখলদার। কিন্তু ভূমি হস্তান্তর করতে হলে 'বীথি-অধিকরণের' (বর্তমান পঞ্চায়েৎ) অনুমতি নিতে হত। দেশের প্রশাসনিক বিভাগ ছিল– ভুক্তি (দেশ), তার অধীন 'মণ্ডল' (জেলা), তার অধীন ছিল 'বীথি' (পঞ্চায়েৎ)। পরবর্তীকালে বীথির জায়গায় আসে 'চতুরক' বা চৌকি।

এই লিপি থেকে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের তদনুযায়ী পদবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'বর্দ্ধমানের ইতিহাস– যৎ কিঞ্চিৎ ' প্রবন্ধে পাওয়া যায়:- 'কার্তাকৃতিক, ঔর্ণস্থানিক, হিরণ-সামুদায়িক, আবসথিক, দেবদ্রোণী সম্বন্ধ'। কার্তাকৃতিক যিনি কৃতকে অকৃত করতে পারেন অর্থাৎ Appellate Authority,

ঔর্ণস্থানিক— যিনি ঊর্ণস্থানের (যেখানে পশমের বা রেশমের সূতা উৎপন্ন বা বিনিময় হয়) অধ্যক্ষ। (এ শব্দটির আসল অর্থ ও তাৎপর্য ঐতিহাসিকরা এখনও লক্ষ্য করেন নি। এদেশে সিল্কের চাষের প্রাচীনত্ব এবং তাহাতে রাজস্ব উৎপত্তির ইঙ্গিত এখানেই পাচ্ছি। ঔর্ণস্থানিক তা হলে- Superintendent of Production and Marketing)। তখনকার দিনে নদীর বালি থেকে সোনা সংগ্রহ করা হত। যিনি বা যাঁরা সেই ব্যাপারে রাজার বা অধিকরণের তরফে অধ্যক্ষতা করতেন তিনি বা তাঁরা 'হিরণ্য সামুদায়িক' বলে মনে হয়। 'পত্তলক' বোধ হয় গুজরাটি পটেল, গ্রামের বা বীথির Notary। আবসথিক বোধ হয় বাসিন্দা ব্রাহ্মণদের নেতা। দেব মন্দিরের সম্পত্তির যিনি তদারক করতেন সেই কর্মচারীই সম্ভবত দেবদ্রোণী সম্বন্ধ বলে উল্লিখিত।'

গ্রামের নামগুলি ডঃ সেন কিভাবে অপভ্রংশিত হয়েছে তা দেখিয়েছেন, 'গোধগ্রাম'>গোহগ্রাম, বক্কত্তম>বাক্তা, কোড্ডইর>কোড্ডে, অধকরক>অদ্ধঅরতা-আদরা, কপিস্থবটিক>ইত্থ আডঅকইতাড়া, মধুবাটক>মহু আডঅ-মওড়া, খণ্ডজোটিকা খাণ্ডজোডিঅণ্ডাড়াজুলি, শাল্মলী বাটক>সিম্মলি আডঅ- সিমলাড়া সিমলুড়, বিল্বপুর>বিল্লউর-বিজুর।' প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল বাবুর ব্যাখ্যার হুবহু মিল আছে। কেবল ননীগোপাল 'শাল্মলি বাটককে' বলেছেন— সারুল বা মল্লসারুল কিন্তু ডঃ সেন বলেছেন সিমলুড়। সিমলুড় গ্রামও স্থানীয় ব্লকে আছে।

মঙ্গলকোটের পুরা কীর্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ১৯৮৮-৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অজয় ও কুনুর নদীর সঙ্গম স্থলের কাছে ঐতিহাসিক মঙ্গলকোট গ্রামে পুরাতাত্ত্বিক খনন কার্য চালিয়ে এক সুপ্রাচীন উন্নত সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগ কয়েক বছর ধরেই এখানে খনন কার্য চালাচ্ছিলেন। পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডঃ সমীর কুমার মুখোপাধ্যায় জানান, মঙ্গলকোটে পুরাতাত্ত্বিক খননের ফলে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে সুরু করে মধ্যযুগ পর্যন্ত একটানা উন্নত সভ্যতার নানাবিধ প্রত্নসম্ভার পাওয়া গেছে। তাম্রপ্রস্তর যুগকে সিন্ধুসভ্যতার যুগ বলা হয়। এই সময় মানুষ তামার ও প্রস্তরের ব্যবহার জানতেন। এর ব্যাপ্তি খ্রীঃ পূর্ব দেড়হাজার বছর পর্যন্ত।

ঐতিহাসিকরা অনুমান করেন খ্রীঃ পূর্ব দেড় হাজার বছর আগে সিন্ধু সভ্যতা বা মহেঞ্জোদড়ো হরপ্পার সভ্যতা বিনষ্ট হয়। কিন্তু বর্দ্ধমানের এই মঙ্গলকোটে তাম্রপ্রস্তর যুগ থেকে টানা কুষাণ ও গুপ্তযুগ পর্যন্ত সভ্যতার একটি ধারাবাহিকতা পাওয়া গেছে। অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত এই ব্যাপ্তিকালের সভ্যতার নিদর্শন মঙ্গলকোটে পাওয়া গেছে। সিন্ধুসভ্যতার যুগে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদ এখানেও পাওয়া গেছে। যেমন— পাকা ইঁটের তৈরী ঘর বাড়ির অংশ, উন্নতধরণের

পয়ঃ প্রণালী, ছোট ছোট ইঁটের তৈরী ভিত, কুষাণ ও গুপ্তযুগে ব্যবহৃত শিলমোহর, বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্র, অলঙ্কৃত প্রস্তর, ছাঁচে ঢালা তাম্রমুদ্রা, টেরাকোটার মূর্তি ইত্যাদি থেকে বলা যায় যে গুপ্ত ও কুষাণযুগে মঙ্গলকোটে একটি সমৃদ্ধশালী নগর সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া এই সভ্যতা থেকে তাম্রপ্রস্তর ও মধ্যযুগের সমাধি দেওয়ার প্রচলিত রীতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। তাম্রপ্রস্তর যুগে কবর দেওয়ার সময় মৃতদেহের সঙ্গে কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র দেওয়ার চল ছিল।

মঙ্গলকোটে হুসেন শাহের মসজিদ ও দানেশখন্দ হামিদ মসজিদ

মঙ্গলকোটে সুলতান হুসেন শাহ (খ্রীঃ ১৪৯৩-১৫১৯) নির্মিত মসজিদটি জেলায় একটি অন্যতম প্রত্নবস্তু। বাদশাহী সড়ক এই মঙ্গলকোটের পাশ দিয়ে চলে গেছে। গ্রামের উত্তরে ক্ষুদ্র স্রোতোস্বিনী কুনুর বয়ে গেছে। কুনুরের পূর্বদিকে এই ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত মসজিদটি অবস্থিত। এর গায়ে কৃষ্ণপাথরে খোদিত করা একটি শিলালিপি সকলকে অবাক করে। দেবনাগরী হরফে লেখা 'শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতি'। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের কোন অখ্যাতনামা বংশধর হবেন এই শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতি। তাই ইতিহাসে আমরা 'চন্দ্রসেনের' কোন উল্লেখ পাই না। মসজিদটি একটি স্তূপের উপর অবস্থিত। স্থানীয় লোকজন মনে করেন যে স্তূপগুলি বৌদ্ধবিহার, পরে হুসেনশাহ এগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। বাদশাহী সড়কের উপর সুউচ্চ স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে থাকা এই মসজিদে প্রবেশ করলে বামপার্শ্বে চোখে পড়বে কয়েকটি বড় কালো পাথর, তার একটি পাথরেই উল্লিখিত লিপিটি খোদাই করা আছে। প্রাচীন এই মসজিদে খোদিত রয়েছে প্রাচীন স্থাপত্য কলার নানারকম কারুকার্য। মসজিদের খিলানগুলি নিপুণ, নক্সা শুধু চমৎকার নয়, বিস্ময়করও।

মঙ্গলকোটকে আঠারো আউলিয়ার দেশ বলে। ইরাকের বাগদাদ থেকে আঠারোজন সুফি সাধুপীর (গাজী) এই মঙ্গলকোটে এসেছিলেন। গিয়াসউদ্দীন যখন গৌড়ের সিংহাসনে তখন মঙ্গলকোটে পরাক্রমশালী হিন্দুরাজা বিক্রমজিৎ রাজত্ব করতেন। মঙ্গলকোট অঞ্চলের একটি উঁচু ঢিবিকে এখনও 'বিক্রমাদিত্যের ডাঙা' বলে পরিচয় দেয়। এই ডাঙা নিয়ে বহু কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু বিক্রমজিৎ নামে যে এক পরাক্রান্তশালী নৃপতি রাজত্ব করতেন মঙ্গলকোটে সে সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। এই সময় বাগদাদ থেকে ঐ গাজী সাহেবরা মঙ্গলকোটে এসে বসতিস্থাপন করেন। রাজা বিক্রমজিতের সঙ্গে সংঘর্ষে গাজী সাহেবের মৃত্যু হয়। আর তারপরেই গজনবী নামে শেষ আউলিয়ার আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি রাজা বিক্রমজিৎকে নিহত করে মঙ্গলকোটে মুসলমান শাসনের পত্তন করেন। গজনবী ও তার পূর্ব্ববর্তী সতেরোজন গাজী সাহেব, আঠারো আউলিয়া নামে খ্যাত। এই সব পীরসাহেবদের আজও সমাধি

মন্দির সে কাহিনীই স্মরণ করিয়ে দেয়। সে সব ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সমাধির পাশেই পীর পঞ্চাননের মেলা বসে। এই পঞ্চপীর আঠারো আউলিয়ারই অন্যতম কিনা কেউ বলতে পারে না।· কিন্তু দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যলোভী মানুষ ফকির-আমির এখানে ছুটে আসেন পঞ্চপীরের 'উরস্ উৎসবে।

যুবরাজ .খুররমের (পরে সম্রাট শাহজাহান) শিক্ষাগুরু ছিলেন মঙ্গলকোটের অধিবাসী ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত আব্দুল হামিদ বাঙালি। বর্দ্ধমানে অবস্থানকালীন যুবরাজ খুররম এই পণ্ডিত আব্দুল হামিদ বাঙালির কাছে ফারসী ভাষায় পাঠগ্রহণ করতেন। যুবরাজ খুররম যখন সম্রাট 'শাহজাহান' নামে সিংহাসনে বসেন তখন গুরুভক্তির নিদর্শন স্বরূপ মঙ্গলকোটে ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আনুমানিক চুরানব্বই হাজার তঙ্কা ব্যয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন। আব্দুল হামিদকে 'দানেশখন্দ মহাজ্ঞানী' উপাধি দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন মোজাদাদ আলফে সানির শিষ্য। আব্দুল হামিদ দানেশখন্দ বাঙালি এই মসজিদে উপাসনা করতেন। তাই তাঁর নামানুসারে এই বিখ্যাত মসজিদটিকে হামিদ দানেশখন্দ বাঙালি মসজিদ বলে। আজও দানেশখন্দের সমাধির পাশে মঙ্গলকোটের বিখ্যাত এই মসজিদ প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে।

মঙ্গলকোটে অপর একটি প্রাচীন পুরাতত্ত্বের নিদর্শন হল 'তেল ঢালা' পুকুর। আড়াইবিঘা আয়তনের চতুষ্কোণ এই পুকুরটির তলদেশ থেকে উপর পর্যন্ত চতুর্দিক ছোট ছোট ইঁট দিয়ে বাঁধানো। ইঁট গুলি বিভিন্ন আকারের— কেউ কেউ এটিকে মৌর্যযুগের স্থাপত্য বলে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের ফলে বিভিন্ন ধরণের ও পরিমাপের ইঁট এখানে এসেছে। পুকুরের পশ্চিম পাড় ঘেঁষে কয়েকটি সিঁড়ির মাঝখানে দুটি কূপ দেখা যায়। জনশ্রুতি, কূপ দুটি ভূগর্ভের সুড়ঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলেন, এটি ছিল প্রাচীনকালে হিন্দুরাজ অন্তঃপুরিকাদের স্নানাগার। স্নানাগারে জল নিষ্কাশন ও পূর্ণ করার কাজে এই কূপ দুটি ব্যবহার করা হত। স্থানীয় অধিবাসীদের ধারণা ও কোন কোন গবেষকের মতে 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে মঙ্গলঘট বলে যে স্থানটি উল্লেখ করা হয়েছে বর্তমান অজয় নদীর তীরে সেই স্থানটিই এখনকার মঙ্গলকোট। 'তেল ঢালা' পুকুরটি খনন করলে হয়ত নূতন কোন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

মঙ্গলকোটের অন্তর্গত কিম্বদন্তীর নগর উজানি হল বর্তমান কোগ্রাম উজানি এককালে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল। মঙ্গলকাব্যের চরিত্র ধনপতি সওদাগরের বাসভূমি ছিল এই উজানি-কোগ্রাম। কুনুর আর অজয়নদ যেখানে এসে একসঙ্গে মিশেছে, সেখানেই ছিল প্রাচীনকালের উজানি, বর্তমানের কোগ্রাম কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উজানির বর্ণনা দিয়েছেন :

উজানী নগর, অতি মনোহর,
বিক্রমকেশরী রাজা, করে শিবপূজা।
উজানীর রাজা, কৃপা হইল দশভুজা।

এই উজানি নগর ছিল ধনপতি সওদাগরের বাসভূমি। ধনপতির এক স্ত্রী খুল্লনার বাড়ি ছিল ইছানীতে, বর্তমান ইছাবট গ্রাম। ধনপতি ও তার দুই স্ত্রী খুল্লনা ও লহনা বিকালে যে মাঠে পায়রা উড়াতেন, সেই পায়রা ওড়ার মাঠ এখনও আছে। ধনপতির পুত্র শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে সিংহল যাত্রা করার পূর্বে উজানিতে চণ্ডীপূজা করেছিলেন। সেই শ্রীমন্তের চণ্ডী উজানি বা কোগ্রামে সাক্ষী হয়ে আছে।

বল্লালসেনের নৈহাটী তাম্রশাসন (দ্বাদশ শতাব্দী)

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ঝামটপুরের কাছে নৈহাটী গ্রামে বল্লালসেনের একটি তাম্রফলক পাওয়া গেছে। এই তাম্রফলকটি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের। যদিও বলা হয় যে সেন রাজগণের প্রথম পুরুষ রাঢ়ের লোক নন, এনারা দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ থেকে এসেছিলেন, তথাপি এই ভূমিদান পট্ট থেকে জানা যায়, সেন রাজারা রাঢ়ের অধিবাসী। বংশের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ও স্বদেশের গুণবর্ণনায় বল্লালসেন তাঁর সভাকবিকে দিয়ে বিস্তর প্রশস্তি লিখিয়েছেন।

॥ ভূমিদান পট্টের প্রশস্তিসূচক বিষযবস্তু নিম্নরূপ ॥

ওঁ ওঁ নমঃ শিবায়।

হর্ষোচ্ছ্বাল পরিপ্লবো নিধির পাং

ত্রৈলোক্যবীর: স্মরো নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো বিশ্রান্ত মানাধয়: যস্মিনভ্যুদিতে চকোর নগরা ভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ স শ্রীকণ্ঠ শিরোমণি র্বিলজতে দেবস্তমী বল্লভাঃ। ২

বংশে অস্যাভুদয়িনি সদাচারচর্যা—নিরূঢ়ি প্রোঢ়াং রাঢ়ামকলিত চরৈভূর্যয়ন্তো-হনুভাবৈঃ শশ্বদ্বিশাভয় বিতরণ স্থূল লক্ষ্যাবলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যূল্লোলৈঃ স্নপিত বিয়েত জঞ্জিরে রাজপুত্রাঃ॥ ৩

তেষাম্বংশে মহৌজাঃ প্রতিভট পৃতনাম্ভোধিকল্পান্ত সুর: কীর্তি জ্যোৎস্নাজ্জ্বল শ্রীঃ প্রিয় কুমুদবনোল্লাস লীলামগাঙ্কঃ আসীদাজন্মরক্ত প্রণয়িগণ মনোরাজ্য সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নিরপধি করুণাধাম সামন্ত সেন: ৪

উক্ত ভূমিদান পট্টের মর্মার্থ নিম্নরূপ।

প্রণবেশ শিবকে প্রণাম।

নিশিবল্লভ শিববশিরোমণি, চন্দ্রের উদয়ে হর্ষোচ্ছল হয় জলধি, কামদেব ত্রিভুবন জয় করেন, কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়, চকোরনগরে প্রাচুর্যে হরিণ-নয়না স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ

করে, সেই চন্দ্রের জয় জয়। তাহার সমুজ্জ্বল বংশে সদাচারী সর্ব্বচারী সর্ধ অভয় স্বরূপ সুপ্রকট কীর্তিধারায় পরিস্নাত রাঢ়ভূমির অলঙ্কার অপূর্ব গৌরব খদ্ধ রাজপুত্রগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন মহাতেজী সামন্ত সেন যিনি ছিলেন শত্রুসৈন্যাম্বোধি কল্পান্তশূর সূর্য, কুমুদোপম মিত্রগণের কীর্তি জ্যোৎস্নায় প্রোজ্জ্বল মৃগাঙ্ক চন্দ্র, গণমনোরাজ্যে যিনি ছিলেন আজন্ম সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা শৈল অনন্ত করুণাধাম সত্যশীল নৃপতি।

ইছাই ঘোষের দেউল ও রাঢ়েশ্বর মন্দির

পশ্চিমরাঢ়ে অজয়নদীর তীরে ঢেকুর। এই রাজ্যের অধিপতি সোম ঘোষ গোপ নরপতি। তাঁর পুত্র বীর ঈশ্বরী ঘোষ বা ইছাই ঘোষ (দশম শতাব্দী) স্বাধীন নরপতি বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন এবং গৌড়ের অধীনতা অস্বীকার করলেন। তাঁর রাজধানী শ্যামারূপার গড়। এই অঞ্চলটারই নাম সেন পাহাড়ী। একটি অনতি-বিস্তৃত উচ্চভূমির উপর ইছাই ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, সৈন্যাবাস, বিশালকায় দীঘি, শ্যামারূপার মন্দির ও ইছাই ঘোষের দেউল বিদ্যমান। শ্যামারূপাও ঐস্থানে পূজিতা হচ্ছেন। শ্যামারূপা হলেন অষ্টধাতু নির্মিত দেবী মূর্তি। সমগ্র রাজ্য ঢেকুর গোপরাজ্য নামে খ্যাত। ঘোষ বংশোদ্ভূত সদগোপ রাজা ছিলেন ইছাই ঘোষ। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে গৌড়াধিপতি কর্ণসেনের পুত্র লাউসেনকে পাঠালেন ইছাইকে দমন করবার জন্য। ইছাই ঘোষ ছিলেন বৈদিক ধর্মে বিশ্বাসী মাতৃসাধক এবং লাউসেন ছিলেন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। ইছাই ঘোষ ও লাউসেনের যুদ্ধ দুই ধর্মমতের সংঘর্ষ। ইছাই ঘোষের সেনাপতি কালু ও লক্ষ্মী ডোম অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে যুদ্ধে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইছাই ঘোষের পতন হয়। গোপভূমি সমসাময়িক কালে বর্দ্ধমানের সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। একখানি তাম্রশাসনে ইছাই ঘোষের নাম আছে। এইখানেই নির্মিত হয় এক বিরাট দেউল নাম তার ইছাই ঘোষের দেউল। অরণ্যের মধ্যে মাথা উঁচু করে ইছাই ঘোষের দেউল দাঁড়িয়ে আছে আজও। ইহা প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ দেউল। উহার গর্ভ গৃহে কোন বেদী নাই বা রত্নবেদী নাই। উহা শৈব, শাক্ত বা বিষ্ণু মন্দির হলে দেবতার একটি প্রতিষ্ঠাবেদী (Plat form) অবশ্যই থাকত। কিন্তু শূন্যমূর্তি বুদ্ধের কোনও রত্নবেদী নাই। এই দেউল লাউসেন যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে নির্মাণ করেন। লাউসেন ছিলেন বৌদ্ধ, কাজেই দেউলটিও বৌদ্ধ দেউল। বর্তমানে দেউলটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দ্বারা সংরক্ষিত। পাশেই গৌরাঙ্গপুরের জঙ্গলে প্রাচীনকালের রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। নিকটেই ইছাই ঘোষের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। রাঢ়েশ্বর এখন অরণ্য মধ্যে। গঠনটি দেউল আকৃতির। গোপভূমির সদগোপ রাজাদের পূর্বপুরুষ সম্ভবতঃ রাঢ়ের দিগ্বিজয়ী বীরত্বের স্মারক হিসেবে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপরাজাগণ প্রথমে ছিলেন শৈব তারপর শাক্ত। একই স্থানে 'রাঢ়েশ্বর' ও 'শ্যামারূপা' তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বরাকরের দেউল-দেহারা

জেলার বহুস্থানে এই বৌদ্ধ দেউল-দেহারা ছড়িয়ে রয়েছে বৌদ্ধ যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমাণ মাথায় নিয়ে। কালনা মহকুমার বৈদ্যপুরের দেউল দুটিও রাঢ় বর্দ্ধমানে বৌদ্ধবাদের স্মৃতিচিহ্ন। রেখদেউল, সপ্তরথ পদ্ধতিতে তৈরী, শিখর স্থাপনের নিদর্শন।, পাণ্ডুয়ায় যে বিরাট দেউল রয়েছে তাও মধ্যরাঢ়ের বৌদ্ধধর্মের পরিচয় বহন করে। মুসলমান শাসনকালে এটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু এর স্থাপত্য ও শিল্পকলা থেকে বলা যায়, এটি ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা মন্দির। আঝাপুরের দেউলটিও বৌদ্ধধর্মবাদের স্মৃতিচিহ্ন। এটিও রেখ দেউল, বৈদ্যপুরের দেউলের মত গঠনরীতি, খাঁজে খাঁজে সঙ্কীর্ণ হয়ে চূড়ার দিকে উঠে গেছে! শিখরদেশে স্থাপত্যের কলাকৌশল। বরাকর ও বহুলাড়ার দেউল দুটি ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন। এ দুটিও রেখ দেউল। অন্য দেউল অপেক্ষা এর বিশিষ্টতা হল মাঝখানে মন্দির গাত্রে চতুর্দিকে দুই সারি পোড়ামাটির কাজ করা অপূর্ব্ব স্থাপত্যের নিদর্শন। সম্ভবতঃ গুপ্ত বা পাল যুগের। পোড়ামাটির কাজের পর উপরদিকে দশ সারি খাঁজ কাটা রেখা সঙ্কীর্ণ হয়ে উপরে উঠে গেছে। তারপর শীর্ষ পর্যন্ত নানা রকম কারুকার্য করা এবং একেবারে শীর্ষে বসানো একটি ছত্রাক। পাশের দেউলটি আরও উঁচু।

জগদানন্দপুর— রাধাগোবিন্দপুরের মন্দিরটি পাথরের তৈরী। বর্দ্ধমান জেলার সমগ্র পাথরের তৈরী মন্দির একটিও নেই। পাথর কেটে এই মন্দির তৈরী করা হয়েছে। মন্দিরটি পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের মত এবং বজ্রাঘাত থেকে রক্ষার জন্য শীর্ষে লৌহশলাকা দেওয়া। এর নির্ম্মাণকাল নবম/দশম শতক বলে অনুমান করা হয়। [বর্দ্ধমান পরিচিতি]

মেমারী দেউলিয়ার দেউল

মেমারী ১ নং ব্লকের নিমো গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত সুন্দর একটি গ্রাম দেউলিয়া। এই গ্রামের আকর্ষণ একটি হাজার বছরের পুরাতন দেউল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক দুর্লভ সম্পদ এই দেউল। অনেকের মতে উড়িষ্যার রেখ-দেউলের আদলে গড়া এই মন্দির। প্রবেশ দ্বারে ক্রমবর্দ্ধমান খিলান, খিলানের গায়ে অপূর্ব পোড়া মাটি ও ইঁটের কাজ। বাইরের দেওয়ালে চৈত্য, জানালার মনোরম কারুকার্য। কেউ কেউ বলেন, এখানে একটি জৈনস্তূপ ছিল। সম্ভবতঃ পাল যুগে খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীতে এটি স্থাপিত হয়। এখানে একটি প্রাচীন বিদ্যালয় ছিল যেখানে দেশ বিদেশ থেকে ছাত্ররা জৈনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসতেন। দামোদর তখন এই দেউলিয়ার কোল ছুঁয়ে বহে যেত, বাণিজ্যপোত এসে এখানে নঙর করত। এটি ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়। বর্তমানে এই গ্রামের বাসিন্দারা মুসলমান—সংখ্যায় বেশি, কিন্তু

এই মন্দিবটি তাদেব কাছেও বড় শ্রদ্ধাব বস্তু— না দেখলে বিশ্বাস কবা যায় না। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়েব সেতুবন্ধন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতীক। দেউলটি জেলাব প্রাচীনত্বের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়।

শহীদ খাজা আনোয়ার সমাধি :

বর্দ্ধমান শহবেব দক্ষিণে সদবঘাটেব সন্নিকটে খাজা আনোয়াব বেড় শুধু ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত স্থান নয়, মোগল স্থাপত্যেব এক অপূর্ব নিদর্শন। খাজা সৈয়দ



সমাধি মন্দিব খাজা আনোয়াব বেড়

আনোয়াব ও আবুল কাশেম ছিলেন দিল্লীশ্বরেব দুই বিশ্বস্ত সেনাপতি। বর্দ্ধমানে সর্দার পাঠানরা বিদ্রোহ ঘোষণা কবলে দিল্লীশ্বব ফাব্রুকশিয়ব সৈয়দ অনোয়াব ও আবুল কাসেম সেনাপতিদ্বয়কে বর্দ্ধমানে প্রেবণ করেন (১৭১৩-১৯ খ্রীঃ) কিন্তু পাঠান সর্দাব রহিম খাঁ কৌশলে এই সেনাপতিদ্বয়কে হত্যা করেন। এই দুঃসংবাদ দিল্লীতে পৌঁছুলে দিল্লীশ্বরের অর্থে বেড় এলাকায় নির্মিত হল এক স্মৃতিসৌধ অভিজাত-শহীদ সৈন্যদের স্মৃতিরক্ষার্থে। তৈবী হল মসজিদ, বাঁধানো পুষ্করিণীর মধ্যে কক্ষ, ফুলওয়ারি বা পুষ্পোদ্যান এবং পুষ্করিণী বা সরোবরের চতুর্দিকে মনোরম বাগিচা। সরোবরের উত্তর দিকে অপূর্ব বেড়-মসজিদ মোগল স্থাপত্যের পরিচয় বহন করছে। গম্বুজাকৃতির এই সমাধির সামনে দুটি করে দুপাশে সুন্দর মিনার। সামনের প্রাঙ্গনে বেশ কয়েকটি কবর— এগুলি যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের কবর। সমগ্র এলাকাটির

প্রবেশ পথ দক্ষিণ দিকে, বিশাল খিলানের উপর উর্ধাংশ অবস্থিত ছোট ছোট ইঁট, ল্যাটেরাইট পাথর ও চুন সুরকি দিয়ে গাঁথা, উপরে বেশ কারুকার্য আছে। সরোবরের মধ্যস্থলে কক্ষে যাবার একটি সরু পথ এসেছে পূর্ব্ব দিক থেকে! পূর্বদিকে রয়েছে খড়ের দোচালা ধাঁচের দুটি কবর—একটি আবুল কাশেমের ও অপরটি সৈয়দ আনোয়ারের।সরোবর ও চতুর্দিকের পথ বাঁধানো। সংরক্ষণের অভাবে সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। সম্রাট এই উপলক্ষ্যে পাঁচটি গ্রাম দান করেন, যার আয় হতে ভবিষ্যতে মকবেরা মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ ও কর্মচারীদের পোষণ করতে কোন অসুবিধে না হয়। বর্দ্ধমানে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হলে খাজা অনোয়ার বেড় আক্রান্ত হয়, সেই সময় সম্রাট প্রদত্ত সনন্দটিও খোয়া যায়। আশরফখান শহীদদের অধঃস্তন পুরুষ হিসাবে সম্রাটের নিকট এই সংবাদ জানালে বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম আর একটি সনন্দ দান করেন (১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে), এই সনন্দে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে সমাধি ক্ষেত্রের সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যয় ভার প্রদত্ত ভূসম্পত্তির আয হতে খরচ হবে শহীদগণের আইনসম্মত উত্তরাধিকারীদের মারফৎ। ভূমিরাজস্ব বিভাগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে ফরমানভুক্ত পাঁচটি মৌজা বর্দ্ধমান মহারাজার জমিদারীর অন্তভুর্ক্ত হয় এবং তার পরিবর্তে মহারাজার কোষাগার থেকে বছরে তিন হাজার ছ'শ নব্বই টাকা শহীদদের বংশধরদের আদায় দেওয়া হত। পরবর্তীকালে মহারাজা সরকারের ট্রেজারীতে উক্ত প্রদেয় বরাদ্দ অর্থ জমা দিতেন এবং ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে মাসিক তিনশত একুশ টাকা পাঁচ আনা চার পয়সা শহীদদের ওয়ারিশানদের দেওয়া হত। শহীদদের শেষ প্রতিনিধি মির্জা শা, গুপ্তা বকত ১৯৪৮ সালের মার্চ পর্যন্ত মাসিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। বর্তমানে শহীদদের উত্তরাধিকারীগণ পাকিস্থানে বসবাস করছেন। বেড়ের মকবেরা এখন সরকার অধিগ্রহণ করেছেন। পৌনে তিনশ বছর ধরে শিয়ামতে শিয়াধর্মের প্রথা অনুযায়ী সমাধি ক্ষেত্রটি রক্ষিত হলেও আজ ভগ্নদশা অবস্থিত। মকবেরায় রয়েছে সেই সুন্দর মসজিদটি যেখানে সকল মুসলমান নামাজ পাঠ করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই প্রতিবছর পয়লা মাঘের পুণ্যদিনে উৎসবে যোগ দেন এবং দূর-দূরান্ত হতে বহু দিশি ও বিদেশী ধার্মিক মানুষ এই স্থানটি দর্শন করতে আসেন। ঐদিন মসজিদের দরজা খোলা রাখা হয়।

বারোদুয়ারী :

বর্দ্ধমান শহরের পশ্চিমে উদয়পল্লীতে অবস্থিত বর্দ্ধমান মহারাজের কীর্তিসৌধ একটি প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য। বর্দ্ধমানরাজ বীরবর কীর্তিচন্দ রায় চিতুয়া ও বরদার (মেদিনীপুর) জমিদার শোভাসিংহের পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন শোভাসিংহের রাজ্য জয় করে। মেদিনীপুরের জমিদার শোভাসিংহ কারণে, অকারণে বর্দ্ধমান রাজের উপর হামলা করত, এমন কি নারীদের উপর পাশবিক



বারোদুয়ারী

অত্যাচার পর্যন্ত করত। কীর্তিচন্দের পিতা জগৎরাম রাযকে শোভাসিংহ ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। তার ভাই হিম্মৎ সিংহই ছিলেন নাটের গুরু। কীর্তিচন্দ সিংহাসনে বসেই ১৭৩৭ খ্রীঃঅব্দে শোভাসিংহ ও তাব ভাই হিম্মৎ সিংহকে সম্মুখ সমরে আহ্বান কবেন এবং সিংহ ভ্রাতৃদ্বয়কে রাজ্যচ্যুত কবেন। এই বিরাট বিজয়ের স্মারক হিসাবে তিনি এই অঞ্চলে বর্তমান উদয়পল্লীতে বাবোটি তোরণ নির্মাণ করেন। এখন একটি মাত্র ভগ্ন অবস্থায় তার সাক্ষ্যবহন করছে, বাকী এগারোটি তোরণের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তালগাছ চলে গেলেও যেমন তালপুকুর নামটা থেকে যায়, এখানেও তাই একটি দুয়ারীই এখন বারোদুয়ারীতোরণ নামে খ্যাত। তোরণের গায়ে একদিকে ইংরেজীতে লেখা আছে:

'This gate way now stands in solitary grandeur to heral the fact that at one time there were 12 such triamphal arches erected

by the heroic Kirtichand Rai of Burdwanand Barodwari the entrance in to Kanchannagar, a town established by himself, and that they were erected to commemorate his victory over Hemmat Singh about the year 1737 A. D. in relation of the brutal assault on the Rajfamily committed by his brother Seva Singh, a Zaminder of Chetua and Barada.'

'অপর দিকে তোরণের ডানদিকে বাংলায় লেখা আছে:

'বর্দ্ধমানাধিপতি বীরবর কীর্ত্তিচন্দ রায় চিতুয়া ও বরদার জমিদার শোভাসিংহের পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধার্থে তাহার ভ্রাতা হেম্মৎ সিংহ প্রভৃতিকে সম্মুখ সমরে ১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দেব কিছুকাল পূর্ব্বের পরাজয়ে কাঞ্চননগরের প্রবেশদ্বারে বারদ্বারী' নামক যে দ্বাদশটি বিজয়তোরণ সংস্থাপন করেন তম্মধ্যে এইটি মাত্র বর্তমান তাহার সেই প্রাচীন কীর্ত্তি বহন করিতেছে।"

চিতুয়ার জমিদার শোভাসিংহ কীর্তিচন্দের পিতামহ কৃষ্ণরাম রায়কে পরাজিত করে বর্দ্ধমান নগরী অবরোধ করলে কৃষ্ণরামের বীরাঙ্গনা কন্যা সত্যবতী রাজঅন্তঃপুরের মহিলাদের নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু শোভাসিংহের লোকজন রাজবাড়ির মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। সত্যবতী শোভাসিংহকে ছুরিকাঘাতে নিহত কবেন ও অন্য মহিলাদের নিয়ে জহরব্রত পালন করে আত্মাহুতি দেন। কৃষ্ণরামের পুত্র ও কীর্তিচন্দের পিতা জগৎরাম ঢাকায় পালিয়ে যান। এর প্রতিশোধ নিতে কীর্তিচন্দ চিতুয়া ও বরদা আক্রমণ করে হিম্মৎসিংকে সম্মুখ সমরে নিহত করেন ও শোভাসিংহের জমিদারী দখল করে পিতৃ-লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

তোরণটির দুদিকে চতুষ্কোণ খাঁজকাটা থাম আছে। মাঝে মাঝে টেরাকোটার কাজ। দুটি থামের মধ্যে খিলানের উপর ঊর্ধাংশ স্থাপিত—মাঝখানে প্রবেশ দ্বার। একেবারে শীর্ষে গ্রাম বাংলার চালাঘরের ছাঁচে তিনটি দেউল। মাঝেরটি আকারে বড় ঠিক পাল্কীর মত দেখতে, দু পাশের দেউল দুটি ছোট। মাঝেরটিতে উভয় দিকেই তিনটি প্রবেশ দ্বার, পাশের ছোট দেউলদুটিতে একটি করে প্রবেশ দ্বার। সংরক্ষণের অভাবে এটি ভেঙে পড়ছে ক্রম।

গোবিন্দদাসের স্মৃতিফলক

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সহচর কড়চা প্রণেতা ভক্তকবি গোবিন্দদাসের স্মৃতিফলক রয়েছে কাঞ্চননগরে, কঙ্কালেশ্বরী কালীমন্দিরের সামনে। পঞ্চদশ শতকে গোবিন্দদাস এই কাঞ্চননগরে কর্মকার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। যেখানে গোবিন্দদাসের ভিটা তার উপর এই সমাধি ফলক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বর্দ্ধমান শাখা নির্মাণ করেন

সন ১৩৫৯ সালেব ১লা বৈশাখ। স্মৃতিফলকে কড়চার ১ম পৃষ্ঠা মুদ্রিত আছে নিম্নরূপ:

"বৰ্দ্ধমান কাঞ্চননগবে মোব ধাম।
শ্যামাদাস পিতৃনাম, গোবিন্দ মোব নাম।।
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে কামাব।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমাব।।
আমাব মাসীব নাম শশীমুখী হয়।
একদিন ঝগড়া কবি মোবে কটু কয়।।
নিবগুণে মুবখ বলি গালি দিলা মোবে।
সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম মোবে।।
চৌদ্দশ ত্রিশ অব্দে বাহিবিতে যাই।
অভিমানে গব গব ফিবে নাহি চাই।।



গোবিন্দ দাসেব সমাধি মন্দিব

কর্মকাব সন্তান গোবিন্দদাস। অস্ত্র, হাতা-বেড়ি গড়াই ছিল তাব কাজ। কিন্তু ভিতরে কবি মন উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। সামান্য লেখাপড়া শিখেই কবিতা লেখা তাঁব নেশা হয়ে দাঁড়ায়। মাসীর ঘবে মানুষ হচ্ছিলেন, কবিতা লেখাব জন্য মাসী

তাকে তিরস্কার করেন। ১৪৩০ খ্রীঃ অব্দে তিনি গৃহত্যাগ করে চলে যান নবদ্বীপে। সেখানে মহাপ্রভুর সাহচর্য পেয়ে তাঁর সহচর হন এবং মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে বেরুলে গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর রোজনামচা কাব্যের ছন্দে লেখেন। তাকেই বলা হয়— গোবিন্দদাসের কড়চা। এটি মনীষীর জন্ম ভিটে, একটি পুরাকীর্তি। বঙ্গীয় কর্মকার সমাজ ১৩৮৯ ষ্টাব্দে ১লা বৈশাখ এই স্মৃতিফলকর পুনঃ নির্মাণ করেন।

শের আফগান-কুতুবউদ্দীনের সমাধি ও পীরবাহারাম

বর্দ্ধমানের পুরাতন চকে অবস্থিত একই সংলগ্ন স্থানে বর্দ্ধমানের শাসনকর্তা ও নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগান এবং দিল্লীর সেনাপতি ও সম্রাট জাহাঙ্গীরের দুধভাই কুতুবউদ্দীনের পাশাপাশি সমাধি আছে। যুদ্ধে শের আফগান ও কুতুবউদ্দীন উভয়েই নিহত হন কুতুবউদ্দীন ও শের আফগানের সমাধি দুটি একটি কক্ষে পাশাপাশি আছে। সমাধির উপরাংশ মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। এই সমাধি দুটির কয়েক গজ দূরে পৃথক একটি কক্ষে হজরত বাহারাম সাক্কা বা পীরবাহারামের সমাধিটি স্বর্ণখচিত চাদর দিয়ে ঢাকা। কক্ষের মেঝেও মার্বেল পাথরে বাঁধানো। হজরত বাহারাম সুদূর তুর্ক থেকে দিল্লী আসেন ও সম্রাট আকবর বাহারামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দিল্লী থেকে বাহারাম বর্দ্ধমানে আসেন ও পুরাতন চকের এই মহল্লায় অবস্থান করেন। এ কাহিনী আগেই বিবৃত হয়েছে। সংলগ্ন এলাকায় মনোরম বাগান রয়েছে। সামনেই একটি সুন্দর পুষ্করিণী। যাত্রীরা এই পুষ্করিণীতে স্নান করে হজরত পীরবাহারামের সমাধিতে পুষ্প, ধূপ দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। এলাকাটি ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান হিসেবে সংরক্ষিত।

কুতুবউদ্দীনের মর্মর সমাধিতে লেখা আছে:

'The forter brother of Emperor Jahangir, received the promise of the high office of Subadar of Bengal on condition that he would procure for his royal master the beautiful Meher-un-nisa, wife of Sher Afgan, Kutubuddin fell in fight that ensured with his gallant opponent and is buried here'

শের আফগানের মর্মর সমাধিতে লেখা আছে:

'Here lies Sher Afgan, Governor of Burdwan, and first husband of Meher-un-nissa. After wards the famous Moghul Empress Nurjahan A.D. 1610.'

সাধু পীরবাহারাম সাক্কার দরগার দক্ষিণে জনসাধারণের ব্যবহার্য গোরস্থানের

দক্ষিণ পশ্চিমদিকে রয়েছে সাধক যোগী জয়পালের সমাধি। হিন্দু-মুসলমান ভক্তগণ শ্রদ্ধাভরে এই দুটি স্থান দর্শন করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পীরবাহারামের আস্তানা ও তৎসংলগ্ন ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগান ও নবাব কুতুবউদ্দীনের সমাধিক্ষেত্র সরকার (Ancient Monument Preservation Act 1904) কর্তৃক সংরক্ষিত।

জুম্মা মসজিদ বা জিমা মসজিদ

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৌহিত্র নবাব আজিম-উশ-শান সপ্তদশ শতাব্দীতে



জুম্মা মসজিদ ও শিব মন্দির

সুবাদার হয়ে বর্দ্ধমান আসেন এবং এই শহরে কিছুদিন বসবাস করেন। পীরবাহারামের সমাধি ক্ষেত্রের দক্ষিণে বাঁকা-নদীর অপর তীরে আজিম-উশ-শানের প্রাসাদ ছিল। আওরঙ্গজেবের অপর নাম ছিল আলমগীর। তাই এই অঞ্চলের নাম হয়ে যায় আলমগঞ্জ। পাঠানদের প্রভাব খর্ব করার জন্য আজিম-উশ-শান কে আলমগীর বর্দ্ধমান

প্রেরণ করেন। ঢাকার নবাব জবরদস্ত খাঁয়ের সহায়তায় আজিম-উশ-শান পাঠানদের পরাস্ত করেন ও মোগল বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ তিনি পীরবাহারামের আস্তানার নিকট সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করেন। এ ছাড়া বর্দ্ধমান কুবুতরখানায় একটি বিরাট মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। আজিম-উশ-শানের নামানুসারে এই মসজিদটির নাম জিমা বা জুম্মা মসজিদ রাখা হয়। এটি বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজবাটির দক্ষিণে অবস্থিত। বিরাট তিনটি গম্বুজবিশিষ্ট এই মসজিদ তৎকালীন মোগল স্থাপত্যের নিদর্শন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জুম্মা মসজিদেব এক পাশে শিবমন্দির ও অন্য পাশে শক্তিময়ী দেবীর যুগল মন্দির। অর্থাৎ ধর্মীয় সহাবস্থানের এই অপূর্ব নিদর্শন দুর্লভ। স্থানটির বর্ত্তমান নাম ময়ূরমহল। রাজবাড়ির দক্ষিণে অবস্থিত।

কালো মসজিদ

রাজবাড়ির সন্নিকটে পুরাতন চক মহল্লায় দিল্লীর সাহেনশা শেরশাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কালো মসজিদ' হিজরী ৯৫০ অব্দে ইংরাজী ১৫৩৭ খ্রীঃ অব্দে নির্মিত হয়। এটি পাঠানদের স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে হুমায়ুন শেরশাহের চুনার দুর্গ আক্রমণ করলে শের কৌশলে মোগল সম্রাটের বশ্যতা মেনে নেন ও আত্মরক্ষা করেন। এই সময় শেরশাহ বর্দ্ধমানে আত্মগোপন করে থাকেন। এই অজ্ঞাতবাস বা কালো অন্ধকারময় দিনকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য শেরশাহ যখন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন তখন এই মসজিদ নির্মিত হয়। অন্ধকার বা কালো দিনগুলির স্মারকচিহ্ন হিসাবে মসজিদের নাম হয় 'কালো মসজিদ'। এতে আরবি ও ফার্সী শিলালিপি রয়েছে, 'লা এলাহা ইল্লাললাহ মোহম্মদ রাসুলুল লা আল হুমদো লিল্লাহে রাববুল আলামীন ওয়াল অফিয়াতুল মুঁততাকিন ওয়াম সালামে আলা সৈয়দুল মুরসালিন ও আলায়হে ও আসহাবে আজ মাইল, আফরিন সদ আফরিণ বর শেরশাহ শোদ ব আহাদ মসজিদ ও মিমবর আলা হাম মোজাহিদমে মোজাদদাদ দর পনাহ কারদ্র বার হক ব তায়েত সিজদাগাহ মোমিনো বাহ রে খোদায়ে জুল জালাল কর নামাজে পানজ গানা কন বখাহ গুয়ত হাতিফ বহরেনাফি তারি-খুশ কনুন মিমবর ও মেহরাব ও মসজিদ মরহবা হিজরী ৯৫০' যার মমার্থ হলো: শত প্রশংসাধন্য শেরশাহ যিনি এটি প্রার্থনার জন্য তৈরী করালেন উক্ত মর্যাদা সম্পন্ন শাসকের আমলে তৈরী এই মসজিদে ধর্মযোদ্ধা এবং ধর্ম সংস্কারক সকলেই পরম প্রভুর উদ্দেশ্যে মাথা নত করতে পারেন। হে ধর্মপ্রাণ মানুষেরা আপনারাও এখানে আল্লার উদ্দেশ্যে নামাজে রত হন। এই মসজিদ স্থাপনের তারিখ 'মেম্বর মসজিদ মেহরাব' শব্দর মধ্যে নিহিত রয়েছে হিজরী ৯৫০ [বর্দ্ধমান রাজ-গণিখান]

কঙ্কালেশ্বরী

কঙ্কালেশ্বরী মূর্ত্তির কথা আমরা আগেই বলেছি কাঞ্চননগরের জঙ্গলের মধ্যে

এটি অবস্থিত। এখন স্থানীয় পল্লীর লোকেরা স্থানটি পরিচ্ছন্ন করেছেন এবং সামনে একটি নাটমন্দিব নির্মাণ কবেছেন। কঙ্কালেশ্ববীব পদতলে শিব থাকায় অষ্টভূজা



কঙ্কালেশ্ববী মন্দিব

এই চামুণ্ডা মূর্তিকে কালীমূর্তি হিসাবে পূজা করা হয। মূর্তিটি পাথবে খোদাই কঙ্কালেব মত। কঙ্কালের উপব দেহের শিরা উপশিবাগুলি এমনভাবে বিন্যস্ত যে অবাক হতে হয়। যে ভাস্কব সে যুগে এই মূর্তি পাথর কুঁদে তৈরী কবেছিলেন, তাব Anatomy-ব জ্ঞান (শারীববিদ্যা) বিস্ময়কর। মূর্তির মাথার উপরে হস্তী ও পদতলে শায়িত শিব। উপরের দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল, তার অগ্রভাগ শায়িত শিবের পাশে অসুব নিধনে রত। কিন্তু অসুর নেই। দুপাশে দুটি শৃগাল উপর দিকে মুখব্যাদন করে আছে। মূর্তির গলায় ঝুলছে নরমুণ্ডের মালা— ভয়ঙ্কর এর রূপ, ভযপূর্ণ ভক্তির সমাহাব। সমগ্র পাথরটি কঙ্কালেশ্বরী মন্দিরের দেওয়ালে সাঁটা। মূর্তিটি কত প্রাচীন সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানতে পারা যায় না। কিন্তু কেউ কেউ বলেন মূর্তিটি জৈন আমলের, আবার কেউ কেউ বলেন এটি থেকে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব অনুমান করা যায়।

কালীবাড়িটিও প্রাচীন। মন্দিরের টেরাকোটার কাজ দেখলেই বোঝা যায় এই মন্দিরও প্রাচীন। বাংলার খড়ের ঘরের চারচালা আদলের নিম্নাংশ ও উপরের অর্থাৎ মধ্যস্থানের দেউলটি মন্দিরের চূড়ার মত।

পুতুল, মূর্তি, ভগ্নাবশেষ

বর্দ্ধমান শহরে একটি শিবমন্দিরে ১৯ শতকের পোড়ামাটির কাজ রয়েছে। প্রবেশ পথের অর্থাৎ তোরণের মাথার উপর 'রামের রাজ্যাভিষেকের' দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। দুই পাশে চামর দোলাচ্ছে দুজন পবিচালিকা। রাম ও সীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট। নীচের তোরণের ঠিক উপরেও পোড়ামাটির কাজ। শায়িত অবস্থায় দুজন গায়ক দুদিকে গান করছেন এবং যন্ত্রসংগীত বাজাচ্ছে।



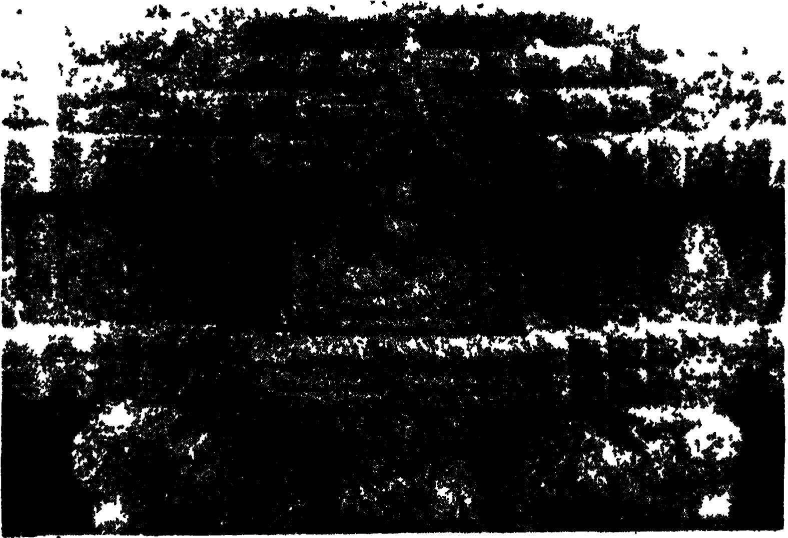
প্রাচীন শিবমন্দিব

অমরার গড় দীর্ঘদিন গোপরাজাদের রাজধানী ছিল। এই অমরার গড়ে ইঁটের তৈরী মন্দির আছে যার ছাতটা দেখতে খড়ো ঘরের চালার মত। বেড়ের খাজা

আনোয়ার শহীদের কবর ও মসজিদ দেখতে খড়ের দোচালার মত। ছোট ছোট ইঁট দিয়ে তৈরী তোরণের অংশটি খিলানের উপর গাঁথা। প্লাস্টার এখনও এমন শক্ত যে ছেড়ে পড়েনি।

মন্তেশ্বর থানার সিজনা গ্রামে পাওয়া গেছে একাদশ শতকের ত্রিভঙ্গ চতুর্ভুজ দণ্ডায়মান বিষ্ণু মূর্তি। মাইকাসিস্ট পাথরে তৈরী। সময়কাল: একাদশ শতক। বৰ্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত। বৰ্দ্ধমান সদর থানার কুচুট ও নবস্থা গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে দণ্ডায়মান অবস্থায়।

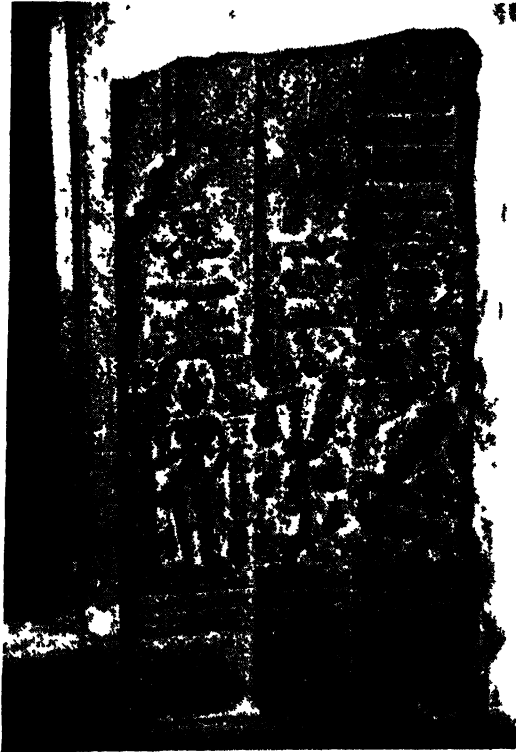
বিষ্ণুমূর্তির ভগ্নাংশ। বিষ্ণুর পাশে দেখা যাচ্ছে বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবীকে। দেবীব বামহস্তে পদ্মফুল মস্তকে গজসিংহ (Motif) মূর্তি। কষ্টিক পাথরে নির্মিত মূর্তি একাদশ শতকের বলে অনুমান হয়। মূর্তিটি বৰ্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত।



বাহির সর্বমঙ্গল মন্দিরের প্রবেশ পথে বেলেপাথরের তৈরী সরদল

বৰ্দ্ধমানের সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির খুবই প্রাচীন। দশম একাদশ শতকের তৈরী। মন্দিরের প্রবেশ পথের সরদল (lintel) টি অপূর্ব্ব কারুকার্য খচিত। সরদলটির মধ্যস্থানে ললিতাসনে উপবিষ্টা চতুর্ভূজা দেবী। প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যের নক্সা খোদিত রয়েছে। সরদলটি বেলেপাথরের তৈরী। পাথর কেটে ও কুঁদে ঐ মূর্তি গড়া হয়েছে।

পাথবেব কাজ বন্ধ হয়ে যায় মুসলমান সংস্কৃতিব আগমনেব সঙ্গে সঙ্গে। তখন শুধুই পোড়ামাটি বা টেবাকোটাব কাজ। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায় বেলে পাথবেব মূর্তি খোদাই এব কাজটি দশম একাদশ শতকেব বলে উল্লেখ কবেছেন। কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলা মন্দিব তৈরী কবে দেবী সর্ব্বমঙ্গলাব প্রতিষ্ঠা কবেন মাহতাব চন্দ ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তা হলে সবদলেব এই বেলেপাথবটি নিশ্চযই সংগৃহীত ছিল, মন্দিব তৈবীব সময এটি লাগানো হয়।



গ্রানাইট পাথবেব তৈবী মন্দিব দবজাব অংশ

মন্তেশ্বব থানাব বোমপুর গ্রামে পাওয়া গেছে গ্রানাইট পাথর নির্মিত মন্দিরের দ্বারের অংশ। বিশ্বেশ্বরীব যোগমায়া আশ্রমের কর্তৃপক্ষ পুকুর খননকালে পাথর দুটি পান ও বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালাকে দান করেন। গ্রানাইট পাথরের নির্মাণকাল নবম-দশক শতকের বলে অনুমিত হয়।

বর্দ্ধমানের কাঞ্চননগরের বালির স্তূপ থেকে পাওয়া গেছে বেলে পাথরের

মূর্তি। শ্রমপদস্থানে দণ্ডায়মান দ্বিভুজ বৈশ্রবণ মূর্তি। বৈশ্রবণ মূর্তিটি বৌদ্ধ দেবতা অমিতাভ পরিবারের অন্তর্গত। নির্মাণকাল : নবম শতক।

অষ্টাদশ শতকের পঞ্চরত্ন দেউল। কাঞ্চননগর কঙ্কালেশ্বরী মন্দিরের পিছনে এখনও ভগ্নাবস্থায় রয়েছে। গৌড়ীয় স্থাপত্যের নিদর্শন। গ্রাম্য চণ্ডী মণ্ডপের আটচালার ধাঁচে ছাউনী ও তার চারকোণে চারটি ছোট ও মাঝে একটি বড় দেউল। গায়ে পোড়ামাটির টেরাকোটার কাজ ও নক্সা।

জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের মূর্তি। কালো পাথরের উপর খোদাই করা। তীর্থঙ্করগণ বস্ত্রাবরণে থাকতেন না, তাই উলঙ্গ কিন্তু শান্ত ও সৌম্য মূর্তি। জৈন আমল বা তৎপরবর্তী জৈনশিষ্যদের দ্বারা প্রস্তুত। অজয় নদের গর্ভে পাথরের একটি বুদ্ধ মূর্তিও পাওয়া গেছে। নির্মাণকাল : বৌদ্ধোত্তর যুগ।

বৈদ্যপুরের শিবমন্দির। মন্দিরের প্রবেশ পথের উপর দেওয়ালে পোড়ামাটিব অপূর্ব কাজ। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারিতে অর্দ্ধ-বৃত্তাকার চালচিত্র নক্সা খচিত এবং দুপাশে ও উপবে তোরণের মত তাতে পোড়ামাটির কাজ তিন সারি। নির্মাণকাল : উনিশ শতকের ?

গলসী থানার আদ্রাহাটিতে পাওয়া গেছে বেলে পাথরের ধ্যানমগ্ন মহাদেব মূর্তি আবক্ষ। নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।

কাইতির পুরাকীর্তি

রায়না থানার কাইতি গ্রাম সম্ভবতঃ প্রচুর পুরাসম্পদে পূর্ণ। অদ্যাবধি তা নিয়ে খননকার্যের মাধ্যমে প্রত্নসম্ভার উদ্ধারের বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। গবেষক ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। কাইতির উত্তর পশ্চিম প্রান্তর বেষ্টন করে মুণ্ডেশ্বরী খাল প্রবাহিত। এই মৃত নদীর উভয়তীরে বাণরাজার কীর্তিকলাপেব নিদর্শন বিদ্যমান। বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ, উষাপোতার স্তূপ, শ্বেতগঙ্গা দীঘি ও তীরবর্তী একটি ভগ্ন মসজিদ উল্লেখযোগ্য প্রত্নবস্তু। গ্রাম পরিবেষ্টিত এককালের 'অগ্নিগড়' আজও প্রাচীন রাজকীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। কাইতির এই বাণরাজাকে পৌরাণিক যুগের 'বাণরাজা' বলে অনেকেই অভিহিত করেন। ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কাইতির ধনাঢ্য বণিক রামরায়কে বণিকদের স্বজাতীয় বিচার সভায় ডাকের নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা রূপরাম চক্রবর্তীর নিবাস ছিল কাইতি-শ্রীরামপুরে। তিনি দিগবন্দনায় কাইতির বাণরাজার পাট, উষাবালি পোতা ও শ্বেত গঙ্গার ঘাটের উল্লেখ করেছেন। গ্রাম বন্দনা করেছেন রূপরাম এইভাবে :

কাইতি চাপিয়া মন্দ বাণবাজার পাট
উষাবালি পোতা বন্দ শ্বেত গঙ্গার ঘাট

অষ্টাদশ শতকে কাইতি সম্পর্কে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য সম্বলিত দলিলে উল্লেখ রয়েছে, কাইতি গ্রামে চৌকি ও মুনসেফী আদালত ছিল।

এই শ্বেতগঙ্গা আদিতে ছিল একটি ধর্মপীঠ। গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহ ও তৎপুত্র নসরৎ শাহের আমলে এই ধর্মপীঠ বিধ্বস্ত হয়েছিল। রূপান্তরিত হয়েছিল মসজিদে। শ্বেতগঙ্গার তীরে অবস্থিত ভগ্ন মসজিদটি পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্য উদঘাটিত হবে। মসজিদটি হিন্দু নাটমন্দিরের ধ্বংস স্তূপের উপর অবস্থিত। পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক হতে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় পাদের মধ্যে এর বর্তমান রূপান্তর। মসজিদের আকৃতি ও দেওয়ালের উপর টেরাকোটার কাজ নিঃসন্দেহে ঐস্লামিক সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে না। সম্ভবতঃ মন্দিরটি পাল, শূর বা তৎপরবর্তী কালের হবে। মূল মসজিদের পূর্বাংশের অনতিদূরে 'অসুরের বিঁড়ে, নামক একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড বর্তমান। স্থানীয় লোকেরা বলেন, শ্বেতগঙ্গা খননকারী 'অসুর' মাটি বইবার জন্য এটিকে মাথায় বিঁড়ে রূপে ব্যবহার করেছিল। উচালনের দীঘির এক কোণে অনুরূপ বিরাট একটি শিলাখণ্ড বিদ্যমান। দশম শতাব্দীতে ধর্মপূজার প্রচলন হয় বল্লুকার তীরে। দেখাদেখি দক্ষিণ দামোদর এলাকায় বড় বড় দীঘি খনন করে কোথাও কোথাও তার নাম দেওয়া হল সাগর বা সায়র বা গঙ্গা। তারই তীরে বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে কূর্মরূপী ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা ও তার পূজা চালু হয়। এই 'বিঁড়েগুলি তারই নিদর্শন। শ্বেতগঙ্গা আয়তনে প্রায় ষোল একর। আদি মন্দির থেকে শ্বেতগঙ্গায় অবতরণের নিমিত্ত সুবিখ্যাত—'শানঘাট'। কবি রূপরাম শ্বেতগঙ্গার সুরম্য সোপানাবলীরও উল্লেখ করেছেন।

শ্বেতগঙ্গার মন্দিরটি ধর্মঠাকুরের—চতুর্দ্বারী মসজিদে রূপান্তরিত করার সময় দক্ষিণদিকের প্রবেশ পথকে পরবর্তীকালে মসজিদের প্রধান ফটক বানানো হয়েছে। বর্তমানে প্রধান ফটকের উভয় পার্শ্বে পুরাতন ইঁটের মূল গাঁথনির দেওয়ালের সঙ্গে পরবর্তীকালে চারহাত প্রস্থের গাড়ার গাঁথনি জোড়া দেওয়া হয়েছিল। এই ধরণের প্রক্ষেপ সম্ভবতঃ একাধিকবার ঘটেছিল। ছাদের ভিতর পিঠের খিলানে অসংখ্য শঙ্খানুকৃতির মৌলিক কারুকার্য এখনও দর্শকদের অবাক করে। মসজিদ গাত্রে রিলিফের কাজে পদ্মের নিদর্শন তিনদিকেই লক্ষ্য করা যায়। মৌলিক মসজিদের অলঙ্করণে এই সকল রূপবিন্যাস বড় একটা দেখা যায় না। পূর্বদিকের দেওয়াল ভেঙে গেছে। নাটমন্দিরের বা চাঁদনির তিনটি স্তম্ভ বিদ্যমান। স্তম্ভগুলির গঠনরীতি পালযুগের। ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাকীর্তির উপরিভাগ Laterite পাথরের চাঙড় দ্বারা গঠিত। অসুরের 'বিঁড়ে' নামক শিলাখণ্ডটি কৃষ্ণবর্ণ উদগত মুখ (পরে বিনষ্ট হয়েছে) বিশাল কূর্মমূর্তি।

দৈর্ঘ্য৩২" × প্রস্থ ৩০" × বেধ, প্রোথিত থাকায় অনুমান করা যায় না। বর্তমানে মৌলবীরা এটি ব্যবহার করেন মশলাবাটার শিলারূপে। আসলে শ্বেতগঙ্গার মন্দিরে ধর্মঠাকুর নামে এই কূর্মমূর্তিটিই পূজিত হতেন। যে গ্রামে নসরৎশাহের এই মসজিদটি রয়েছে এখন সেই গ্রামের নাম মসিদপুর। মসজিদপুরের অপভ্রংশিত নাম।

কাইতি গ্রামে 'বাণেশ্বর' নামে একটি শিবলিঙ্গ আছে। প্রবাদ এই —বাণেশ্বর শিবের মস্তকে একটি মণি স্থাপিত ছিল। একদা এক সন্ন্যাসী এই মণি অপহরণের চেষ্টা করেন। বিগ্রহটির মস্তকচুর্ণ এবং পরবর্তীকালে আবার জোড়া লাগানো হয়েছে। কিন্তু প্রস্তরের আকৃতিতে শ্বেতগঙ্গা মন্দিরের কূর্মশিলার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

বর্তমানে 'সিদ্ধেশ্বরী'র সন্নিকটে বিচূর্ণ বাণেশ্বর শিবকে স্থাপনা করা হয়েছে। জৈনধর্মে কূর্মদেবতা—'কর্মঠাকুর'। শ্বেতগঙ্গায় এর বর্তমান পরিচয় অসুরের বিঁড়ে। শ্বেতগঙ্গা ও কূর্মদেবতা বাণরাজের প্রতিষ্ঠিত। বাণরাজার পৌরাণিক কাহিনী হলো: বাণরাজ ছিলেন অসুর। তার কন্যা সুন্দরী ঊষার প্রতি আকৃষ্ট হন শ্রী কৃষ্ণ পৌত্র অনিরুদ্ধ। তিনি ঊষাকে অপহরণ করেন। ফলে অসুররাজ বাণের সঙ্গে শ্রী কৃষ্ণের যদু বংশের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাণরাজা নিহত হন এবং ঊষার জীবন্ত সমাধি রচিত হয়— এই ঊষা পোতায়। এটি বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণডাঙ্গায় অবস্থিত।

বর্ত্তমানে শ্বেতগঙ্গা হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি। সম্ভবতঃ হুসেনশাহের আমলে এটি মুসলমানদের কবলে আসে। পরবর্তীকালে সহাবস্থান— হিন্দু ও মুসলমানের। বর্তমানে খোন্দোকার বংশ ভগ্ন মসজিদের মৌলবী ও মতোয়ালী। খুব সম্ভবতঃ এঁরাই ছিলেন আদিবাসী পরে সুলতানী উপঢৌকনে বশীভূত হয়েছেন। ধর্মপুরাণের ঐতিহ্যমতে এবং রামাই পণ্ডিতের কথামত ব্রাহ্মণের অনাচার দূর করবার জন্য বৈকুণ্ঠবাসী ধর্মঠাকুর মাথায় কালো টুপী পরে হাতে তীর ধনুক নিয়ে উত্তম ঘোড়ায় চেপে স্বয়ং খোদাবতার 'খোনকার' রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। কাজেই যবন খোন্দকারগণ পরবর্তীকালে খোনকার রূপে পরিচিত হয়েছেন। 'শ্বেতগঙ্গার ঘাটের' উল্লেখ সপ্তদশশতকেও দেখতে পাওয়া যায়। কবি রূপরাম চক্রবর্তী এই ঘাটের বন্দনা করেছেন। মুসলমানগণ শ্বেতগঙ্গাকে 'পীরপুকুর' বলেন। এই পীরপুকুর পারাপার হবার জো নাই। এসব থেকে অনুমান করা যায় বাণরাজার শ্বেতগঙ্গা, সুলতান আমলে মুসলমানদের দখলে আসে। সে সময় শ্বেতগঙ্গার নাম হয় পীরপুকুর এবং গঙ্গার তীরে ধর্মঠাকুরের (কূর্মরূপী ধর্মরাজ) উচ্ছেদ করে মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়। তখনকার গ্রামের নাম মসজিদপুর আজকের মসিদপুর। আর পাশেই 'দওড়া' গ্রাম 'দেববাড়ি'র অপভ্রংশিত রূপ। মসিদপুরে খোন্দকার মুসলমান ও দেওড়াতে বাগদীদের বসতি।

ঊষা পোতা স্তূপটি দেখেই মনে হয়, খনন করলে স্তূপের অভ্যন্তরে প্রাচীন সভ্যতার অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। মুণ্ডেশ্বরী খালের পশ্চিমতীরে 'ঊষা বালি পোতা' অর্থাৎ ঊষাকে বালি দিয়ে প্রোথিত করা হয়েছে। এখনও এই ডাঙ্গাটি বালি ভর্তি।

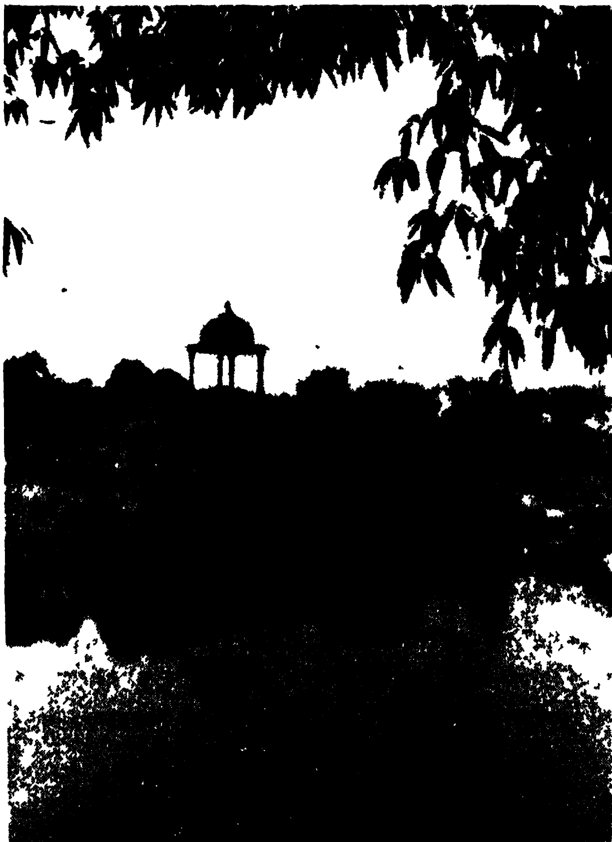
বর্তমানে 'ব্রাহ্মণডাঙ্গা' গ্রামের পূর্ব্বাংশে প্রায় চার একর পরিমিত স্থানের উপর আনুমানিক পঁচিশ ফুট উঁচু মাটির স্তূপ। প্রধান স্তূপের দিকেও ছোট ছোট কয়েকটি স্তূপ আছে। মনে হয় সমগ্র ব্রাহ্মণডাঙ্গার দক্ষিণ মাঠ জুড়ে উষা পোতার স্তূপ বিস্তৃত। সম্ভবতঃ এককালের খরস্রোতা মুণ্ডেশ্বরীর গর্ভেই উষাকন্যার প্রাসাদ হারিয়ে গেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঁটের কুচি ও হরেকরকম পাথরের টুকরো গবেষকদের কৌতূহল জাগায়। কাইতি গ্রাম পর্যবেক্ষণ ও প্রদক্ষিণ করলে এটিকে একটি অতীত নগরীর কঙ্কাল বলে মনে হবে। এখানে ছিল অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর আদিম বাসিন্দা ছুতিয়া জাতি, কোল সম্প্রদায় প্রভৃতি। এদের ছিল আদিম সংস্কৃতি, নরবলির পর কাঁচা মাংস এরা খেতে দিত দেব-দেবীকে। কাঁচা মাংসকে উৎসর্গ করা হত যে দেবতার নামে— তার নাম 'কেসা খাঈতি' অর্থাৎ কাঁচা মাংসখাকী মহাদেবী। এই খাঈতি নাম থেকেই বর্তমান 'কাইতি' নাম অপভ্রংশিত হয়েছে। বর্তমান 'সিদ্ধেশ্বরী'ই সেই প্রাচীনকালের কেস্যা খাইতি।

বিজয়তোরণ

বর্দ্ধমান শহরের মধ্যস্থলে জি, টি, রোড থেকে বি, সি, রোডের প্রবেশ মুখে সুন্দর এই তোরণটি নির্মাণ করান মহারাজ বিজয়চন্দ মহতাব ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড কার্জনের বর্দ্ধমান শহরে আগমন উপলক্ষ্যে। লর্ড কার্জন বর্দ্ধমানে এলে ষ্টেশন থেকে জি, টি, রোড ও বি, সি, রোড লাল কার্পেট দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়, ছড়ানো হয় পুষ্প ও গোলাপজল। তখন তোরণটির নাম খোদিত ছিল STAR OF INDIA বোম্বের আরব সাগরের তীরে অবস্থিত Gate way of India ধাঁচে। এটি প্রস্তুত করতে ইতালি থেকে স্থপতি আনা হয়েছিল। মূল তোরণটি মাঝে-খিলান দিয়ে তৈরী। মধ্যস্থলে শীর্ষে দণ্ডায়মান একটি নারী ও তার দুপাশে উপবিষ্ট দুটি নারী— এই তিনজনেই স্বাগত জানাবার ভঙ্গীতে প্রস্তুত। দুপাশে দুটি ছোট তোরণ, এদুটিও খিলান দিয়ে তৈরী। এই প্রশাখা তোরণের উপর দুটি সিংহ উপবিষ্ট। মূল তোরণের দুপাশে দুটি করে গোল স্তম্ভ। আধুনিক ইতালীর স্থাপত্যের এটি একটি চমৎকার নিদর্শন। বর্তমানে পূর্তদপ্তর তোরণটির সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকার বিজয়চন্দ মহতাবের নামে তোরণের নাম রাখেন 'বিজয়তোরণ' তার আগে লোকে এই তোরণকে বলতো, কার্জন গেট। আর শহরের প্রবেশ মুখ রাখা হয় বি, সি, রোড বা বিজয়চন্দ রোড। এটি এখন বর্দ্ধমানের স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নমুনা।

বৰ্দ্ধমান ও কালনার ভাস্কর্য

বৰ্দ্ধমান ও কালনা শহরে বৰ্দ্ধমান রাজাদের দৌলতে যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে তা এখন স্থাপত্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। বৰ্দ্ধমান রাজবাড়ি চতুর্দিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা চত্বরের মাঝে বিশাল ও উঁচু প্রাসাদ আজও অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ইতালির ভাস্কর ও স্থাপত্য শিল্পীব ছোঁয়া রযেছে প্রতিটি থামের উর্ধভাগে কার্ণিশেব কারুকার্যে। প্রাসাদের উর্দ্ধাংশ সুন্দর কাঠের জাফরি দিয়ে ঘেরা। তোরণ গড়ে উঠেছে খিলান দিয়ে। রাণীমহলের অভ্যন্তরভাগ মার্বেল পাথরে মোড়া। নর্তকীদের জন্য কাঠের সিঁড়ি ও মেঝেতে পাটাতন। এখন এখানে বৰ্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রশাসনিক



গোলাপ বাগ

অফিস রয়েছে। গোলাপবাগের সুন্দর বাগিচা, হাওয়া মহল, পরিখা ও গাছগাছালির রমণীয় সমাহার নয়নমুগ্ধকর। বিজয় বাহার অরণ্যে স্থাপিত হয়েছে 'ডীয়ার পার্ক' বা হরিণাবাস। বনবিভাগ এর রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তেমনি বনাবাস কুটিরে এখন ষ্টুডেন্টস হেলথ হোম স্থাপিত হয়েছে। রাজবাড়ির মন্দিরগুলির স্থাপত্য শিল্পও গর্ব করার মত।

কালনায় রয়েছে মহাপ্রভুতলা, যেখানে ভগবান শ্রীচৈতন্য বিশ্রাম করেছিলেন। বর্দ্ধমান রাজ প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের মন্দির– পঁচিশ চূড়া বিশিষ্ট অপূর্ব নক্সা করা টেবাকোটার কাজ। রাধাকৃষ্ণের মন্দির অভ্যন্তরে রয়েছে সুন্দর আলপনার নক্সা। রাজবাড়ির শিব মন্দিরটি সুউচ্চ, গাত্রে টেরাকোটার খাঁজ, তাতে পোড়া মাটির কাজ করা– কোথাও শোভাযাত্রা, কোথাও আবাহন, কোথাও লতাপাতার নক্সা এবং খাঁজ কাটা জাফরি। শিবমন্দিরটির উর্ধভাগ ক্রমশ খাঁজ কাটা ও সরু হয়ে উপরে উঠে গেছে। আব আছে ১০৮ শিবমন্দির, বৃত্তাকারে সজ্জিত বর্দ্ধমান মহারাজের সৃষ্ট স্থাপত্য শৈলী বাদ দিলে বর্দ্ধমানেব গৌরব করার আর কিছু থাকেনা।

গ্রন্থপঞ্জী

1. The Excavations at Pandu Rajar Dhibi– P. C. Dasgupta
2. An Encyclopaedia of Indian Archacology– A. Ghosh (Vol-II)
3. প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা– পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত
4. Inscriptions of Bengal– N. G. Majumdar
5. বর্দ্ধমান রাজ– আব্দুল গণিখান
6. শারদীয় বিজয় তোরণ– ১৯৮১, ৮২, ৮৩, ৮৬, ৮৭ সংখ্যা
7. Burdwan University Museum & Art Gallery with spl reference to Sailendranath Samanta
8. History of Ancient Bengal– Dr. R. C. Majumdar
9. Statistical Accounts of Bengal– W. Hunter
10. উগ্রক্ষত্রিয় পরিচিতি– সঞ্জীব বন্ধু
11. বাঙালীর ইতিহাস– (আদিপর্ব)– নীহাররঞ্জন রায়
12. বর্দ্ধমান সাম্মিলনী হীরক জয়ন্তী সংখ্যা– ১৯৭৪

তৃতীয় পর্ব

জেলা পরিচিতি

গ্রাম-গঞ্জ-ব্লক-শহর

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জেলা বর্দ্ধমান ঐতিহাসিক দিক থেকে তো বটেই, শিল্পে সমৃদ্ধ ও কৃষি প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে শিল্প ও অপরদিকে কৃষি—এই দুই সম্পদে সমৃদ্ধ রাজ্যের জেলা বর্দ্ধমান। আয়তন ৭০২৪.৪৫ বর্গকিলোমিটার, লোক সংখ্যা (১৯৮১ আদম সুমারী) ৪৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৮৬, বর্তমানে প্রায় ষাট লক্ষ। গ্রামের সংখ্যা ২৭২৮, পঞ্চায়েতের সংখ্যা ২৯৩, জেলাপরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২৩, পঞ্চায়েত সমিতির সংখ্যা ৩১ এবং পঞ্চায়েত ব্লক ২টি (হীরাপুর ও কুলটি)। প্রায় দশ শতাংশ তফশীল জাতি ও উপজাতিভুক্ত। কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ৪,৫৫,৩০০ হেক্টর—এর প্রায় অর্ধেক জমিতে দুই বা তিনবার ফসল ফলে।

জেলা বর্দ্ধমান ছয়টি মহকুমায় বিভক্ত— বর্দ্ধমান সদর (উত্তর ও দক্ষিণ), কাটোয়া, কালনা, দুর্গাপুব ও আসানসোল। মোট তেত্রিশটি ব্লক নিয়ে এই বিশাল জেলা। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সম্প্রতি সদর মহকুমাকে উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। দুই অংশের জন্য দুজন সদর মহকুমা শাসকও নিযুক্ত হয়েছেন। এছাড়াও রয়েছে কয়েকটি পুর এলাকা—যেমন: বর্দ্ধমান, কালনা, দাঁইহাট, কাটোয়া, রাণীগঞ্জ, আসানসোল ও গুসকরা। আর রয়েছে নোটিফায়েড এলাকা— দুর্গাপুর। হীরাপুর ও কুলটি বাদ দিলে একত্রিশটি ব্লকেই রয়েছে নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতি। জেলার মানচিত্রকে ঘিরে রেখেছে বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও হুগলী জেলা এবং বিহার রাজ্য। তাই খুব স্বাভাবিক কারণে সামাজিক সহবাসে সীমানা এলাকার জনগণের মধ্যে পাশের রাজ্য ও জেলার প্রভাব পড়েছে বেশ। সীমানা এলাকার শহর ও গাঁয়ে—তাই বর্দ্ধমান জেলার প্রকৃত চিত্র নেই। ভিতর ও বাইরের সংস্কৃতি মিলে মিশে নূতন এক ধারা গড়ে তুলেছে এখানকার জনগোষ্ঠী। যেমন—আসানসোল, কুলটি, বরাকরে আছে বিহারের ছায়া, বাঁকুড়ার প্রান্ত এলাকায় খণ্ডঘোষ ব্লকের গ্রামগুলিতে আছে বাঁকুড়ার টান, বীরভূম সংলগ্ন কাঁকশায় রয়েছে বীরভূমের ছোঁয়া, নদীয়া ও হুগলীর সীমান্তবর্তী বর্দ্ধমানের গ্রামগুলিতে রয়েছে তার সংস্কৃতির মিশ্রিত প্রতিফলন।

কালনা, কাটোয়া ও সদর মহকুমা হল শস্যভাণ্ডার। শিল্প এলাকা দুর্গাপুর-আসানসোল কৃষিকাজে অনুর্বর, ফসলও তাই কম। সাধারণভাবে ধান, গম,

সরিষা, আলুই প্রধান শস্য। কিন্তু এছাড়া কাঁচা শাকসব্জি মূলো, কপি, কড়াইশুঁটি, মুসুর, মুগ, অরহর, তিল, পালং, বেগুন, উচ্ছে, ঢ্যাঁড়স, তরমুজ, ঝিঙা, পটল, লংকা প্রভৃতি সব্জি শস্যও কৃষি এলাকায় ভাল হয়। গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে পাট চাষ ব্যাপকভাবে হয়। কৃষি এলাকায় পাম্পের সাহায্যে ও ক্যানেলের জলে বোরো চাষ হয়।

সদর মহকুমা

এগারোটি ব্লক নিয়ে এই মহকুমা গঠিত। এগুলি হল: (১) বৰ্দ্ধমান, (২) ভাতাড়, (৩) গলসী-২, (৪) আউসগ্রাম-১, (৫) আউসগ্রাম-২, (৬) জামালপুর, (৭) মেমারী-১, (৮) মেমারী-২, (৯) খণ্ডঘোষ, (১০) রায়না-১, (১১) রায়না-২, এই ১১ টি ব্লক ছাড়াও রয়েছে বৰ্দ্ধমান ও গুসকরা পুরসভা। উপরে বর্ণিত প্রথম পাঁচটি ব্লক নিয়ে গড়ে উঠেছে বৰ্দ্ধমান সদর (উত্তর) মহকুমা ও বাকী ছটি ব্লক ও বৰ্দ্ধমান পুরসভা নিয়ে গঠিত হয়েছে বৰ্দ্ধমান সদর (দক্ষিণ) মহকুমা। দুই মহকুমার সদর দপ্তর বৰ্দ্ধমান পুরসভায় অবস্থিত।

সদর মহকুমার প্রায় সব কটি ব্লকই সমতল ভূমি। ব্যতিক্রম কিছুটা আউস গ্রাম। এই ব্লকের লাল কাঁকর মাটি বীরভূমের বৈচিত্র্য এনেছে। প্রধান নদী অজয় ও দামোদর। ছোট নদী রয়েছে খড়ি, বাঁকা, কুনুর, বেহুলা, দেবখাল। বড় নদী দামোদর বৰ্দ্ধমান সদর মহকুমার সভ্যতাকে ধরে রেখেছে। বিহারে হাজারীবাগ থেকে এই নদী উদ্ভুত হয়ে ছোট নাগপুরের মধ্য দিয়ে এসে বৰ্দ্ধমান জেলার ডিসেরগড়ে বরাকরের সঙ্গে মিশেছে। এরপর বৰ্দ্ধমান জেলার প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে খণ্ডঘোষ থানার কাছে এই জেলায় ঢুকেছে এবং বৰ্দ্ধমান শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শক্তিগড় থেকে খাড়া দক্ষিণে চলে গেছে। জেলার সর্বদক্ষিণে মোহনপুরের কাছে হুগলী নদীতে ঢুকেছে।

এই এলাকার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাষের জন্য দামোদরের উপর নির্ভরশীল। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন হওয়ার পর জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে ডি, ভি, সি সত্যই বৰ্দ্ধমানের জনজীবনে আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। আগে দামোদরকে বলা হত বৰ্দ্ধমানের দুঃখ। কিন্তু ডি, ভি, সির বাঁধ সেই বন্যাকে রুখে দিয়েছে, তেমনি সেচের খাল দিয়ে জলসরবরাহের ফলে দুটো ফসল বৰ্দ্ধমানে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। তাই এই মহকুমার গ্রামীণ অর্থনীতি গ্রামের ছেলেদের গ্রামছাড়া করেনি। শহরে কর্মসংস্থান ও বাণিজ্য উপলক্ষে গেলেও গ্রামের মাটিতে তাদের ভাগ্য বাঁধা পড়েছে। বাঙলার শস্যভাণ্ডার হিসাবে সদর মহকুমা সেই সাক্ষ্যই বহন করছে। ফলে এককালের জীর্ণ ভাঙা-চোরা গ্রাম নূতন কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে চাঙ্গা

হয়ে উঠেছে। পূজা পার্বণ-মেলায় বৰ্দ্ধমান মহকুমার গ্রামগুলি মুখর। সফল গ্রামীণ অর্থনীতি বর্দ্ধমান শহরকে পুষ্ট করছে প্রতিনিয়ত। যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট সবই বর্ধিষ্ণু গ্রামের প্রগতির ফলেই।

সদর মহকুমার মূল বৰ্দ্ধমান শহর ছাড়াও গ্রামে বড় বড় গঞ্জ গড়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, মিষ্টান্ন শিল্প এবং হাতে তৈরী জিনিষপত্রের উপর অনেক মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল। শক্তিগড়ের ল্যাংচা, বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, জামালপুরের মাখা সন্দেশ, মানকরের কদমা, রায়নার রসগোল্লা, শুধু বিখ্যাতই নয়, অনাদিকালের ধারাবাহিকতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। লুপ্তপ্রায় কাঞ্চননগরের ছুরি কাঁচি, গুসকরার পিতলের বাসন; ডোকরা, মেমারীর মাদুর শিল্প ও রেশমের শাড়ি, পঞ্চপল্লীর কুটিরশিল্প ও মাটির বাসন শিল্প—এই মহকুমার অস্তিত্বকে বৈচিত্র্যে ভরিয়ে দিয়েছে। এই মহকুমার রাস্তার ধারে ধারে গড়ে উঠেছে বড় বড় রাইস মিল আর কোল্ড ষ্টোরেজ। গ্রামীণ অর্থনীতির পরিপুষ্টির লক্ষণ এগুলি।

বৰ্দ্ধমান নগর

বৰ্দ্ধমান পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ নগর। এককালে এই শহর দামোদর নদ বা তার শাখা প্রশাখার তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমান বর্দ্ধমান নগর দামোদরের শাখা বাঁকা নদীর তীরবর্তী। কিন্তু দামোদর পর্যন্ত ক্রমে বিস্তৃত হচ্ছে। একদা বাঁকা নদী দিয়েই দামোদরের এক প্রধান ও স্থায়ী স্রোত বারো মাস বইত। সুতরাং প্রাচীন বর্দ্ধমান শহর দামোদর তীরবর্তী কোন স্থানে ছিল বলে অনুমান করা যায়। কেউ কেউ বলেন বৰ্দ্ধমান নামটি বড়য়ান বা বড়ৈঁয়া শব্দের অপভ্রংশিত রূপ। মেমারীর কাছে 'বড়ৈঁয়া' শব্দের নামে গ্রাম এখনও আছে। এই গ্রাম বেশ প্রাচীন তা ধর্মপূজা পদ্ধতি থেকে জানা যায়। তবে কি প্রাচীন বৰ্দ্ধমান শহর ঐ বড়ৈঁয়া? কালক্রমে দামোদর খাত পরিবর্তন করলে 'বৰ্দ্ধমান' শহরের পত্তন হয় দামোদর শাখানদী বাঁকার তীরে? বৰ্দ্ধমান প্রদেশ ও বর্দ্ধমানভুক্তি সমগ্র রাঢ় উপত্যকাকে বোঝাত, কিন্তু শহর বৰ্দ্ধমান কোথায় ছিল? বর্তমান বৰ্দ্ধমান নগরীই বা কে পত্তন করেন? এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। প্রায় ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা দুটি বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত ছিল—উত্তর ও দক্ষিণ। খণ্ড দুটির মধ্যেকার ভেদরেখা ছিল ভাগীরথী। উত্তর প্রদেশের প্রধান নগর পুণ্ড্রবর্ধন থেকে সেখানকার প্রশাসনিক নাম হয়েছিল—পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি। দক্ষিণ প্রদেশের প্রধান নগর বর্দ্ধমানের নাম অনুসারে এদেশের নাম হয়েছিল বৰ্দ্ধমানভুক্তি। সেই বর্দ্ধমান নগর কিন্তু বর্তমান বৰ্দ্ধমান নগর নয়। মল্লসারুল তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ৬ষ্ঠ শতকের সেই বৰ্দ্ধমানভুক্তির কথা: সতত ধর্মক্রিয়া বৰ্দ্ধমানায়াং'। কিন্তু প্রাচীন বর্দ্ধমান নগরী কোথায় ছিল, তা অনুমান সাপেক্ষ। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সেই প্রাচীন শহর ছিল গুপ্ত রাজাদের অধীনে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে

সামন্ত রাজা বিজয়সেনের অধীনে, তারপর 'রণধারা বাহি জয়গান গাহি' একে একে এর হাত বদল হয়েছে শশাঙ্ক, গোপাল, ধর্মপাল, মহীপাল, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন হয়ে বক্তিয়ার খিলজির। তারপর আসে মোগল যুগ। আকবর বাংলাদেশ অভিযান করেন (১৫৭৪-৭৬ খ্রীঃ অঃ); শূর বংশের পাঠানদের পর কররানী বংশের সুলেমান কররানী বাংলার সুলতান হন (১৫৬৫খ্রীঃ অঃ) সুলেমান কররানী আকবরের কর্তৃত্ব স্বীকার করলেও তাঁর মৃত্যুর (১৫৭২ খ্রীঃ অঃ) পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খান সিংহাসনে বসে নিজ নামে খুতবা পাঠ ও মুদ্রার (Coin) প্রচলন করেন। আকবর দাউদের ঔদ্ধত্ব দমন করবার জন্য বাংলাদেশ অভিযান করেন। আকবরের দক্ষ সেনাপতি মুনিম খাঁর হাতে দাউদ খান রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন (১৫৭৬ খ্রীঃ অঃ)। অপর সেনাপতি টোডরমল বৰ্দ্ধমান শহরেই যুদ্ধের ঘাঁটি রচনা করে বৰ্দ্ধমান দুর্গে দাউদের পরিজনদের বন্দী করে রাখেন। আইনী আকবরী-ই-গ্রন্থে পাওয়া যায় মোগল আমলে বৰ্দ্ধমানের নাম ছিল 'শরিফাবাদ'। শরিফ শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্ত।. তখনও ঠিক বর্দ্ধমান শহর যা বর্তমানে রয়েছে গড়ে ওঠেনি। শের আফগানের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-২৭ খ্রীঃ) দুই ভাই কুতুবউদ্দীনের যুদ্ধকালে বর্তমান পাকিস্তানের লাহোর শহরের অন্তর্গত কোটলা মহল্লা নিবাসী জনৈক ক্ষত্রিয় বাবু রায় ও সঙ্গম রায় বাদশাহী সৈন্যদের খাদ্য জুগিয়েছিলেন, ফলে সঙ্গম রায় মোগল বাদশাহের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং জাহাঙ্গীর সঙ্গম রায়কে বন্ধুত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ চার হাজারী মুনসেফদারী (কোতোয়ালী) দান করেন। বর্তমান শহরের গোড়া পত্তনের ইতিহাস এখান থেকে সুরু। কারণ সঙ্গম রায় ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। বৰ্দ্ধমান থেকে সস্তায় খাদ্যদ্রব্য কিনে বাইরে চালান দিতেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে শুষ্ক বল্লুকা নদীর তীরে বাসভবন ও একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা কবেন (১৬১০ খ্রীঃ অঃ) এই সঙ্গম রায়ের বংশই তিল তিল করে বৰ্দ্ধমানকে সজ্জিত করে গেছেন, যার গোড়া পত্তন আজ থেকে প্রায় চারশত বছর আগে। ইংরেজ বণিক জবচার্ণক কলিকাতা নগরীর পত্তন করেছিলেন, আর ক্ষত্রিয় বণিক সঙ্গম রায় বৰ্দ্ধমান রাজ্য ও নগরীর সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। অতএব বলতে পারি, বর্দ্ধমান নগরীর বয়স প্রায় চারশ বছর। এই চারশ বছর ধরে বৰ্দ্ধমান রাজবংশের সঙ্গম রায় থেকে শুরু করে উদয়চন্দ পর্যন্ত বৰ্দ্ধমান নগরী গড়ে তোলেন।

দ্রষ্টব্য স্থান :

রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি রমণীয় গোলাপবাগ, রমনার বাগান, বিজয় বিহার, রাজবাড়ী, বনাবাস কুটির, টাউনহল, বিজয়তোরণ, বারোদুয়ারী, মহন্তর অস্থল, উদয়চন্দ গ্রন্থাগার, রাজকলেজ, সর্বমঙ্গলা মন্দির, রাধাবল্লভ মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ মন্দির, রাজরাজেশ্বর শিব মন্দির, সোনার কালীবাড়ী, ঈশানেশ্বর, কমলাকান্ত

কালীবাড়ী, সাহিত্য পরিষদ, হরিসভা, উদয়চন্দ মহিলা কলেজ, মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনলজি, বি. সি. রোড, একশত আট শিবমন্দির, কৃষ্ণসায়র, শ্যামসায়র, রাণীসায়র, কমলসায়র, বিজয়চাঁদ হাসপাতাল প্রভৃতি। পুরা সম্পদ ও ভাস্কর্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হল– কঙ্কালেশ্বরী কালী, গোবিন্দদাসের সমাধি, কাঞ্চননগরে কর্মকার বংশে জন্মগ্রহণ করেন কড়চা প্রণেতা গোবিন্দদাস। তিনি মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের মাঠ, সতীর মাঠ, বাবা বর্দ্ধমানেশ্বর। প্রভৃতি স্বাধীনতার পর গড়ে ওঠা উল্লেখযোগ্য হল– সরকার ডেয়ারী, কৃষক সেতু, অরবিন্দ ভবন, বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভবন, রেডক্রশ ভবন, মেডিকেল কলেজ, বিবেকানন্দ ভবন. ডঃ শৈলেন্দ্র নাথ মূক-বধির বিদ্যালয়, বর্দ্ধমান ব্লাইণ্ড একাডেমী, পূর্তভবন, অরবিন্দ ষ্টেডিয়াম, রাধারাণী মহতাব ষ্টেডিয়াম, ষ্টুডেন্টস হেলথ হোম, শহীদ শিবশংকর সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ আশ্রম, দূরদর্শন স্তম্ভ, মীনভবন।

।। বর্দ্ধমান পৌরসভা ।।

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১ এপ্রিল। ৬টি ওয়ার্ড ছিল তখন, জনসংখ্যা ছিল ৩৫,৯২১। পরে ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দে ২৫টি ওয়ার্ডে বিভক্ত কবা হয়। শহরের পার্শ্ববর্তী কিছু অনুন্নত গ্রাম এলাকাকে যুক্ত করে ওয়ার্ডের সংখ্যা ২৫ থেকে ২৯ করা হয় ১৯৮৮ খ্রীঃ অব্দে। পৌর এলাকার বর্তমান আয়তন ২২.৭ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৩শত ৬৪ জন। প্রায় ৩৫ হাজার হোল্ডিং এর উপর করদাতা আছেন পৌরসভায়, যার বাজেট হল বৎসবে পাঁচ কোটি টাকা। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি ক্রমশঃ পৌর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ও আয়তন ক্রমশঃ বাড়ছে। গ্রামাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও মনীষীগণ প্রায় সকলেই বর্দ্ধমান শহরে কর্মোপলক্ষে বাস করতেন। বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিনের বাসভবন ছিল পার্কাস রোডে। এই রোডেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাসা ছিল।

।। বর্দ্ধমান সদর ব্লক ।।

মৌজার সংখ্যা· ১৫৫ এবং গ্রামের সংখ্যা ২৩৪, আয়তন ৩৮৪.২ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চায়েত ১৬, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৪৯। সদর মহকুমার উল্লেখযোগ্য গঞ্জ হল–সেহারা বাজার, মেমারী, গোবিন্দপুর, পাহাড়হাটি শক্তিগড়, বড়শূল, রসুলপুর, গুসকরা, জামালপুর, রায়না, ভাতাড়, কাইতি, গলসী, শ্যামসুন্দর, বলগোনা, গোতান, কুলীনগ্রাম, জৌগ্রাম, চকদিঘি, শুড়েকালনা, খণ্ডঘোষ, উচালন, কুড়মুন, নাসিগ্রাম।

এই ব্লক বর্তমানে বর্দ্ধমানে (উত্তরের) মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য

স্থান '১০৮ শিবমন্দির', বর্দ্ধমান পুর এলাকার সন্নিকটে এই সদর ব্লকের অন্তর্গত। এই ব্লকের কুড়মুন একটি প্রাচিন গ্রাম। ঈশানেশ্বর শিবের গাজন বিখ্যাত। রাঢ়ের আদি দেবতা ধর্মরাজই ঈশানেশ্বর। গ্রামের 'মণ্ডল' উপাধিধারীগণ গাজনের পরিচালক। গাজনের উল্লেখযোগ্য হল—সন্ন্যাসীদের 'নরমুণ্ডের' খেলা। কবি বৃন্দাবন দাস উল্লেখ করেছেন—

কেহ কেহ মানুষের ছিন্ন মুণ্ড লৈয়া।
খড়্গ করে নর্ত্তন করয়ে মত্ত হৈয়া।।

আর 'শ্মশান চেয়ানো'। খড়ি নদী গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। এই গ্রামের ব্রাহ্মণ কন্যা শ্রীমতী দেবীকে রাজা রামমোহন রায় দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। গ্রামটি প্রায় তিনশ বছরের পুরাতন বলে অনুমান করা হয়। 'উগ্রক্ষত্রিয়রাই' বেশি, অন্য জাতিও আছে— তবে কম। বণ্ডুল অঞ্চলের অন্তগর্ত কামারকিতা একটি কীর্তিময়ী গ্রাম। এখানে হাজার বছর আগেকার সামন্তরাজাদের গড় বর্তমান। গ্রামের উত্তর পূর্ব প্রান্তে বিস্তীর্ণ পরিখা দ্বারা বেষ্টিত এই গড়। বেষ্টনীর দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় মাইল ও প্রস্থ এক মাইল। কুড়মুন-বুড়ার গ্রামে ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন কবি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ।

বর্দ্ধমান শহর থেকে সড়কপথে ১৯ কিমি দূরে দামোদর নদের উত্তরতীরে অবস্থিত প্রাচীন বর্ধিষ্ণু 'বড়শুল' গ্রাম। মধ্যযুগের সুচনা থেকেই বাণিজ্যের জন্য বড়শুল বিখ্যাত। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক ও তাম্বুলীরাই বাণিজ্য লক্ষ্মীর কল্যাণে শত শত বছর ধরে এখানে বড় বড় ব্যবসায়, বিপুল ধনসম্পত্তির রাজ্যপাট জাঁকিয়ে বসেছিলেন। দামোদর প্রবাহ পথে এদের বাণিজ্যতরী ভাসত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে জনার্দন পণ্ডিতের পাত্র নির্ব্বাচন থেকে এই ধনাঢ্য সওদাগরদের এক তালিকা পাওয়া যায়—সওদাগর হরিদত্তের বাস এই বড়শুল গ্রামে। ধর্মরাজতলায় সওদাগর হরিদত্তের ভগ্ন প্রাসাদ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। প্রাসাদটির চতুর্দিকে রয়েছে পরিখা। বড়শুল বেসিক ট্রেনিং কলেজের পাশ দিয়ে বহে যাওয়া ক্ষীণকায়া গাঙ্গুড়েই' বেহুলা' লখিন্দরের দেহ নিয়ে ভেলা ভাসিয়েছিলেন।

বর্দ্ধমান মুসলমানদের অধীনে এলে বড়শুলেও তার প্রভাব পড়ে। বড়শুল হাটতলার পশ্চিমদিকে সুবিশাল 'পীরতলাটি' তারই প্রমাণ। কিংবদন্তি, বড় রসুল অর্থাৎ 'বড় পীর' তার থেকেই গ্রামের নামকরণ বড়শুল। এখানে বেসিক ট্রেনিং কলেজ, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিজ্ঞান মন্দির, সাধারণ পাঠাগার, ছোটখাটো কুটির শিল্প ও বড় ধরণের একটি সূতার কল আছে।

'ল্যাংচার' জন্য শক্তিগড় ভারত বিখ্যাত হলেও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। শেরশাহের নির্মিত জি, টি, রোড যা আগের বাদশাহী সড়ক বলে পরিচিত ছিল,

এই রাস্তার ধারে ধারে মোগলরা সৈন্যশিবিরের ছাউনী ফেলত– শিমলাগড়, শক্তিগড়, পানাগড় ইত্যাদি নাম থেকে এ তথ্য অনুমান করা যায়। কেউ কেউ বলেন এখানে মধ্যযুগে সামন্ত রাজারা রাজত্ব করতেন, তার থেকেই 'গড়' বা দুর্গ নামের উৎপত্তি। বড়শুলের বামুনপাড়ায় ব্যঙ্গরস সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর জন্ম।

এই ব্লকের সোনাপলাশী গ্রাম 'রেভারেণ্ড' লালবিহারীদের জন্মস্থান বলে বিখ্যাত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'বাঙলার কৃষক জীবন' Bengal Peasant, life ইংরাজীতে লিখে প্রথম ভাবতীয় হিসাবে পুরস্কার পেয়েছিলেন। সদর থানাব খড়ি নদীর তীরে চান্নাগ্রামে 'বিপ্লবের ব্রহ্মা' যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ইনি নিরালম্ব স্বামী নাম নিয়ে অধ্যাত্মজীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'বর্দ্ধমানের গান্ধী' যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা সাটিনন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। রিপণ কলেজে অধ্যয়নের সময় মনীষী অধ্যক্ষ রামেন্দ্র সুন্দব ত্রিবেদীর সংস্পর্শে আসেন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন।

।। জামালপুর ব্লক ।।

আয়তন ২৬৭.৮৮ বর্গ কিলোমিটার, পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৩, মৌজার সংখ্যা ১২৩, গ্রামের সংখ্যা ২২৯, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৭১ হাজার ২ শত ২৩। মেমারী ব্লকের দক্ষিণে এবং দামোদর নদীর পূর্বতীরে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ফালির মত জামালপুর ব্লক হুগলির সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। ২৩০টি গ্রাম নিয়ে এই বিশাল ব্লক গড়ে উঠেছে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে জামালপুর গ্রাম সম্পর্কে বলা হয়েছে: "Jamalpur– a village situated some eleven miles south of Memari railway station on the east bank of Damodar river. The village is an important trading centre and contains a sub-registry office, a police station, a sub-post office, a lower pry school and a Public Works Department inspection Bungalow."

আজ জামালপুর ব্লকের জামালপুর, শুঁড়ে-কালনা এবং চকদীঘি বড় গঞ্জ এবং ব্যবসায় কেন্দ্র। এখানকার প্রধান ফসল ধান ও আলু এবং রবিশস্য। ডি. ভি. সির প্রধান সেচ খাল এই ব্লকের মাঝামাঝি চলে গেছে, তাই এখানকার প্রায় আশিভাগ জমি দুই বা তিন ফসলী। এই ব্লকের পূর্বদিক বরাবর কর্ড লাইন রেল থাকায় যাত্রীদের অধিকাংশই কলকাতায় ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কর্মসংস্থান ও ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করেন। সেজন্য কর্ডলাইনের পার্শ্ববর্তী উচ্চ বিদ্যালয়গুলি রবিবারে খোলা থাকে, অন্য বার একদিন বন্ধ থাকে, যাতে করে গ্রামের মানুষ অফিস ছুটির দিন স্কুলের তদারকি করতে পারেন। এই ব্লকের

উচ্চ ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক। বর্দ্ধমান-চকদীঘি রাস্তার ধারে ধারে অনেকগুলি হিমঘর আছে।

জামালপুর ব্লকে মুসলমান আমলে সেলিমাবাদ পরগণা পরবর্তীকালে বৈষ্ণব-সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। জৈন ও বৌদ্ধ দেউল প্রাচীন সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আঝাপুরের দেউল তার প্রমাণ। জামালপুরে অনার্য সংস্কৃতির উৎসবে এখনও গ্রামগুলি মুখরিত হয়-মনসার ঝাপান, শিবের গাজন, চড়ক বেশ ঘটা করেই হয়। 'মডেল ভগিনী', বাঙ্গালী চরিত্র, নেড়াহরিদাস, কালোচাঁদ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা "শ্রী শ্রীরাজলক্ষ্মী" নামক প্রথম বহত্তম বাংলা উপন্যাসের লেখক যোগেশচন্দ্র বসু ও বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসুর জন্মস্থান জামালপুরেব বেরুগ্রামে।

বর্দ্ধমান জেলার চুয়াল্লিশটি বৈষ্ণব পাটের অন্যতম শ্রেষ্ঠপাট এই কুলীন গ্রাম। প্রাক-চৈতন্য যুগে এখানে জন্মগ্রহণ করেন মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের রচয়িতা। তাঁর পুত্র সত্যরাজ খানের অনেক কীর্তি কুলীন গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে। সত্যরাজের পুত্র রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমবয়সী ও অন্যতম ভক্ত পার্ষদ ছিলেন। সেই সুবাদে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদধূলিতে এই গ্রাম ধন্য। রামানন্দ বসুর হাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রথের ছিন্নরজ্জু বা পট্টডোরীর কিয়দংশ দিয়ে বলেছিলেন, 'এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান'। সেই থেকে প্রতি বৎসর পিতা সত্যরাজের সঙ্গে রামানন্দ কুলীন গ্রাম থেকে পুরীতে পট্টডোরী নিয়ে যেতেন জগন্নাথের রথ টানার জন্য। সে প্রথা এখনও আছে। কুলীন গ্রাম থেকে পট্টডোরী গেলে তবে জগন্নাথের রথ চলে।

কুলীন গ্রামে যবন হরিদাস একটি বকুল গাছের তলায় জপ করতেন। সেখানে চারচালা যুক্ত একটি ছোট মন্দির রয়েছে। হরিদাস ঠাকুরের পাটে প্রতি বছর আশ্বিন মাসে একদিনের জন্য তাঁর তিরোধান দিবস পালন করা হয় এবং অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় মঠের বার্ষিক উৎসব হয়। এই আস্তানাটি এখন হরিদাস গৌড়ীয় মঠ নামে অভিহিত। হরিদাস উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুরে বুঢ়ন নামে এক মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ধার্মিক ছিলেন এবং অচিরেই হরিনামের প্রতি আকৃষ্ট হন ও কৃষ্ণ ভজনা করতে থাকেন। যৌবনেই তিনি চাঁদপুর, নবদ্বীপ ও মায়াপুর এই সব স্থানে কৃষ্ণনাম গান করতে থাকেন ও অতর্কিতে নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামে তাঁর দেখা হয় অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে। অদ্বৈত আচার্য তাঁকে হরিমন্ত্রে দীক্ষা দেন। ভক্ত হরিদাস তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। শেষ জীবনে নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে বসবাস করার আগে কুলীন গ্রামে সাধনপীঠ গড়ে তোলেন।

কুলীন গ্রামে শিবাণী দেবীর মন্দির, গোপেশ্বর মহাদেবের মঠ উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া এখানে ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব সংস্কৃতির বেশ কিছু নিদর্শন। আঝাপুর একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তর পৈতৃক নিবাস এই গ্রামে। জামালপুর ব্লকের আর একটি প্রাচীন গ্রাম জাড়গ্রাম। শোনা যায়, প্রায় হাজার বছর আগে 'রায়' উপাধিধারী সামন্তরাজগণ এখানে রাজত্ব করতেন। পশ্চিম পাড়ায় একটি ভগ্ন ইঁটের স্তূপ থেকে পোড়ামাটির ফলকে খোদাই মূর্তি, শিবমূর্তি, গালার চুড়ি, একটি শিলালিপি 'দেবশর্ম্মা—১০৪২ শকাব্দ' পাওয়া গেছে। এগুলি জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে।

এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য দেব দেবী-ধর্মরাজ কালুরায়। বিরাট মেলা হয় বারোদিন ব্যাপী।

কর্ড লাইনের ষ্টেশন জৌগ্রাম আর একটি প্রাচীন গ্রাম। কথিত আছে এই গ্রামের পূর্ব নাম ছিল জম্ভীয় গ্রাম। চব্বিশতম জৈন তীর্থঙ্কর 'মহাবীর বৰ্দ্ধমান' এই গ্রামে এসে তপস্যা করেছিলেন ও কৈবল্য লাভ করেছিলেন এখানকার ঋজুকুলা নদীর তীরে। তাই গ্রামটি বেশ প্রাচীন। কেউ কেউ বলেন, এই গ্রামের নাম ছিল, যোগগ্রাম। পরে অপভ্রংশে জৌগ্রাম হয়েছে। গ্রামের মধ্যে বদর পীরসাহেব এখানে বিখ্যাত। সাধারণতঃ নদীপথে যাতায়াতকারী মাঝিমাল্লারা 'ঝড় তুফানের' হাত থেকে রক্ষা পেতে 'বদরপীরের' নাম নিত। অতএব এর থেকে অনুমান, যে এখান দিয়ে বহমান কোন স্রোতস্বিনী ছিল— এখন মজে গিয়েছে। বদরপীরের মসজিদটি ভাঙা, জীর্ণ, দেখে মনে হয় এটি হিন্দুর মন্দির। কারণ টেরাকোটার কাজ যা গুপ্তযুগের বলে অনুমান করা হয়। জৌগ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির 'জলেশ্বর নাথ'। একটি উঁচু ঢিবির উপর মন্দিরটি অবস্থিত। জৈন সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে মন্দিরের গাত্রে। জলেশ্বর মন্দির ছাড়াও গ্রামে আরও বারোটি শিবমন্দির আছে। প্রত্যেক মন্দিরে রয়েছে 'টেরাকোটার' অপূর্ব কারুকার্য। গ্রামের মুক্তকেশী কালী প্রায় দুশ বছরের পুরাতন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক কর্নাদ ভট্টাচার্যের জন্মভূমি এই জৌগ্রাম। ইলসরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বৰ্দ্ধমানের বিধান রায় দানবীর ডঃ শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে।

জামালপুর ব্লকের আর একটি প্রাচীন গ্রাম চকদীঘি। মহারাজ মনীন্দ্রলাল সিং এখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর বিরাট পরিত্যক্ত ভগ্ন বাড়ি সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইনি জেলা বোর্ডের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় এসেছিলেন স্কুল স্থাপনা করতে। বিখ্যাত পণ্ডিত ন্যায় বাগীশ অপর্ণা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভূমি এই ব্লকের রক্ষিনীমহলা।

॥ রায়না ব্লক ॥

রায়না ১ নং ব্লকের আয়তন ২৬৬.৪৩ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চায়েত ৮, মৌজার সংখ্যা ১১৩ ও গ্রামের সংখ্যা ১৩৮, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩ শত ৯ এবং রায়না ২ নং ব্লকের আয়তন ২২২.৪০ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চায়েত ৮, মৌজা ৮৬ এবং গ্রাম ১২৭, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার ৬ শত।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জেলা গেজেটিয়ারে রায়না সম্পর্কে পিটারসন লিখেছেন 'It is the head quarters of a police station and in the early part of the 19th century was notorious for its thogs, who were first found in Bengal in 1802. According to popular rumour, the people of Raina thana are particularly fierce and warlike. After suppression of thogs the descendants of the thogs are said to have taken decoity as a means of subsistence. বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতেও দক্ষিণ দামোদরেব রায়না থানা, জঙ্গলে ভর্তি, দুর্গম এলাকা। আধুনিক সভ্যতার চাপে বর্দ্ধমানের আদি বাসিন্দারা ক্রমশঃ দামোদর অতিক্রম করে এই সব দুরতিক্রম্য স্থানে বাসা বাঁধে। ডোম, দুলে, কাহার, বাউড়ি, মুচি, বাগদীরা সংখ্যায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ শতাংশ। বেশির ভাগই রাহাজানি, লুঠতরাজ ও ডাকাতির উপর ছিল নির্ভবশীল। কিন্তু কালের প্রবাহে আজ সকলেই কৃষি শ্রমিক হিসাবে জীবন অতিবাহিত করে। এখানের অন্য সম্প্রদায় বেশির ভাগই আগুরি বা উগ্রক্ষত্রিয়। সকলেই কৃষির উপর নির্ভরশীল। উৎপন্ন শস্য ধান ও গম, কিন্তু আলু, পিয়াঁজ, সরিষা, কুমড়ো, ঝিঙে, উচ্ছে দামোদর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর ফলে। এক সময় দামোদরের বন্যায় তীরবর্তী গ্রাম সমূহ ডুবে যেত, সেজন্য এ ব্লকের দক্ষিণ দামোদর তীরবর্তী গ্রামগুলি উঁচু উঁচু স্তূপের উপর অবস্থিত। বর্ষাকালে তখন এ গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল নৌকা। বড়বৈনান, সুবলদহ, কামারগড়িয়া গ্রামগুলির বাড়ী-ঘরদোরের ব্যবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর ও দ্বারকেশ্বর বিধৌত নদীসঙ্কুল এই ব্লকে প্রাচীন অনার্য সভ্যতার বহু চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সুবলদহ গ্রামে ১৮৮০ খ্রীঃঅব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রধান সড়ক বর্দ্ধমান-আরামবাগ রোড। এছাড়া সগড়াই থেকে একটি শাখা সড়ক কারেলাঘাট পর্যন্ত ও অপর একটি সড়ক শ্যামসুন্দর হয়ে রায়না এবং শাকনাড়া হয়ে গোতান দামুন্যা পর্যন্ত গেছে। শ্যামসুন্দর থেকে আর একটি সড়ক সোজা দক্ষিণে পহলানপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। আর একটি সড়ক মীরপোতা থেকে কাইতি গ্রাম

পর্যন্ত গেছে। প্রতিটি সড়কেই বাস যাতায়াত করে। ন্যারোগেজ বা ছোট লাইনের ট্রেনও চলাচল করে রায়না থেকে বাঁকুড়া পর্যন্ত। রেল পথটির নাম বি. ডি. আর বা বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলওয়ে। দামোদরের উপরে কৃষক সেতু হওয়ায় এখন দক্ষিণ দামোদর আর দুর্গম নয়। শ্যামসুন্দর ও সেহারাবাজারে ব্লক অফিস, শ্যামসুন্দরে পুলিশ থানা এবং রায়না, শ্যামসুন্দর লোহাই, কাইতি সেহারাবাজারে সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে এবং জাতীয় ব্যাঙ্কগুলিও শাখা অফিস খুলেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। অনেকেই বাসে সড়ক পথে নিত্যযাত্রী।

শ্যামসুন্দরে রায়বাহাদুর বিশালাক্ষ বসু প্রতিষ্ঠিত 'শ্যামসুন্দর কলেজ', রামলাল আদর্শ বিদ্যালয় ও দর্শনীয় ঠাকুরবাড়ী রয়েছে। এই গ্রামের পূর্ব নাম ছিল 'আহারবেলমা'। কিন্তু বিশালাক্ষ বসু এই নাম পরিবর্তন করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবতা 'শ্যামসুন্দরের' নামানুসারে গ্রামের নাম রাখেন শ্যামসুন্দর। গরীবের সন্তান বিশালাক্ষ বসু বাল্যে পড়াশুনার সুযোগ পাননি। কর্মসংস্থানের জন্য গ্রাম ত্যাগ করেন ও প্রতিজ্ঞা করেন, যে গ্রামের তিনি সেবা করতে পারবেন না, সেই গ্রামের জলস্পর্শ করে আর ঋণগ্রস্ত হবেন না। তিনি আজীবন গ্রামের দরিদ্র মানুষের সেবা করে গেছেন ও প্রতিশ্রুতি মত কোনদিন গ্রামের জলস্পর্শ করতেন না। তাঁর আমন্ত্রণে ঠাকুর বাড়ীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বাঙলার খ্যাতিমান পুরুষ এসেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, ডঃ সুকুমার সেন, রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জী, ধীরেন্দ্রমোহন সেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রায়না থানার পুলিশ হেড কোয়ার্টার, ব্লক অফিস, ভূমি সংস্কার অফিস ও কয়েকটি ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক শাখা এই গ্রামে অবস্থিত।

আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে 'কাইতি' গ্রামের উল্লেখ আছে। মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীতে 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে এই গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন। কবিকঙ্কন তাঁর গ্রন্থে ধনপতি সদাগরের পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত লোকের তালিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"কাইতি হতে আসে যাদবেন্দ্র দাস।
রঘুদত্ত আইসে যার জাড়গ্রামে বাস॥

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ধর্মমঙ্গল রচয়িতা রূপরাম চক্রবর্তী কাইতির নিকট শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে এই গ্রামটিকে চিহ্নিত করেছেন, "কাইতি-শ্রীরামপুর" বলে। গ্রামের বন্দনা করেছেন :

কাইতি চাপিয়া বন্দ বাণ রাজার পাট।
উষা বালি পোতাবন্দ শ্বেতগঙ্গার ঘাট॥

কাইতির শ্বেতগঙ্গা একটি পুরাকীর্তির নমুনা। "পুরা সম্পদ ও ভাস্কর্য" অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সিদ্ধেশ্বরী

অর্থাৎ কালী। হাট, বাজার, গঞ্জ, বাসষ্ট্যাণ্ড, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, ক্লাব, পাঠাগার নিয়ে কাইতি এই অঞ্চলের উন্নত গ্রাম। বাসিন্দাদের মধ্যে কায়স্থগণই প্রবল। বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্য ব্যক্তি নিবারণচন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। স্বাধীনতা সংগ্রামী রতিকান্ত সরকার এই গ্রামের মানুষ। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এম. ডি. ও এফ. আর. সি. এস ডিগ্রিধারী ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র কাইতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন খ্যাতনামা শল্য চিকিৎসক ছিলেন। পুরাতাত্ত্বিক সম্পদে কাইতি ভরপুর—আগামী দিনের গবেষকদের অপেক্ষায় রয়েছে বহু সম্পদ। উষাপোতা তেমনই একটি পুরাতথ্য সম্বলিত, বাণেশ্বর শিব ছাড়াও বহু শিবমন্দির—জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সাক্ষী হয়ে রয়েছে। বর্দ্ধমান-আরামবাগ রোডের ধারে কৃষ্ণপুর-কুকড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী।

বর্দ্ধমান-আরামবাগ রাস্তায় বর্দ্ধমান শহর থেকে কুড়ি কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত উচালন প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এই গ্রামটি বালি মাটির বহু স্তূপে ভর্তি। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে বহু পাথর ও ইটের কুঁচি। গ্রামের বিশাল দীঘি থেকে কিছু মূর্তি ও দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে, অনেকেই অনুমান করেন এগুলি পাল রাজাদের কীর্তি। দীঘির দক্ষিণে 'শাহমীর' পীর এক কিম্বদন্তী যা গবেষণার বিষয় হতে পারে। পীর সাহেবের এই ভাঙা মসজিদটি উঁচু একটি স্তূপের উপর অবস্থিত। এর পাশেই এক বিরাট পাথরের চাঙ রয়েছে। স্থানীয় প্রবীণরা বলেন এটি হিন্দুর মন্দির ছিল, মসজিদে পরিণত হয়েছে। স্তূপ খনন করলে অনেক অজ্ঞাত ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হবে। গ্রামে শিব মন্দির ছাড়াও 'উচ্চৈশ্বরী' দেবী আছেন। এই দেবীর নাম অনুসারে পল্লীকে 'উচ্চৈশ্বরী' পাড়া বলে। উগ্রক্ষত্রিয় একাদশ তিলিই প্রধান। কিন্তু ব্রাহ্মণ, মুসলমান, তাম্বুলি, নমঃশূদ্র, বাগদী, মুচি, ডোম ও দুলেরাও এক একটি পাড়ায় সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করেন। প্রধান ফসল গম, আলু, তিল, ও সরিষা। একটি মাত্র সেচ খাল এলাকার উপর দিয়ে গিয়েছে। রাইসমিল, বহু হাস্কিংমিল, দোকান-পাট, উচ্চ বিদ্যালয়, ডাকঘর, ওষুধের দোকান, তেলের ঘানি, আটাচাকি, কাঠের কারখানা, ব্যাঙ্ক, ডি, ভি, সি, অফিস রয়েছে। উচালন গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝখান দিয়ে দেবখালও রয়েছে। সর্বদক্ষিণে একলক্ষীর দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে দারকেশ্বর নদী বয়ে গেছে।

খণ্ডঘোষ ব্লকের সর্বদক্ষিণ ও রায়না থানার দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে বহমান দারকেশ্বর নদী। এই নদীর তীরেই অবস্থিত 'একলক্ষী' গ্রাম একটি বড় ধরণের গঞ্জ। নদী

অধ্যুষিত স্থানটি প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনোরম। উচালনের 'শাহমীর' এর মতই এখানে আছে 'শাহ্-চাঁদ' পীর। ভাঙা দরগার সামনে পড়ে আছে বহু ছোট বড় মাটির ঘোড়া, হাতি। এটিও কোন বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ বলে মনে হয়। এখানে একটি বিরাট হাট বসে, তাতে কাঁচা শাকসব্জী ছাড়াও চাল, ডাল, মরিচ, মশলা, বাঁশের চুবড়ি, পেতে ঝুড়ি, মাটির হাঁড়ি, খাবরি, কলসী, জালা, লোহার জিনিষপত্র, কাপড়-গামছা, মাছ ধরার জাল, বাসন-কোসন বেশ সুলভে পাওয়া যায়। প্রধান ফসল ধান, গম, আলু, সরিষা, শাঁকআলু, পটল, তরমুজ, উচ্ছে, ঝিঙে প্রভৃতি সব জাতির লোক বাস করেন। বড় বড় দোকান পাট, ব্যাঙ্ক, উচ্চবিদ্যালয়, ডাকঘর, বাসষ্ট্যাণ্ড আছে।

বর্দ্ধমান-আরামবাগ রোডের উপর বর্দ্ধমান থেকে পনেরো কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত 'সেহারাবাজার' গ্রামটি এই এলাকার সবচাইতে বড় গঞ্জ ও ব্যবসায় কেন্দ্র। হুগলী ও বাঁকুড়াকে কাছে টেনে এনেছে এই সেহারাবাজার—কয়েকটি সড়কপথ দিয়ে যেমন আকুই-বর্দ্ধমান রোড, বোঁয়াইচণ্ডী বর্দ্ধমান রোড, কাইতি-বর্দ্ধমান রোড, বামুনিয়া-বর্দ্ধমান রোড। সব কয়টিই ভায়া সেহারা। আর বি, ডি, আর রেলপথ। সেজন্য এখানে বড় বড় রাইস মিল, ছোট কলকারখানা, বড় বড দোকান-পাট, ধান চালের কারবার গড়ে উঠেছে। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক, ব্লক অফিস, ভূমি সংস্কার অফিস, ডি. ভি. সি, বিদ্যুৎপর্ষদের অফিস, ডাকঘর, সিনেমা হাউস, হোটেল, রেলষ্টেশন ও দৈনিক বাজার গড়ে উঠেছে। তাছাড়া প্রতি মঙ্গলবারে এখানে একটি গরুর হাট বসে। প্রায় হাজার পাঁচেক গরু, মোষ, ছাগলও ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগমে স্থানটি গম গম করে। যেহেতু গঞ্জ সেইহেতু সেহারাবাজার একটি শহরের চেহারা নিয়েছে। ১১৯৭ বঙ্গাব্দে এই গ্রামে ধর্ম ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়ে কবি রামকান্ত রায় জন্মগ্রহণ করেন।

শ্যামসুন্দর-পহলানপুর বাদশাহী সড়কের উপর ছোট বৈনান একটি প্রাচীন গ্রাম। পুরানো দলিল-দস্তাবেজে এই গ্রামের নাম পাওয়া যায় ছট-বৈনান। দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় সভ্যতার নমুনা প্রচুর। অনুমান করা হয় এই গ্রামে 'ছুতিয়া' বা আদিবাসীর বাস ছিল। প্রায় ৬৩ একরের দীঘি 'ছাতাদীঘি' সে কত্তাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মতে; মুসলমান আমলে বিদ্রোহী হিন্দু গ্রামের উপর শাস্তিস্বরূপ একরকম কর বসানো

হত যার নাম বাহ-ই-নান কর। এই বাহ-ই-নান শব্দই অপভ্রংশিত হয়ে বৈনান হয়েছে। জনশ্রুতি, যদু নামে এক ব্যক্তি গোঁড়া হিন্দুদের দ্বারা বাল্যে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তিনি মুসলমান সুলতানের আশ্রিত ও মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হন। পরে এই যদু জালালউদ্দীন নামে সুলতান হন ও গৌড় থেকে গোপ অবধি এক সড়ক নির্মাণ করেন। এই সড়কই বাদশাহী সড়ক নামে পরিচিত। এই সড়কের ধারে ধারে প্রায় দু মাইল অন্তর তিনি অনেকগুলি মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে পরাক্রমী হিন্দু বাজা ছত্রধর সিংহ্ মসজিদ ভেঙে সেই জায়গায় কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

এই গ্রামে আগুবী, একাদশ তিলি ও ব্রাহ্মণরাই প্রধান। গ্রামে ডাকঘব, উচ্চবিদ্যালয়, হাট, দোকান-পাট, বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বাদশাহী সড়কেব উপর বিখ্যাত কালীমন্দির অতীতকালের সাক্ষী। ছোট বৈনান কালীতলা ছাড়িয়ে সোজা কয়েক মাইল দক্ষিণে গেলেই পড়বে পহলানপুর। পহলানপুরও একটি বড় গঞ্জ ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে রাইসমিল গড়ে উঠেছে। গ্রামে রয়েছে পহলান পীরেব দরগা। এখানে মুসলমান, তপশীল, আদিবাসীদের আধিক্য। আগুরী, তাম্বুলী, একাদশ তিলি সদগোপও আছে।

রায়না থেকে গোতান পর্যন্ত এবংগোতান হয়ে দামুন্যা অতিক্রম করে দামোদবেব পশ্চিম তীর ঘেঁষে যে সড়ক চলে গেছে হুগলী জেলার মলয়পুর পর্যন্ত এই রাস্তাকে অহল্যাবাঈ রোড বলে। গোতানের পর দক্ষিণ দিকে বন্যার জলে রাস্তা ধুয়ে যেত। এখন মোরাং পড়েছে। এই রাস্তার ধারে শাকনাড়া একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষা গুরু প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের জন্মস্থান। প্রেমচাঁদের মাতা কুড়ুনি দেবী ছিলেন বিদূষী। ব্যাকরণ শাস্ত্রে ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। স্বামীর অনুপস্থিতিতে চতুষ্পাঠিতে তিনি নিজেই অধ্যাপনা করতেন। এখানে উচ্চ বিদ্যালয় আছে।

তারও দক্ষিণে বর্ধিষ্ণু গ্রাম গোতান—একটি বড় গঞ্জ। হুগলী জেলা থেকে লরী লরী আলু গোতানের বাজারে আসে। সেখান থেকে জেলার বিভিন্ন জায়গায় চালান যায়। এখানেও উচ্চ বিদ্যালয়, ডাকঘর, হাট বাজার, রাইসমিল, কোল্ডস্টোরেজ গড়ে উঠেছে। এছাড়া ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতি বিপনন কেন্দ্র আছে। ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেনের জন্মস্থান এই গ্রাম। জন্মবর্ষ ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে।

গোতানের দক্ষিণে বর্দ্ধমানের প্রাচীন গ্রাম দামুন্যা। ঐ সড়কের উপরই। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের জন্মভূমি। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম শেরশাহের ডিহিদার কর্তৃক অত্যাচারিত হয়ে গ্রাম ত্যাগ করেন। রাজস্ব আদায় করাই ছিল শাসকবর্গের লক্ষ্য। মুকুন্দরাম তাঁর গ্রন্থে এই অস্থির ও করুণ অবস্থা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন:

মিথ্যা এ জগাতি ভণ্ড।
পরদ্রব্য করে দণ্ড॥
ডাকা দেই দিবস দুপুরে।
বিষম রাজ্যের লোক॥
পরদ্রব্য খাইতে জোঁক।
দেখিতে দেখিতে বিত্ত হরে॥

॥ মেমারী ব্লক ॥

মেমারী ১ ব্লকের আয়তন ২০৯.৫৩ বর্গ কি. মি, পঞ্চায়েত ১১, মৌজা ১১৮, গ্রাম ১৬৮ ও লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭ শত ২৯। মেমারী ২ ব্লকের আয়তন ২৩০.৪৮ বর্গ কিমি, পঞ্চায়েত ১১, মৌজা ১১৭, গ্রাম ১৫১, এবং লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৪ শত।

মেমারী দুটি ব্লকে বিভক্ত—সমৃদ্ধ ও উন্নত। এর প্রধান কারণ দুটি ও তিনটি ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এখানের চাষীরা শুধু ধান ও গম চাষই করে না। এখন প্রধান ফসল আলু—প্রচুর ফলন হয়। তাই গড়ে উঠেছে বহু কোল্ডষ্টোরেজ বা হিমঘর। তাছাড়া গড়ে উঠেছে রাইসমিল, ধানের তূষ থেকে তেল তৈরীর কারখানা, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, লেদ মেসিন, অটোপার্টসের দোকান, আড়তদারী ব্যবসায়, বাস বা লরীর বডি বিল্ডার্স। তাছাড়া আছে কলেজ, ছেলেদের ও মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিনেমা হাউস, রেলষ্টেশন, বিভিন্ন সরকারী অফিস সব মিলিয়ে মেমারী এখন শহরের চেহারা নিয়েছে। মেমারীর মধ্য দিয়ে এককালে প্রাচীন বল্লুকা নদী বইত, এখন শুষ্ক ক্ষীণ মজে যাওয়া বল্লুকা। এই বল্লুকা নদীর তীরে দশম শতাব্দীর কিম্বদন্তী মনীষী রামাই পণ্ডিত ধর্ম পূজা করেছিলেন। এখন তা শুধুই কিম্বদন্তী। আগুরী, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি সম্প্রদায়ের বাস। কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে সাঁওতাল ও আদিবাসীর আধিক্য। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজ করার জন্যই তাদের আসা।

তবে শহুরে আবহাওয়ার মধ্যে সংস্কৃতির ঐতিহ্য হারিয়ে যায় নি। মেমারী ১ নং ব্লকের নিমো গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি সুন্দর গ্রাম দেউলিয়া। এখানে রয়েছে হাজার বছরের এক পুরাতন মন্দির, যার উপর প্রত্নতাত্ত্বিকগণ গবেষণা চালিয়েছেন।

এই গ্রামে মুসলমানরাই সংখ্যায় বেশী। তাঁরাই এখন এই দেউলটির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মেমারীর দাদপুর গ্রামটিও প্রাচীন। এখানে ধর্মঠাকুরের গাজন ও চড়ক উৎসব হয়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য বর্ধিষ্ণু গ্রাম গন্তার, আমাদপুর, সাতগেছিয়া। সবকটিই বড় গঞ্জ ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

পালসিট ও ভৈটা গ্রাম দুটিও প্রাচীন বর্ণময়। বৈষ্ণব তীর্থেব অনেকগুলি শ্রীপাটের একটি শ্রীপাট পালসিট। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরমভক্ত শ্যামাদাস আচার্যেব পূণ্যস্মৃতিবিজড়িত এই পালসিট। তিনি আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর পূর্বে শ্রী শ্রীমদন গোপাল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যামাদাস অদ্বৈতার্যের শিষ্য ছিলেন ও ভাগবতার্য উপাধিলাভ করেন। বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে বৈষ্ণবগণ শ্যামাদাসের তিরোধান দিবসে আসেন। তখন বাউল, কৃষ্ণ কীর্ত্তন খুব ধুমধামে হয় এই শ্রীপাট পালসিটে। ভৈটা গ্রামে আছে পুরাতন মন্দির, স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। আমাদপুর, সাতগাছিয়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সাতগাছিয়া থেকে মেমারী, কালনা, কাটোযা, মালম্বা যাওয়ার বাস ছাড়ে। সাহিত্যিক ও অর্থনীতি বিশারদ ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যাযেব জন্মভূমি আমাদপুব; বর্দ্ধমানের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী মহেশ চৌধুরীর জন্মস্থানও। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ হিউম ও উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী মহেশ চৌধুরী জাতীয় মহাসভার (Indian National Congress) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বঙ্গদেশে জয়েন্টষ্টক কোম্পানী স্থাপন তারই কীর্তি। মহেশ চৌধুরী Bengal National league 1883. এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

।। খণ্ডঘোষ ব্লক ।।

আয়তন ২৫৬.১৩ বর্গ কিমি, গ্রাম পঞ্চায়েত ১০, মৌজা ১১৯, গ্রাম ১২৩ এবং লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৫ শত ৬৯। বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে খণ্ডঘোষ ব্লক প্রায় দুশ কিলোমিটার নিয়ে বিস্তৃত বাঁকুড়া জেলার প্রান্ত ঘেঁষে। সেচ এলাকা ছাড়া বর্ষা না হলে চাষীদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। তাই খণ্ডঘোষ ব্লক অপেক্ষাকৃত কৃষি ফলনে পিছিয়ে আছে। দুটি ফসল এখানে নাম মাত্র। মূল শস্য ধান। কিন্তু আলু, সরষে মাটি এঁটেল তাই সেচ এলাকায় ভাল ফসল হয়। বর্দ্ধমান-আরামবাগ রোড মোটামুটি ভাবে রায়না-খণ্ডঘোষকে বিভক্ত করেছে। এছাড়া বর্দ্ধমান দীঘলগ্রাম, বর্দ্ধমান-একলক্ষ্মী, বর্দ্ধমান-মেটেডাঙ্গা ও বর্দ্ধমান-আকুই বাসরুটে যাতায়াতের বেশ সুবিধা। পাশে বাঁকুড়া থাকায় বাঁকুড়ার টান বর্দ্ধমান জেলার এই অংশের অধিবাসীদের মুখে সংক্রামিত হয়েছে। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় সভ্যতার চিহ্ন গ্রামগুলির নামের মধ্যে বেশি পরিমাণে ছড়িয়ে আছে: মুইধাড়া, রাউতাড়া, গোপালবেড়া, কেন্দুড়, আমড়া, বাউড়া, কেঁজেড়া প্রভৃতি। অধিবাসীদের বেশীরভাগই আগুরী ও মুসলমান। এছাড়া আছে সদগোপ, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, তিলি, কামার, কুমার, নাপিত।

তপশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাগদীই প্রবল। কিন্তু মুচি, দুলে ডোম, বাউরীও আছে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ধর্মঠাকুর বা শিব পুজিত হন। শিলা, লিঙ্গ বা বর্তুলাকার এইসব মূর্তি আর্যেতর দেবতাদের নমুনা। এখন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার দেবতা গণদেবতা।

উল্লেখযোগ্য গ্রাম খণ্ডঘোষ। এখানে উচ্চবিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, থানা বা পুলিশ ষ্টেশন, ভূমিসংস্কার , স্বাস্থ্যবিভাগের অফিস আছে। বৰ্দ্ধমান-বাঁকুড়া রাস্তার উপর অবস্থিত। বাঁকুড়া জেলার প্রান্ত বলে গঞ্জও। এই রাস্তার উপর ওঁয়াড়ি গ্রাম, বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্ত ও শিক্ষাচার্য বিজয় ভট্টাচার্যের জন্মস্থান। বাদুলিয়া মোড়ে বর্তমান ব্লক অফিস এবং গঞ্জ অবস্থিত। এখান থেকে একটি রাস্তা সোজা পশ্চিমে চলে গেছে বেড়ুগ্রাম পর্যন্ত। বেড়ুগ্রাম, চা গ্রাম, শশঙ্গা খুব বড় গ্রাম। উচালন থেকে ভেঙে গেছে দীঘলগ্রাম রোড–এর উপর রয়েছে মুইধাড়া, গোপালবেড়া সমৃদ্ধ গ্রাম। মোগলমারি মোগল-পাঠান যুদ্ধে মোগলদের পতনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখান থেকে সড়ক গেছে বোঁয়াইচণ্ডী গ্রাম–দেবী বসন্তচণ্ডী যার গ্রামদেবতা। বৈশাখ থেকে আষাঢ় পর্যন্ত শনি ও মঙ্গলবারে হাজার হাজার ভক্ত মায়ের পূজা ও অঞ্জলি দেবার জন্য মায়ের পুকুরে স্নান করেন। খণ্ডঘোষের মাঝখান দিয়ে বি. ডি. আর রেলপথ চলে গেছে–উল্লেখযোগ্য ষ্টেশন কৈয়ড়, সরঙ্গা, গুইর। গুইর গ্রামে বিপ্লবী অনিল বরণ রায় (জন্ম ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তোড়কোনায় রাসবিহারী ঘোষের জন্মস্থান (১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দ) এবং শাঁকারী গ্রাম বিখ্যাত 'বাসুদেব' দেবতার জন্য। স্বাধীনতা সংগ্রামী অম্বুজাক্ষ বসুর জন্মস্থান এই শাঁকারী।

॥ ভাতাড় ব্লক ॥

আয়তন ৪১৪.৪ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ২৩৩, গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৪, গ্রামের সংখ্যা ১২৮ এবং মৌজার সংখ্যা ১০৭। অন্যতম সমৃদ্ধ ব্লক ভাতাড়ের মধ্য দিয়ে কুনুর ও খড়ি নদী বহে গেছে। এরই তীরে তীরে একদিন অনার্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল। তার নিদর্শন মিলবে নদীর তীরে অবস্থিত বসতপুর, বরমল্লিকর, রামচন্দ্রপুর, পারহাট গ্রামগুলিতে ধর্ম ও মনসা পূজার ধুম দেখে। আবার অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু গ্রাম নাসিগ্রাম, বড়বেলুন, ভাতাড়, মাহাতায় শিবের গাজন ও চড়ক পূজার ধূম দেখে মনে হয় বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির ফলশ্রুতি এগুলি। নূতন সেচ ব্যবস্থায় ও স্বাধীনতার পর গ্রামোন্নয়নের প্রভাবে ভাতাড় এখন বেশ উন্নত। দুটি করে ফসল ফলে এবং কৃষিশ্রমিকও প্রচুর পাওয়া যায়। আগুরী, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণই প্রবল। কিন্তু মুসলমানও সংখ্যায় বেশ আছেন। বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া রোডের উপর চটি করজোনা প্রাচীন গ্রাম। এক সময় কোম্পানীর আমলে ঠ্যাঙাড়ের উৎপাত ছিল ভীষণ। পথচারীরা সর্বস্ব লুণ্ঠিত ও নিহত হত দস্যুদের হাতে। এখনও

লোকমুখে সেই প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে: "যদি পেরুলি করজোনা, নেয়ে ধুয়ে ঘর যানা।" কর্জনা চটি থেকে যে রাস্তাটি সোজা পূর্বদিকে চলে গেছে সেই পুরাতন বাদশাহী রোডের ধারের গ্রামগুলিতে মুসলমান ছাড়াও আছেন আদিবাসী সাঁওতাল ও তপশীল সম্প্রদায় বাগ্দী, ডোম, মুচি, বাউরী প্রভৃতি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন বড় বেলুন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের পণ্ডিত ও ভাষ্যকার কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ভাতাড় ব্লকের মাহাতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ মনোহর রায় নাসিক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

ভাতাড় গ্রাম থেকে সরে এসে বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া রোডের উপর গড়ে উঠেছে ভাতাড় চটি, এখন শুধুই ভাতাড়। এখানে পুলিশ ষ্টেশন, রেল ষ্টেশন (বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া ছোট লাইন), ফায়ার ব্রিগেড অফিস, ব্লক অফিস, ডাকঘর, ভূমি সংস্কার অফিস, পঞ্চাশ বেডের গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্যাঙ্ক অফিস, গান্ধী কালচার, পূর্তবিভাগের ডাক বাঙলো, প্রেক্ষাগৃহ, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, বহু সরকারী ফ্লাট গৃহ গড়ে উঠেছে। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেনের অবদান এগুলি। তিনি এই গ্রামের নাম দিয়েছিলেন সেবাগ্রাম। প্রত্যেকটি গ্রামে মোরাং রাস্তা ও ভাতাড়ে পৌরসভার মত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। আছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়। বৰ্দ্ধমান-কাটোয়া রাস্তা ছাড়াও কৈচড়-নূতনহাট, ভাতাড়-গুসকরা, ভাতাড়-নাসিমগ্রাম-দাঁইহাট রোড ও বহু ছোট ছোট পাকা সড়ক গ্রামগুলিকে যুক্ত করেছে। নাসিগ্রাম, বড়বেলুন, এরুয়ারেও উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এখানে শিব ও কালীপূজার ধূম দেখে মনে হয় এ দুটি তাঁদের বড়ো উৎসব।

কাশীপুর, নূরপুর, সাহেবগঞ্জ, কুবাজপুর, রামপুর, নীলডাঙ্গায় এককালে নীলের চাষ হত। নূরপুরের শালজঙ্গলের মধ্যে নীলসাহেবের সমাধি আছে। সাহেবরা সম্ভবতঃ বাস করতেন সাহেবগঞ্জে তাই নাম হয়েছে সাহেবগঞ্জ। নীলকরদের ভাঙা বাড়ি ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জঙ্গল সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। জনশ্রুতি, কাটোয়া যাবার পথে ভাস্কর পণ্ডিত পারহাট গ্রামের মন্দিরটি ধ্বংস করেছিলেন ও পার্শ্ববর্তী বামুনপাড়া গ্রামে ছাউনি ফেলেছিলেন। এখনও 'বর্গীর মাঠ' তার স্মৃতি বহন করছে।

।। গলসী-২ ব্লক ।।

বৰ্দ্ধমান জেলার মধ্যে কৃষিশস্যে সমৃদ্ধ হল গলসী-২ ব্লক। এখানে দুটি ফসল বোরো ও আমন শস্য গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে। ভূমিহীন শ্রমিকরা তাই বছরের প্রায় সবসময় কাজ পায়। আয়তন ২৭৭.৯ বর্গ কি.মি., গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৯, গ্রামের সংখ্যা ৯৭ এবং মৌজার সংখ্যা ৭৮, লোক সংখ্যা ১,০০,২০৯

জন, তার মধ্যে তপশীল ৩৮,২৫৫ এবং উপজাতি ৯,৩৩৪। ডি. ডি. সির সেচখাল গলসী ২ব্লকের উপর দিয়ে গেছে, তাই বোরো ও আমন ফসল নিশ্চিত। আকাশবৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না এখানের চাষীদের। জি. টি. রোডের উপর দুই পাশে গড়ে উঠেছে গলসী বাজার। এখানেই ব্লকের সদর দপ্তর। ভূমিসংস্কার অফিস, ব্যাঙ্ক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সমবায় সমিতি, প্রেক্ষাগৃহ অবস্থিত। গলসী একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ও গঞ্জ। গ্রাম থেকে দূরে গলসী রেল ষ্টেশন রয়েছে মেন লাইনে। গলসী ২ ব্লকের অন্তর্গত সমৃদ্ধ গ্রামগুলি হ'ল– গলসী, পুড়শো, সাঁকো, জয়কৃষ্ণপুর, পারাজ প্রভৃতি। সাঁকো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রতাপ চন্দ্র রায়। তিনি একজন প্রকাশক ও গ্রন্থকার ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে গদ্যে মহাভারতের সম্পূর্ণ খণ্ডগুলি প্রকাশ করেছিলেন। বাল্যে মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট শিক্ষানবিশ ছিলেন। সিড়োড়াই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ফকির চন্দ্র রায়। তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, পরে মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে বামপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দামোদরের তীরে অবস্থিত কিম্বদন্তী গ্রাম কসবা-চম্পাই। কথিত আছে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর এখানেই বাস করতেন। জনশ্রুতি, একটি সুউচ্চ ঢিবিকে সদাগরের প্রাসাদ ও অপর একটি ঢিবিকে লক্ষীন্দরের বাসর সাতালি পর্বত নামে অভিহিত করা হয়। এখানে একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে যা নাকি চাঁদ সদাগরের প্রতিষ্ঠিত।

।। আউশগ্রাম ব্লক ।।

আউশগ্রাম ১-এর আয়তন ১৮৬ বর্গ কি. মি., লোকসংখ্যা ৯৭ হাজার ৫৯৫, গ্রাম পঞ্চায়েত ৭, গ্রামের সংখ্যা ৮৭ এবং মৌজার সংখ্যা ৭০ এবং আউশ গ্রাম ২ ব্লকের আয়তন ৩৫৪ বর্গ কিমি, লোকসংখ্যা ৯৭ হাজার ৪৯২, পঞ্চায়েত ৭, গ্রামের সংখ্যা ১৫৩, মৌজার সংখ্যা ১০৬। উত্তরাংশে লাল কাঁকর মেশানো মাটি ও জঙ্গলে ভর্তি। পশ্চিমে গলসী ব্লক ও উত্তরে অজয় অতিক্রম করলেই বীরভূম। আউসগ্রাম ১নং ব্লকের সদর দপ্তর গুসকরায় অবস্থিত এবং ২নং ব্লকের সদর দপ্তর অমরারগড়ে অবস্থিত। এই ব্লকের সদর দপ্তর অমরারগড় একটি গঞ্জ। এখানে হাট-বাজার, দোকানপাট, ব্লক অফিস, ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত অফিস, সমবায় সমিতি, উচ্চ বিদ্যালয়, সিনেমা হাউস, ডাকঘর প্রায় সবই আছে। প্রাচীনকালে অমরারগড় ছিল গোপভূমির রাজধানী, সদগোপরা এখানে রাজত্ব করতেন। আসানসোল থেকে কাঁকসা হয়ে আউশগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল শৌর্য ও পরাক্রমের জয়যাত্রা। সদগোপ রাজাদের গড় তারই সাক্ষী। খ্রীষ্টিয় একাদশ শতকে এখানে রাজত্ব করেন গোপরাজা মহেন্দ্রনাথ। অমরারগড়ের চতুর্দিক ঘিরে পরিখা, কুচো ইঁটের দেওয়াল চলে গেছে গড়ের চারপাশে। দুর্গের আয়তন প্রায় এক বর্গমাইল।

দু নং ব্লকের একটি উন্নত গ্রাম সুয়াতা। এক সময় সুয়াতায় সরকারী কৃষিক্ষেত্র ও সমবায় সমিতির দপ্তর ছিল। নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এর প্রতিষ্ঠাতা। এখানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ এখানে বাহমান পীরের উরস উৎসবে হাজার হাজার লোক জমায়েত হন। মাইল খানেকের মধ্যেই রয়েছে 'ভালকী গ্রাম'। কিম্বদন্তী সদগোপ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভল্লুপদ এই অমরাবতীতে (অমরারগড়) গোপরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শিবাক্ষ্যা' দেবীর মন্দিব এখনও আছে। মুসলমানগণ অমরারগড় আক্রমণ করলে শিবাক্ষ্যার মূর্তি মন্দির থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এই সময় মাটিতে পড়ে যেয়ে মূর্তির নাকটি ভেঙে যায়। এই মূর্তি এখনও অমরারগড়ে আছে। মানকর রেলষ্টেশন থেকে দু মাইল পূর্ব্বে গেলেই অমরারগড় পড়বে।

এই ব্লকের তকীপুর গ্রামে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সৈন্যধ্যক্ষ সর্দার শংকরের বংশ গরিমার ঐতিহ্য বহন করছেন বর্তমান চট্টোপাধ্যায় বংশধরগণ। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের চারুচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন ও দেশে ফিরে বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রামগড়ে নেতাজীর সহযোগী ছিলেন। কলিকাতার চারুচন্দ্র কলেজ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

পুলিশ থানা আউশগ্রামে অবস্থিত। এখানে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আদিবাসী-তপশীল ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস আছে। সেচের সুব্যবস্থা না থাকায় ও মাটি পাথুরে হওয়ায় ফসল খুবই কম নয়। চাষের সমস্তটাই ক্যানেল নির্ভর। আদিবাসী ও তপশীল জাতি সংখ্যায় বেশি। কিন্তু সদগোপ, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি সম্প্রদায়ও বেশ রয়েছে। অমরারগড় থেকে দুই মাইল পশ্চিমে সড়ক পথে মানকর গ্রাম। সমৃদ্ধ ও প্রাচীন গ্রাম এবং রেলষ্টেশন, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, সরকারী অফিস রয়েছে। গ্রামটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের পুরাতন, বহু জীর্ণ ভাঙা প্রাচীন বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এখন মানকর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন 'কদমা'র জন্য মানকর বিখ্যাত। এখানে প্রাচীনকালে চতুস্পাঠী ও টোল ছিল। মানকরের সন্নিকটে কোটা গ্রামে পঞ্চদশ শতকের শেষে বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও অষ্টাদশ শতকে মেয়ে পণ্ডিত রূপমঞ্জরী জন্মগ্রহণ করেন। দুনং ব্লকের বাহাদুরপুর গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখার্জী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে সোঁয়াই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিদূষী মহিলা হটী বিদ্যালংকার।

আউশগ্রাম ১নং ব্লকের অন্তর্গত গুসকরা একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ও গঞ্জ। স্বাধীনতার পর ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গুসকরাকে পৌরসভা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গুসকরা রেলষ্টেশন এবং সড়ক পথেও গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। একটি কলেজ, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। যেহেতু এখানের উৎপন্ন ফসল ধান, তাই

বহু রাইসমিল গড়ে উঠেছে। বহু দোকান পাট, হাট, বাজার এলাকাকে জনবহুল করে তুলেছে। ব্লক অফিস, ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে। পাশ দিয়ে বহে চলেছে খড়ি নদী। নদীর সেতুর পাশে দু'শ বছরের পুরাতন 'রটন্তি' রক্ষাকালী বিখ্যাত। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর আগের চতুর্দশীতে ধূমধামে পূজা ও মেলা হয়। দৈনিক হাজার পাঁচেক দর্শক সমাগম হয়, চলে এক সপ্তাহ ধরে। গুসকরাব সন্নিকটবর্তী বননবগ্রাম একটি মনোরম গ্রাম। এই গ্রামের চট্টোপাধ্যায় পরিবার ঐতিহ্যপূর্ণ। সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাবজজ ছিলেন। তার পুত্র নলিনী রঞ্জন ১৯২৪ খ্রীঃ প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি Bengal Sanskrit Association ও Cow Preservation League এর সভাপতি ছিলেন। গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়'ও বিশাল বসতবাটি দালান আছে। গুসকরার সন্নিকটে (কারো কারো মতে মঙ্গলকোটের শীতল গ্রাম) সিদ্ধল (বর্তমান সিধলে) গ্রামে ভবদেব ভট্ট জন্মগ্রহণ করন। তিনি বঙ্গের রাজা হরিবর্মার সন্ধি বিগ্রহিক ছিলেন, যার শস্ত্র ও শাস্ত্রে পাবদর্শিতা বিস্ময়কর। হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগ ও ধর্মীয অনুষ্ঠানের প্রবক্তা ছিলেন তিনি।

।। কাটোয়া মহকুমা ।।

বর্দ্ধমান জেলার উত্তর পূর্বে অজয়ের তীর পর্যন্ত কাটোয়া মহকুমা বিস্তৃত। অন্যান্য সদর ও কালনা মহকুমার মত সমস্ত এলাকাই সমভূমি—কৃষিক্ষেত্রে পূর্ণ। উত্তরে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণে বর্দ্ধমান ও কালনা, পূর্ব্বে ভাগীরথী নদী এবং পশ্চিমে বীরভূম জেলা। অজয় ও কুনুর কাটোয়া মহকুমার প্রধান নদী। অজয় এই মহকুমার সীমানা দিয়ে ২৪ কিমি পথ প্রবাহিত হয়ে কাটোয়া শহরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। দুইটি শহর ও পুরসভা—কাটোয়া ও দাঁইহাট। তসর শিল্প ছিল এখানের অন্যতম শিল্প। গেজিটিয়ারে আছে: The silk weaving industry although a declining one, is still fairly prosperous.....It is carried on at Bagtikra, Musthali and Ghoranash in the Katwa Sub-Div and at Memari, jagdabad and Panchkhola in the Sadar. The tasar cloth produced at Bagtikra and Memari is of excellent quality and is exported as far as Madras and Bombay. The Majority of Katwa Silk goes to Calcutta where it is sold or exported.

এন, জি, মুখার্জী কৃত Monograph on the silk fabrics of Bengal পুস্তকে রয়েছে যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কাটোয়া মহকুমার ১২টি গ্রামে তসরের গুটি পোকার চাষ হত-তা থেকে রেশমের সূতো ও তসর কাপড় উৎপন্ন হত।

সেই গ্রামগুলি হল—বাগটিকরা, গোয়ালকানিগি, মাধাইপুর, মুস্থলী, আমডাঙ্গা, পাঁচবেড়িয়া, জগদানন্দপুর, চাণ্ডাল, শ্রীবাটি, মুলটি ও মায়াগাছি। এই শিল্প এখন লুপ্ত হলেও তখন প্রায় পাঁচহাজার পরিবারের অন্নসংস্থান হত। কাটোয়া ১ ব্লক, কাটোয়া ২ ব্লক, মঙ্গলকোট ব্লক, কেতুগ্রাম ১ ও কেতুগ্রাম ২– এই পাঁচটি ব্লক দুটি পুরসভা নিয়ে কাটোয়া মহকুমা।

।। কাটোয়া শহর ।।

পৌরসভার আয়তন ১৯.২ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৩২ হাজাব ৮৯০, ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪। কাটোয়া শহরটি বাঙলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে এই শহর মুসলমান আক্রমণ থেকে সুরু করে ইংরেজের কোম্পানী আমলের উত্থান পতনের সাক্ষী। আলিবর্দি, সিরাজদ্দৌলা ও লর্ড ক্লাইভের স্মৃতিবিজড়িত এই শহর। বৈষ্ণবদের কাছে কাটোয়া তীর্থক্ষেত্র; কারণ কণ্টক নগরেই (তৎকালীন নাম) ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাই পণ্ডিত গঙ্গার তীরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন ও মস্তক মুণ্ডন করে কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। জগাই-মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন দিয়ে চৈতন্য দান করেছিলেন—সেই গৌরাঙ্গ মন্দির ও মাধাইতলা আজ তীর্থক্ষেত্র। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দি খাঁ মারাঠা বর্গীদের এই শহর থেকে বিতাড়িত করেন ও নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গ থেকেই মারাঠাদের সঙ্গে নবাব সৈন্যের তুমুল যুদ্ধ হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ কলকাতা থেকে গঙ্গার জলপথে সৈন্য নিয়ে এই কাটোয়া শহরেই প্রথম ছাউনি ফেলেন। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে তিনি সিরাজদ্দৌলার কাছ থেকে কাটোয়ার দুর্গ দখল করেন। পরে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজকে পরাজিত করেন। বাঙলার সৌভাগ্য সূর্যের পথ পরিক্রমায় কাটোয়া শহরের ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য।

কোম্পানীর আমল থেকেই ভৌগোলিক অবস্থান কাটোয়াকে বড় বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত করেছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এখানে ব্যাণ্ডেল থেকে রেলপথ সম্প্রসারিত করে। জলপথে পরিবহনের কাজে লিপ্ত থাকত স্টীমার। কিন্তু ক্রমাগত গঙ্গায় পলি পড়তে থাকায় মাল বোঝাই জাহাজ ভিড়তে পারত না– তাই কোম্পানীর কাছে রেলষ্টেশন পত্তন খুব জরুরী হয়ে পড়ে। পৌরসভার পত্তনও ষাটের দশকের শেষে অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। রেলপথ কাটোয়াকে মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং জলপথ নদীয়া ও হুগলীর সঙ্গে যুক্ত করেছে কাটোয়াকে।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান হল শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির, মাধাইতলা, টাউনহল, যোগেশ্বর



গৌরাঙ্গ মন্দির

শিব। কাটোযাতে একটি কলেজ, একটি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ, অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। কিন্তু একশত বৎসরে শহরের যা উন্নতি হওয়া উচিত ছিল তা হয় নাই। এখানে রযেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তৈরী মুর্শিদ কুলি খাঁ বা জাফর আলি খাঁর একটি বিরাট মসজিদ। মুর্শিদ কুলি খাঁ ১৭০২ খ্রীঃ হতে ১৭২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন, মসজিদটি সেই সময়কার তৈরী স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। কাটোয়ার বিখ্যাত লোক উৎসব কার্তিক লড়াই—এখন ক্রমশঃ লুপ্ত হতে বসেছে। কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন কার্তিকঠাকুর বিসর্জনের মূল উৎসবই হল, 'থাকার' প্রতিযোগিতা। শিখ গুরু গোবিন্দ সিং কাটোয়া শহরে এসেছিলেন। কাটোয়ার গুরুদ্বার সেই জমির উপর প্রতিষ্ঠিত যার দানপত্র গুরু গোবিন্দ সিং নিজে গ্রহণ করেছিলেন। এই শহরে এসেছিলেন খৃষ্টান মিশনারী উইলিয়ম কেরীর পুত্র জুনিয়ার কেরী। তিনি স্ত্রী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় খুলে ছিলেন। এখানেই তিনি দেহ রাখেন। সমাধিক্ষেত্রটি

পৌরসভা কর্তৃক রক্ষিত আছে। ভাগীরথীর বন্যায় প্রায়ই কাটোয়া শহর প্লাবিত হত, এই বাঁধ—অঞ্চলে সারি সারি গাছ এক নূতন পরিবেশ গড়ে তুলেছে। এখানে একটি গেষ্ট হাউস পর্যটকদের কথা ভেবেই গড়ে তুলেছে পুরসভা।

।। দাঁইহাট ।।

একেকালে দাঁইহাটের কোল ঘেঁষে বহে যেত ভাগীরথী। কিন্তু এখন সেই গঙ্গা বহু দুরে চলে যাওয়ায় দাঁইহাটের গুরত্ব অনেকাংশে কমে গেছে। সেই সময দাঁইহাট ছিল একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের ১লা এপ্রিল দাঁইহাট পৌরসভার পত্তন হয়। তখন লোক সংখ্যা ছিল ৫,৩৪২, আয়তন ১২.৭০ বর্গ কিমি বর্তমান লোকসংখ্যা ১৭ হাজার। ১০টি ওয়ার্ড নিয়ে লোকসভা। ব্রিটিশ এই শহরটিকে পৌরসভার মর্যাদা দান করেন বিশেষতঃ প্রাচীন শহর বলেই। একেকালে দাঁইহাটের তসর শিল্প ও কাঁসা পিতলের বাসন ছিল বিখ্যাত। গঙ্গার জলপথে ঐসব সামগ্রী বাইরে রপ্তানী হত। দাঁইহাটে পাথরের মূর্তির খুব সুনাম ছিল। সে সময দাঁইহাট ছিল নদীবন্দরগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। তপশীলি জাতি ও উপজাতিব সংখ্যা বেশি। কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, আগুরি, সম্প্রদায়ের লোকও আছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এসে গড়ে তুলেছে গঙ্গার চরে উপনিবেশ।

দাঁইহাট বর্দ্ধমান মহারাজাদের প্রিয় ছিল। তাই তাদের তৈরী অনেক দেবমন্দির আছে, আর আছে রাজবংশের প্রথানুযায়ী মৃত্যুর পর স্মারক হিসাবে অস্থি সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এই দাঁইহাট শহরেই মারাঠা সর্দ্দার ভাস্কর পণ্ডিত দুর্গাপূজা করেছিলেন। সেই মন্দির ও যজ্ঞের স্থল এখন ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান। এই শহরেই 'বেড়া' নামক স্থানে একটি বিরাট পাথরের চাঁই আছে। সেটি নাকি ময়ূরভঞ্জ বাজাব প্রাসাদের চিহ্ন। আর একটি সুদৃশ্য পাথর আছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের দরজায়। এই দাঁইহাটে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃৎ বিপ্লবী জিতেন্দ্রনাথ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামে সাধারণ পাঠাগার এখন একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। পাঠাগারের প্রাঙ্গনে জিতেন্দ্রনাথেব মর্মরমূর্তি আছে।

।। কাটোয়ার গ্রামাঞ্চল ।।

কাটোয়া—১ ব্লকে আয়তন ১৭০.৯৪ বর্গ কিমি, ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং

৮১টি গ্রাম নিযে গঠিত। মৌজার সংখ্যা ৬৩ কাটোয়া শহরেই এর ব্লক অফিস। লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫ শত ৮২। জমি যথেষ্ট উর্ব্বর তাই ফলনও ভাল। ধান প্রধান শস্য হলেও আলু, গম, সরিষা, তিল ও রবিশস্যও জন্মে। কুটির শিল্পও আছে যেমন– পুতুল, বেতের ঝুড়ি, মাদুর, চামড়ার জুতা, সৌখীন দ্রব্য ও শোলার জিনিষপত্র তৈরী হয়।

এই ব্লকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রাম শ্রীপাট শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবতীর্থ হিসাবে বিখ্যাত। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালেই শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পীঠে পরিণত হয়। মহাপ্রভুর ভক্ত ও পার্ষদ নরহরি সরকার এখানে জন্মগ্রহণ করেন। নরহরির দাদা মুকুন্দ এবং মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ও স্বয়ং নরহরি–এই ত্রয়ী শ্রীখন্ডকে বৈষ্ণব-নাগরীভাবের এক সাধন ক্ষেত্রে পরিণত করেন। মহাকবি দামোদর এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পান্ডিত্যের জন্য তিনি "যশোরাজ" উপাধি পেয়েছিলেন। এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী খণ্ডেশ্বরীব নামানুযায়ী গ্রামের নাম শ্রীখণ্ড হয়। এই গ্রামে মাতুলালয়ে বৈষ্ণব পদাবলীব গোবিন্দদাস কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন।

কাটোয়া শহর থেকে ১২ কিমি দক্ষিণে গঙ্গার তীরে অবস্থিত অগ্রদ্বীপ এখন একটি ছোট্ট গঞ্জ। ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেলপথের একটি ষ্টেশন এই অগ্রদ্বীপ। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিখ্যাত, তার মন্দিরটিও প্রাচীন। এখানে বৈষ্ণব সমাজের এক বিরাট মেলা বসে বৈশাখ মাসে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু পরদিন এখানে রাত্রি যাপন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে অগ্রদ্বীপে বিখ্যাত জমিদার মল্লিক পরিবারের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান রমাপ্রসাদ মল্লিক রাজশাহী ও কাটোয়ায় অনরারী ম্যাজিস্ট্রেট ও লাহোর কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন। অগ্রদ্বীপ বেলষ্টেশন থেকে দু কিমি দূরে রয়েছে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'বাঙ্গাল গেজিটি'র সম্পাদক গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের জন্মভূমি বহড়া গ্রাম। এখনও বহড়া গ্রামের ছাপাখানা ডাঙ্গা সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীরামপুরের ছাপাখানা তুলে এই গ্রামে নিয়ে এসে এখান থেকেই 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশ করতেন গঙ্গাকিশোর। এ কম গৌরবের কথা নয়। বহড়াগ্রামটি অবশ্য কালনা মহকুমায় পূর্বস্থলী ব্লকে

অবস্থিত। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়া শহরের পাঁচমাইল পশ্চিমে বাঁধমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত পাঁচালীকার দাশরথি রায়। ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ঝামটপুরে জন্মগ্রহণ করেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

যাজি গ্রামে সাধন পাঠ গড়ে তোলেন মহাপ্রভুর অন্যতম ভক্ত শ্রীনিবাস আচার্য। যদিও তাঁর জন্ম নদীয়ার চাকন্দী গ্রামে, তবু বৃন্দাবন থেকে শাস্ত্র শিক্ষা শেষ করে আচার্য উপাধি লাভ করেন শ্রীনিবাস। কথিত আছে শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর নামে দুই বৈষ্ণব মহান্ত ও কয়েকজন সঙ্গীসহ শ্রীনিবাস যখন গৌড়ে আসছিলেন সঙ্গে ছিল একটি বস্তায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' এবং আরও কিছু বৈষ্ণব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। মল্লভূমি রাজ্যের মধ্য দিয়ে আসার সময় মল্লরাজ বীর হাম্বির ঐ বস্তায় ধনরত্ন আছে ভেবে লুট করেন। শ্রীনিবাস পাগলের মত ছুটে গিয়ে গ্রন্থগুলি উদ্ধার করেন ও মল্লরাজ হাম্বিরকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে মামার বাড়ি যাজি গ্রামে এসে বৈষ্ণব সাধনপীঠ গড়ে তোলেন। শ্রীনিবাস সাধনপীঠের অনতিদূরে প্রাচীন ঠাকুর কালিন্দীনাথ শিব রয়েছেন। কাটোয়ার নিকট দুর্গা গ্রামে ঐতিহাসিক অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। "নবাবী আমলের ইতিহাস" তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

।। কাটোয়া ২ ব্লক ।।

আয়তন ১৬৪.৪৫ বর্গ কিমি, সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ ৮১ টি গ্রাম ও ৬১টি মৌজা নিয়ে এই ব্লক। লোকসংখ্যা ৯১ হাজার ৫৭। লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ হল তপশীল জাতি। সেচখাল না থাকায় এখানে নদীর জল উত্তোলন করে কিম্বা গভীর নলকূপ থেকে সেচ দিয়ে জমিতে দুটো ফসলের ব্যবস্থা হয়েছে। লিফট ইরিগেশন প্রকল্প ও গভীর নলকূপ মিলে সংখ্যা প্রায় ৫০ টি হবে। ধান প্রধান ফসল আর তাঁতের কাপড় ও শোলার জিনিষের জন্য এই ব্লকের খ্যাতি।

বাঙলা মহাভারতের রচয়িতা কবি কাশীরাম দাসের জন্মভূমি ইন্দ্রানী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গি। আগে সিঙ্গি ছিল গঙ্গাতীরবর্তী, এখন গঙ্গা বহুদূরে চলে গেছে। সিঙ্গিগ্রামে কাশীরামের ভিটেতে ভাঙা বাড়ি এখনও বিদ্যমান। 'ক্ষেত্রপালের' পূজা

এই গ্রামের একটি বিরাট ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এখানে জামালপুরে বুড়োশিবের পূজা ও গাজন উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রপুরায় গড়ে উঠেছে গঞ্জ। এখানে উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চাণ্ডুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি বিখ্যাত অধ্যাপক ও দর্শনশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। পরবর্তী কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করলে তিনি স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ নামে খ্যাত হন।

।। কেতুগ্রাম ব্লক ।।

কেতুগ্রামে থানার পশ্চিমাংশই কেতুগ্রাম ১ ব্লক। আয়তন ১৮৯.৮৬ বর্গ কিমি। আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত ৭৭টি গ্রাম ও ৬৬টি মৌজা নিয়ে এই ব্লক। পাশেই বীরভূম, তাই প্রায় সব কিছুতেই বীরভূমের ছাপ স্পষ্ট। লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ১৮২, লোকসংখ্যার এক চতুর্থাংশ তপশীল জাতি ও উপজাতি। সেচের ব্যবস্থা নেই, তাই ফসল অনিশ্চিত চাষীদেরও অবস্থা তথৈবচ। সে কারণ অর্থনীতির দৌড়ঝাঁপে এ ব্লক পিছিয়ে পড়েছে।

এই ব্লকের গ্রাম কাঁদড়া, বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের জন্মভূমি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্র হল এই কাঁদড়া। জ্ঞানদাস শুধু বৈষ্ণব পদাবলীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হিসাবে নন, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবী দেবীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন জ্ঞানদাস। কাঁদড়া গ্রামে তাঁর সাধন-পীঠ 'জ্ঞানদাস পাট' নামে পরিচিত। মনসামঙ্গলের রচয়িতা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দও এই কাঁদড়ায় জন্মেছিলেন। কথিত আছে মঙ্গল ঠাকুরের দীক্ষাদান পদ্ধতি ছিল 'কর্ণধারণ' করে, তার থেকেই নাকি নামকরণ হয় 'কাঁদড়া' স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়াতে সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভাগীরথীর তীর ধরে কেতুগ্রামের উপর দিয়ে কাঁদড়ায় এসে পৌঁছান ৩ মাঘ। ঐদিন রাত্রে তিনি মঙ্গল ঠাকুরের বাড়িতে আশ্রয় নেন। (মঙ্গল ঠাকুর এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের কিরীটকনা গ্রামের অন্যতম শক্তি পীঠ থেকে। তিনি ছিলেন অকৃতদার ও কিরীটেশ্বরীর পূজারী)। সঙ্গে ছিলেন গদাধর, মুকুন্দ ও আরও অনেকে। যে কুটীরে মহাপ্রভু রাত্রিবাস করেছিলেন, সেখানে এখনও একটি জীর্ণ মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। স্থানটির নাম হয়ে গেছে গৌবাঙ্গডাঙ্গা। এখানেই ৩ মাঘ বিরাট বৈষ্ণব মেলা হয়। মঙ্গল ঠাকুরের বংশে বিখ্যাত হলেন, শশীশেখর, গোকুলানন্দ ও বংশীবদন ঠাকুর। এঁরা ছিলেন কীর্তনীয়া পদকর্তা। বংশীবদন 'দীপান্বিতা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থও লেখেন। বৈষ্ণবদের 'সাঁজি উৎসব', শিবের গাজন, 'সা-সাহেব' পীরের উর্‌স উৎসব এবং মনসার ভাসান ও চণ্ডীর মেলা সব মিলেয়ে সংস্কৃতির এক মিলনক্ষেত্র এই ব্লক।

দধিয়ার বৈরাগ্যতলা ও কুলুটের প্রাচীন মসজিদ বিখ্যাত। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে

গৌড়ের প্রজাবৎসল সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে) গৌড় থেকে হুগলির গড় মান্দারণ পর্যন্ত যে সড়ক নির্মাণ কবেন তা বাদশাহী রোড নামে খ্যাত। এই পথের একক্রোশ দুরে দুরে তিনি মসজিদ, দীঘি ও সরাইখানা তৈরী করেন। কেতুগ্রাম ১ ব্লকের কুলুটের মসজিদটি এমনই একটি মসজিদ। মঙ্গলকোট ব্লকে নূতনহাটে এমনি একটি মসজিদ আছে। এই মসজিদটির শিল্পকর্মের সঙ্গে কুলুটের মসজিদটির শিল্পরীতির বেশ মিল আছে। টেরাকোটার কারুকার্য করা মুসলমান স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন এই মসজিদগুলি।

কেতুগাম ১ ব্লকের অপর উল্লেখযোগ্য গ্রাম হল শ্রীপুর ও ন-পাড়া। কয়েকটি ছোট ছোট পল্লী নিয়ে শ্রীপুর গড়ে উঠেছে। এই গ্রামের উত্তর পশ্চিমে এক বিশাল মাঠ আছে, নাম 'আযমার মাঠ' বা 'বাণনাগরার মাঠ'। অনেক কিম্বদন্তী এই মাঠকে ঘিরে। এই মাঠের মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় পুকুর ও স্তূপ আছে। কিছুদিন আগে পুকুর খননের সময় কতকগুলি মূর্তি ও প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। অনুমান এখানে এককালে একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেই নগর ধ্বংস হয়ে গেছে। বাণনাগরার মাঠে জঙ্গল পরিষ্কর করার সময় কিছুদিন আগে এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্ভবতঃ এটি ধর্মরাজ বা শিবের মন্দির হবে। বাণনাগরার মাঠে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালালে হয়ত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা যাবে।

কন্টকনগরে দীক্ষা নেবার পর শ্রীচৈতন্য রাঢ় দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। অজয় নদের তীর ধরে যেতে যেতে তিনি এই ন-পাড়ায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেই জায়গাটির নাম হয়ে গেছে বিশ্রামতলা, আর তাই থেকে গ্রাম ন-পাড়া হয়ে গেছে বিখ্যাত। চৈতন্যদেব এখান থেকে গিয়েছিলেন কুলাই গ্রামে। এই কুলাই গ্রামে পদাবলীকার বাসুদেব ঘোষের জন্মভূমি। তিনি চৈতন্যলীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে বৈষ্ণবদের কাছে পূজনীয়। বাসুদেব, গোবিন্দ ও মাধব— তিন ভাই কুলাই গ্রামকে বৈষ্ণবদের কাছে তীর্থভূমিতে পরণিত করেছিলেন।

।। কেতুগ্রাম ২ ব্লক ।।

আয়তন ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৪ বর্গ কিমি, মোট সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৮৪টি গ্রাম ও ৫৬টি মৌজা নিয়ে কেতুগ্রাম ২ ব্লক গড়ে উঠেছে। যথারীতি ১ নং ব্লকের পূর্ব্বাংশই হল এই ব্লক। লোকসংখ্যা ৮০ হাজার ৬ শত ৫৪। তার মধ্যে প্রায় পাঁচিশ হাজার তপশীল জাতি। সেচখাল না থাকায়— নদী-সেচ-প্রকল্প ও গভীর নলকূপ দিয়ে ফসল ফলানো সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা হয়েছে, এমন প্রকল্পের সংখ্যা ৩১। জমি খুব উর্ব্বর নয়, ধানই প্রধান ফসল, তবু আলু, গম, তিল,

সবিষাও হয়। অজয় নদ আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত হচ্ছে এই ব্লকের মধ্য দিয়ে। তাই অজয়েব প্লাবনে কেতুগ্রামেব এই ব্লক ভেসে যায়। কুটিব শিল্পেব উপব নির্ভব করে বেশ কিছু মানুষ। সেগুলি হল— তাঁত, লৌহজাত জিনিষ, কাঠ, চামড়া ও বেতের কাজ। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া এই ব্লকে বৈষ্ণব সংস্কৃতি ঢেউ এসেছিল সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ঘিবে। কৃষ্ণদাস গোস্বামীব স্মৃতি বিজড়িত ঝামটপুব, প্রাচীন গ্রাম বহড়ান, শাক্ত-সংস্কৃতিব পীঠস্থান উদ্ধাবণপুবেব ঘাট বহু মানুষেব কাছে বিস্ময়।

এই ব্লকেব ঝামটপুবে 'চৈতন্যচবিতামৃত' কাব্যেব স্রষ্টা বৈষ্ণব কুলতিলক গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিবাজ জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি এই ঝামটপুবে বসেই চৈতন্য জীবন কাব্য বচনা কবেন। সেজন্য বৈষ্ণবদেব কাছে এই গ্রাম পুণ্যভূমি। বহড়ান গ্রামটি জেলাব মধ্যে কুলীন। খ্রীষ্টিয় ৮ম শতাব্দীতে এই গ্রাম সমৃদ্ধ ছিল। নবম শতাব্দীতে বাংলাব রাঢ় প্রদেশে আদিশূব বাজত্ব কবতেন। তিনি কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন কাযস্থকে



অট্টহাস দেবীব মন্দিব

এই বাঙলায় নিয়ে আসেন এবং তাদেব কতকগুলি গ্রাম দান করে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার বন্দোবস্ত করে দেন। এই পাঁচজনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পুরুষোত্তম

দাস। রাজা তাঁকে বহড়ান গ্রাম দান করেন। রাজা যে সব কায়স্থকে রাঢ়ের উত্তরাংশে বসবাস করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তাঁদের বলা হয় 'উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ' এবং যাঁরা রাঢ়ের দক্ষিণে বসবাস করেন, তাদের বলা হয় "দক্ষিণ রাঢ়ীয়" কায়স্থ। বাংলার দুই প্রাচীন কুল পরিচায়ক গ্রন্থ 'কায়স্থ-কুল-পঞ্জিকা' এবং 'ঘটক-কুল-নির্ণয়' একথা বলে। পুরুষোত্তম দাসের পরবর্তী সপ্তম পুরুষ হলেন রামদাস। এই রামদাস পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যই তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধি দেওয়া হয়। গ্রামে 'রামদাস সরস্বতী'র বাস্তুভিটে এখনও আছে। গ্রামের মানুষ রামদাসের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য 'রামদাস সরস্বতী স্মৃতি রক্ষা সমিতি' গঠন করেছেন।

কেতুগ্রাম ২ ব্লকের নিরোল মৌজায় দক্ষিণডিহি দেবী অট্টহাসের জন্য বিখ্যাত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে এখানের জনপদ একেবারে জনশূণ্য হয়ে যায়। কিন্তু দেবী অট্টহাস ও তার মন্দির জেগেছিল। সেখানে নূতন গ্রাম এই দেবীকে ঘিরেই গড়ে উঠে। দেবী ভৈরবী, ভৈরব আছেন পাশের বিল্লেশ্বর গ্রামে। শাক্তপীঠ বলে বহু যাত্রী আসেন। এই ব্লকের আর একটি প্রাচীন দেবস্থান উদ্ধারণপুর। পাঁচশ বছর আগে এই গ্রামের নাম ছিল—"নৈহাটি" ঐ নৈহাটি ছিল নৈরাজার রাজধানী, এখনও নৈহাটি গড় তার সাক্ষী। এখান থেকে বল্লালসেনের 'তাম্রশাসন' পাওয়া গেছে। এই গ্রামে সুলতান হুসেন শাহের সেনাপতিদ্বয় চৈতন্যভক্ত রূপ ও সনাতন জন্মগ্রহণ করেন। রাজপদ ত্যাগ করে তাঁরা মহাপ্রভুর সঙ্গী হয়ে বৃন্দাবনবাসী হন। এই ব্লকের আর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম হল—'গঙ্গাটিকুরী'। কাটোয়া ষ্টেশনের পরেই গঙ্গাটিকুরী। রস সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মভূমি।

।। মঙ্গলকোট ব্লক ।।

কাটোয়া মহকুমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্লক হল মঙ্গলকোট। অজয়, কুনুর নদী বিধৌত এই ব্লক জেলার উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। পুরা সম্পদের রত্নভাণ্ডার এই মঙ্গলকোট। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা চালিয়ে অনেক পুরাসম্পদ এখানে পাওয়া গেছে। বীরভূমের সন্নিকটবর্তী হওয়ায় বর্দ্ধমানের সংস্কৃতিতে বীরভূমের ছোঁয়া আছে। বিরাট এই ব্লককে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—পশ্চিম মঙ্গলকোট ও পূর্ব্ব মঙ্গলকোট। সদর দপ্তর অজয়ের তীরে অবস্থিত নূতনহাট গ্রামে। আয়তন ৩৬৪.৯ বর্গ কি. মিটার, ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১৫৪টি গ্রাম এবং ১৩১টি মৌজা নিয়ে মঙ্গলকোট ব্লক। লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৪০। তপশীলি জাতি ও উপজাতির সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। অজয় ও কুনুরে প্লাবন হলে মঙ্গলকোট ভেসে যায়। সেচের সুব্যবস্থা নেই। মাত্র চারটি নদীসেচ প্রকল্প ও তিনটি গভীর নলকূপ রয়েছে। একটি ফসলের জন্যও চাষীদের তাকিয়ে থাকতে হয়

আকাশের দিকে বৃষ্টির অপেক্ষায়। সেজন্য কৃষি শ্রমিকদের বর্ষা হলে কাজ আছে, নইলে নেই। অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়।

যদিও ব্লকের নাম মঙ্গলকোট, তবু মঙ্গলকোট গ্রামে ব্লকের সদর দপ্তর নেই, আছে নূতনহাটে। অথচ মঙ্গলকোট গ্রামের নাম থেকেই কিন্তু ব্লকের নাম। তার একটিই কারণ, মঙ্গলকোট গ্রামটি প্রাচীন ও ঐতিহ্য সম্পন্ন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ গবেষণা চালালে অনাবিষ্কৃত বহু তথ্য এই গ্রামের প্রাচীনত্বকে সমর্থন করবে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকোটের রাজা ছিলেন বিক্রমজিৎ। মঙ্গলকোটের একটি উঁচু ডাঙাকে এখনও বিক্রমাদিত্যের ডাঙা বলে। এক সময় আঠারোজন গাজী মঙ্গলকোট অধিকার করতে আসেন। কিন্তু বীর বিক্রমজিৎ একে একে আঠারোজন গাজীকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাদের সমাধি আছে, সেজন্য মঙ্গলকোটকে বলে আঠারো আউলিয়ার দেশ। সর্ব শেষ 'গজনবী' নামে অপর একজন গাজী বিক্রমকে যুদ্ধে নিহত করে মঙ্গলকোট দখল করেন। পরবর্তীকালে বর্দ্ধমানে মোগল পাঠানের দ্বন্দ্বের সময় মঙ্গলকোট মোগলদেব সৈন্য সমাবেশের স্থান ছিল, অনেকে বলেন, মোগল-কোট থেকে অপভ্রংশিত হয়ে 'মঙ্গলকোট' নাম হয়েছে। সেজন্য মুসলিম সংস্কৃতির বহু সাক্ষী যেমন মসজিদ ও মুসলমানী নাম এই ব্লকে ছড়িয়ে রয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের চরিত্র ধনপতি সদাগরের বাসভূমি ছিল এই ব্লকের 'উজানি নগব' যার বর্তমান নাম কো-গ্রাম, অজয়ের তীরে অবস্থিত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুকুন্দরাম এই গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন:

"উজানি নগর, অতি মনোহর,
বিক্রম কেশরী রাজা।
করে শিবপুজা উজানির রাজা,
কৃপা হইল দশভূজা॥"

অর্থাৎ এখানে যিনি রাজত্ব করতেন তাঁর নাম 'বিক্রমেশ্বরী', তিনি ছিলেন শৈব। সওদাগর ধনপতির দুই স্ত্রী খুল্লনা ও লহনা। খুল্লনার বাড়ি ছিল—'ইছানীতে' বর্তমান নাম ইছাবটগ্রাম। খুল্লনা বিকালে যে মাঠে পায়রা ওড়াতেন, সেই মাঠ এখনও আছে—"পায়রা ওড়ানোর মাঠ।" ধনপতি সওদাগরের পুত্র শ্রীমন্ত পিতার খোঁজে সিংহল যাত্রা করার আগে উজানিতে "মঙ্গলচণ্ডীর"পূজা করেছিলেন। সেই চণ্ডী এখনও "শ্রীমন্তের চণ্ডী" বলে উল্লেখিত হন। আবার এই উজানিতে সতীর কনুই পড়েছিল বলে শক্তি সম্প্রদায়ের কাছে উজানি (যা বর্তমানে কো-গ্রাম নামে খ্যাত) একটি শাক্ত পীঠ! কুনুর ও অজয়ের সঙ্গমস্থলে এই উজানি নগর ভয়ঙ্কর ছিল "ভোমরার দহের" জন্য। এখনও বর্ষাকালে অজয়-কুনুরের এই সঙ্গমস্থল ভয়ানক হয়ে ওঠে। মুকুন্দরামের কাব্যে আছে:

পূর্ব হইতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে॥

লোচনদাসের বাস ছিল মঙ্গলকোটের এই উজানিতে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের গীতিকবি এই লোচনদাস চৈতন্যমহাপ্রভুর জীবনকাব্য রচনা করেছেন "চৈতন্যমঙ্গল"।

পল্লিকবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের (জন্মবর্ষ ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দ) জন্মভূমি এই কোগ্রাম। সেখানে কবির বসতবাটি আজিও বিদ্যমান লোচনদাস পাটের পাশেই। লোচনদাস পাটে কবির সংগৃহীত বেশ কিছু মূর্তি রয়েছে—যেগুলি বুদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির সাক্ষী। অজয় ও কুনুরের বালি খুঁড়তে গিয়ে এই মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে। কোগ্রাম-উজানির প্রবেশ পথে একটি প্রাচীন মসজিদ চোখে পড়বে। উজানি-মঙ্গলকোট ১২১৪-১৫ খ্রীঃ অব্দে মুসলমান অধিকারে আসার পর সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়। সুলতান হুসেন শাহ ষোড়শ শতাব্দীতে এই মসজিদ নির্মাণ করেন। এই ব্লকের কাশিয়াড়া বৈরাগীতলা গ্রামে ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নবাব আব্দুল জব্বারখান বাহাদুর সি. আই. ই। তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে বৃত হন। অবসর গ্রহণের পর ভুপালের নবাব সাহজাহান বেগমের প্রধানমন্ত্রী পদে যোগদান করেন। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন;কলকাতার টাউনহলে প্রধান বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন।

মঙ্গলকোটের আরও দুটি গ্রাম কাশেম নগর ও কাঁকোড়া-অবিভক্ত বাঙলার মুসলমান নেতা আবুল কাশেমের জন্মস্থান। তাঁর নামেই প্রাচীন বৈরাগীতলার নাম হয় কাশেমনগর। তিনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী। কাশেম নগরে ছড়িয়ে রয়েছে মুসলিম স্থাপত্য ও সংস্কৃতির চিহ্ন। কাঁকোড়া গ্রাম নাগদেবতা কর্কটনাগের জন্য বিখ্যাত। চাঁদ সদাগরের কাহিনীতে যে সর্প দেবতা মনসার পূজা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখি হয়ত কর্কটনাগ তারই ফলশ্রুতি।

মঙ্গলকোট আজও দেশ-বিদেশে বিখ্যাত তার অন্যতম কারণ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার পূজা। বহু দূর দূর থেকে যাত্রীরা আসেন এই যোগাদ্যার মেলায়। আগুরী সম্প্রদায়ের বসতি যে সব গ্রামে ব্যাপক, সেখানেই যোগাদ্যা দেবীর পূজা হয়। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা হলেন মূল। এই গ্রামেও আগুরী জাতির প্রাধান্য, অবশ্য অন্য সব জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষও আছেন। এই আগুরী বা উগ্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের আধিক্য রয়েছে—চৈতন্যপুর, মাঝিগ্রাম এবং যবগ্রামেও। ভারতের খ্যাতনামা চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ গণপতি পাঁজা এই মাঝিগ্রামে দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। মাতার নামে গ্রামে বিশ্বেশ্বরী হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত পাঁজা এই বংশের সন্তান। মাজিগ্রামের শাকম্ভরী পূজা ও চৈতন্যপুরে শৈলেশ্বর শিবের পূজা বিখ্যাত

কথিত আছে, চৈতন্য মহাপ্রভু রাঢ় দেশ ভ্রমণ করতে করতে পথিমধ্যে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে যান। ভক্তগণ ধরাধরি করে এখানে নিয়ে আসেন ও সেবা শুশ্রূষা করার পর চৈতন্য ফিরে পান, তাই গ্রামের নাম চৈতন্যপুর। কড়ুই গ্রাম ঐতিহ্যপূর্ণ এবং বৈষ্ণবতীর্থ। এই গ্রামে পালরাজাদের বহু সংস্কৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। তখন ছিল কড়ুই বৌদ্ধভূমি। উগ্রক্ষত্রিয় রাজারা রাজত্ব করতেন। পরে বুদ্ধদেব লৌকিক দেবতা ধর্মরাজে পরিণত হন। নিত্যানন্দ প্রভুর বংশের একটি শাখা এখানে বসতি করেন তাদের দেবতা রাধামাধব। কবি শেখর কালিদাস রায় ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে কড়ুইতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পদকর্তা লোচনদাসের বংশধর ছিলেন।

॥ কালনা মহকুমা ॥

কালনা পৌরসভা ও পাঁচটি ব্লক নিয়ে এই মহকুমা। ব্লকগুলি হল —কালনা-১, কালনা-২, পূর্বস্থলী—১, পূর্বস্থলী-২ ও মন্তেশ্বর ও কালনা পৌরসভা। মহকুমার আয়তন প্রায় ১০৩৩ বর্গ কিমি। পশ্চিমে নদীয়া, পূর্বে ভাগীরথী, দক্ষিণে হুগলী এবং বর্দ্ধমান সদর মহকুমা। আর উত্তরে কাটোয়া। সদর মহকুমার মত সমস্ত অংশটাই সমভূমি। বিগত শতাব্দীতে ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বর্দ্ধমান জেলায় ভয়ানক ম্যালেরিয়াতে প্রায় ৭ লক্ষ লোক মারা যায়, তার বেশির ভাগ লোক কালনা ও আউসগ্রামের ছিল। ফলে গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে পড়ে। কালনায মারা গিয়েছিল এক তৃতীয়াংশ লোক। সরকারী নথিপত্রে এই ম্যালেরিযার নাম দেওয়া হয়েছিল "Burdwan Fever"। এর একমাত্র কারণ হয়ত ছিল, গঙ্গার ভাঙন ও খাত পরিবর্তন। পরিত্যক্ত স্থান গঙ্গার স্রোতের বদলে মজে যাওয়া খালা-খন্দে পরিণত হয় ও জমা জল পচে মশককুলের উৎপত্তি

কালনার উৎপন্ন ফসল ধান। কিন্তু গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে পাট এখন অন্যতম সম্পদ। এছাড়া রবিশস্য তো আছেই। কালনা মহকুমার গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলেব তাঁত বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি বঙ্গ জোড়া। একসময় তসর ও খান্দসারী চিনি বা ভুঁরো উৎপন্নের খ্যাতি ছিল—সে সব এখন কেবলই গল্প। যোগাযোগের মাধ্যম জলপথ,. রেলপথ ও সড়ক। ব্যাণ্ডেল থেকে বড় সড়ক পথ কালনা হয়ে কাটোয়া গেছে। বর্দ্ধমান থেকে কালনা পর্যন্ত ৪৫ কিমি দূরত্বের সবটাই প্রাচীন আঁকাবাঁকা সড়ক পথ, জি, টি, রোড ধরে বৈঁচি হয়ে যাওয়া যায় কালনা। উন্নত কৃষি কার্যের জন্য বড় বড় গ্রামগুলি সড়কপথের উপর গড়ে উঠেছে—গঞ্জ ও বাণিজ্য কেন্দ্র। কালনা মিষ্টান্ন 'নোড়া পান্তুয়ার' জন্য বিখ্যাত। নোড়ার মত আকৃতি বলে নাম 'নোড়া পান্তুয়া'। গায়ের রং আরশুলা বর্ণ—বাইরের আবরণ খুব শক্ত কিন্তু পাতলা। ভিতরে ছানার জালি রসে ভর্তি থাকে। কামড়ালে পিচকিরির মত রস ছিটকে যাবে। এই মিষ্টি এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে।

কালনার নিকটবর্তী নাখুন্দ গ্রামে বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক এ অধ্যক্ষ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

অকাল পৌষ গ্রামে ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে বিখ্যাত চিত্র পরিচালক দেবকীকুমার বসু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনে মহাত্মাগান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিউথিয়েটার্স ষ্টুডিও তে গৃহীত চিত্র গুলির মধ্যে–'চণ্ডীদাস', 'পুরাণভকত', সীতা, 'সাগরসঙ্গমে', 'অপরাধ' উল্লেখযোগ্য। তিনি পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত হন। এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন স্বদেশী আন্দোলনের পুরোহিত অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ। ১৯০৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'লে জাতীয় শিক্ষাপরিষদে তিনি যোগদান করেন।

॥ কালনা শহর ॥

কালনা শহর বেশ প্রাচীন। ঘিঞ্জি ও অপ্রশস্ত রাস্তায় ভর্তি। ভাগীরথীর তীরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা এপ্রিল কালনা পৌরসভার পত্তন হয়। তখন লোকসংখ্যা ছিল মাত্র ৮,৬০৩ বৰ্দ্ধমান গেজেটিয়ার রয়েছে, জন্মলগ্নে কালনা পৌরসভার কমিশনার ছিলেন ১৪ জন, ১৪টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ১৪জন কমিশনার নির্বাচিত হন। ৩জন মনোনীত প্রতিনিধি। বর্ত্তমানে পুরসভা এলাকার আয়তন ৩৫.১০৪ বর্গ কিমি, মহকুমা আদালত ও জেল ছিল। জেলে মাত্র ১৪জন বন্দীর থাকার ব্যাবস্থা ছিল।

প্রাচীনকালে কালনা বড় বন্দর ছিল। জলপথে ব্যবসা বাণিজ্য হত দিনে রাতে। Rev. James Long তাঁর On the banks of Bhagirati. (Calcutta Review 1846) গ্রন্থে বলেছেন, Kalna is noted for its great trade, being the port of Burdwan District the bazar has 1000 shops, the houses are chiefly of bricks. গঙ্গায় ক্রমাগত পলি পড়ে এখন মজে গেছে। তাই কালনা প্রাচীন হলেও আর বাড়তে পারেনি। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে জনসংখ্যা ছিল ৮,১২১, বর্তমানে লোকসংখ্যা ৩৫ হাজার ২৩ জন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে কালনার গুরুত্ব অপরিসীম। জেলায় আরও দুটি কালনা থাকায় শহর কালনাকে 'অম্বিকা কালনা' নামে অভিহিত করা হয়। দেবী অম্বিকার নামেই কালনার পরিচিতি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাঢ়দেশ ভ্রমণের সময় কালনায় যেখানে পদধূলি দিয়েছিলেন সেই স্থান আজ 'মহাপ্রভুতলা' নামে খ্যাত। কালনা শহরে গঙ্গার তীরে ছিল বৰ্দ্ধমান মহারাজাদের অবসর বিনোদনের স্থান। তাই কালনায় বৰ্দ্ধমান রাজার বাড়ি আছে এবং বহু দেবদেবীর মন্দির আছে। লালজী মন্দির কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির, গোপাল মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, ১০৮ শিবমন্দির, প্রতাপেশ্বর দেউল ও জগন্নাথ মন্দির উল্লেখযোগ্য।

অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী। রাজা চিত্রসেন রায় বর্তমান মন্দিরটি তৈরী

করেন ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দে। বৰ্দ্ধমান মহারাজার লালজীর মন্দির দেখবার মত- ২৫ দেউল বিশিষ্ট। বৰ্দ্ধমান রাজ জগৎরাম রায়ের স্ত্রী রাণী বিষণকুমারী দেবী ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। সারা ভারতে এই ধরণের ২৫ চূড়ার মন্দির



লালজী মন্দির

আর নেই। বিষ্ণুপুরের স্থপতিরা এই মন্দির করেন। মন্দিরের গায়ে অসংখ্য টেরাকোটার কাজ অবাক্ বিস্ময়ে দেখতে হয়। এখানে দর্শনীয় ২৫ দেউলের মন্দির আরও দুটি রয়েছে। একটি গোপাল মন্দির, অন্যটি কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির। কীর্তিচন্দ এই মন্দির দুটি নির্মাণ করেন। মন্দির দুটির গায়েও টেরাকোটার কাজ স্থাপত্য শিল্পের বিস্ময়। এখানেও ১০৮ শিবমন্দির আছে বৰ্দ্ধমান নবাবহাটের আদলে। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ তেজচন্দ এটি নির্মাণ করেন। এককেন্দ্রিক বৃত্তকারে সাজানো মন্দিরগুলির ভিতরে রয়েছে পর্যায়ক্রমে সাদা ও কালো শিবলিঙ্গ- বাইরের বৃত্তে ৭৪টি, ভিতরের বৃত্তে রয়েছে ৩৪টি মন্দির, কালনার সবচেয়ে দর্শনীয় স্থাপত্য শিল্পে অনন্য মন্দিরটি হল প্রতাপেশ্বর দেউল। রাজা প্রতাপচন্দের স্ত্রী পিয়ারী কুমারী স্বামীর স্মরণে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজে ভরা। পুরাকীর্তির অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে মন্দিরগুলি। এছাড়া শহরে রয়েছে দেবী মহিষ-মর্দিনী, বদর সাহেব পীর,— হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির যেন মিলন মেলা এই কালনা। কালনা রেলষ্টেশন আছে এবং যাতায়াতের জন্য এক্সপ্রেস বাস সার্ভিস কালনাকে বৰ্দ্ধমানের কোলে

টেনে এনেছে। দত্ত-দেড়িয়াটোন গ্রাম স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি হিসাবে বিখ্যাত। 'পল্লবাসী পত্রিকার (১৮৯৬ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পণ্ডিত গোপেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস কালনায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অম্বিকা কালনায় জন্মগ্রহণ করেন পণ্ডিত কালিদাস সার্বভৌম। তিনি মনু এবং মিতাক্ষরার অনুবাদক ও ভাষ্যকার। পাতিলপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন কবি ও বর্দ্ধমান সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। তিনি পরবর্তী কালে উখরার বাসিন্দা হন।

॥ **কালনা ১ ও ২ ব্লক** ॥

কালনা—১ ব্লকের আয়তন ১৬৫.৪৮ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৯, ১৩৯টি গ্রাম ও ১০১টি মৌজা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ব্লক। লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ২১ হাজার ৮২ জন।

কালনা—২ ব্লকের আয়তন ১৮৫.৩২ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৮; ১৪৪টি গ্রাম ও ১৩৩টি মৌজা নিয়ে ২নং ব্লক। লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৪ হাজার ৪৩১ জন। সেচ খাল না থাকায় নদীর জল উত্তোলন প্রকল্প ও গভীর-অগভীর নলকূপ প্রকল্পে ভালো সেচের কাজ হয়। তাতে তিনটি ফসল সহজেই পাওয়া যায়, আমন ও বোরোর উৎপাদন বেশ ভালই। কালনা শহর থেকে দেড় কি, মি পূর্বে এই ব্লকের সদর দপ্তর। ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেলপথ এই ব্লকের উপর দিয়ে গেছে। যাতায়াতের সড়ক পথ ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া, বর্দ্ধমান-কালনা (ভায়া ধাত্রীগ্রাম), বর্দ্ধমান-বৈঞ্চি ষ্টেশন।

অন্যতম বৈষ্ণবপীঠ বাঘনাপাড়া এই ব্লকের একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া ব্রডগেজ রেলপথ একটি ষ্টেশন বাঘনাপাড়া। বাঘনাপাড়া বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র বা সাধন পীঠ। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্ত্রী জাহ্নবীদেবীর শিষ্য আচার্য রামচন্দ্র গোস্বামী বাঘনাপাড়ায় "বলরাম- কৃষ্ণের " মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীরামচন্দ্রের তপস্যার ফলে এই অঞ্চল ব্যাঘ্র শূন্য হয়ে যায়, তাই স্থানের নাম বাঘ-না-পাড়া হয়— এইরকমই প্রবাদ আছে। এখানের গোপীশ্বর মন্দির বিখ্যাত (গ্রাম দেবতা ও মেলা দ্রষ্টব্য)।

কালনা থানা এলাকার দক্ষিণাংশ নিয়ে কালনা ২ ব্লক আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও শতাধিক গ্রাম নিয়ে এই ব্লক। নবদ্বীপ ও নদীয়ার বৈষ্ণব প্রভাবের গভীর ছাপ আছে এই সব গ্রামগুলিতে। এখানেও ফসল তোলা হয় গভীর ও অগভীর নলকূপে সেচের মাধ্যমে। ধান, গম, সরিষা, আলু প্রধান শস্য। বেহুলা ও মনসা এখানে বিভিন্ন জায়গায় সমানভাবে পূজিতা। বেহুলা বা গাঙ্গুর নদীর ক্ষীণ স্রোত বহে গেছে ব্লকের উপর দিয়ে।

এই ব্লকের প্রতিষ্ঠিত গ্রাম বৈদ্যপুর। এখানে "বৈদ্য রাজা" সেন বংশীয়রা রাজত্ব করতেন দ্বাদশ শতাব্দীর পরে ও খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কিঙ্কর মাধব সেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (১৭শ শতাব্দী) মনসার ভাসানে বেহুলার যাত্রাপথে বৈদ্যপুরের উল্লেখ করেছেন। এখানে এক বৈদ্য বেহুলাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলেও বৈদ্যপুরের উল্লেখ আছে। বৈদ্যপুরের রথের মেলা সর্ব্বজনবিদিত। রাজ রাজেশ্বর ও বৃন্দাবন দেবতার উৎসব– রাস, পঞ্চমদোল ও রথযাত্রা বিখ্যাত। গ্রামে প্রচুর পুরাতন জীর্ণ প্রাসাদ-এর ধ্বংসাবশেষ এবং মন্দির প্রমাণ করে গ্রামটি খুব প্রাচীন। বর্তমানে বৈদ্যপুর একটি বড় গঞ্জ, হাট-বাজার ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বেচা কেনা হয়। বৈদ্যপুর উচ্চ বিদ্যালয়টিও প্রাচীন। জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শিক্ষাব্রতী জিতেন্দ্রনাথ মিত্র এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী ও জননেতা আব্দুস সাত্তার এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বৈঞ্চির নিকটবর্তী টোলা গ্রামে জননেতা আব্দুস সাত্তার জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে বৈদ্যপুর পাদপ্রদীপে উঠে আসে। এখানে ব্লক অফিস, ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত সমিতির অফিস রয়েছে। লোকসংখ্যা পাঁচ হাজার।

কিঙ্কর মাধব সেন ছিলেন সামন্তরাজা। মীরহাট-পাতিলপাড়া-বৈদ্যপুর ও নারকেলডাঙ্গা জুড়ে ছিল তাঁর রাজ্যপাট। রাজত্ব ছিল আরও বিস্তৃত। বৈদ্যপুর থেকে দু মাইল পূর্ব্বে সেনের ডাঙ্গায় ছিল মূল প্রাসাদ, পশ্চিমে সেনের ডাঙ্গা ও দক্ষিণে গড়ের ডাঙ্গা ছিল দুর্গ, রাজডাঙ্গা ছিল রাজ্যসভা, নস্করদীঘি ছিল সৈন্যদের ছাউনী বা আবাস। অন্তঃপুরে পুষ্করিণী ছিল রাজঅন্তঃপুরবাসিনীদের স্নানাগার। (কিঙ্কর মাধব সেন– হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য।)

কালনা শহর হ'তে দু মাইল দূরে কালনা-পাণ্ডুয়া রাস্তার উপর অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম একচাকা। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মভূমি। একচাকা গ্রামেই বৈষ্ণব কীর্তনীয়াদের খোলের উৎপত্তি। কথিত আছে চৈতন্যভক্ত রাধাবিনোদ দাস একচাকার এঁটেল মাটি ও গঙ্গামাটি মিশিয়ে বাদ্যযন্ত্র 'খোল' প্রস্তুত করেন। এখানে একসময় তাম্র শিল্পের প্রসার লাভ ক'রেছিল।

কালনা থানার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম গোপালদাসপুর। বৈদ্যপুর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে। এই গ্রামের বিখ্যাত দেবতা "কৃষ্ণ-গোপালের" নাম থেকেই গ্রামের নাম "গোপালদাসপুর"। বৈষ্ণবধর্মের প্রবাহ এই গ্রামকেও সর্বতোভাবে প্লাবিত করেছিল–দেবতা 'রাখালরাজের' বিভিন্ন অনুষ্ঠান সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আর্যেতর সংস্কৃতির দাপটও এই ব্লকের নারকেলডাঙ্গা ও উদয়পুর গ্রামে লক্ষ্য

করা যায়। নারকেলডাঙ্গার দেবী "জগৎগৌরী" হলেন দুর্গা ও মনসার মিশ্রিত মূর্তি। মধ্যযুগের মঙ্গলকবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের লেখায় মনসার ভাসানে নারকেলডাঙ্গায় 'বেহুলার' মনসা পূজার উল্লেখ আছে। মনসার ভাসান এখনও এখানকার শ্রেষ্ঠ উৎসব। পাশেই উদয়পুরে 'বেহুলা' নিজেই দেবী হিসাবে পূজিতা হচ্ছেন। পূজা করেন বাগ্দীরা, কিন্তু জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব জাতিই পূজা দেন, মানত করেন। পরবর্তী কালে মুসলমান অধিকাবেব পর মুসলমান সংস্কৃতির কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে 'বোহার'। এখানে আববি ও ফারসি শিক্ষাব জন্য আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু দূরদূরান্ত থেকে মুসলমান ছাত্রগণ জ্ঞান লাভের জন্য এখানে আসতেন। তার ধ্বংসাবশেষ আজিও বিদ্যমান। দুষ্প্রাপ্য বহু পুঁথি ও গ্রন্থ বর্তমান ন্যাশন্যাল লাইব্রেবীতে স্থানান্তরিত হযেছে।

॥ পূর্ব্বস্থলী ১ ও ২ ব্লক ॥

পূর্বস্থলী ১ ব্লকের আযতন ১৫৫.৪০ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চাযেতের সংখ্যা ৭ ও ১৫৪টি গ্রাম এবং ১০০টি মৌজা নিয়ে এই ব্লক গঠিত। লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১৩ হাজাব ২২৫। পূর্বস্থলী ২ ব্লকের আয়তন ১৯১.৬৬ বর্গকিলোমিটার, ১০টি গ্রাম পঞ্চাযেত ও ১৩০টি গ্রাম ও ৯০টি মৌজা নিয়ে গঠিত। লোক সংখ্যা ১ লক্ষ ২২ হাজার ৪০২। বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব প্রান্তে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লক। উভয় ব্লকেরই এক চতুর্থাংশ তপশীলি জাতি ও উপজাতি। গঙ্গার অববাহিকায় এই ব্লকের মাটি খুবই উর্ব্বরা। প্রায় ২০টি নদী সেচ প্রকল্প ও ৫৩টি গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ প্রকল্পেব ব্যবস্থা আছে। উৎপন্ন শস্য মূলতঃ ধান হলেও গম, সরিষা, আলু, পাট, প্রচুর হয়। এক সময় গঙ্গা প্রায়ই প্লাবিত করত এই ব্লককে, এখন চড়া পড়ে গঙ্গা পূর্বদিকে বহে চলেছে। নবদ্বীপ এখান থেকে পাঁচ মাইল, তাই বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগে আছে সর্বত্র। গঙ্গার অববাহিকা বলে বায়ু আর্দ্র, তাই গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে গড়ে উঠেছে তাঁত শিল্প—যা বহু মানুষের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছে।

গ্রাম পূর্বস্থলী খুবই প্রাচীন। সংস্কৃত ও দর্শন চর্চার খ্যাতি ছিল প্রাক চৈতন্য যুগ থেকে। সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন এই পূর্বস্থলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', 'বেদান্ত পরিভাষা,' 'মীমাংসা ন্যায় প্রকাশ', 'সংখ্যাতত্ত্ব কৌমুদী', 'স্মৃতিসিদ্ধান্ত' উল্লেখযোগ্য। চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত, তাঁর পৌত্র কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ১৭৭১ শকাব্দে এই গ্রামেই শ্যামাদাস বাচস্পতির জন্ম। কাশীতে মহাত্মা গঙ্গাধরের সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র পণ্ডিত পরেশনাথের কাছে শাস্ত্র শিক্ষা করেন তিনি। অদ্বিতীয় নাড়ী-জ্ঞানী বলে তিনি পরিচিত হন এবং 'শ্যামাদাস

বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেন। বৰ্দ্ধমান মহারাজার প্রথম দেওয়ান ও কবিসাধক রঘুনাথ রায় এই গ্রামের অধিবাসী। তাহার লিখিত প্রথম চর্যাপদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তাঁর বসতবাড়ি এখন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন।

১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে সরডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কর্তা ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

পাটুলী একটি প্রাচীন সংস্কৃতি প্রধান গ্রাম, গঙ্গার তীরে অবস্থিত। পূর্বে বিস্তীর্ণ ইন্দ্রানী পরগণার অন্তর্গত ছিল এই পাটুলী। এখানে গঙ্গা উত্তরবাহিনী, সে জন্য মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নানের মেলা বসে। নীলকুঠি ও রাজবাড়ির জৌলুষ ছিল এককালে। চৈতন্য পার্ষদ বংশীবদন গোস্বামীর জন্মভূমি। দাশুরায় পাটুলিতে পাঁচালী গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এখানকার লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির বিখ্যাত। পাটুলীতে গঙ্গাস্নান করে জামালপুরের বুড়োরাজদর্শনে ভক্তগণ যাত্রা করতেন।

এককালে সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল পাটুলী। ব্লকের সদর দপ্তর এই গ্রামে অবস্থিত। কথিত আছে মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দি খাঁর রাজত্বকালে পাটুলীতে নৃসিংহ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ব্লক অফিসের পাশেই একটি বিরাট ঢিবি আছে, এটি খনন করলে অনেক প্রত্ন সম্পদ পাওয়া যেতে পারে। এখানে কাঠ খোদাই করে দারুমূর্তি তৈরীতে শিল্পীদের খ্যাতি আছে। কিন্তু বর্তমানে সবটাই অবলুপ্তির পথে। ডাঙ্গার তীরবর্তী জামালপুর অঞ্চলে "বুড়োরাজ" প্রাচীন শিব। বহু দূরদূরান্ত থেকে শিবের কাছে মানত দিতে আসেন অগণিত ভক্তের দল। জামালপুরের বুড়োবাজ বৌদ্ধ সংস্কৃতির ফলশ্রুতি, কারণ বৈশাখের বুদ্ধপূর্ণিমায় বিরাট মেলা হয়। শিব, কিন্তু পাঁচ ছয়শ পাঁঠা বলি হয়। ধাত্রীগ্রাম কালনা ১ নং ব্লকের একটি বড় গঞ্জ ও বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে প্রচুর তাঁত শিল্প গড়ে উঠেছে। ধাত্রীগ্রামের পাশ দিয়ে একটি সড়ক কাটোয়া হয়ে কালনা প্রবেশ করেছে। ধাত্রীগ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে ও ব্যাণ্ডেল কাটোয়া রেল লাইনের একটি ষ্টেশন। এখান থেকে গঙ্গা তীর অঞ্চল খুব কাছে। গঙ্গার পলি মাটিতে রবিশস্য খুবই ভাল হয়। সমুদ্রগড় পূর্বস্থলী ব্লকের একটি গঞ্জ। বুনো রামনাথের জন্মস্থান এই গ্রামে। কথিত আছে রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে রাজত্ব করতেন। কিন্তু তার কোন ঐতিহাসিক সত্যতা পাওয়া যায় না। পূর্বস্থলী ব্লকের চকবামন গড়িয়ায় জন্মগ্রহণ করেন বেদের বাংলা অনুবাদকার দুর্গাদাস লাহিড়ী।

খড়ি নদীর মোহানায় নাদনঘাট একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ও গঞ্জ। বন্যায় প্রায়ই নাদনঘাট প্লাবিত হয়। এখানে বিরাট বাজার বসে সকালে বিকালে। যেহেতু গঙ্গা অতিক্রম করলেই নদীয়া সেজন্য চাল ও পাটের একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্র হল এই নাদনঘাট। ছেলেদের ও মেয়েদের দুটি পৃথক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে।

নাদনঘাট প্রবেশের আগেই খড়ি নদীর উপর সেতু হয়েছে– কৃষক সেতু। খড়ির অপর তীরে মনোরম ও প্রাকৃতিক পরিবেশে জেলা পরিষদের ডাকবাঙলো। এককালে খড়ির চিংড়ি মাছ ছিল বিখ্যাত। বড় বড় লালরঙের চিংড়ি দেশে-বিদেশে চালান যেত। সম্ভবত নদীর মাঝে বাঁধ দেওয়ায় এবং সেচের কাজে জল তুলে নেওয়ায় সেই চিংড়ি আর হয় না। খড়ির দুপাশে জল-উত্তোলক সেচ ব্যবস্থায় বহু রকমের চাষ হয়। নাদনঘাটে বড় বড় পাকা বিল্ডিং দেখে অনেকেই মনে করতে পারেন যে এখানে পৌরসভা চালু হয়েছে। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

॥ মন্তেশ্বর ব্লক ॥

মন্তেশ্বর ব্লক বিশাল সমৃদ্ধশালী ব্লক। ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১৭৩টি গ্রাম নিয়ে ১৪৪টি মৌজা সমন্বিত এই ব্লকের আয়তন ৩০৫.৪০ বর্গকিলোমিটার। গ্রামের সংখ্যা ১৭৭টি, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৭ জন। ব্লকের সদরদপ্তর মন্তেশ্বর গ্রামে অবস্থিত।

সমৃদ্ধ গ্রামের মধ্যে রয়েছে মালম্বা বড় গঞ্জ ও বাসষ্ট্যাণ্ড, কুসুমগ্রাম একটি প্রাচীন মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। বহু প্রাচীন মসজিদ তার সাক্ষী। কুসুমগ্রাম থেকে নাদনঘাট, মন্তেশ্বর, মালডাঙ্গা, সাতগেছিয়া সড়কপথ চলে গেছে। প্রতিদিন এই কুসুমগ্রাম চৌরাস্তায় হাট বাজার বসে। দৈনিক কয়েক হাজার লোক ব্যবসাকেন্দ্রে কেনাবেচা করতে আসে। ব্লক অফিস মন্তেশ্বরে অবস্থিত। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, সেচ অফিস, পঞ্চায়েত অফিস আছে। সম্প্রতি ডঃ গৌরমোহন রায় কলেজ স্থাপিত হয়েছে। মালডাঙ্গাও একটি গঞ্জ ও বাসষ্ট্যাণ্ড। কে. মল্লিক নামে খ্যাত বিখ্যাত গজল গায়ক খোদা বক্স মল্লিক কুসুমগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গুলিটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতাসংগ্রামী ও কংগ্রেস নেতা নারায়ণ চৌধুরী। চৈতন্যপুর তাঁর পৈত্রিক গ্রাম; বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও জননেতা কমরেড বিনয় চৌধুরীর জন্মস্থান শিহি গ্রামে। শুশুনিয়া একটি প্রাচীন গ্রাম– এই ব্লকের সংস্কৃতির পীঠস্থান। গ্রামের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী তারাখ্যা– পালযুগের মূর্তি। গোয়ালা, মুসলমান ও উগ্রক্ষত্রিয়ই প্রধান। কুলুটে হোসেন শাহের প্রাচীন মসজিদ বিখ্যাত।

দেনুড় একটি প্রাচীন গ্রাম । শ্রীচৈতন্যের দীক্ষাগুরু কেশব ভারতী এখানে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাসের জন্মভূমি ও এইদেনুড়। মন্তেশ্বরের খেড়ুর গ্রামে বাস ছিল বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ নবাই ময়রার। প্রথম জীবনে তিনি মালডাঙ্গার হাটে মাসিক তিন টাকা বেতনে চাকুরী করতেন। পরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমান কালের যাত্রা পালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের বাস এই ব্লকে।

প্রতি বৎসর মাঘীশুক্লা ভৈমী একাদশীতে ভারতীপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষ্যে দেনুড়ে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ উৎসব হয়। 'রত্ন' পত্রাষ্টক কাব্য ও বঙ্গ গ্রন্থের লেখক অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

।। দুর্গাপুর মহকুমা ।।

চারটি ব্লক নিয়ে গঠিত দুর্গাপুর মহকুমা: ১) গলসী-১, ২) ফরিদপুর ব্লক, ৩) অণ্ডাল ব্লক ও ৪) কাঁকসা ব্লক। এছাড়া রয়েছে দুর্গাপুর নোটিফায়েড এলাকা। কাঁকসা বাদে বাকী সবটাই শিল্পাঞ্চল, তাই শহরের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। দুর্গাপুর এককালে জঙ্গল ও পাথুরে টিলায় ভর্তি ছিল। ডঃ বিধান চন্দ্র রায় এই শিল্পনগরী গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ সহযোগিতায় তৈরী হয়েছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, মিশ্র ইস্পাত কারখানা দুর্গাপুর, প্রোজেক্ট লিমিটেড, এম. এ. এম. সি কারখানা, দুর্গাপুর কেমিকেলস, এফ. সি. আই কারখানা, দুর্গাপুর সিমেন্ট কারখানা, দুর্গাপুর ডেয়ারী, দুর্গাপুর কোকওভেন, ভারত অপথ্যালমিক গ্লাস লিমিটেড, দুর্গাপুর গ্যাস কার্বন প্রভৃতি। স্বাধীনতার পরবর্তী পরিকল্পনা মাফিক এই আধুনিক শহর গড়ে উঠেছে, তাই এব রাস্তা খুব প্রশস্ত, মাঝে মাঝে পার্ক, উদ্যান ও গাছ-গাছালির সমারোহ। পুরাতন দুর্গাপুর বেনাচিতি খুব ঘিঞ্জি ও বিবর্ণ। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনানুযায়ী গড়ে উঠেছে সেচ ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা, যার নাম ডি. ভি. সি। দামোদরে গড়ে উঠেছে–দুর্গাপুব ব্যারাজ, বৃহৎ সেচপরিকল্পনা। উৎপন্ন হচ্ছে ষাটহাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ–এই বিদ্যুতে কোকচুল্লী চলছে। এই কোকচুল্লী থেকে গ্যাস, তাপবিদ্যুৎ, আলকাতবা, তরল এমোনিযা, সালফিউরিক এ্যাসিড, বেঞ্জিন, টলুইন প্রভৃতি উৎপন্ন হচ্ছে। ভারত সরকার গড়ে তুলেছেন ইস্পাত কারখানা।

দুর্গাপুরের জলবায়ু শুষ্ক, গ্রীষ্মে প্রচণ্ড উত্তাপ কখনও কখনও ৪৫° ডিগ্রি সেলসিয়াস উঠে যায়, সে সময় জলের কষ্ট হয় খুব। শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাধীনতার আগেও দুর্গাপুরের জঙ্গলের সঙ্গে বিহার জঙ্গলের যোগ ছিল। ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের উপদ্রব ছিল। এখন দুর্গাপুরের কারখানা গুলিতে তিন শিফটে কাজ চলে। তাই প্রচুর লোক এসে বসত করেছেন। শধু বর্দ্ধমানের নয় সারা ভারতের ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, কারিগরি কর্মী সরকারী অফিসার, অধ্যাপক, শিক্ষক, ম্যানেজার ভারতের প্রায় সব প্রদেশ থেকে এখানে আসায় দুর্গাপুর একটা কসমোপলিটন শহরের রূপ নিয়েছে। ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারা মিশে দুর্গাপুর এক মিশ্র সঙ্কর সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে।

ব্লকগুলির মধ্যে কাঁকসা ও অণ্ডালে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে অনেক। গলসী ১নং ব্লকের সন্নিকট কাঁকসা ব্লকের অধীন ভরতপুরের স্তূপ প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

গলসী—১ ব্লক

আয়তন ২৯২.২৭ বর্গ কিলোমিটার, গ্রামপঞ্চায়েতের সংখ্যা ৯, গ্রামের সংখ্যা ৯৪ এবং মৌজার সংখ্যা ৮০, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০৫ জন। বর্দ্ধমান শহর থেকে ৩৭ কিমি পশ্চিমে গলসী ১নং এর সদর দপ্তর বুদবুদ জি, টি, রোডের উপরই অবস্থিত, বেশ বড় গঞ্জ ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গলসী ব্লক ধান উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ, কারণ সেচ এলাকায় ক্যানেলের জলে বোরো ও আমন দুটি ফসলই ভাল হয়। সদগোপ রাজাদের অধীনে ছিল গলসী ১ নং ব্লক। এই রাজ্যকে বলা হত গোপভূমি। বুদবুদেই গলসী ১নং ব্লক অফিস, পুলিশ থানা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পূর্তবিভাগ ও জেলা পরিষদের ইন্সপেকশন বাঙলো, ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি, ডাকঘর, সিনেমাহল, রেলষ্টেশন, অটো পার্টসের বহু দোকান আছে। ব্লকের মধ্যে দিয়ে রেলপথ ও জি, টি, রোড চলে গেছে।

এই ব্লকের ঐতিহ্য অনুসারী গ্রাম মাড়ো। মানকর ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে কয়েক মিনিটের রাস্তা গেলেই মাড়োতে পৌছাতে হয়। বর্দ্ধমান জেলার সংস্কৃতি অনুসারেই এই গ্রাম ধর্মরাজ, চণ্ডী ও মনসা পূজিতা হন। এছাড়াও আছেন মহাপ্রভু ও খণ্ডেশ্বরী। প্রায় প্রত্যেক মন্দিরের সঙ্গে রয়েছে 'নাটমন্দির'। আচার্য রঘুনন্দন গোস্বামী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে রঘুনন্দন ছিলেন শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী মনীষী। অ্যাডাম ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এক রিপোর্টে লিখেছেন: "The most voluminous native author I have met with Sri Raghunandan Goswami dwelling at Maro." বস্তুতঃ রঘুনন্দন শিরোমণির মত নৈয়ায়িক সে সময় বিরল ছিল। রঘুনন্দন শিরোমণির রচিত গ্রন্থের সঠিক হিসাবে কেউ বলতে পারেন না। কিন্তু অ্যাডাম সাহেবের তালিকা থেকে দেখা যায় গ্রন্থের সংখ্যা ৩৭, এর মধ্যে পঁয়ত্রিশটি সংস্কৃত ও দুটি বাংলায় লেখা। সংস্কৃত বইগুলির মধ্যে 'ছন্দোমঞ্জরীর টিকা', 'সদাচার নির্ণয়', 'রোগার্ণবতারিণী', 'লেখ দর্পন', 'প্রামাণ্যবাদ' 'চিন্তামণি দীধিতি', 'পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ' বিখ্যাত। বাঙলায় লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'রামরসায়ণ' পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে 'মাড়ো' এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম 'মানকর'ছিল বিদ্যাচর্চ্চার অন্যতম পীঠস্থান। উনবিংশ শতক পর্যন্ত হিতলাল মিশ্রের সময় অবধি এই ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। ১৮৬২ খ্রীঃএর ভয়াবহ মহামারী ও ১৮৬৬ খ্রীঃএর দুর্ভিক্ষে এই এলাকা প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে আবার গ্রাম সমাজ জেগে উঠেছে বটে, কিন্তু প্রাচীন বিদ্যাকেন্দ্রগুলি স্তিমিত হয়ে যায়। 'মানকর' একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ গ্রাম। কিছু সময় ধরে মানকর গোপরাজাদের রাজধানী ছিল— ইতঃস্তত

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট ইঁটের ভগ্নস্তূপ সে কথাই প্রমাণ করে। গ্রামে মানিকেশ্বর, মল্লিকেশ্বর ও বুড়োশিব নামে তিনটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ রায়ের দীক্ষা গুরু ভক্তপালের স্মরণে এই মন্দিরগুলি স্থাপিত হয়। মানকরে জন্মগ্রহণ করেন রামানন্দ গোস্বামী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন শাক্ত সন্ন্যাসী। গ্রামের উত্তর প্রান্তে মহাশ্মশানে বড়কালীর মূর্তি স্থাপনা করে তিনি পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনভজন করতেন। পরবর্তীকালে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হন এবং রাধাবল্লভজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লেখা বাংলায় গ্রন্থ 'রামতত্ত্ব' বহু আলোচিত ও সমাদৃত গ্রন্থ। গ্রামের বর্ষীয়ান লোকেরা দাবি করেন, এই গ্রামে অজ্ঞাতবাস কালে পঞ্চপাণ্ডব এসেছিলেন। একটি বিশাল বটগাছের তলায় একটি ভাঙ্গা মন্দিরে পঞ্চপাণ্ডবের পাথরে খোদাই করা পঞ্চমূর্তি তারই স্মৃতি। শোনা যায় তন্ত্রসাধনার পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করতে কবি চণ্ডীদাস ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই গ্রামে এসেছিলেন। কিন্তু তার কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মানকরের পাশেই মল্লিকপাড়া গ্রাম। এখানকার জমিদার কবিরাজ বংশ বর্দ্ধমান রাজপরিবারের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। মানকর, মল্লিকপাড়া, কোটায ভাল তাঁতবস্ত্র উৎপন্ন হত। বেনারসী, চেলী, তসর, মুগার বস্ত্র দেশ বিদেশে রপ্তানী হত। মানকরের বিখ্যাত মিষ্টান্ন 'কদমা' ও 'তিলে-খাজা' আজ ও অনেকেরই জিহ্বা রসালো করে। কোটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও পণ্ডিত রূপমঞ্জরী। মানকরে ষ্টেশন, কলেজ, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর পুলিশ চৌকী, সমবায় ব্যাঙ্ক, সিনেমা, দৈনিক বাজার ও বহু দোকান-পাট রয়েছে।

।। কাঁকসা ব্লক ।।

আয়তন ২৮২.৯০ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৭ এবং ৯১টি গ্রাম ও ৯১টি মৌজা নিয়ে এই ব্লক। লোকসংখ্যা অন্যান্য ব্লকের তুলনায় অল্প, ৯৬ হাজার ৮শত ৯৩। তারমধ্যে তপশীলি জাতি ৩৯ হাজার এবং উপজাতি ৯ হাজার, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। সে জন্য স্বভাবতঃই খুব অনুন্নত ও দরিদ্র ব্লক। কঙ্কেশ্বর শিব নাম থেকে কাঁকসা অপভ্রংশিত হয়েছে। মাটি লাল রুক্ষ, পাথুরে ও অনাবাদী। বিশাল জঙ্গল বীরভূম জেলার ইলামবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত। যার জন্য এই এলাকার নামই হয়ে গেছে 'জঙ্গলমহল' এলাকা। শাল পিয়ালই বেশি। নকশাল আন্দোলনের সময় এই জঙ্গল মহলেই আশ্রয় সন্ত্রাসবাদীরা। বীরভূম জেলার সীমারেখা টেনেছে এই ব্লক। একদিকে বীরভুম, অন্যদিকে বাঁকুড়া। কিন্তু বীরভূম জেলার কৃষ্টিই আধিপত্য বিস্তার করেছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলে গেছে পানাগড় ইলাম বাজার রাস্তা। জঙ্গলের

মধ্যে গ্রামগুলিতে যাতায়াতের জন্য বহু সড়ক তৈরী হয়েছে, ফলে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি অনেক কমে গেছে। যেহেতু লাল কাঁকুরে মোরাং মাটি সেহেতু সেচের জন্য বড় কূপ ও সেচখালের ব্যবস্থা করা হয়েছে— কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। একটি মাত্র ফসল ধান তাও আকাশ বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে—অনিশ্চিত দিন গুজরাণ ছাড়া পথ নেই। তাই কৃষক ও কৃষিজীবি মানুষ এখানে খুবই দরিদ্র।

পানাগড় রেলষ্টেশন থেকে আধ মাইল উত্তরে গেলে কাঁকসা গ্রাম পড়বে। প্রাক্তন গোপরাজগণ কাঁকসা ও সেনপাহাড়ী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। পূর্ব্বতন সেলিমপুর পরগণা অবধি গোপরাজ্য বিস্তৃত ছিল। রাজধানী ছিল ভরতপুর ও কঙ্কেশ্বর। গোপরাজাদের শেষ সময়ে সৈয়দ বোখারী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গোপরাজ্য আক্রমণ করেন ও কাঁকসার দুর্গ বিধ্বস্ত করেন। সৈয়দ বোখারীর বংশধরগণ এখনও কাঁকসায় আছেন ও তাদের জমি-জমার দলিল দস্তাবেজে এ সবের প্রমাণ মেলে। কাঁকসার জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট্ট দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এর নিকটেই জঙ্গলের মধ্যে একটি জলাশয় আছে। সেখান থেকে ব্যাসল্ট পাথরের তৈরী মূর্তি পাওয়া গেছে। পাঠান মুসলমানদের আক্রমণের পর বর্দ্ধমান মহারাজ চিত্রসেন রায় গোপভূমি অধিকার করেন ও কাঁকসা থেকে চার মাইল উত্তরে রাজগড়ে চিত্রসেন একটি দুর্গ তৈরী করেন ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ের স্মারক হিসাবে। দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে।

এই ব্লকের বিষ্ণুপুর গ্রাম থেকে ৫ কিমি দুরে বিখ্যাত শ্যামারূপার মন্দির। ইছাই ঘোষ এটি নির্মাণ করেন, এখন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। আড়রা শ্যামারূপার মন্দির থেকে পূর্ব্বদিকে প্রায় ৫ কিমি দূরত্বে বিশাল ইছাই ঘোষের দেউল। আড়রা গ্রামের সন্নিকটে আর একটি স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। আর একটি মনোরম গ্রাম হল ভরতপুর, এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ধর্মরাজ বিখ্যাত। ভরতপুরের স্তূপটি পুরাতত্ত্বের অমূল্য সম্পদও আমাদের ঐতিহ্যবাহী।

কাঁকসা গ্রামে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্লক অফিস, পঞ্চায়েত অফিস, আছে। পাশেই পানাগড় বাজারের মধ্য দিয়া জি, টি, রোড চলে গিয়েছে। পানাগড়ে মিলিটারী বেস আছে, রেলষ্টেশন, অটোপার্টসের দোকান, ভাঙ্গা-চোরা জীপ (সবই মিলিটারীদের নিলামে বিক্রি) সারিয়ে বিক্রি করার কেন্দ্র, বহু দোকানপাট, সিনেমা হাউস, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট ও লজ আছে। পানাগড় থেকেই সুরু হয় হিন্দি ভাষার আধিপত্য।

।। অণ্ডাল ব্লক ।।

আয়তন ১৮৪.৬৭ বর্গ কিলোমিটার, পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৪, গ্রামের সংখ্যা ৫৫ এবং মৌজের সংখ্যা ৫৫, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৮৯ হাজার৯৯০। বিস্তীর্ণ

এলাকায় রয়েছে কয়লা খনি— তাই শ্রমিক, কারিগর, ইঞ্জিনীয়ার বহু এসেছেন ভিন্ন প্রদেশ হতে, স্বভাবতঃই লোকসংখ্যার ঘনত্ব জেলার অন্য অংশের চাইতে বেশি। উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল জমি কৃষির অনুকূল নয়, কিন্তু ছোট বড় নানা ধরণের অসংখ্য কয়লা খনিতে এলাকাটি ভর্তি। কাঁচা কয়লার স্তূপ পুড়িয়ে কোক কয়লা করাব ধুম। কালো ধোঁয়া কালো মাটিতে জলের রঙও কালো হয়ে গেছে। মাটি খুঁড়লেই তাল তাল কয়লার চাঙড়। জোয়ান ছেলেরা কেউই বেকার নয়, সবাই এই কয়লার উপর নির্ভরশীল। এককালে এখানে ছিল বিরাট জঙ্গল। কালক্রমে সেই জঙ্গল মাটির তলায় চাপা পড়ে কালো কয়লায় পরিণত হয়েছে। মানুষ এখন সেখানে বসত করে মাটি খুঁড়ে সেই কালো মানিকের দৌলতে জীবনধারণ কবছে। যেহেতু মাটি পাথুরে তাই উৎপন্ন ফসলের উপর জীবিকা নির্ভরশীল নয়। এই ব্লকের উল্লেখযোগ্য গঞ্জ হল পান্ডবেশ্বর, অজয় নদের তীরে অবস্থিত।

অণ্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনের একটি ষ্টেশন এই পাণ্ডবেশ্বর। কথিত আছে যে, মাতা কুন্তি পঞ্চপাণ্ডব সহ অজ্ঞাতবাসের সময় এই গ্রামে এসেছিলেন এবং একচক্র ও বকাসুর নামে দুই রাক্ষসকে এখানেই মেরেছিলেন মধ্যম পাণ্ডব ভীম। এই দুই জায়গার নাম হল বীরচন্দ্রপুর ও বক্রেশ্বর—অজয়ের অপর তীরে বীরভূম জেলায় অবস্থিত এই দুটি গ্রাম। তাঁদের স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে রয়েছে পাণ্ডবেশ্বর শিব। পঞ্চভ্রাতা পাঁচটি ও মাতা কুন্তী একটি মোট ছটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই স্থানটি অত্যন্ত মনোরম, নির্জন—আম জাম, কাঁঠাল, তাল ও তমালের সজ্জা স্থানটিকে রমনীয় করেছে।

উখরা এই ব্লকের একটি সমৃদ্ধ গঞ্জ, শহরের রূপ নিয়েছে। এখানে দৈনিক হাটবাজার বসে—পার্শ্ববর্তী কোলিয়ারী থেকে অজস্র মানুষ বাজারে কেনাকাটা করতে আসেন। বহু ইঁটের ঘর-বাড়ী, ভাঙ্গা দেউল ইঁটের স্তূপ দেখে মনে হয় উখরা প্রাচীন শহর, এককালে সমৃদ্ধ ছিল, এখন প্রাক্তন উখরা এষ্টেটের কাছারী বাড়ী যেখানে রয়েছে, সেখানে এককালে বাংলার শাসনকর্তা শের আফগানের দুর্গ ছিল। এখনও একটি বিশাল পুকুর ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। শের আফগান স্থানীয় পাঠানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোগলদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। নিজের আত্মরক্ষার জন্যই উখরার দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন, এই দুর্গের অভ্যন্তরে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ ছিল বহু। উখরার জমিদার সিং রাজারা শের আফগানকে বহুভাবে সাহায্য করেছিলেন। শোনা যায় কুতুবউদ্দীন যখন বর্দ্ধমান আসেন তখন শের আফগান কন্যা লায়লী ও মেহেরউন্নিষাকে উখরার দুর্গে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে যান। পরে শের নিহত হলে এই গড় থেকে মেহেরউন্নিষা দিল্লীতে নিজ পিত্রালয়ে চলে যান। শের আফগানের স্মৃতি বিজড়িত উখরাকে তাই এখনও 'শের পরগনা' বলা হয়। উখরার পুরাতাত্ত্বিক খনন করলে অনেক প্রাচীন সভ্যতা বাঙময় হয়ে উবে। এখনও

বর্দ্ধমান রাজবংশের আত্মীয় স্বজন উখরার বাসিন্দা। বর্দ্ধমানের সঙ্গে উখরার একটি আত্মিক যোগ শের আফগানের আমল থেকেই।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত স্বামীভাস্করানন্দ সরস্বতী উখরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের সংস্কৃতে অনুবাদ। এই সংস্কৃতে অনুদিত কাব্যখানি মুদ্রিত করে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করেন।

উখরায় মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, বড় বড় আড়তদারী দোকান ও গদি, অটোপার্টসের দোকান রয়েছে। অণ্ডাল এলাকার বিখ্যাত মিষ্টান্ন 'অমৃতি' এখানকার কারিগরদের দ্বারা প্রস্তুত। জিলাপীর মত ঘোরানো ঘোরানো চারপাশে সুন্দর বিনুনী, মাঝে রস টুবটুব করে, কিন্তু বাইরেটা বেশ শক্ত, আরশোলা বর্ণ রঙ। কামড় দিলে ভিতরের রস পিচিকিরির মত ছুটবে। জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন শিল্প।

জি, টি, রোড অণ্ডালের মধ্যদিয়ে সোজা উত্তর পশ্চিমে চলে গেছে। মাঝে মাঝে জি, টি, রোডের উপরই গড়ে উঠেছে মোড় বা গঞ্জ। যেমন অণ্ডাল ষ্টেশন থেকে জি, টি, রোড অতিক্রম করে উখরা পর্যন্ত একটি রাস্তা গেছে। বহু মিনিবাস ও ট্যাক্সি অণ্ডাল ষ্টেশন থেকে উখরা হু হু করে ছুটে যায়। জি, টি, রোডের উপরই অণ্ডাল মোড়। এখানে বহু অটোপার্টসের দোকান, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট, ভলকানাইজিং কারখানা গড়ে উঠেছে। আর জি, টি, রোডের ধারে ধারে গড়ে উঠেছে পাঞ্জাবীদের খাবারের দোকান 'ধাবা'। সামনে বহু দড়ির খাটিয়া পাতা। ট্রাক ড্রাইভারগণ ক্লান্ত হলে এখানে রাস্তার ধারে ট্রাক থামিয়ে দু এক পেগ তরল পদার্থ গিলে নেয়, রুটি মাংস দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে ও দড়ির খাটিয়ায় কিছুক্ষণের জন্য চৌদ্দ পোয়া হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নেয়। সে এক দেখবার মত জিনিষ। ট্রাক ড্রাইভারদের কাছে এই ধরণের গঞ্জ মরুভূমির বুকে মরুদ্যানের মত।

অণ্ডাল গ্রামটি আসানসোল যেতে জি, টি, রোডের বাম দিকে পড়ে। গ্রামটি সেই পুরাতন আমলের জীর্ণ ও বিবর্ণ। দু একটি পাকা বাড়ী গড়ে উঠেছে। রাস্তা মোরাং দেওয়া বলে কাদা নেই। কিছু দোকান পাট ও হাই স্কুল আছে। লোকসংখ্যা হাজার দুই মত। কিন্তু অণ্ডাল বাজার বা রেলষ্টেশনের সন্নিকট—সেটাই এখন অণ্ডালের পরিচয়। এখানে ব্লক অফিস, দৈনিক হাটবাজার, সিনেমা হল, নাট্যমঞ্চ, রেলওয়ে ক্লাব ও কোয়ার্টার্স, ব্যাঙ্ক, সওদাগরি অফিস, অটো পার্টসের দোকান গড়ে উঠেছে। এবং এটাই অণ্ডালের গঞ্জ। এখান থেকে সাঁইথিয়া লাইন গেছে তাই এটি একটি জংশন।

॥ ফরিদপুর ব্লক ॥

দুর্গাপুর শহর এলাকা নোটিফায়েড এলাকা বলে ও গ্রাম এলাকা ফরিদপুর ব্লক নামে পরিচিত।

আয়তন ১৫৯.৩১ বর্গ কিলোমিটার। গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৬, প্রায় ৮০টি গ্রাম ও ৭০টি মৌজা নিয়ে ফরিদপুর ব্লক গড়ে উঠেছে। লোকসংখ্যা ৭০ হাজার ১৩৭ জন।

এই ব্লকের সমৃদ্ধ গঞ্জ হল 'লাউদোহ' গ্রাম। এখানে অফিস, ব্যাঙ্ক, স্কুল, বেসিক ট্রেনিং কলেজ, সিনেমাহল, বহু বড় বড় দোকান পাট, দৈনিক হাট বাজার আছে। দুর্গাপুরের ছোঁয়া লেগে থাকলেও গ্রামাঞ্চলে উৎপন্ন ফসল ধান ও গম। দুর্গাপুর এলাকায় বহু কারখানাতে গ্রামের লোকেরা কাজ করে। দুর্গাপুর ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন সংক্ষেপে ডি, এস, টি, সি, বাস ও স্টীল প্লান্টের বাস চতুর্দিকের গ্রাম ঘুরে দুর্গাপুরে আসে। তাতে ভিন্ন ভিন্ন শিফটে কাজ করার কর্মীরা কর্মস্থানে যাতায়াত করেন। দুর্গাপুরের সন্নিকট 'ধোয়াবুনি' গ্রামে কবি, সাধক ও কৃষ্ণযাত্রা পালাকার নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

॥ আসানসোল মহকুমা ॥

আসানসোল মহকুমায় রয়েছে ৮টি ব্লক যথা— ১) আসানসোল, ২) রাণীগঞ্জ, ৩) জামুরিয়া-১, ৪) জামুরিয়া-২, ৫) হীরাপুর, ৬) কুলটি, ৭) বারাবণী ও ৮) সালানপুর। এছাড়া দুটি পুরসভা রয়েছে—রাণীগঞ্জ ও আসানসোল। আর আছে চারটি "নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি।" এগুলি হল :— বার্ণপুর, নিয়ামতপুর, কুলটি ও ডিসেরগড়। নোটিফায়েড এরিয়াগুলির মধ্যে বার্ণপুর আয়তনে সব চাইতে বড় ও সমৃদ্ধ।

জেলার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আসানসোল মহকুমা অবস্থিত। হাওড়া থেকে আসানসোল শহর রেলপথে ২১৩ কিলোমিটার। এই শতকের প্রথম দিকে আসানসোল মহকুমা "রাণীগঞ্জ" মহকুমা নামে পরিচিত ছিল। আসানসোল বিহারের প্রান্ত মহকুমা। ক্রমশ সমৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসকগণ এই এলাকার খনি ও শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ও মহকুমার সদর দপ্তর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জ থেকে সরিয়ে আসানসোলে নিয়ে আসেন। সে সময় মহকুমার নাম ও পরিবর্ত্তন করে রাখা হয় "আসানসোল" মহকুমা। কয়লাখনি এই অঞ্চলের কেন্দ্রে থাকায় এবং চতুস্পার্শ্বে বড় বড় শিল্প কারখানা বিশেষ করে লৌহজাত শিল্প গড়ে ওঠায় অসীম গুরুত্ব পায় আসানসোল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে গেজেটিয়ারে পাওয়া যায়, একশ বছর আগে আসানসোল এলাকাটি পুরো জঙ্গলে ভর্তি ছিল, মাঝে মাঝে ছোট ছোট

বসতি। বহু শতাব্দী ধরেই এই অঞ্চল ছিল আদিবাসীদের বাসস্থান– যাদের বলা হত 'চুয়াড়'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও এই এলাকা ছিল বর্বর, দস্যু ও সমাজবিরোধীদের আস্তানা। তাদের একমাত্র উপজীব্য ছিল সুযোগ বুঝে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যথাসর্ব্বস্ব লুন্ঠন করে আবার জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করা। কিন্তু এলাকার চেহাবা বদলে যায় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে, যখন জঙ্গলের ভিতর হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় মাটির অভ্যন্তরে কয়লার ভাণ্ডার। বস্তুতঃ কয়লা আবিষ্কৃত হওয়ার পর এলাকার নবজন্ম হয়। বন ও জঙ্গল কেটে মানুষ শয়ে শয়ে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকেন। বহু অবাঙালী শ্রমিক বিহার থেকে কাজের জন্য চলে আসেন। বড় বড় ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা জঙ্গল কিনে নিয়ে মাটি খুঁড়ে কয়লা তুলতে থাকেন। রাতারাতি আলাদিনের "যাদুই চিরাগের" মত এলাকাটা হয়ে ওঠে কর্মচঞ্চল। সেই পরিবর্তনের স্রোত এখনও বহে চলেছে।

এই মহকুমার উত্তরে বিহারের সাঁওতাল পরগণা আর অজয় নদ, যা বর্দ্ধমান-বীরভূমের সীমা; পূর্ব্বে দুর্গাপুর মহকুমা, দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর আর বরাকর নদী এই জেলাকে আগলে রেখেছে এবং বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও বিহারের ধানবাদ থেকে পৃথক করে রেখেছে। জলবায়ু চরমভাবাপন্ন, কারণ মাটি পাথুরে–তাই গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম এবং শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। জমিও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর ও কাঁকুরে। এবড়ো-খেবড়ো ও উঁচু-নীচু টিলায় ভর্তি–এত অসমতল যে এখানে সড়ক নির্মাণের সময় যথেষ্ট মেহনত করতে হয়। নদীগুলি অগভীর, কোন শ্রী নেই– কোথাও ক্ষীণকায় এবং কোথাও বিশাল চওড়া বর্ষায় নদীগুলি খরস্রোতা। গ্রীষ্মকালে মার্তণ্ডদেবের তেজ কী ভীষণ এখানে এসে প্রত্যক্ষ করতে হয়। নদী নালা খাল বিল সে সময় সব শুকিয়ে চৌচির। তৃষ্ণার জল সে সময় মহার্ঘ। প্রচণ্ড জলকষ্টে দিন কাটাতে হয় এবং জেলা পরিষদ, ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, পুরসভা, স্বাস্থ্য বিভাগকে ট্যাঙ্ক ভর্তি জল নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে পানীয় জল যোগাতে হয়। নলকূপ হয় না, পানীয় জলের জন্য গভীর কূপ খনন করা হয়। কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাও শুকিয়ে যায়।

যেহেতু মাটির তলায় কালোমানিক বা Black Diamond তাই নির্বিচারে চলছে বন কেটে বসতি এবং মাটির তলায় কয়লা খুঁড়তে খুঁড়তে ভিতরটা ফোঁপরা হয়ে যাচ্ছে। নিয়মানুযায়ী বালি দিয়ে ভর্তি করার কথা, কিন্তু খনি মালিকরা শুধু মুনাফাই লোটেন, নিরাপত্তার কথা দূর অস্ত। বড় বড় কলকারখানার চিমনি নিসৃত ধোঁয়ায় পরিবেশ দূষণ বেড়ে চলেছে। মানুষ নিজেই নিজের গলায় ছুরি লাগাচ্ছে। প্রকৃতিও তাই নির্মমভাবে শোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাণীগঞ্জ ছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের পশ্চিম প্রান্তের শেষ রেলষ্টেশন। কয়লা পরিবহনের দায়েই পূর্ব ভারতে রেলপথের সম্প্রসারণ হয়। ব্রিটিশ কোম্পানী "বেঙ্গল কোল" কোম্পানীর হেড অফিস ছিল রাণীগঞ্জের এগরায়। যখন পশ্চিমদিকে কয়লাখনির

সম্প্রসারণ হয়, তখন রেলপথও সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আসানসোল রেলষ্টেশনের পত্তন হয়। ক্রমে ক্রমে রাণীগঞ্জকে কানা করে দিয়ে আসানসোল এগিয়ে গেল মূলতঃ খনিজ সম্পদ, কলকারখানা ও প্রশাসনিক গুরুত্বের উপর ভর দিয়ে। এখন এই মহকুমার গুরুত্বপূর্ণ কয়লাখনির মালিক "ইষ্টার্ণ কোল ফিল্ড লিমিটেড" বা সংক্ষেপে ই, সি, এল। প্রথম প্রথম কয়লাখনিগুলি ছিল ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে। ব্রিটিশ যেমন কোল কোম্পানী গড়ে তুলেছিল তেমনি দেশীয় রাজা, মহারাজা ও ধন্যাঢ্য ব্যক্তিগণও কয়লাখনির মালিক হয়ে যান। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এমনি এক গুচ্ছ কোলিয়ারীর মালিক। জমিদারীর আয় থেকেও কয়লাখনির আয় অনেক বেশী, তাছাড়া জমিদারীর কর আদায় উৎপন্ন ফসলের উপর নির্ভর করে– তাই সে সময় বহু জমিদার নিজ জমিদারী বিক্রয় করে কোলীয়ারী এলাকায় রাণীগঞ্জ ও আসানসোলে জমি কিনে নিয়ে কোলিয়ারীতে রূপান্তরিত করে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করতে থাকেন। বহু অবাঙালি শ্রমিক বাংলায় এসে ধনবান হয়ে যান। দেখাদেখি এতদঞ্চলের কৃষি শ্রমিকও খনি শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে আসানসোল মহকুমা জুড়ে সামাজিক পরিকাঠামোর বিবর্তন সুরু হয়। এই মহকুমার প্রায় প্রত্যেক ব্লকেই কয়লাখনি আছে। ফলে মানুষের জীবনে এসেছে নূতন ধারা, অবশ্যই অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে এই ধারা আবর্তিত হচ্ছে। সংস্কৃতিতেও এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। শান্ত-সৌম্য-মন্থর গ্রাম্যজীবন গতিশীল ও চঞ্চল হয়েছে খনি শিল্পের দৌলতে। ব্রিটিশ যাদের বিহার থেকে এনেছিলেন খনি শিল্পের তাগিদে, তারা এখানেই বসবাস করে এখানকার বাসিন্দা হয়ে গেছেন। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বাংলায় ঢেলে দিয়েছেন উজাড় করে, পরিবর্তে বাংলার সংস্কৃতি এই সব আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছে এক নূতন মিশ্র সংস্কৃতি। না বাঙালিয়ানা, না বিহারীয়ানা। এটাই আসানসোল মহকুমার বৈশিষ্ট্য। এখানকার সাধারণ মানুষের কথার টান (Dialect) দেখে তা উপলব্ধি করা যায়।

পৌনে দু'শ বছর আগে হঠাৎ এক সাহেব আবিষ্কার করেন যে রাণীগঞ্জের এক জঙ্গল খুঁড়ে মাটির তলা থেকে কয়লা পাওয়া যায়। তারিখটা হয়ত আজ কারোরই মনে নেই, কিন্তু সালটা আছে—১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। রাণীগঞ্জের মানুষ দেখল, গর্তের মুখে বসেছে অদ্ভুত যন্ত্র। চাকা ঘুরিয়ে খাঁচায় বসিয়ে মানুষকে নামিয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর জঠরে। সবাই জানল, এ হল কয়লাখনি। ভূগর্ভ থেকে চাপ চাপ কালো অন্ধকার কেটে তুলে আনছে, যার ভিতর আত্মগোপন করে রয়েছে প্রচুর আলো, প্রচুর তাপ শক্তি। এরই নাম কয়লা, হীরের চেয়েও দামী—ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। এক অদ্ভুত জীবিকা—সারাদিন পৃথিবীর গহ্বরে কালো মানুষ কালো কয়লা কেটে চলেছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কয়লার আকর্ষণে দিকবিদিক থেকে ছুটে এল অসংখ্য মানুষ। বিশ বছরের মধ্যে খনি থেকে তোলা কয়লা নিয়ে আসানসোল মহকুমায় সব চাইতে

বড় রকমের অর্থনৈতিক পদক্ষেপ সুরু হল। পুরো আসানসোল মহকুমার অভ্যন্তরে জমির তলায় হাজার ফুট পর্যন্ত গভীরে সঞ্চিত রয়েছে ভারতের সবচাইতে দামী প্রথম শ্রেণীর কয়লা। সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত ৮২ মিলিয়ন টন এবং দু হাজার ফুট পর্যন্ত ২৫০ মিলিয়ান টন। প্রথম কয়লাখনি তৈরীর ৩৫ বছর পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইন বসল। এই লাইনের অণ্ডাল, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, বরাকর, সীতারামপুর, পূর্ব রেলের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ কোলিয়ারী। মহকুমার ৭৫ ভাগ কয়লা কিনে নেয় পূর্ব রেল—কয়লার ইঞ্জিন হুস হুস করে এগিয়ে যায় পাতা লাইন ধরে। মাকড়সার জালের মত রেলপথ বাড়তে থাকে ক্রমশঃ এই কয়লার দৌলতেই। জঙ্গলমহলের জংলি বাঘ লাফে লাফে রাঁচী, হাজারীবাগ, কোডারমার দিকে পালিয়ে যায়। এই মহকুমায় সত্তরের দশকে কোলিয়ারী ছিল ২০৫টি, যেখানে দেড় লক্ষ মানুষ জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিল কয়লাখনির কাজ। ৩৬ হাজার টন থেকে দশ বছরে বেড়ে উৎপাদন হয় ১৬.১৮ মিলিয়ন টন। আর ১৯৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে এই উৎপাদন দাঁড়ায় ২৮.০৪ মিলিয়ন টন। সমগ্র ভারতের শতকরা ২৮ থেকে ৩১ ভাগ কয়লা আসানসোল মহকুমা সরবরাহ করেছে। আজ এই কযলা শিল্পের উপর নির্ভর করছে দু কোটির মত মানুষ। খনি শ্রমিক, খনির যন্ত্রাংশ উৎপন্ন হচ্ছে—জ্বালানী গ্যাস, এমোনিয়া সালফেট, বেনজিন, টলুইন, ন্যাপথেলিন, এনথ্রাসিন, ফেনল, ক্রেসল, পিচ। এইসব মূল রাসায়নিক দ্রব্য থেকে তৈরী হচ্ছে রঙ, সুগন্ধি কার্ব্বলিক এসিড, ওযুধ, ভেষজ তেল, প্লাস্টিক, ডিসইনফেকটেন্ট, ফিউয়েল, এডিটিভস, নাইলন এবং সিনথেটিক রবার।

কয়লার সঙ্গে সঙ্গে আকরিক লোহার আবিষ্কার জেলার শিল্প সম্ভাবনাকে সম্প্রসারিত করেছে। চারটি বড় বড় স্টীল প্লান্ট বসেছে কুলটি, হীরাপুর, বার্ণপুর ও দুর্গাপুরে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল আয়রন কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে আসানসোলের কাছে বসল প্রথম লোহা তৈরীর কারখানা ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী। কারখানা বসল বার্ণপুর ও কুলটিতে। দুর্গাপুরে বসল হিন্দুস্তান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী। ১৯৬২-৬৩ সালে এই শিল্পের থেকে উৎপাদনের আয় ছিল প্রায় ৮০.২১ কোটি টাকা। কোল মাইনিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প থেকে লোহা ও ইস্পাতের স্থানীয় চাহিদার পরিমাণ ছিল ২৪.৩৪ কোটি টাকা। এ জেলায় উৎপাদন শিল্পে কয়েক লক্ষ লোক চাকুরীর সুযোগ পেয়েছেন। আসানসোলের এক হাতে কয়লা ও অন্য হাতে লোহা। এই মণিকাঞ্চন যোগে দুর্গাপুরে হয়েছে সিমেন্ট কারখানা কোক-চুল্লী, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন তৈরীর কারখানা। আসানসোল ও রাণীগঞ্জের মাঝামাঝি জায়গায় জে, কে নগরের বিশাল এলুমিনিয়াম কারখানা, গ্লাস ফ্যাক্টরী, রাণীগঞ্জে বেঙ্গল পেপার মিল—সুবিশাল উৎকৃষ্ট কাগজের কল। রাণীগঞ্জে তিনটি

পটারী ও রিফ্র্যাকটরী, রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্তান কেবলস ও পটারীর কারখানা। আসানসোল ও দুর্গাপুর মহকুমায় সঞ্চিত হয়েছে ফায়ার ক্লে। আগুনে পোড়ে না এই মাটি। গণ্ডোয়ানা শিলাস্তর আসানসোলের দিক থেকে জেলায় প্রবেশ করেছে। এই মাটি দিয়ে তৈরী হচ্ছে ফায়ার ব্রিকস বা আগুনে ইঁট, যা কোক চুল্লী তৈরীতে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ সম্পদ গর্ব করার বৈকি। আসানসোল সেন-র‍্যালে সাইকেল তৈরীর কারখানা বহু মানুষের জীবনে এনেছে গতি ও স্বস্তি।

এই সব শিল্প কারখানাগুলিকে পরামর্শ ও পরিচালনার জন্য প্রস্তুত হয়েছে– ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডেভলপমেন্ট এণ্ড রেগুলেশনস এ্যাক্ট। এই সংস্থার অনুমোদিত বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হল ৯১, এর ইঞ্জিনীয়ারিং ১১ টেক্সাটাইল-১, কেমিকেলস-৬, নন মেটালিক মিনারেল প্রোডাক্টস-৫৬, বেসিক মেটাল-৬, কেবলস-৪, রি ফ্যাক্টরী-৬, অন্যান্য-৪ ; রেজিষ্টার্ড ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ১৯৬৯ খ্রীঃ অব্দে ছিল ২৭৪, এবং ৭০ খ্রীঃ অব্দে বেড়ে হয় ২৯১। ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বুরো অব এপ্লায়েড ইকনেমিকস এণ্ড ষ্ট্যাটিসটিকস সারা জেলায় সমীক্ষা চালিয়ে ছোট বড় ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করেছিলেন ৩৮,১২০টি। এগুলির ২০ শতাংশর অবস্থান শহরে। সারা রাজ্যের মধ্যে শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে বৰ্দ্ধমানের স্থান পঞ্চম। রাজ্যের মোট শিল্পের ৭ ভাগ এই জেলার দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমায় রয়েছে। খনিজ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ভারী শিল্পও জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। কালনা, কাটোয়া ও বৰ্দ্ধমান সদর মহকুমায় কৃষি শিল্পকে উন্নত কবতে গড়ে উঠছে কৃষি যন্ত্রপাতি। যেখানে দু'পা গেলেই হাতের কাছে কাঁচা মাল পাওয়া যায় সেখানে আজ চিন্তা করা হচ্ছে স্কুটার, মোটর সাইকেল ট্রাক্টর ও অটোমোবাইলসের যানবাহন তৈরীর কথা। দুর্গাপুর থেকে হলদিয়া পর্যন্ত সড়ক পথ কাঁচা মালের আদান প্রদান সুনিশ্চিত করবে। ভারী শিল্পের সম্ভাবনায় রয়েছে ক্রেন, রোড রোলার, রোলড স্টীল প্রোডাক্ট, রেলওযে ইকুইপমেন্ট, কাষ্ট আয়রণ পাইপ, রেডিও, টি ভি, ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট, মেটাল কনটেনার, মেসিনটুলস তৈরী। এছাড়া এলুমিনিযাম ও রিফ্যাক্টরীতে বহু জিনিষপত্র বাসনকোসন আজ শিল্প জগতের বিস্ময়। এছাড়া শিল্প তালিকায় রয়েছে বাল্‌ক হ্যাণ্ডলিং ইকুইপমেন্ট, মেসিনারী কমপোনেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট, ফাউণ্ড্রি, ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাক্টরী ও হরেকরকম আনসিলারী ইণ্ডাষ্ট্রী। আসানসোল মহকুমার গ্রামাঞ্চলে প্লাষ্টিক শিল্প, ফিল্ম, ব্যাগ, টেপ, পাইপ, বোতাম ও অন্যান্য ছাঁচ ঢালাই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ও উঠ্‌ছে।

শিল্প সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পকে মিশিয়ে যে সব কারখানা গড়ে উঠছে তাতো একদিন সারা ভারতের মধ্যে দুর্গাপুর ও আসানসোল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে। সেগুলি হল– হাস্কিং মিল, গমভাঙা কল, তেলকল, বেকারী, কনফেক্শনারী, ডেয়ারী, স মিল, ক্যাবিনেট তৈরী, প্যাকিং বাক্স, ক্রেন্ট, মৌমাছির চাষ, পোলট্রি, পিগারী, গোবর গ্যাস, পেসটিসাইড ফর্মুলেশন, ক্যাটল ফিড, পাম্প

ও অয়েল ইঞ্জিন, ইট ও টালি, স্প্রেয়ারডাষ্টার, সেচের সরঞ্জাম, কৃষি যন্ত্রপাতি, ফাইবার প্রোডাক্টস, সোডাওয়াটার ফ্যাক্টরী, লেদার ফুটওয়ার, সাইকেল টায়ারস, ববার প্রোডাক্টস, পেট্রোকেমিক্যাল বেসড ইণ্ডাষ্ট্রী, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মেসিনারী মেসিন টুলস, প্লাষ্টিক কনভারসন ইণ্ডাষ্ট্রি, সিনথেটিক প্রোডাক্টস, ড্রাগস এণ্ড ইন্টারমিডিয়েটস অটোমোবাইল স্পেয়ার পার্টস, স্যানিটারী ইকুইপমেন্টস, কাটলারী লেন্স, মাইক্রোসকোপ, ক্যামেরা ইত্যাদি।

আসানসোল মহকুমায় কয়লা ও লোহা নিয়ে প্রগতির রমরমা চললেও খনি ও বড় শিল্পে দুর্ঘটনা আমাদের বড় রকম অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কয়লাখনিগুলি দুরকমের—ওপেনকাষ্ট বা 'খোলামুখী খনি' এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ড বা ভূগর্ভ খনি। মহকুমায় এই খনিগুলি প্রায় দেড়শ বছর ধরে ব্যক্তি মালিকানাধীনে ছিল। সরকার থেকে একটি"কোল মাইনস অথারিটি" গঠন করে খনিগুলির নিরপত্তার কাজ ও শ্রমিক মঙ্গল ব্যবস্থা পরিচালনা করা হত। তাতে অনেক ক্ষেত্রে মালিক পক্ষ সরকারের তোয়াক্কা না করেই শ্রমিকদের কম বেতন দিতেন, নিরাপত্তাব কোন ব্যবস্থা মানতেন না এবং খনি শ্রমিক নিহত হলে তার পরিজনদের রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা করতেন না। তাই জাতীয় কংগ্রেসের দশ দফা কর্মসূচীর অন্যতম সূচী হিসাবে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার কয়লাখনিগুলিকে জাতীয়করণ করলে ব্যক্তি মালিকানা লুপ্ত হয়। সত্তরের দশক থেকে কয়লাখনির শ্রমিকদের জীবনে উদয় হয় নূতন প্রভৃতি। পরিচালনা ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, শ্রমিক মঙ্গল ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে আনে নূতন কল্যাণমুখী জোয়ার। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর সমগ্র ভারতের সমস্ত কয়লাখনিগুলিকে একটি পরিবারভুক্ত করে নাম দেওয়া হয় 'কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড'। এই সংস্থার প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন লেফটেনান্ট জেনারেল কে, এস গেরওয়াল। সারা ভারতের সাতটি কলিয়ারী গুচ্ছকে একত্রিত করে নাম দেওয়া হয় 'কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড' সংক্ষেপে সি, আই, এল। এই সাতটি কোলিয়ারী গুচ্ছ হল :— বিলাসপুর এস, ই, সি, এল, সাঁকতোরিয়া—ই, সি, এল, রাঁচী—সি, সি, এল, ধানবাদ—বি, সি, সি এল, নাগপুর—ডবলু, সি, এল, সিঙ্গরৌলি—এন, সি, এল এবং মারগেরিটা—এন, ই, সি। আসানসোল মহকুমার কয়লাখনি গুচ্ছ এখন "ইষ্টার্ণ কোল লিমিটেড" বা সংক্ষেপে ই, সি, এল; এর হেড অফিস বর্দ্ধমানের প্রান্ত সাঁকতোরিয়ায়। গত ১৯৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় সারা ভারতে কয়লার মোট উৎপাদন হয়েছে ১৫৯.০৬ মিলিয়ান টন। কিন্তু তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমায় কয়লাখনি গুচ্ছ "ই. সি. এল"-এর উৎপাদন ঐ সময় ছিল ২৮.০৪ মিলিয়ান টন। এর উপরে রয়েছে বিলাসপুর—এস. ই. সি. এল ৩৯.৯৫ মিলিয়ান টন। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ উৎপাদনে দ্বিতীয়। যখন ব্যক্তি মালিকানায় খনিগুলি ছিল, তখন দুর্ঘটনা ঘটলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও উদ্ধারকার্য চালাতে বিলম্ব হত। কিন্তু

জাতীয়করণের পর এখন সে সম্ভাবনা নেই। আসানসোল মহকুমার কোলিয়ারীতে অভ্যন্তরভাগ ধ্বসে যেয়ে বহু শ্রমিক মাটি চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, ভিতরে বিষাক্ত মার্শ গ্রাস ও কার্বনডাই অক্সাইডে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেছেন অনেকেই। বহু ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান না পেয়ে স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। কিন্তু রাণীগঞ্জের কাছে 'মহাবীর' কোলিয়ারীতে ৬৭জন শ্রমিক ভূগর্ভে ধ্বস নামার জন্য যেভাবে আটকা পড়েন তা খনি শিল্পের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। ১৯৮৯ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বরের শেষ দিকের ঘটনা। মহাবীর কোলিয়ারীর ৬৭জন শ্রমিক কয়লা কাটতে কাটতে হঠাৎ ভিতরে ধ্বস নামার জন্য আটকে পড়েন। তাঁরা যেখানে আটকে পড়েন তার দু ফুট নিচু দিয়ে বইছিল জলের প্রচণ্ড স্রোত এবং অন্যদিকের পথটি ধ্বস নেমে বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থায় বিজ্ঞানীও প্রযুক্তিবিদগণ চেষ্টা করে আটকা পড়া শ্রমিকদের অবস্থান নির্দ্ধারণ করেন ও বিভিন্ন পরিকল্পনায় উদ্ধারকার্য চালান। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অতঃপর এক পাঞ্জাবী ইঞ্জিনীয়ার ইস্পাতের ক্যাপসুল তৈরী করেন যার মধ্যে একটি মাত্র মানুষ দাঁড়াতে পারে। যে স্থানে শ্রমিকরা আছেন তার সোজাসুজি মাটির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত বোর করে ক্যাপসুল নামানো হয় ও একে একে ৬১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় প্রায় তিন দিন বাদে। কিন্তু বাকী ৬জনের কোন হদিস মেলেনি। তার চৌদ্দ দিন বাদে বাকী দুজনের গলিত দেহ ঐ ক্যাপসুল অপারেশন করে উদ্ধার করা হয়। খনিশিল্পের ইতিহাসে এইভাবে উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে যে ৬১জন শ্রমিক তিনদিন অন্ধকারে আবদ্ধ থেকে দিনের আলো দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তা রহস্য সিরিজের চাইতেও রোমাঞ্চকর। কয়লাখনির ইতিহাসে 'মহাবীর কোলিযারী' আজ পৃথিবী বিখ্যাত। ব্যক্তিগত মালিকানায় এই কোলিয়ারীটি ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের।

।। আসানসোল সদর ব্লক ।।

আয়তনে খুবই ছোট মাত্র ৭৯.৩৬ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৬টি, গ্রামের সংখ্যা ২৭ এবং মৌজার সংখ্যাও ২৭, লোকসংখ্যা ৩৫ হাজাব ৮৬২ জন। ব্লকের দপ্তর আসানসোল শহরেই অবস্থিত। ব্লকের মোট এলাকার শতকরা পনেরো ভাগ হল চাষের জমি। সুতরাং অনুমান করা যায় এই ব্লকের মানুষ চাষের জমির উপর নির্ভরশীল নয়। ফলে গ্রামগুলি হয়েছে শহর ঘেঁষা। মানুষের স্থান সঙ্কুলান করতে শহরের পরিধি ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে গ্রামের শান্ত জীবন। এই ব্লকের উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলি হল রঘুনাথ বাটি, গাড়ুই, উষাগ্রাম। রঘুনাথবাটির রাধেশ্যাম মন্দির প্রায় পাচশত বৎসরের পুরাতন, স্থাপত্যের গর্ব। গাড়ুই এর বিষ্ণুমন্দিরও এই ব্লকের প্রাচীনত্বের নিদর্শন। আসানসোল মহকুমায় একমাত্র পাথরে তৈরী মন্দির এটি। সম্ভবতঃ পালবংশের সময়ে প্রতিষ্ঠিত।

আসানসোল গ্রাম পত্তনের সুরু হয়েছিল শহর আসানসোলের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে উষা গ্রামে। এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ঘাঘরাচণ্ডী। বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারক তিনটি পাথরের ডিম্বাকৃতি মূর্তি, খোলা আকাশের তলায় গাছের বেদীতে অধিষ্ঠান। মেলা ও উৎসব হয় বেশ ধূমধামে।

।। জামুরিয়া ১ ব্লক ও জামুরিয়া ২ ব্লক ।।

জামুরিয়া থানাকে দুটি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে জামুরিযা ১ ও জামুরিয়া ২। জামুরিয়ার পুরোটাই কয়লাখনি অঞ্চল। মাঝে মাঝে খুব ছোট ছোট জঙ্গল, মাটি এবড়ো খেবড়ো। এ সব দেখে মনে হয় এগুলির তলায় প্রচুর কয়লা আছে। নূতন নূতন কয়লাখনি হচ্ছে এবং জঙ্গল অপসারিত হচ্ছে।

জামুরিয়া ১ ব্লকের আয়তন ১২৩.৯৭ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১০, গ্রামেব সংখ্যা ৭৮ এবং মৌজার সংখ্যা ৪০, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১১ হাজার ২০৩ জন, তার মধ্যে সাড়ে ২৮ হাজার তপশীল ও ১০ হাজারের বেশি উপজাতি। অর্থাৎ প্রায এক তৃতীয়াংশ তপশীল ও উপজাতি।

জামুরিয়া—২ ব্লকের আযতন ১১০.৭৩ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চাযেতের সংখ্যা ৮, গ্রামের সংখ্যা ৩৫ এবং মৌজার সংখ্যা ৩৪, লোকসংখ্যা ৬৮ হাজার ১০৫ জন। তার মধ্যে ১২ হাজার ৫০৭ জন তপশীল ও ২ হাজার ৮ শত ২৫ জন উপজাতি অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ তপশীল ও উপজাতি।

জনসাধারণের মধ্যে মিশ্র সংস্কৃতি ক্রমশঃ গড়ে উঠছে। বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আসা শ্রমিক, কর্মী এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা এক্সকিউটিভ অফিসার আর বর্দ্ধমানের বাসিন্দা—এই তিনটি সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র জামুরিয়া। জীবন-জোয়ার প্লাবিত হচ্ছে খুব সঙ্গত কারণেই কয়লাখনিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তবু প্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধর্মরাজ আর অন্ত্যজ শ্রেণীর শিব কিন্তু হারিয়ে যায়নি। তারা সভ্যতার বিবর্তনে সকল শ্রেণীর পূজা পাচ্ছেন এবং গ্রাম জীবনের উৎসবকে ধরে রেখেছেন—রাস, চড়ক, গাজন, দোল উৎসবের মাধ্যমে। এইখানেই বর্দ্ধমানের নিজস্বতা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অধিকাংশ আদিবাসী যেহেতু সাঁওতাল, সেহেতু তারা নিজেদের উৎসবকে ত্যাগ করেনি। অপর দিকে বীরভূম থেকে আউল-বাউল এসে বৈষ্ণব সংস্কৃতির ক্ষীণ ধারায় সিক্ত করেছে সেই মিশ্র সংস্কৃতিকে।

এই ব্লকের একটি মনোরম গ্রাম বেনালী দ্বিতীয় কেন্দুলি মেলার জন্য বিখ্যাত। কয়েকজন বৈষ্ণব কেন্দুলি যেতে না পেরে পথিমধ্যে বেনালীর এই মনোরম স্থানটিকে বেছে নিয়ে এইখানেই কৃষ্ণের নাম গান করতে থাকেন। তাই জয়দেবের কেন্দুলি মেলার সঙ্গে একই সময় দ্বিতীয় কেন্দুলির মেলা বসে।

এই ব্লকের একটি সমৃদ্ধ গ্রাম চুরুলিয়া নজরুল ইসলামের জন্মস্থান। কিন্তু শুধু বিদ্রোহী কবির জন্মভূমি বলে নয়, চুরুলিয়া পঞ্চায়েতের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছেন—অপূর্ব্ব কারুশিল্পী ও ভাস্কর। এঁরা পাথর কেটে কেটে সুন্দর সুন্দর মূর্তি ও গৃহসামগ্রী প্রস্তুত করেন। শিল, নোড়া, ধূপদানি, আতর দান, চন্দন পিঁড়ি, পাথরের বাসন প্রভৃতি দেখবার মত। এটাই এই সব শিল্পীদের মূল জীবিকা। চূরুলিয়া গ্রামটিও খুব প্রাচীন—গড় বা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। রাজা নরোত্তমের রাজধানী ছিল এই চুরুলিয়া। সামন্তরাজা নরোত্তমের গড়টি এখন একটি স্তূপে পরিণত হয়েছে। ঐতিহাসিক ওল্ডহ্যামের মতে মুসলমান আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সামন্তরাজা নরোত্তম বা তার বংশধরগণ রাজত্ব করেছেন। মুসলমানদের আগমনে ও আক্রমণে এই গড় বিধ্বস্ত হয় এবং সামন্তরাজা নিহত হন। এই মুসলমানগণ হলেন 'আয়মাদার'। এঁরা এখনও গড় এলাকার চতুস্পার্শে বাস করেন। পরবর্তীকালে দুর্গের পুরাতন ইঁট ও রাঙা মাটির গাঁথনি দিয়ে তাঁরা ঘর বানিয়েছেন। নজরুলের পূর্বপুরুষ এই আয়মা বংশের মানুষ ছিলেন। গ্রামে নজরুল একাডেমীর উদ্যোগে নজরুল পাঠাগার, নজরুল সংগ্রহশালা রয়েছে। নজরুলের জন্মদিন থেকে সপ্তাহব্যাপী মেলা বসে—নজরুল মেলা। অজয় নদের তীরে চুরুলিয়া একটি মনোরম পরিবেশের গ্রাম। এখানে হাট, বাজার, ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি, উচ্চমাধ্যমিক স্কুল ও নজরুল ইসলাম কলেজ আছে। বর্দ্ধমান চুরুলিয়া বাস প্রতিদিন কয়েকবার বর্দ্ধমান থেকে যাতায়াত করে।

জামুরিয়া ব্লকের একটি আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম দামোদরপুর--ছাতা পরব ও সাঁওতালী উৎসবের জন্য বিখ্যাত। ঝুমুরিয়া বাজার থেকে অণ্ডাল পর্যন্ত একটি সড়ক চলে গেছে। দামোদরপুর থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে ঝুমুরিয়া বাজার, একটি গঞ্জ। এখানে দৈনিক বাজার বসে। দোকান পাট, ও ব্যবসা বাণিজ্যে গঞ্জটি সব সময় সরগরম থাকে। আদিবাসীরা প্রায় সকলেই খনিতে কাজ করে। দিনের শেষে সন্ধ্যায় বাজার গমগমে হয়ে উঠে—যখন মেয়ে পুরুষ আদিবাসী সাঁওতালরা বেশভূষা করে আনন্দের খোরাক নিতে গঞ্জে জড়ো হয় সে এক দেখবার জিনিষ। অণ্ডাল-বরাবনি-সীতারামপুর রেললাইনে অণ্ডাল থেকে ২১ কিলোমিটার দূরে জামুরিয়া ষ্টেশন। রেলষ্টেশন জামুরিয়া থেকে বাসে চুরুলিয়া যাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ এবং অণ্ডাল ষ্টেশন থেকে সর্ব্বত্র বাস চলাচল করে।

।। আসানসোল পুর এলাকা ।।

আসানসোল পুরসভা একটি বিরাট শহর। জি. টি. রোডের দুপাশে ইচ্ছামত দৈর্ঘ্যে ও প্রশস্তে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এই শহর। পুরসভার প্রতিষ্ঠাকাল ১লা অক্টোবর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। আয়তন ২৫.২ বর্গ কিলোমিটার, ওয়ার্ডের সংখ্যা ২৪ ও লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৭৫ জন। বাস্তবে লোকসংখ্যা আরও বেশি

প্রায় চার লক্ষের কাছাকাছি। আসানসোল পূর্ব্ব ভারতের একটি অন্যতম বণিজ্যকেন্দ্র, অবশ্যই দুটি দামী খনিজ সম্পদ কয়লা ও লোহাকে কেন্দ্র করেই আসানসোলের এই রমরমা। শহরটি বিহারের কাছাকাছি হওয়ায় হিন্দির আধিপত্য প্রবল। আসানসোলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে বিরাট বিরাট শিল্প কারখানা ও শহর—রাণীগঞ্জ, বরাকর, বার্ণপুর, কুলটি, হিবাপুর, কন্যাপুর, রূপনারায়ণপুর, সীতারামপুর ও চিত্তরঞ্জন। এই সব শহরগুলি থেকে শয়ে শয়ে বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সী ও ইষ্টার্ণ রেলপথে মানুষ আসানসোলে আসেন। তাই আসানসোল একটি কসমোপলিটন শহরের রূপ নিয়েছে।

প্রশাসনিক দিক থেকেও আসানসোলের গুরুত্ব রয়েছে। এই শহরেই একজন অতিরিক্ত জেলা শাসক পূর্ণ ক্ষমতা বলে মহকুমা ও শহরের প্রশাসন পরিচালনা করছেন। পূর্ব্ব রেলের একটি ডিভিশনের সদর দপ্তর আছে এই আসানসোল শহরে। এছাড়া মহকুমার শাসক ও মুন্সেফ আদালত আছে। পূর্ব্বে বি, এন, আর এর হেড অফিস এখানেই ছিল। পুরসভার আয় থেকে শহবেব প্রগতি সম্ভব নয়. বলে, সরকার "আসানসোল ডেভলপমেন্ট অথরিটি" তৈরী করেছেন। এই প্রকল্পে আধুনিক বাজার, সড়ক, সেতু, প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে। এই শতাব্দীর গোড়াতেই আসানসোল জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম পুর এলাকা বলে চিহ্নিত হয়। নানা কাজে ভিন দেশ থেকে মানুষ আসছে। এক সময় সাহেবদের স্বর্গোদ্যান ছিল এই আসানসোল। বিলাসবহুল সেই মহল্লা এখন 'আপকার' গার্ডেন বলে পরিচিত। এককালে জঙ্গলে ভর্তি ছিল এই শহর। ঠ্যাঙ্গাড়ে ডাকাতের বিচরণক্ষেত্র এই এলাকা যেদিন থেকে কয়লাখনির দৌলতে মহকুমা হল এবং রাণীগঞ্জ থেকে মহকুমা অফিস উঠে এল—সেদিন থেকেই আসানসোল শহরের বাড় বাড়ন্ত। রাণীগঞ্জ শহর থেকে আসানসোল শহর পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখনও আসানসোল ছিল গহন অরণ্যের মধ্যে সদগোপ আদিবাসীদের ছোট গ্রাম। গোপ-রাজবংশের অস্তমিত শিখা রায় পরিবারের জমিদারী ছিল এই আসানসোল গ্রাম ও বিস্তীর্ণ জঙ্গল। প্রায় তিনশ বছর আগে এই পরিবারের তিনকড়ি রায় এবং রামকৃষ্ণ রায় বনজঙ্গল কেটে আসানসোল শহরের পত্তন করেন। সে হিসাবে আসানসোল শহরের বয়স মোটামুটি তিনশ বছর। কিন্তু শহরের বাড় বাড়ন্ত সুরু হয় রেলষ্টেশনের পত্তনের পর এখন থেকে একশ সাতাশ বছর আগে। বর্তমানে আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খনি অঞ্চল।

।। রাণিগঞ্জ পুরসভা ।।

এই শতাব্দীর গোড়া অবধি আসানসোল মহকুমার নাম ছিল "রাণিগঞ্জ" মহকুমা। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লাখনির পত্তন হওয়ার পর এখানে জঙ্গল কেটে মানুষ জনের বসতি সুরু হয়। তারপর থেকে এই কয়লার আকর্ষণেই যত না ছুটে এল বাঙলার অন্য জায়গার মানুষ, তার বেশি এল বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ

থেকে, যেমন কবে মধুর লোভে ছুটে আসে মধুমক্ষিকা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পিটারসেনের গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, একশ বছর আগেও পুরো মহকুমাটি (তখন অর্থাৎ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ) ছিল ঘন জঙ্গলে ভর্তি। যার মাঝে মাঝে দেখা যেত খুব ছোট সমতল জায়গা ওছোট ছোট জনবসতি। গেজেটিয়ারে পিটারসন আরও বলেছেন, বহু শতাব্দী ধরে ছিল এই অঞ্চলে অদিবাসীদের বাসস্থান। এঁদের বর্ণহিন্দুরা বলতেন 'চুয়াড়'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও এলাকা ছিল এই সব বর্বর দস্যুদের আস্তানা। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বলেছেন, চোযাড় জাতিই রাঢ়ের অধিবাসী।

"অতি নীচকুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়"

ইংবেজ শাসকরা মূলতঃ কয়লা খনির জন্যই ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান থেকে রাণীগঞ্জ রেলষ্টেশন সম্প্রসারিত করেন ও বর্তমান আসানসোল মহকুমার নাম রাখেন 'রাণীগঞ্জ' মহকুমা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিক অবধি রাণীগঞ্জ মহকুমা ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানী 'বেঙ্গল কোলের' হেড অফিস ছিল রাণীগঞ্জের কাছে এগরায। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে কয়লাখনি বাড়তে থাকল, তখন রাণীগঞ্জকে টেক্কা দিয়ে এগিযে গেলে মহকুমা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জ থেকে উঠে আসানসোলে গেল ও মহকুমার নাম পরিবর্তন করে রাখা হল 'আসানসোল মহকুমা'।

রাণীগঞ্জ পুরসভার আয়তন ১৮.৫ বর্গ কিলোমিটার, ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৫ এবং লোকসংখ্যা ৪৮ হাজার ৭০২ জন। রাণীগঞ্জ শহরের সন্নিকটে রয়েছে দামোদর নদের তীরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট কাগজের কল 'বেঙ্গল পেপার মিল'। দামী ও উৎকৃষ্ট কাগজ তৈরীতে 'বেঙ্গল পেপার মিল' ছিল বিখ্যাত। পুরসভা রাণীগঞ্জ শহর এলাকায় নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখলেও বাইরে থেকে শহরের কোন শ্রী নেই বলেই মনে হবে। কারণ অপ্রশস্ত সড়ক, পরিকল্পনাহীন ঘর-বাড়ি ও ব্যবসায়ীদের যথেচ্ছ ভীড় শহরটিকে সেই প্রাচীন আমলেই বেঁধে রেখেছে। রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজবংশের জন্য বিখ্যাত। ঊনবিংশ শতাব্দীর গেড়ার দিকে কাশ্মীর থেকে ভাগ্যের অন্বেষণে এসেছিলেন কয়েকজন ব্রাহ্মণ। শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ রায়না, (যিনি পরে গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিত নামে খ্যাত হন) ছিলেন তাদের অন্যতম। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিতও ছিলেন এদের সঙ্গী। এই গোবিন্দ প্রসাদই সিয়ারসোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। হঠাৎ কয়লার ব্যবসায়ে গোবিন্দ প্রসাদ ধনী হয়ে যান ও ৮টি জেলার জমিদারীর মালিক হন। সিয়ারসোলে প্রকাণ্ড রাজবাড়ি, হাওড়া, রাঁচি, দেওঘর ও বারাণসীতে বাড়ি তৈয়ারী করেন। সিয়ারসোলে হাইস্কুল ও ছাত্রাবাস এবং গৃহদেবতা দামোদরজীর মন্দির নির্মাণ করেন। গোবিন্দ প্রসাদের পুত্র ছিল না, জামাতা মতিলাল মালিয়া পরে রাজা হন। জামাতার বংশধর মালিয়া

পরিবার ছিলেন বরেণ্য। এই রাজবাড়িতে পদধূলি দিয়েছেন কাশীর ভাস্করানন্দ স্বামী, দেওঘরের বালানন্দ স্বামী, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কবি মধুসূদন, বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি, শ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রমুখ। রাণীগঞ্জের উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ী ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া নিজ অর্থে গড়ে তোলেন বনোয়ারীলাল ভালোটিয়া কলেজ।

যেহেতু এর মাটির তলায় প্রচুর কয়লা, তাই খনি থেকে কয়লা তোলার ফলে শহরের তলদেশ ফাঁপা হয়ে গেছে। বালি দিয়ে ভর্তির কোন ব্যবস্থা প্রথম দিকে ছিল না। তাই কয়লা খনি এলাকায় ও যত্রতত্র প্রায়ই ধ্বস নামছে, মাটি বসে যাচ্ছে। আবার শিল্পাঞ্চল হওয়ায় আবহাওয়া দূষণ বেড়ে চলেছে। সব মিলিয়ে শহরটি এখন দুঃ স্বপ্নের নগরীর মত মৃত্যুর দিন গুণছে। যে কোন দিন এই শহর ধ্বসে তলিয়ে যেতে পারে।

।। রাণীগঞ্জ ব্লক ।।

পুরসভা বাদ দিলে রাণীগঞ্জ এলাকা খুব বড় নয়। আয়তন ৯৩.৬৫ বর্গ কিলোমিটার, গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৭, গ্রামের সংখ্যা ৩১ এবং মৌজার সংখ্যাও ৩১, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১ হাজার ৪১৯ জন। তারমধ্যে তপশীল ৩৮ হাজার ৬৩২ এবং উপজাতি ৭ হাজার ৬২৬ জন। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ মোট জমির ১৫ শতাংশ। কাজেই রাণীগঞ্জ ব্লকের লোকজন বেশির ভাগই খনি শিল্পের উপর নির্ভরশীল। গ্রামাঞ্চলে যে সব খনি পরিত্যক্ত হয়েছে, সেগুলির অভ্যন্তরে জল জমলে তাই দিয়ে ফসলের সেচের কাজ চলে। বহু জায়গায় উপরের মাটি ধ্বসে গেছে এবং এইসব এলাকার পার্শ্ববর্তী গ্রাম জনশূন্যও হয়ে গেছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়।

।। কুলটি ব্লক ।।

কুলটি ব্লকটি জেলার পশ্চিম প্রান্ত বিহারের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। বার্ণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানীর জন্য এই ব্লক বিখ্যাত। এই কোম্পানী রেলের ওয়াগন তৈরী করে চলেছে। বহুদূর থেকে কুলটির লৌহচুল্লীর আগুনের লাল আভা দেখা যায়। বিরাট এলাকা নিয়ে এই কারখানা, বহু লোক কাজ করে। ব্লকের আয়তন খুব বেশী নয়, ৮৪.৪৮ বর্গ কিলোমিটার, পঞ্চায়েতের সংখ্যা ৯, গ্রামের সংখ্যা ৯৮ এবং মৌজার সংখ্যা ৬০, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৭৮, তারমধ্যে তপশীল ৩৫ হাজার ৪০৫ ও উপজাতি ৬ হাজার ৭০২। এখন এটি ব্লক পঞ্চায়েতের অধীনে। বার্ণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানীর জন্য লোকসংখ্যার আধিক্য, মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৫ শতাংশ। ব্লকে ছড়িয়ে রয়েছে বহু ছোট-বড় শিল্প কারখানা।

আসনসোল থেকে ২৬ কিমি দূরে মাইথন যাবার পথে মূল রাস্তা থেকে ঘুরেই পাহাড়ের নীচে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। দামোদর নদের তীরে এই মন্দির প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্ন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণপুরে 'ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী' [IISCO] প্রতিষ্ঠিত হয়। কুলটি বরাকরকে 'নোটিফায়েড এরিয়া' বলে ঘোষণা করার পর বরাকর শহরটি মর্যাদা পায়। বরাকর নদীর পশ্চিম তীরে শহরটি অবস্থিত। এটিই হল বৰ্দ্ধমান জেলার পশ্চিম সীমান্তের শেষ শহর ও রেলষ্টেশন। এখানে পাথরের তৈরী সুন্দর রেখ দেউল রয়েছে। এখান থেকে চার মাইল উত্তরে হালদা পাহাড়ে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। রাজা কল্যাণসিংহ্ এর প্রতিষ্ঠাতা। এখানেও মিশ্র সংস্কৃতির প্রবাহ আদি সংস্কৃতিকে ঢেকে দিয়েছে।

।। সালানপুর ব্লক ।।

একেবারে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে জেলার শেষ ব্লক। আয়তন ১৩৪.৯১ বর্গ কিলোমিটার, পঞ্চয়েতের সংখ্যা ১১, গ্রামের সংখ্যা ৭৭ এবং মৌজার সংখ্যা ৭৭, লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৬০ জন, তারমধ্যে তপশীল ৩০ হাজার ৫৩৩ এবং উপজাতি ১২ হাজার ১৩০ জন। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন তৈরীর কারখানা আছে। এই শহরের পত্তন হয় ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কর্তৃক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসেব নামানুযায়ী। প্রথম রেল ইঞ্জিন তৈরী হয় ১৯৫০-৫১ অব্দে। এলাকাটিকে সংরক্ষিত করা আছে, সুন্দর ও মনোরম শহর। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের গেষ্ট হাউস আছে। লোকোমেটিভ ওয়ার্কসে প্রচুর লোক কাজ করেন। এখানে কলেজ, স্কুল, হাসপাতাল, দৈনিক বাজার আছে। রূপনারায়ণপুরে হিন্দুস্তান কেবলস্ এর কারখানা আছে।

।। হীরাপুর ।।

হীরাপুর ব্লকের প্রায় তিনচতুর্থাংশ শিল্প কারখানা ও খনিজ সম্পদে ছেয়ে রয়েছে। দামোদর নদের তীরে আসানসোল ও কুলটি ব্লকের দক্ষিণে অবস্থিত। আয়তন ৬৩.৬৬ বর্গ কিলোমিটার, গ্রামের সংখ্যা ২৭, মৌজার সংখ্যা ২৭, হীরাপুর ব্লকটি এখনও ব্লকপঞ্চায়েতের অধীনে। লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৫৫০ জন। তারমধ্যে ২০ হাজার ৯২৭ জন তপশীল এবং ৪ হাজার ১৭৭ জন উপজাতি অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ। আসানসোলের অন্য ব্লকের মতই মিশ্র সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেছে। দামোদর নদের তীরবর্তী অঞ্চলে চাষাবাদ হয়। দামোদর নদের তীর বরাবর বহু শিল্প কারখানাও গড়ে উঠেছে।

॥ 'নোটিফায়েড এরিয়া' ॥

দুর্গাপুর ও আসানসোল মহকুমার কতকগুলি শিল্পাঞ্চল যা আধা শহর হিসাবে গড়ে উঠেছিল, সেগুলিকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে ও শহরের উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা করে দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'নোটিফায়েড এরিয়া' বলে ঘোষণা করেছেন। সেগুলি হল, দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়া, কুলটি-বরাকর নোটিফায়েড এরিয়া, বার্ণপুর নোটিফায়েড এরিয়া এবং নিয়ামতপুর নোটিফায়েড এরিয়া। এর প্রত্যেকটিতে উন্নয়নের জন্য একটি করে ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা হয়েছে।

দুর্গাপুর নোটিফায়েড এরিয়ার লোকসংখ্যা ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৭ শত ৯৮; তারমধ্যে তপশীল ৩৬ হাজার ৩৫৫ জন এবং উপজাতি ৪ হাজার ৫৯৩; এর সদর দপ্তর সিটি সেন্টার জি. টি. রোডের ধারেই। পরিকল্পিত নগর বলে এর সড়ক বেশ প্রশস্ত, মোড়ে মোড়ে পার্ক; প্রশাসনিক সুবিধার জন্য জোনে ভাগ করা হয়েছে। সব কলকারখানা এখানেই অবস্থিত। সড়কের দু পাশে কেয়ারী করা গাছ, সাজানো-গোছানো দেখে মনে হবে কোন বিদেশী শহর। আবহাওয়া চরম ভাবাপন্ন; গ্রীষ্মে ৩১°C থেকে ৩৬°C পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এবং শীতকালে ৫°C থেকে ১৫°C পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়। দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সেরা 'কসমোপলিটন' শহর হিসাবে বিখ্যাত।

কুলটি বরাকর নোটিফায়েড এরিয়ার লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ১ হাজার ২৬২, তার মধ্যে তপশীল ১৪ হাজার ৭৬৭ ও উপজাতি মাত্র ৮৯০, অথরিটির দপ্তর কুলটিতে অবস্থিত, সম্প্রতি বরাকর ও কুলটি শহরের শ্রী-ছাঁদ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলেছে।

বার্ণপুর নোটিফায়েড এরিয়ার লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার, তার মধ্যে তপশীল মাত্র ৭ হাজার ও উপজাতি মাত্র ৬ হাজার। বার্ণপুর আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর দৌলতে এমনিতেই গোছানো শহর ছিল, তাকে সুদৃশ্য ও রমণীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

নিয়ামতপুর নোটিফায়েড এরিয়ার লোকসংখ্যা ৩৮ হাজার ৫৩০ এবং দিসেরগড় নোটিফায়েড এরিয়ার লোকসংখ্যা মাত্র ১৩ হাজার ১৮২; যেহেতু আসানসোল মহকুমার অন্য শিল্প কেন্দ্রগুলিকে নেটিফায়েড এরিয়া করা হয়েছে, সেজন্য এই দুটি ছোট শহরকেও নোটিফায়েড আওতায় এনে প্রগতির সমতা রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে।

॥ রাণীগঞ্জ-আসানসোলে কয়লাখনির ইতিবৃত্ত ॥

জেলার খনিজ শিল্পে সমৃদ্ধ রাণীগঞ্জ-আসানসোলের খনিশিল্পের ইতিবৃত্ত বলে

এই পর্ব শেষ করব। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জে প্রথম ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কয়লা উত্তোলন সুরু হলেও এর বহু আগে থেকে এতদঞ্চলের লোকেরা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য এখানে ওখানে মাটি খুঁড়ে কয়লা তুলতে থাকে। যতদূর জানা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর সুরু থেকে এই প্রান্তের বরাকর, ডামালিয়, চিনাকুড়ি, এথোড়া, প্রভৃতি জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে মাটি খুঁড়ে কয়লা তোলার কাজ সুরু হয়। এইগুলি ছিল ছোট ছোট 'পুকুরিয়া খাদ', অর্থাৎ পুকুর কাটার মত মাটি কেটে কয়লা তোলা হত। কোনটাই ত্রিশ-চল্লিশ ফুটের বেশি নয়। এই সংবাদ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়লে প্রথম ব্রিটিশ কোম্পানী 'জোন্স' রাণীগঞ্জের কাছে এগরাতে তাঁবু ফেলেন, সে ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তাঁরা দেখলেন পুকুর খাদের কয়লা খুব উন্নতমানের নয়; ইংলণ্ডের নিউক্যাসেল থেকে আনা কয়লার মত উৎকৃষ্ট নয়। কিন্তু তাঁরা দেখলেন যে যদি গভীরে যাওয়া যায়, তবে ভাল কয়লা পাওয়া যেতে পারে। 'জোন্স' কোম্পানী ৯০ ফুট গভীর করলেন খাদ, এইরকম তিনটি খাদ থেকে এগরায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রথম কয়লা তোলা সুরু হল ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রিটিশ কোম্পানীর সাফল্য দেখে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ এই শিল্পে মনোনিবেশ করেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'কার টাগোর' কোম্পানী স্থাপিত হয় এবং নারানকুড়ি ও এগরার খনিগুলি থেকে কয়লা নিয়ে দামোদরে নৌকাযোগে কয়লা কলকাতাতে পাঠাতে সুরু করেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে এই 'জোন্স' কোম্পানীই 'বেঙ্গল কোল' কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয় ও সারা ভারতে উৎকৃষ্টমানের কয়লা সরবরাহের জন্য সুনাম অর্জন করে। এই সময় সিয়ারসোলের রাজা গোবিন্দ পণ্ডিত, রাণী স্বর্ণময়ী, কৈলাসনাথ রায়, তারাচাঁদ পাল প্রভৃতি বাঙালি ব্যবসায়ীগণ কয়লা শিল্পে আকৃষ্ট হন।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত দুর্গাপুর থেকে বরাকর পর্যন্ত জঙ্গলে ভর্তি ছিল—দুর্গাপুর জঙ্গল, হাড়ভাঙ্গা জঙ্গল এর উদাহরণ। এই জঙ্গলের কাঠ থেকে ভাল কাঠ কয়লা হত। সেই কাঠ কয়লাতেই (যখন .কয়লা আবিষ্কৃত হয় নাই) গ্রামে গ্রামে কামারশালের চুল্লী হত। এই সব চুল্লীতে আকরিক লোহা গলানো ও ইস্পাতের ফাল, কাঠারী, কোদাল, কুড়ুল, বেলচা প্রভৃতি চাষের যন্ত্রপাতি তৈরী হত। তৈরী হত বল্লম, দা, খোঁচা, তরোয়াল, হাতিয়ার। বীরভূম জেলার লোহাপুর, লোহারডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আর বর্দ্ধমান জেলার লালমাটিয়া, কাঁকরডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আকরিক লোহা সংগৃহীত হত। বর্দ্ধমানের বনপাশ, কামারপাড়া, কামারপুর, শালডাঙ্গা, এথোরা, ইকড়া, এগরা, উখরা প্রভৃতি গ্রামে তিনশ বছর আগে ছোট ছোট লোহাঘাঁটি ছিল। সেই ঘাঁটিতে আমাদের দেশের কামাররা লোহার দ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করত কাঠ কয়লার চুল্লীতে। এদের নৈপুণ্যে উৎসাহিত হয়ে, রাণীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রের ও রেল যোগাযোগের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে

"বেঙ্গল আয়রন এণ্ড স্টীল কোং" কুলটিতে প্রথম লৌহ ঢালাই কারখানা স্থাপন করেন। এরাই প্রথম বর্দ্ধমান জেলার এই প্রান্তে লৌহ গলনের কাজে কয়লা ব্যবহার করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কয়লা নিয়ে যাওয়ার প্রধান অন্তরায় ছিল যোগাযোগের অভাব। নদীপথে মেদিনীপুর হয়ে কলকাতা বেশ ঘুরপথ। অবশেষে রাণীগঞ্জ ও হুগলীর ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় ও সৈন্য বিভাগের সহায়তায় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ বসল। রেল, ষ্টিমার, জুটমিল, জেসপ ও টাটা কোম্পানীর কাছে ক্রমশ কয়লার চাহিদা বাড়তে থাকে, ফলে কোলিয়ারীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বাঙলি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্রিটিশ কোম্পানী জোন্স্, জেসপ, আরস্কিন এগিয়ে এল কয়লা শিল্পের বাজারে। ক্রমে ক্রমে সড়ক পথে যোগাযাগ ব্যবস্থা ও জি. টি. রোডের সংস্কার হওয়ায় নৃতন নৃতন শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে লাগল। উন্নত কয়লার জন্যই রাণীগঞ্জে উৎকৃষ্ট কাগজের কল, 'বেঙ্গল পেপার মিল' স্থাপিত হয়। এছাড়া লোহার অনেক ছোট ছোট 'ঢালাই কারখানা' স্থাপিত হয়। কয়লা শিল্পের বিস্তারের সাথে সাথে লৌহ শিল্পের বিস্তার স্থানীয় এলাকা অর্থনৈতিক প্রগতির জোযার আসে। বর্দ্ধমানের কৃষিভিত্তিক পরিবেশের সঙ্গে শিল্প সংস্কৃতির অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটে। কয়েক বৎসবের মধ্যে দুর্গাপুর ও আসানসোল এলাকায় শতকরা ষাটজন কৃষির উপর ও চল্লিশজন শিল্পের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। স্থানীয় আদিবাসী ডোম, বাগ্দী, বাউড়ী, কাহার, কৌড়া প্রভৃতি কৃষি শ্রমিকগণ শিল্প শ্রমিকে রূপান্তরিত হন। শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা কয়লাখনিতে কেউ কেরাণী, কেউ এক্সকিউটিভ, কেউ কারিগর, কেউ ম্যানেজার, কেউ ইঞ্জিনীয়ারের কাজ পেয়ে যেন আলোর মুখ দেখল। এ দেশে খনি বিজ্ঞানে বিদ্যার চল ছিল না, শিক্ষারও সুযোগ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে রাণীগঞ্জে স্থাপিত হয় ইভনিং মাইনিং ক্লাস শিবপুর কলেজে চালু হল কোর্স—খনি বিজ্ঞানের। পরে স্থাপিত হয় ধানবাদে "ইণ্ডিয়ান স্কুল অব মাইনস্"। এখান থেকে শিক্ষিত হয়ে মাইনিং ম্যানেজারের চাকুরী পেতে লাগল ট্রেনীরা। দেশীয় শ্রমিকদের দিয়ে বিস্তীর্ণ কয়লাখনির খননকার্য ও কয়লা উত্তোলন বাকী পড়তে লাগল। তখন খনির মালিকরা খনি শ্রমিক আনতে লাগলেন বিহারের গয়া, গিরিডি, দুমকা, আরা, হাজারীবাগ এবং উত্তর প্রদেশের আজমগড়, গোরখপুর, উড়িষ্যার ময়ুরভঞ্জ, গঞ্জাম, বহরমপুর এবং মধ্যভারতের বিলাসপুর থেকে। যন্ত্রপাতি চালনা ও মেরামতির জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে এলেন দক্ষ কারিগর। ফলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা বহুরকম মানুযের মেলামেশায় এখানে গড়ে ওঠে এক অভিনব সংকর-সংস্কৃতি। বাঙালির রামায়ণ গান ও হিন্দুস্তানীর 'রামসীতা' নাটকের মিশ্রণে তৈরী হয়েছে এখানের নিজস্ব গান নিজস্ব ঘরানার 'রামলীলা'। আগে বাংলার ঘরে ঘরে ছিল মণ্ডা ও বাতাসা। এখন সেখানে পশ্চিম থেকে এসেছে প্যাড়া, লাড্ডু। তাই দিয়ে চলছে অতিথি আপ্যায়ন। বাঙলার দোচালা, চারচালা ও আটচালা

গৃহ শিল্পের সঙ্গে টালি ও খাপড়া ছাউনী সখ্যতা স্থাপন করেছে। চৌকোণাকৃতি খড়োর চৌচালার মত ও শীর্ষে গম্বুজাকৃতি শিবমন্দির পশ্চিমের লম্বা গম্বুজে রূপান্তরিত হয়েছে। হনুমানজী ও বজরাংওয়ালী আজ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পাশে ঠাঁই করে নিয়েছে। প্রত্যেক কোলিয়ারীতে ছুটির দিন চলে 'মুরগীর লড়াই' কিম্বা 'কুস্তির লড়াই', কুস্তির আসরটা জিইয়ে রাখে ছোট বড় কুলি পালোয়ানরা। রাত্রে বসে লেটো, যাত্রাগান, রামলীলা, তরজা ও কবিগানের আসর। আসর বসে কীর্তন ও কাওয়ালী গানের। কখনো সখনো সারা রাত ধরে চলে গ্রামের এই লোক সঙ্গীতের আসব। লোকসঙ্গীতের উপর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে এই অঞ্চলের। বাবু ভাইয়াদের ঘরে সত্যনারায়ণের কথা, পাঁচালী কিম্বা সুবচনীর কথা হলে সবাই আসে। সেখানে বাঙালি, বিহারী, গুজরাটি, মারাঠি, উড়িয়ার মিলন মেলা বসে। লোকগীত, লেটো, ভাদু, ভাঁজো, তোষলা, ঘেঁটু ও হোলি উৎসবে সবাইমেতে ওঠে। উৎসবের এই মিশ্র সংস্কৃতি আশ্চর্য এক মরমী সূতোয় যেন সবাইকে বেঁধে রাখে।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Bengal District Gazetteers, Burdwan (1910)– J. C. K. Peterson
2. Statistical Accounts of Bengal– W. Hunter
3. Draft out line of Eighth Five Year Plan (1990-95), Burdwan– Dist Planning Committee
4. District Plan, Burdwan 1989-90– Govt. of W. Bengal
5. বৰ্দ্ধমান সম্মিলনী হীরকজয়ন্তী সংখ্যা– ১৯৭৪
6. শারদীয় বিজয় তোরণ '৮১, '৮২, '৮৩, '৮৬, '৮৭, '৮৮
7. বৰ্দ্ধমান জেলার পুবাকীর্তি ও সংস্কৃতি– বৰ্দ্ধমান জেলা পরিষদ
8. বৰ্দ্ধমান পবিচিতি– শ্রী নারাযণ চৌধুবী ও অনুকূল চন্দ্র সেন
9. পশ্চিমবঙ্গেব সংস্কৃতি– বিনয় ঘোষ
10. বাঙলাব লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড) আশুতোষ ভট্টাচার্য
11. Block Profile, Dist-Burdwan March 1988– Govt. of W. Bengal
12. History of Bengal– Stewart
13. Some Historical and Ethnical Aspects of Burdwan Ditst– W. B. Oldham 1894.

চতুর্থ পর্ব

শিক্ষা বিস্তারে বর্দ্ধমান

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রাচীনতার ঐতিহ্যবাহী এই বর্দ্ধমান। পঞ্চদশ শতকের আগে এই বর্দ্ধমানে শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন ছিল তা জানা না গেলেও মঙ্গলকাব্যে ঐ সময়কার শিক্ষাব্যবস্থার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে জানা যায়, বর্দ্ধমানের গ্রামে গ্রামে তখন পাঠশালা ছিল এবং বিশেষ বিশেষ বর্ধিষ্ণু গ্রামে টোল, চতুষ্পাঠি প্রভৃতি সংস্কৃত পড়ার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী প্রধান মহম্মদ বখতিয়ার বণিকের বেশে (ঘোড়া ব্যবসায়ী) আঠারোজন সঙ্গী (অশ্বারোহী) নিয়ে নদীয়ায় প্রবেশ করলেন। সম্রাট লক্ষ্মণ সেন পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন উত্তরবঙ্গে ও পরে ঢাকায়। সেই সঙ্গে সুরু হল বর্দ্ধমানে মুসলমান সুলতানের রাজত্ব এবং ফলে এসে গেল মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতি। ১২০১ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত যুগকে হিন্দু যুগ বলে—এই সময় বর্দ্ধমানে সমগ্র বঙ্গের মত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার চল ছিল। প্রাকৃত ও তার অপভ্রংশকে ভিত্তি করে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়। বিশেষ করে মাগধী প্রকৃতি ও সৌরসেনী অপভ্রংশের মিশ্রণে বাংলা ভাষার আদি-রূপের উদ্ভব হয়। বাংলা সাহিত্যে এই আদি রূপকে চর্যাপদ বলে। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি রচিত পদগুলি চর্যাপদ নামে খ্যাত। এই চর্যাপদগুলির মধ্যেই রয়েছে সেকালের শিক্ষা, সভ্যতা ও সমাজ বিন্যাসের পরিচয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯১৯ খ্রীঃ), সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬ খ্রীঃ) এবং ডঃ সুকুমার সেন প্রমাণ করেছেন চর্যাপদগুলি বৌদ্ধগান ও দোঁহা। এগুলিই বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ—অবহট্টের নির্মোকমুক্ত বাংলা ভাষার প্রাচীনতম পদচিহ্ন। রাঢ় বর্দ্ধমানে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ পরিক্রমা করেছিলেন, তার নিদর্শন গ্রাম বর্দ্ধমানের বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে রয়েছে। চর্যাপদে দেখা যায়, বিদ্যা ছিল গুরুমুখী। গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেন এবং সেই উপদেশ জনগণের কাছে শিরোধার্য বলে গণ্য হত। দোহাগুলির বেশিরভাগই অধ্যাত্মমূলক। জীবন ধর্মের আচার ও আচরণে গ্রহণযোগ্য ও পালনীয় বিধিনিষেধ। যেমন :—

ভবণই গ্রহণ গম্ভীর বেগে বাহী
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী॥

ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই,
পারগামী লো অ নির্ভর তরই

অর্থাৎ ভবনদী গ্রহণ গম্ভীর, বেগে প্রবাহিত, দুইধারে কাদা, মাঝে থই নাই, ধর্মের তরে চাটিল সাঁকো গড়িয়াছে, পারগামী লোক নির্ভয়ে তরে।

সে সময় উচ্চবর্ণের মানুষ গুরুগৃহে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চ্চা করতেন। তার উদাহরণ বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত পোখরণ গ্রামের শিলালিপিই প্রমাণ। কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষ যাঁরা বর্দ্ধমানের আদি বাসিন্দা সেই কিরাত, শবর, ডোম প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ লেখাপড়া শিখত না। জীবনের আচার আচরণে একটি শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার জন্য বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ গান, দোঁহা প্রভৃতি রচনা করেছিলেন এবং এগুলিতে বেশি করে সেই নিম্নবর্ণেরই উল্লেখ আছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, চর্যাগীতিতে সমসাময়িক জীবনের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আর কোথাও নাই। চর্যাগীতিতে যে জীবনচরিত ক্ষণোদ্ভাসিত তাহা দেব-দেবীর নয়, রাজা উজীরের নয়, ব্রাহ্মণ শুদ্রের নয় * * * সেকালের ছোটবড় সাধারণ লোকের প্রতিদিনের জীবন যাত্রার ও আচরণের বিম্বপ্রায় প্রতিরূপ। অর্থাৎ চর্যাগীতির মধ্য দিয়ে সেকালে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেবার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন, 'সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই গীতিগুলি রচিত হয় নাই, হইয়াছিল বৌদ্ধ সহজ সাধনার গূঢ় ইঙ্গিত ও তদনুযায়ী জীবনাচরণের আনন্দকে ব্যক্ত করিবার জন্য।' আর পরবর্তী সময়ে এগুলিই সাধারণ নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকশিক্ষার উপকরণ হিসেবে কাজ করেছে ব্যাপক।

নিম্ন সম্প্রদায়ের ও সাধারণ মানুষ টোল বা চতুষ্পাঠীতে না গিয়েও জীবন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করত। যেমন—

'উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহে
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী
নানা তরুবর মৌলিলরে গঅণত লাগেলী ডালী
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।

এখানে শবরকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে: ওগো উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোলে ভুল করিও না। দোহাই তোমার আমি তোমারই গৃহিনী, নামে সহজ সুন্দরী। নানা তরু মুকুলিত হইল, গগন স্পর্শ করিল ডাল, কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী—একেলা শবর এ বন ঘুরিয়া বেড়ায়।'

অতএব বলা যায় আজকের মাতৃভাষা বাংলা মাগধী প্রাকৃত ও সৌরশেনি অপভ্রংশের প্রাচীন রূপ নিয়ে যখন চলতে সুরু করেছিল তখন রাঢ় বর্দ্ধমান ও

রাঢ় বঙ্গের নিম্নসম্প্রদায় ডোম, কাহার, শবর, কিরাতগণই স্তন্য দিয়ে তাকে লালন করেছিল।

সংসারের তত্ত্ব কথা অতি সহজ ও সাধারণভাবে বলা হয়েছে যাতে নিম্নসম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেমন:

কুলেঁ কুলেঁ মা হোইরে মূঢ়া উজুবাট সংসারা
বলি ভিন একুবাকুন ভুলই রাজপথ কন্ধারা॥
মায়া মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝসি যাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভক্তি ন পুচ্ছসি নাহা

অর্থাৎ হে মূঢ় কূলে কূলে ঘুরিয়া ফিরিও না, সংসারে সহজ পথ পড়িয়া আছে। সম্মুখে যে মায়ামোহ সমুদ্র তাহার যদি না বোঝা যায় অন্ত না পাওয়া যায় থই, সম্মুখে যদি না দেখা যায় কোন ভেলা বা নৌকা, তবে এ পথের যাহারা অভিজ্ঞ পথিক, তাহাদের নিকট সন্ধান জানিয়া লও।

প্রাজ্ঞ বা পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া নিগূঢ় তত্ত্ব কথা বলার অধিকার কারো ছিল না। তাই সিদ্ধাচার্যগণ সাধারণ মানুষের কথা দোঁহার মধ্যে উল্লেখ করলেও বৈষ্ণব বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন:—

পণ্ডিঅ লোঅখমহ মহূ এত্থু ন কি অই বি অপু
জো গুরু অণে মই সুঅই তাই কিং কহমি সুগোপনু

অর্থাৎ পণ্ডিত লোক আমাকে ক্ষমা কর, এখানে কিছু বিকল্প করা হইতেছে না। যাহা আমি শুনিয়াছি সুগোপন গুরুবাক্যে তাহা আমি কি করিয়া বলি।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য লুইপাদ, কাহ্নপাদ, সরহপাদ, প্রভৃতি প্রাচীনতম বাংলা ভাষার এই রূপকে লোকশিক্ষার কাজে ভাবের ও তত্ত্বের বাহন করেছিলেন এবং এইভাবেই রাঢ়বঙ্গে এবং রাঢ় বর্দ্ধমানে দরিদ্র শ্রেণীর নিম্ন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ভাষা সংযোগের একমাত্র ভাষা হিসেবে পথ করে নিয়েছিল।

অনার্য ভাষা গোষ্ঠী তাই ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ে, নিজ সঙ্কীর্ণ সমাজ ও গোষ্ঠীর মধ্যে বেঁচে থাকে। তাকে পথ করে দিতে হয় আগামী দিনের জন্য জনসাধারণের বাংলা ভাষাকে।

হিউয়েন সাঙ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই অঞ্চলের লোকজনের যা বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রণিধান যোগ্য। তিনি কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদে অবস্থিত) থেকে ৭০০ লীর কিছু বেশী দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত উঁচু [WU (=U)—TU] প্রদেশে এসেছিলেন। তিনি বর্ণনায় বলেছেন, এখানকার জনসাধারণ দুর্ধর্ষ, বেশ লম্বা এবং ময়লা রঙের। কথাবার্তায় এবং আচার আচরণে তারা মধ্যভারতের লোকেদের চেয়ে আলাদা। পড়াশুনায় তারা

অক্লান্ত এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধ। বহু ধর্মসম্প্রদায় ছিল বিশৃঙ্খলভাবে।' হিউয়েন সাঙ যাঁদের পড়াশুনায় অক্লান্ত বলেছেন, তাঁরা বেশির ভাগই বৌদ্ধ। অর্থাৎ বৌদ্ধরা নিজ ধর্মের প্রসারে পড়াশুনা করতেন এবং তখন ছাপাখানা থাকার প্রশ্নই উঠে না—তালপত্র, ভূর্জপত্র বা গাছের ছালে এইসব পুঁথি লেখার কাজ চলত হিউয়েন সাঙ এর বিবরণী থেকে জানা যায়, এই দেশের রাজা নিজের হাতে পুঁথি নকল করে ধর্মীয় উপহার প্রেরণ করেছেন চীন সম্রাট তেসাঙ্ (Te Tsung) কে। এই পুঁথিটি হলো সংস্কৃত পুঁথি মহাযান ধর্মের। নাম হলো Ta-fang Te-hua-yea-ching হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণ থেকে তাম্রলিপ্ত গিয়েছিলেন, দামোদর অতিক্রম করে বাদশাহী সড়ক ধরে—কাজেই রাঢ় বৰ্দ্ধমানের তৎকালীন অধিবাসীদের শিক্ষা দীক্ষা পরিচয় তা থেকে জানতে পারি। সেকালে শিষ্যগণ গুরুমুখী ছিলেন। শিক্ষার মূলতত্ত্ব ছিল অমৃত আহরণ করা। বৈদিক ঋষিগণ এই অমৃততত্ত্বকেই পূর্ণশিক্ষা বলেছেন। 'যেনাহং নামৃতস্যাম, তেনাহং কিম কুর্যাম—যে অমৃতের সন্ধান দিতে পারে না, তা নিয়ে কি করব—মৈত্রেয়ীর প্রশ্নই ভারতের চিরকালের শিক্ষাদানের প্রশ্ন। শিক্ষা শেষে গুরুর উপদেশ তৈত্তিরীয় উপনিষদে—'সত্যং বদ, ধর্মং চর, স্বাধ্যায়ন মা প্রমদঃ' সত্য বল। ধর্ম আচরণ কর। অধ্যয়ন থেকে বিরত হয়ো না। বা 'মাতৃদেব ভব! পিতৃদেব ভব। আচার্যদেব ভব'। অর্থাৎ মাতা দেবতা হোক, পিতা দেবতা হোক, গুরুদেবতা হোক। বৈদিক যুগের এই ধারাবাহিকতা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের শিক্ষাচার্যগণও অনুসরণ করে এসেছেন। ধর্মাচারণ ও শিক্ষাদানকে একটি দর্শনে পরিণত করেছিলেন তাঁরা। চর্যাপদগুলিতে জীবন ধর্মের পরিচয় থাকলেও অধ্যাত্মসাধনা ও নীতিশিক্ষাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। বৈদিক শিক্ষা যেমন আশ্রমিক ছিল, বৌদ্ধ ও জৈন শিক্ষা তেমনি মঠ-সংঘ ও বিহার কেন্দ্রিক ছিল। অনুমান করা যায় বৰ্দ্ধমানের (ভরতপুরে বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে) বহু স্থানে বৌদ্ধ ও জৈন বিহার ও স্তূপ ছিল এবং সেখানে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। সংস্কৃত ভাষাকে পানিনি শিষ্ট করে তুললেও আর্যাবর্ত ও বঙ্গে তা পণ্ডিতজনের লেখ্য ভাষা ছিল, বৌদ্ধগণও সংস্কৃত ছেড়ে অৰ্দ্ধমাগধী বা পালি ভাষার প্রচলন করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্বাণের কয়েক শতাব্দীপরে রাঢ় বৰ্দ্ধমানে প্রাকৃত ও অবহট্টের প্রকোপে প্রাচীনতম বাংলা ভাষার সৃষ্টি নিঃশব্দে সুরু হয়ে যায়। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সেই বৈদিক গুরুর পথ অনুসরণ করেই শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। যা পরবর্তী কালে জনগণের সম্পদ হয়ে যায়। শিক্ষা চিরকালই রাজানুগ্রহের বস্তু ছিল। বাংলায়-গুপ্ত-পাল-সেন রাজের সময়ে সেটা প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত। ষষ্ঠ শতাব্দীর মহারাজ বিজয়সেনের তাম্রশাসন যা বৰ্দ্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে পাওয়া গিয়েছে তার ভাষা সংস্কৃত এবং অক্ষর ব্রাহ্মী। এছাড়া ধর্মপালের হালিমপুর তাম্রশাসন (অষ্টম শতাব্দীর শেষ), দেবপালের

মোঙ্গের তাম্রশাসন (নবম শতাব্দীর প্রথম), মহীপালের বাণগড় তাম্রশাসন (দশম শতাব্দীর শেষ), বল্লাল সেনের নৈহাটি তাম্রশাসন (দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম), এবং লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন (দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়)—সবই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কথ্য ভাষাকে তখন লেখ্য ভাষার মর্যাদা দেওয়া হত না। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত পাল ও সেন রাজত্বে শিল্প-শিক্ষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা লক্ষ্যণীয়। পাল যুগেব ভাস্কর বীত পাল, ধীমান, আচার্য অতীশ, দীপঙ্কর, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ চক্রপাণি, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী ও সেন যুগের শাস্ত্রজ্ঞ শূলপাণি, ধোয়ীকবি এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ রাঢ় বর্দ্ধমানকে প্লাবিত করেছিল।

রাঢ় বঙ্গের সর্ব্বপ্রাচীন বাংলায় লেখা কাব্য 'শূণ্যপুরাণ'। ধর্ম ঠাকুবেব পূজা-পদ্ধতি কাব্যের আকারে লেখেন বর্দ্ধমান জেলার মেমারীর কাছে বল্লুকানদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রামের কবি রামাই পণ্ডিত। বর্তমানে বল্লুকানদী ও সেই গ্রামের অস্তিত্ব গবেষণার বিষয়। সে দশম শতাব্দীর কথা, গৌড়ের সম্রাট তখন ধর্মপাল। শূন্যপুরাণ সুপ্রাচীন বৌদ্ধ কাব্য, এতে আছে ধর্মঠাকুরের কোন মূর্তি ছিল না, নিবাকার বা শূণ্যাকার, তাই নাম শূন্য পুরাণ:

বাড়ীমোর বল্লুকার
পূজি শ্রীনৈরাকার
শূন্যমূর্তি ধ্যান করি
সাকার মূর্তি ভজি
পূর্বমুখে পূজা করি
পঞ্চম বেদ পড়ি

শূন্য পুরাণের কবি রাঢ় বর্দ্ধমানের রামাই পণ্ডিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

১২০১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ বখতিয়ার রাঢ় বর্দ্ধমানের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে নদীয়ায় যান ও লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য জয় করেন। তারপর থেকেই রাঢ় বর্দ্ধমানে মুসলমান সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। সংস্কৃত, বাংলা, পালি ভাষার সঙ্গে আর একটি মাত্রা যোগ হল ফারসী ভাষার। গড়ে উঠল মসজিদ, মাদ্রাসা ও মোক্তব, আরবি ও ফারসী ভাষা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র টোল-চতুষ্পাঠী পাশাপাশি। মুকুন্দরামের স্বগ্রামে রক্ষিত সন ১০৪৭ সাল (বাংলা) ১ লা ফাল্গুনের দলিলে দেখা যায়, মুসলমান সুলতানের ফারসী ভাষায় খোদাই করা মোহর ছাপ অর্থাৎ রাজ্য পাটের সরকারী শাসন ব্যবস্থায় ছিল সুলতানী ভাষা—আরবী ফারসী এবং সাধারণ মানুষের শিক্ষা-সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত ও বাংলা।

আকবর দিল্লীর সম্রাট হয়েই তাঁর রাজ্যকে সুদূর বর্দ্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত করেন।

বর্দ্ধমানের শাসনকর্তা শের আফগান শিক্ষাবিস্তারে নিজে একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বেগম মেহেরউন্নিষা একজন বিদূষী মহিলা ছিলেন। শের আফগান মক্তব ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেহেরের অনুরোধেই।

দিল্লীর মোগল সম্রাটের সঙ্গে বর্দ্ধমানরাজ শেরআফগানের পত্র আদান প্রদান হত আরবি বা ফারসী ভাষায়। ধীরে ধীরে গ্রাম গঞ্জেও মাদ্রাসা ও মক্তব গড়ে ওঠে। মেহেরউন্নিষার যখন বিয়ে হয় শের আফগানের সঙ্গে তখন তার বয়স পনেরো। শের আফগান অন্তঃপুরে মৌলবী রেখে মেহেরউন্নিষাকে উর্দু, আরবি ও ফারসী ভাষা শেখান। পরবর্তীকালে এই মেহেরউন্নিযাই দিল্লীর সম্রাটের বেগম হন ও পরোক্ষে ভারতশাসন পরিচালনা করেন ১৫ বৎসর ধরে (১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) তার পটভূমিকা বর্দ্ধমানেই রচিত হয়েছিল।

প্রাচীন বর্দ্ধমানের অস্তিত্ব রয়েছে বেড়ের নবাব বাড়িতে। এই মুসলমানগণ বংশ পরম্পরা মুসলমান ছাত্রদের জন্য মক্তব চালিয়ে এসেছেন। এখানে আরবি ফারসী শিক্ষা দেওয়া হত এবং গরীব ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। বর্দ্ধমান রাজসভায় ভারতচন্দ্র কিছুদিন অতিবাহিত করেন। তাঁর রচনায় বর্দ্ধমানে শিক্ষা ব্যবস্থার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের লেখায় আছে:

"দ্বিতীয় গড়েতে দেখ যত মুসলমান,
সৈয়দ, মল্লিক, সেখ মোগল পাঠান।
তুর্কী আরবি পড়ে ফারসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে।

এইসময় উচ্চ বংশের মুসলমান যথা সৈয়দ, মল্লিক, সেখরা তুর্কী, আরবি ও ফারসী পড়তেন। সুলতানের রাজদরবারে বা প্রশাসন বিভাগে চাকুরীর জন্য হিন্দু ছেলেরাও ফার্সী পড়তে লাগলো।

বর্দ্ধমানের বাদশাহী নাম—শরিফাবাদ। শরিফের উর্দু অর্থ সম্ভ্রান্ত। মুসলমান শাসনের আগেই বর্দ্ধমান শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অভিজাত ছিল। মুসলমান শাসনের সময় পীর ও পয়গম্বরগণও শিক্ষাবিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। আইনী আকবরীতে আছে, পীর বাহারাম সাক্কা সম্রাট আকবরের রাজদরবারে একজন দার্শনিক, কবি ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, তিনি সুফী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁর শিষ্য ছিলেন। হিজরী ৯৭০ অব্দে (১৫৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি বর্দ্ধমান আসেন ও অল্প কয়েকদিন বাদে দেহ রাখেন। ময়ুরমহলে তাঁর সমাধি আছে। কবি পীরবাহরাম হিন্দু ও মুসলমানদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করতেন। তিনি কয়েকটি মিলন কেন্দ্র ও ধর্ম শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সম্রাট আকবর এই সাধক কবির একজন পরম ভক্ত ছিলেন। সাক্কার দেওয়ান বা কবিতার সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।

বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে রক্ষিত দুটি খুব সুন্দর দেওয়ান (কবিতা) পার্সী ভাষায় আছে। বর্দ্ধমানে থাকা কালে তিনি কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন (Persian works ms–251 and 365)। বাহ্‌রাম সাক্কার কবিতা জীবনধর্মী ও মর্মস্পর্শী ও গভীর ধর্মভাবাচ্ছন্ন। এখনও পীরবাহারামের আস্তানায় সেবকরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে এই দেওয়ান পাঠ করেন। কবিতাগুলি সকেস্তা—মাত্রা ও ছেদহীন ফারসী ভাষায় লেখা। একটি কবিতার অনুবাদ :

আমি আত্ম নিগ্রহের (রূঢ়তা) ভেঙে ফেলেছি
আমি দেখবো তাতে কি হয়?
আমি অপযশের (ভালবাসার) বাজারে বসেছি,
আমি দেখবো তাতে কি হয়?
আমি গর্হিতভাবে সাধু সংসর্গে জীবন অতিবাহিত করেছি
আমি দেখবো তাতে কি হয়?
লোকে আমায় সময় সময় ধার্মিক
আবার পরক্ষণেই লম্পট আখ্যা দেয়
লোকে যা ইচ্ছে বলুক আমি তাই মানি
আমি দেখবো এতে কি হয়?

—বাহারাম।

শের আফগানের বেগম মেহেরউন্নিষা কেবল নিজেই আরবি ফারসী ভাষা শেখেন নি, তিনি ফারসীভাষা শিক্ষার বিস্তারে শের আফগানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন।

"বর মাজারে মা গরীবাঁ নে চেরাগে যে গুলে
নে পারে পারওয়ানা সোজাদনে সাদায়ে বুল বুলে।"

অর্থঃ আমার ন্যায় দীন দরিদ্রের কবরে কোন প্রদীপ জ্বলবে না, কোন ফুলও দেওয়া হবে না। কোন প্রেমিক পতঙ্গের পালক এখানে পুড়বে না, কোন বুলবুলের আওয়াজ শোনা যাবে না।

এই লাইন দুটি মেহেরউন্নিষার রচনা। মেহেরের যৌবন কেটেছে এই বর্দ্ধমানে। শিক্ষাবিস্তারে যেমন সক্রিয়া ছিলেন, কবিতা রচনা করেছেন বেশ কয়েকটি। নূরমহালী বাদশা, দুদাসী পেশোয়াজ, পাঁচতোলিয়া উড়ানি, কিনারী ফর্স চন্দনী—পোষাক ও অলঙ্কার আভরণ অভিজাত মুসলমান সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় নূরজাহানকে। শুধু মুসলমান ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দান করেই ক্ষান্ত তিনি হন নি, তিনি কমপক্ষে পাঁচ হাজার অনাথ বালিকা কি হিন্দু কি মুসলমান—সৎপাত্রে বিয়ে দিয়েছিলেন।

ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বর্দ্ধমানের সর্বদক্ষিণ দামুন্যা গ্রামে

টোলে অধ্যাপনা করতেন। সেলিমাবাদের ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে গ্রাম ত্যাগ করেন ও মেদিনীপুরে আড়োরা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে থাকেন ও এখানেই বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য (১৫৭৯ খ্রীঃ) লেখেন। চণ্ডীমঙ্গল থেকে মধ্যযুগের এই রাঢ় বৰ্দ্ধমানের যে সমাজচিত্র পাওয়া যায় তা নিখুঁত, জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী। সে সময় বেশির ভাগ মানুষই ছিল দরিদ্র। গ্রামে পাঠশালা, টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। মসজিদে মক্তব বা মাদ্রাসা ছিল। পড়াশুনা করত বেশির ভাগই বর্ণ হিন্দু ও অভিজাত মুসলমানগণ। দরিদ্র ও নিম্ন বর্ণের মানুষকে সারাদিন অন্নের সংস্থানে ঘুরে বেড়াতে হত—পড়াশুনার অবকাশ ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ে ব্যতিক্রম ছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, ‘দক্ষিণ রাঢ়ের স্থানে স্থানে এখনও ডোম ও বাগদী পণ্ডিতের টোল আছে। সেখানে বামুনের ছেলেরাও পড়ে’। এইসব ডোম ও বাগদীরা ধর্মঠাকুরের পূজারী। ধর্মচর্চার জন্য তাঁরা সংস্কৃত ভাষা পড়তেন—তবে এদের সংখ্যা নেহাৎ অল্প। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম শ্রীমন্তের বিদ্যাচর্চার যা বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় এই সময়ে বৰ্দ্ধমানে শিক্ষাদানের ভালো ব্যবস্থা ছিল।

বৰ্দ্ধমানরাজ কীর্তিচন্দের (১৭০২-৪০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজসভায় আশ্রিত ও সভাকবি ছিলেন ধর্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। লাউসেন কর্পূর ধবলের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে ঘনরাম লিখেছেন :

অকারাদি ক্ষকারান্ত জানা হৈল স্বর।
ককারাদি ক্ষকারান্ত হল বর্ণাপর॥
তিনদিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান।
অভিলাষে আঙ্ক আঙ্ক ফলাদি বানান॥
অষ্ট ধাতু অষ্ট সিদ্ধ সুরন্ত অনর।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বুদ্ধে করি ভর॥
ধাতুনাম শব্দভেদ পড়িল অপর
পরম সুবেশ দোঁহে সুশীল সুন্দর॥ —
বেদবাণী জানিতে পানিসি পড়ে রায়।

এই চিত্র তৎকালীন রাঢ় বৰ্দ্ধমানের পাঠশালার পাঠ-পদ্ধতির চিত্র। অকারাদি—অর্থাৎ স্বরবর্ণের পাঠ, ককারাদি অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠ, তারপর যুক্তবর্ণ, ধাতুরূপ, শব্দরূপ, গণিত ও শেষে ব্যাকরণ। মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাঢ় বৰ্দ্ধমানের সমাজচিত্র এত নিখুঁত যে অবাক হয়ে ভাবতে হয়।

মঙ্গলকাব্যের আর একজন কবি শ্রীরামপুর-কাইতির রূপরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যেও রাঢ় বৰ্দ্ধমানে শিক্ষাব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সতেরোশো শতাব্দীর মাঝামাঝি রূপরাম পড়াশুনা করেছিলেন পাষণ্ডা গ্রামে রঘুরাম চক্রবর্তীর টোলে। আঠারো শতাব্দীর

গোড়ায় ঘনরাম গিয়েছিলেন রামবাটির টোলে পড়তে। বর্দ্ধমানের কুলীন গ্রামে পঞ্চদশ শতকে আবিভূর্ত হন 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্যের মালাধর বসু। কুলীনগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জৌগ্রামে টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল। মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' চৈতন্যমহাপ্রভুর প্রিয় গ্রন্থ। তাঁর পুত্র সত্যবাঁজ ও তৎপুত্র রামানন্দ বসু শিষ্য ও ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু নিজে বামানন্দর সঙ্গে কুলীন গ্রামে এসেছিলেন। গৌড়ের সুলতান মালাধর বসুকে গুণবাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন। জৈন তীর্থঙ্কর 'মহাবীর বর্দ্ধমান' বর্দ্ধমানে এসেছিলেন এবং এখান থেকে তিনি পদব্রজে জম্ভীয গ্রাম বা জোগ্রামে যান। ঋজুকুলা নদীব তীবে জৌগ্রামে তিনি সিদ্ধিলাভ কবেছিলেন এবং সিদ্ধিশেষে এক মহাধর্ম সম্মেলন কবেছিলেন। সে সময় দেশ বিদেশেব প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও টোল চতুষ্পাঠীব পণ্ডিতগণ এই সভায ধর্মালোচনা কবেন।



কৃষ্ণদাস কবিবাজেব জন্মভিটা

১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে জেলার কাটোয়াব সন্নিকটে ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থেব লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা ছিল চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিরসে ডুবুডুবু। বাংলায় তুর্কী আক্রমণেব সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির জাতীয় জীবনে যে প্রচণ্ড আঘাত এসেছিল—তা শাপে বর হয়ে দেখা দিল। মধ্যযুগীয় দিগভ্রান্ত বাঙালি—অন্যায় অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দুর্বল ও নিবীর্যে-ক্লিবত্বের অভিশাপ মাথায় নিয়ে যে জীবন-যন্ত্রণা ভোগ করছিল— তার অবসান হল দুর্যগপূর্ণ আকাশে মেঘমুক্ত উজ্জ্বল আলোর বন্যা নিয়ে আসে যে সূর্য তার চেয়েও দীপ্যমান হয়ে আবিভূর্ত হলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জীবনধর্মে বাংলার

বুকে নবজাগরণের সূচনা হল। তার ঢেউ রাঢ় বর্দ্ধমানেও আছড়ে পড়ল, কাটোয়াব শ্রীখণ্ডে মহাপ্রভুর শিষ্যরা গড়ে তুললেন সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র। দেখতে দেখতে গঙ্গা ও অজয় নদের তীরবর্তী গ্রামগুলি পাটুলী, সমুদ্রগড়, অগ্রদীপ, দাঁইহাট, কালনা প্রভৃতি গ্রাম ও জনপদে সংস্কৃত শিক্ষা ও বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টির জোয়ারে ভেসে গেল বাঙালীর এতদিনের জড়ত্ব, ক্লেদ ও কলুষতা। চৈতন্য যুগে যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল, চৈতন্য পরবর্তীকালেও তার রেশ ছিল।

ষোড়শ শতকের কাটোয়ার সন্নিকট সিঙ্গি গ্রামের কবি মহাভারতকার কাশীরাম দাস গাইলেন:

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান।।

কাঁদড়া গ্রামে চৈতন্য পরবর্তী কবি জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পদাবলী সাহিত্যর অন্যতম শ্রেষ্ঠপদকর্তা। জ্ঞানদাসের কবি প্রতিভা চণ্ডীদাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়:

আয় দেখি গিয়া গোরাচাঁদে।
এ চাঁদবদনের আগে গগনের চাঁদ কি লাগে
চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে।।

এই ষোড়শ শতকেই (১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ) বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন লোচনদাস। তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল কাব্য' বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। যেমন—

অমিয় মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছগো
এক ভৈল শুধুই সুনেহা।

বর্দ্ধমান শহরের সন্নিকটে কাঞ্চননগরে এই শতকের কবি 'গোবিন্দদাসের কড়চা', মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের রোজনামচা—বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ষোড়শ শতকেই (১৫১১ খ্রীষ্টাব্দ) বর্দ্ধমান জেলার আমাইপুর গ্রামে 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা জয়ানন্দ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। আর একজন পদাবলী কবি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার গৌরাঙ্গভক্তির অপূর্ব নিদর্শন রেখেছেন তাঁর কাব্য সুষমায়। এই শতকেই বর্দ্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে বৈষ্ণবকাব্যের বেদব্যাস কবি 'বৃন্দাবন দাস' 'চৈতন্য ভাগবত' রচনা করেন ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নির্দেশে তিনি চৈতন্যজীবন কাব্য রচনা করেন:

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলাকৃত ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥

পঞ্চদশকে ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিকটে ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বৈষ্ণব কাব্যের মহাকবি চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের স্রষ্টা কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তিনি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসেন বাল্যকালেই। চৈতন্যজীবনী কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণব বিনয়ও ভক্তিরসের অপূর্ব নিদর্শন:

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে॥

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মানকরের সন্নিকটে কোটাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনাথ ছিলেন নিমাই পণ্ডিতের সহপাঠী নবদ্বীপের টোলে একসঙ্গে পড়তেন। ন্যায়শাস্ত্র ও দর্শনে রঘুনাথ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। রঘুনাথ কোটা গ্রামে তাঁর টোল খুলেছিলেন, সেখানে বহুদূব থেকে ছাত্ররা ন্যায়ের পাঠ নিতে আসতেন। নবদ্বীপের অধ্যক্ষ রঘুনাথকে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি বিতরণের ক্ষমতা দিয়েছিলেন। বাংলার এই গৌরব আর কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে জোটেনি। মিথিলার বিখ্যাত পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র এখানে এসে রঘুনাথকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন।

পঞ্চদশ শতকে আর একজন শিক্ষাচার্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নাম 'বুনো রামনাথ'। কালনা মহকুমার সমুদ্রগড় গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। সমুদ্রগড়ের চতুষ্পাঠীতে বহুদূর থেকে ছাত্রগণ আসতেন এই পণ্ডিতবর দার্শনিকের কাছে ন্যায়ের পাঠ নিতে। তাঁর কাছ থেকে পাঠ নিয়ে বহু শিষ্য নিজ গ্রামে টোল খুলেছিলেন। রামনাথ সর্ব্বকালের ও সর্ব্বযুগের আদর্শ শিক্ষাচার্য ও মনীষী। অষ্টাদশ শতকে বৰ্দ্ধমানে দু'জন মহিলা শিক্ষাচার্য বৰ্দ্ধমানের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কোটা গ্রামের রূপমঞ্জরী এবং সোঁয়াই গ্রামের হটী বিদ্যালংকার।

সংস্কৃত সাহিত্য পড়ার জন্য ছেলের বেশে সরমের পণ্ডিত গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের টোলে ভর্তি হন রূপমঞ্জরী। বাংলার পাঠ শেষ করে তিনি কাশী চলে যান। কাশীতে ন্যায়, জ্যোতিষ, চরক, নিদান, চিকিৎসা, গণিত বিদ্যাতে পারদর্শিতা লাভ করে রূপমঞ্জরী 'বিদ্যালংকার' উপাধি পান। গ্রামে ফিরে তিনি চতুষ্পাঠী খুলে বসেন। তাঁর কাছে বিভিন্ন শাস্ত্রে পরামর্শ নেবার জন্য বহু দূর থেকে জ্ঞান পিপাসু মানুষ ছুটে আসতেন। চিরকুমারী বিদূষী রূপমঞ্জরী বৰ্দ্ধমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি জ্যোতিষ্ক। হটী বিদ্যালংকারও কাশীতে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসেন। সেখানে তিনি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ আয়ত্ত করে বিদ্যালংকার উপাধি পান। দরিদ্র ঘরের কন্যা হয়ে স্বামী ও পিতাকে হারিয়ে অদম্য আগ্রহ নিয়ে শাস্ত্রচর্চ্চা করেছেন তিনি। কাশীতে

তিনি যে ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান দেওয়া হয়। কাশীতেই তিনি চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতে লাগলেন। শুধু বাংলার নন, ভারতীয় নারী সমাজে হটী বিদ্যালংকার একটি উজ্জ্বল রত্ন, রাঢ় বৰ্দ্ধমানের গৌরব।

নবদ্বীপ বিদ্যাসমাজের প্রেরণায় রাঢ় বৰ্দ্ধমানের বহু বড় বড় গ্রামে টোল বা চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই টোল বা চতুষ্পাঠীগুলি খ্যাতনামা সংস্কৃত অধ্যপকগণ পরিচালনা করতেন। এতে স্থানীয় বিত্তশালী জমিদারগণ মুক্তহস্তে অর্থ দান করতেন।

সপ্তদশ শতকে বৰ্দ্ধমান জেলার জৌগ্রামে সুবিখ্যাত পণ্ডিত কলানিধি ভট্টাচার্যের বিদ্যাপীঠ ছিল। তখন নবদ্বীপ ও শান্তিপুর এইসব কেন্দ্রগুলির আদর্শ ও প্রেরণা ছিল। সে সময় শান্তিপুরে অধ্যাপনা করতেন বিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। তাঁর নিকট পাঠ নিতে দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রগণ আসতেন। এই সময় বৰ্দ্ধমান জেলার কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে ধৰ্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তীর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর একটি বড় টোল ছিল। এই টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল একশ কুড়ি জন। রায়না থানার পাষণ্ডা ও সন্নিকটবর্তী আড়ুই গ্রামে টোল ও চৌপাড়ি ছিল। এখানে প্রায় দেড়শত ছাত্র ছিল। রামবাটি গ্রামেও টোল ছিল, কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এখানে পড়াশুনা করেছিলেন।

এই সময় নবদ্বীপের শংকর তর্কবাগীশ ও শিবনাথ ন্যায় বাচস্পতি বিখ্যাত ছিলেন। এছাড়া কুমারহট্টের বলরাম তর্কভূষণ ও শিশুরাম তর্কপঞ্চানন, ত্রিবেণীর বামচাঁদ তর্কভূষণ, কানাই ন্যায়বাচস্পতি, বাঁশবেড়িয়ার ব্রজবিদ্যাবাগীশ, রামকিশোর তর্কপঞ্চানন, ভৈরব তর্কবাচস্পতি, রাঘব তর্কভূষণ, শান্তিপুরের মোহনবিদ্যাবাচস্পতি, কলিকাতার চতুর্ভূজ ন্যায়রত্ন, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, শালকিয়ার জগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত, জনাই-এর অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। রাঢ় বৰ্দ্ধমানে তাঁদের বহু শিষ্য বিদ্যার্জন শেষ করে নিজগ্রামে ফিরে গিয়ে টোল বা চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। পণ্ডিতগণের এই তালিকাটি পাওয়া গেছে কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের এক বংশধরের পুরাতন পুঁথি থেকে। এখানে ৬৮টি গ্রামের নাম পাওয়া যাচ্ছে, যে গ্রামগুলিতে বড় টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। তার মধ্যে নদীয়া জেলার তিনটি, চব্বিশ পরগণার একটি, হাওড়া জেলার দুটি, বৰ্দ্ধমানের সতেরোটি এবং হুগলীর পঁয়তাল্লিশটি গ্রাম রয়েছে। এই টোলগুলিতে ১৩৪ জন ভট্টাচার্য পণ্ডিতের নাম রয়েছে। যাঁরা অধিকাংশই ন্যায় ও স্মৃতির পণ্ডিত দিকপাল শিক্ষাচার্য।

মধ্যযুগে মুসলমান সুলতানদের সহায়তায় সরকারী কাজে ফারসী ভাষা ও শিক্ষা রাজানুকূল্যে পরিচালিত হত। মসজিদ বা মক্তবেও তা সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রামে সংস্কৃত শিক্ষার ঢেউকে তা দমিয়ে দিতে পারেনি। টোলে সংস্কৃত শিক্ষা

কিভাবে হ'ত তার বর্ণনা রূপরাম চক্রবর্তীর 'পুস্তকজায়' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে আছে। কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, তিথি, উদ্বাহ, প্রায়শ্চিত্ত, দুর্গোৎসবাদি, রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্ব—এই সকল বিষয় টোলে পড়ানো হত। তখন টোলের নাম ছিল—চৌপাড়ি (এখনকার চতুষ্পাঠী)। চৌপাড়ি পরিচালনার জন্য জমিদারগণ কৃতী ছাত্রদের বৃত্তি, জলপানি দিতেন। গ্রামে জনসাধারণের কাছ হতে বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদিতে 'চৌপাড়ি আদায়' করা হত। রাজস্ব বা শিক্ষাকরের মত ইহা অবশ্য দেয় ছিল। অল্প শিক্ষিত পণ্ডিতগণের নিজ নিজ পাঠশালা ছিল। এখানে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত, এতে ব্রাহ্মণেতর জাতির ছেলেরাই পড়ত। মুসলমান ছেলেরাও একই সঙ্গে এই পাঠশালায় পড়ত।

সেকালে পাঠশালা বা টোলে ছাত্র ভর্তি করা হত পাট্টা-কবুলতির মত দলিল করে। হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চল হতে এরকম একটি দলিল পাওয়া গেছে (পুরাতন চিঠিপত্রে সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা— ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল)। দলিলটি নিম্নরূপ :—

৺শ্রীশ্রীহরি

সন ১২৬৬ সাল

মহামহিম শ্রীযুক্ত সোনাতন সরকার বরাবরেষু-

লিখিত শ্রীশেখ কালাচাঁদ সাং নওপাড়া পরগণে হাবিলী কস্য একরার পত্রমিদং কার্জ্যানাঞ্চ আগে আপনকার চৌপাড়ি আমাদের গ্রামে থাকায় আমার পুত্র শ্রীশেখ ফজলু হোসেন ও শ্রীতযুর্দ্ধক হোসেন এই দুই লোককে আপনার নিকট লেখাপড়া কোরিবার কারণ পাটকেলট কট হরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাশ বাঙ্গালার হিসাবে ও হরফে ও ইস্তাহামে পুরা কোরিআ দিবেন আর বাঙ্গালার হিসাব ও সন্ধান স্বর আ আঁক জোঁকে তৈআর করিআ দিবেন ইস্তেহামে পুরা করিয়া দিবেন সন ১২৬৬ সাল নাংসক ১২৬৭ সাল মাহ আশ্বীন তক তৈয়ার করিআ দিবেক আর আমার নিকট দুরমাহা মাহা মাঘ মোট চুক্তি সর্বযুদ্ধা কোং ২৫ পোচিষ টাকা দিবো টাকার করাব ফি মাহাতে ৷৷০ আট আনা দিবো পরে এই কেলট্ট কট করারের পরে ইস্তাহামে পুরা করিআ ইস্তাম নিআ আপনকার মাহীনে হিসাব নিকাশ করিয়া দিবো আর এই করারের ভিতর তৈয়ার কোরিআ না না দিতে পার তবে আমার টাকা ফেরত আপনার ঠাঁই লইবো আর এই টাকা জখন দিবেন এই একরারের পীষ্ঠে রোশীদ দিবো এই তদাখ্যা একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ১৩ শ্রাবণ—

শ্রীসেখ কালাচাঁদ
সাং—নওপাড়া

ছাত্রভর্তির এই্ দলিলটি একটি চুক্তিপত্রের মত কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: আবেদনকারী মুসলমান হলেও 'শ্রীশ্রীহরি' দিয়ে চুক্তিপত্র আরম্ভ করছেন।

একশত বছর আগে শিক্ষার যাবতীয় (থাকা-খাওয়া ও পরা) ব্যয় ভার ২৫ টাকায় হত, এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষা সম্পূর্ণ হত—অক্ষর পরিচয়, খাতা সহি, হিসাব নিকাশ, সন্ধান স্বর-আ, আঁক-জোখ ইত্যাদি। শিক্ষাগুরুকে চুক্তি মত শিক্ষা দিতে না পারলে সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হত। এই চুক্তিপত্রে অনুমান করা যায় যে মধ্যযুগ হতে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত।

পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হত বাঙলা ভাষা, গণিত, আর্যা ও বিভিন্ন ধরণের হিসাব। প্রাচীন চিঠিপত্র থেকে ৯৮ প্রকারের 'প্রস্ত' পাওয়া গেছে। একটি সাধারণ গৃহস্থঘরের ছেলেকে ব্যবহারিক জ্ঞানের দিক হতে পরিণত করতে এই 'প্রস্ত' শিক্ষাপ্রণালী যথেষ্ট ছিল। পাকা সংসারী হতে গেলে যে বিষয়গুলি অবশ্যই্ জানা দরকার পাঠশালায় তাই পড়ানো হতো। প্রস্তের সুরুতে অক্ষর শিক্ষা, তারপর যুক্তাক্ষর বানান ও নামতার কড়াগণ্ডার হিসাব মুখস্থ করতে হত। মাহিন্দারের মাস মাইনার হিসাব, ধান, চাল, আলু, গুড় প্রভৃতি জিনিষপত্র কেনাবেচার হিসাব শিখতে হত। এমন কি স্ব-স্ব বৃত্তি বজায় রাখার জন্য সোনা, রূপা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতি খরিদ করাঃ হিসাব, মহাজনি কারবারীর সুদকষা, বাটা কষা আবশ্যিক ছিল। মুদিখানা দোকানদারী চালানোর জন্য মুনাফা-জমা-খরচ, পসারি-জায়, মণ-কষা প্রভৃতি শিখতে হত।

এছাড়া বহুরকমের হিসাব, যেমন: ইটকালি, নৌকা কালি, দেওয়াল কালি, দধি কালি, পুস্করিণী কালি, দুধ কালি শেখাবার প্রথা ছিল। সাধারণ জমির মাপ, রাস্তার মাপ, বারতিথি হিসাব কাকুন, চিঠিপত্র লেখার ধারা, সেয়া-খত লেখার পদ্ধতি এই্ পাঠশালাতেই্ হ'ত। জমি-জমা সংক্রান্ত হিসাব যেমন— জমাগুজস্তা খাজনা, দাখিলা, দলিল, পাট্টাকবুলাতি, ইজারা পাট্টা, খাসকবলা, বর্গ কবালা, ইজারা বন্ধক. নাম ইস্তফার রশিদ, গোমস্তা কুবলাতি, সমৃদ্ধ হুকুমনামা, মহাল ইজারা, দস্তাবেজ শেখানো হ'ত। অংকের ধারার পাঠও ছিল বিচিত্র: উদ্‌কষ্টি, অষ্টকোটা, লবণকোটা বৃদ্ধ আউটি, অতিবৃদ্ধ আউটি। আইন আদালত সম্পর্কেও এই পাঠশালাতেই্ শিক্ষা দেওয়ার কাজ ছিল— আদালতের আর্য্যা, মোক্তারনামা, জবাবল জমা, বন্ধক জবাব, জমানবন্দী, রোরকারী, ফয়সালা, এত্তাল নামা, এত্তার রসিদ, শমন জারি, ইস্তাহার, ফরিয়াদী, এত্তেলা প্রভৃতি। রাঢ়ের সর্বত্র মুসলমান রাজত্বের সুরু থেকে এই্ পাঠ পদ্ধতি ছিল প্রতি পাঠশালাতেই। অর্থাৎ পাঠশালার বিদ্যার্জন শেষ করেই একজন শিক্ষার্থী সমাজ ও সংসারে উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে যে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করবার দক্ষতা অর্জন করত। শুধু সামাজিকতা নয়, উপযুক্ত চরিত্র গঠন করাও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তৎকালীন শিক্ষাপদ্ধতির। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মানবিকতার

প্রকাশ, মূল্যবোধের অনুভূতি ও সদাচার মণ্ডিত আদর্শ জীবন এই পাঠশালার শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যেই শিক্ষার্থীর মানসমুকুলে সঞ্চারিত হত— এ কম গৌরবের নয়। হিন্দুবৈদিক ধর্মের বহু প্রতিভাধর ব্যক্তি এইভাবেই শিক্ষাজীবনের পাঠ গ্রহণ করে সমাজ ও দেশকে ধন্য করেছেন।.

একটি প্রাচীন গ্রাম থেকে প্রাপ্ত দ্বিজ দুর্গারাম ভণিতায় দেখা যায় পাঠশালায় পাঠ্যতালিকায় শিশু জ্ঞানবৃদ্ধির শিক্ষণ পদ্ধতি। এই পুঁথিতে চৌত্রিশ অক্ষর শিক্ষাদানের কথা আছে। বর্তমানে বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে মোট ৪৬টি অক্ষর রয়েছে। এই ৩৪ অক্ষরের ধারা আমরা বাংলা মঙ্গলকাব্যের চৌত্রিশা স্তরের মধ্যে রক্ষিত দেখতে পাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কাশীতে প্রচলিত মহাজনী বর্ণমালা ৩২ অক্ষরে গ্রথিত।

অক্ষরের পরিচয় ও তার পরে শিশু কিভাবে মানুষ হ'ত তা পুঁথির কয়েকটি পঙক্তি তুলে দিলে পরিস্কার হবে:—

"প্রথমে আরম্ভ বিদ্যে চৌত্রিশ অক্ষর.....
কিল্লি আদি...... আংকো আস্কো সিদ্ধি লিখ না করিও হেলা

অতোর্পর কড়ির অঙ্ক সিখ জতো বালা। কড়াকে গুণ্ডাকে লিখ স্বটিকে বুড়িকে লিখ পুনকে আদি জতো চৌকে লিখিত না করিহ হেলা। একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নেত্র চেরে বেদ পাচেঁ পঞ্চবান ছয় ঋতু কয়ে। সাতে সমুদ্র আটে বসু নয়ে নবোগ্র দশে দ্বিগ জান জতো সিবু।" পাঠশালায় যেসব পুঁথি পড়ানো হত তার মধ্যে শঙ্করাচার্য কৃত গঙ্গাস্তব, আশ্রয় নির্ণয়, বাধারসকারিকা, কুম্ভকর্ণের রায়বার—'বাঙগ্না', অঙ্গদের রায়বার, খুল্লনা ও ফুল্লরার বারমাসী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া-সংস্কৃত ও বাংলার অন্য বৈষ্ণব নিবন্ধ, স্তোত্রাদি, আবৃত্তিও পড়ানো হত। এই সব পাঠশালায় মুসলমান ছাত্রগণও পড়ত। তবে এইসব ছাত্রদের মুসলমান সমাজের বিভিন্ন ধারা পৃথকভাবে শেখানো হত, যেমন: 'মোছলমানের প্রকরণ', পীর মুরীদকে, দাদোকে, পোতাকে, দাদী-নানীকে, বড়ো বোনকে, বোনাইকে খত লেখবার স্বতন্ত্র সেরেস্তা শেখানো হত।

মধ্যযুগের শেষে অর্থাৎ সুলতানী আমলের শেষে ও ব্রিটিশের আগমনের সময়ে পড়ুয়াদের মধ্যে অনেক ভুঞা, বণিক, নায়েক, ঘোষ, চোঙ, বৈরাগী, সো পদবীধারী পড়ুয়ার নাম পাওয়া যায়। তার থেকে মনে হয় পাঠশালায় উচ্চ বর্ণহিন্দু ও অভিজাত মুসলমান ছাড়াও সাধারণ গরীব ও মধ্যবিত্ত পড়ুয়ার সংখ্যাধিক্য ক্রমেই বাড়তে থাকে। জাতি ও বৃত্তিগতভাবে পাঠশালায় বিদ্যাদান করতেন পণ্ডিত মশাই:

"অষ্টাদস ছাওয়াল পড়িছে নিরন্তর অষ্টশব্দী আদি করি পড়িল অমর।
বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিআছে সভে অষ্ট কোঠা অষ্টপর শিক্ষা করেবে

তিলির নন্দন তার নারাদিতে বাস কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাস
শ্রীরাম দুলাল দ্বিজ কবিছান্দে কয় অঙ্ক হল্যো অস্থির সুস্থির কর‍্যলয়"।

এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিলি জাতি তেল ব্যবসা করত বলে কঠিন কঠিন অঙ্ক কষছে। বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায় সেকালের পাঠশালার কতকগুলির দুলর্ভ কড়চা রক্ষিত আছে। এতে পণ্ডিত মহাশয়দের নাম, শিক্ষণ পদ্ধতি, পত্র লিখবার নিয়ম, হেঁয়ালী ও ছড়া লিখিত রয়েছে। গল্পের ছলে কিভাবে গণিত শেখানো হত তার নমুনা :—

'সত্যকরি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ দিব্য করি গেলা দুটি শিরে দিয়া হাথ।
বিরহে ব্যাকুল চিত্ত না শুনে বারণ নিঠুর হইয়া নাঞি আল্য প্রাণধন
তিলে শতবার মরিলেক দিব কত দণ্ডকে সহস্রবার হই মূর্চ্ছাগত।
রাগরসবাণ বসু একত্র করিয়া গরাসি তেজিব প্রাণ বাণ ঘুচাইয়া।
শ্রীরাম দুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি জে কহিলে তাই দিব্যানিশি বুঝ্যা দেখি।"

এই কবিতাটির অন্তরালে একটি অঙ্কের উত্তর রয়েছে। অঙ্কটির সমাধান হলে : রাগ রস = ১২, বাণ = ৫, বসু = ৮ মোট ২৫। এর থেকে বাণ ঘুচিয়ে অর্থাৎ ৫ বাদ দিলে থাকে বিষ (বিশ)। এই গরল পান করে নায়িকা প্রাণত্যাগ করতে চান যদি না তার প্রিয়তম শপথ মেনে প্রবাসী থেকে ফিরে আসে।

সেকালে পাঠশালায় আরও দুটি জিনিষ পড়ুয়ারা পড়ত। তা হল, শুভঙ্করী ও খণার বচন। ছাপাখানা ছিল না, তাই পুঁথি নকল করে পুরানো জীর্ণ প্রায় পুঁথি বাতিল করা হত। এইভাবে ধারাবাহিকভাবে নকল পড়ার ও নকল করার জন্য মূল রচনার অদলবদল হত। বহু ছড়া ও শিখন পদ্ধতির কড়চা লোকমুখে আজও চলে আসছে :

"পিঠে পিঠে শেয়াল চড়ে
গাছের কাঁটাল নীচে পড়ে
আঁধার হলে বাগানে যায়,
সবাই মিলে কাঁটাল খায়।"

কিম্বা,—
তেল চুকচুকে পাতা
তার ফলে ধরে কাঁটা
খেতে সে মধুর মধুর
বীজ গোটা গোটা।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৌহিত্র নবাব আজীম-উশ-শান সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান আসেন। বাঁকানদীর ধারে আলমগঞ্জ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। আজীম-উশ-শানের উপস্থিতি সুলতানী সংস্কৃতির সঙ্গে মোগল সংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটায়। এরপর ১৬৫৭

খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের দুশ বছর এবং পলাশীর যুদ্ধের একশ বছর আগে বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ক্ষত্রিয় ক-পুর সঙ্গম রায়ের পৌত্র আবু রায় লাহোর থেকে বর্দ্ধমানে বসবাস করার জন্য আসেন। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন পলাশীর আমবাগানে কামান দাগল লড ক্লাইভ। বাংলার গৌরবসূর্য ইংরেজের পরাক্রমে অস্ত গেল। এই একশ বছরে রাঢ় বর্দ্ধমান রাজবংশের আনুকূল্যে শিক্ষাবিস্তারে নূতন করে পথ সৃষ্টি করেছে। জমিদারী পরিচালনা ও রাজবংশের প্রতিষ্ঠায় নূতন করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান করেছেন– আবু রায়, বাবু রায় (১৬৫৭-১৬৯৬ খ্রীঃ), ঘনশ্যাম রায়, কৃষ্ণরাম রায়(১৬৯৭ খ্রীঃ), জগৎরাম রায় (১৭০২ খ্রীঃ), কীর্তিচাঁদ রায় (১৭০২-১৭৪০ খ্রীঃ), চিত্রসেন রায় (১৭৪০-১৭৫৮ খ্রীঃ), তিলকচাঁদ রায় (১৭৪১-১৭৭১ খ্রীঃ)– পলাশীর যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বর্দ্ধমান রাজবংশের রাজাগণ। রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গলে মধ্যযুগের শিক্ষার একটা পরিচয় পাওয়া যায়:

"কল্পতরু তুল্য ভূপ আধিপত্য নানারূপ
দীন নাহি সে দেশে জনেক।।
চৌদিকে চৌপাড়িময় পাঠচায় পড়ুয়াচয়
দ্রাবিড় উৎকল কাশীবাসী।
কারো বা ত্রিহুত বাড়ি বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি
আগমন বিদ্যা অভিলাষী।"

বর্দ্ধমানের চতুষ্পাঠী ও বর্দ্ধমান মহারাজার (কীর্তিচন্দের) আনুকূল্যে এই বিদ্যাশিক্ষার প্রসার ও পরিচয় রাঢ় বর্দ্ধমানের প্রাচীন শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ রাঢ় বর্দ্ধমান আক্রমণ করলে বহু পাঠশালা, চতুষ্পাঠী ধ্বংস হয়, বহু পণ্ডিত নিহত হন এবং অনেক মূল্যবান পুঁথি নষ্ট হয়। গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণে আছে:

"তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল
যত গ্রামের লোক সব পলাইল।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পলায় পুঁথির ভার লইয়া
সোন্যর বাহনা পলায় পুঁথির ভার লইয়া।"

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দি খাঁ বাংলার তখন নবাব। বর্দ্ধমান রাজের সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের বিবরণ থেকে জানা যায় মারাঠা আক্রমণের ফলে বর্দ্ধমানের শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ে। তছনছ হয়ে যায় রাঢ় বর্দ্ধমানের শিক্ষার অগ্রগতি, প্রগতির ধারা, পাঠশালা, টোল, মাদ্রাসা, চতুষ্পাঠী ও মক্তব। বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, একটা বড় রকমের ছেদ পড়ে বর্দ্ধমানের চলমান জীবনে। ইংরেজদের আগমনে রাঢ় বর্দ্ধমানের পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে

এবং চতুষ্পাঠী, টোল ও মাদ্রাসা ক্রমশঃ বন্ধ হতে থাকে। নূতন করে বাংলার জাতীয় জীবনে এক নবজাগরণের সূচনা হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার

যেমন বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জমিদারদের অবদান অনস্বীকার্য, তেমনি বর্দ্ধমানের শিক্ষাবিস্তারে বর্দ্ধমান মহারাজার অবদান উল্লেখযোগ্য। বর্দ্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্গম রায় (১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে) থেকে সুরু করে পরবর্তী চারশ বছর ধরে এই রাজবংশ বর্দ্ধমানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। মহারাজ চিত্রসেন (১৭৪০-৪৪ খ্রীঃ) রায় এবং তিলকচন্দ রায় (১৭৪৪-৭০ খ্রীঃ) উভয়েই যথেষ্ট বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিলকচন্দের পুত্র তেজচন্দ (১৭৭০-১৮৩২ খ্রীঃ) ও একজন শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর আমলেই সাধক কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সভাকবিরূপে অধিষ্ঠিত হন ও তেজচন্দের পুত্র প্রতাপচন্দের গৃহশিক্ষার দায়িত্ব বহন করেন। এই সময় মিশনারীগণ বর্দ্ধমান শহরে ও শহরের সন্নিকটে কয়েকটি ইংরাজী শিক্ষার পাঠশালা গড়ে তোলেন। অগ্রণী ছিলেন চার্চ মিশনারী সোসাইটির ষ্টুয়ার্ট সাহেব। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে জেলায় দুটি বাংলা স্কুল ও কয়েকটি ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্ট প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সংখ্যা ছিল দশ এবং ছাত্রসংখ্যা প্রায় একহাজার। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ জুলাই সমাচার দর্পণ থেকে জানা যায় ঐ বছর বর্দ্ধমান শহরে স্যাধনপুরে দশ জন ছাত্রের একটি ইংরাজী পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল। সমাচার দর্পণ স্বীকার করছেন যে, ষ্টুয়ার্ট সাহেব প্রতিষ্ঠিত এইসব ইংরাজী ও বাংলা স্কুলগুলির যথেষ্ট সুনাম ছিল। এইসব বিদ্যালয়গুলির শিক্ষণ পদ্ধতি এমন উচ্চাঙ্গের ছিল যে ঐসময় কলিকাতায় স্থাপিত ইংরাজী স্কুলগুলির জন্য পঠনপাঠনের তালিম নিতে জনৈক নিকোলাস উইলার্ড নামক একজন ইংরেজ শিক্ষক বর্দ্ধমানে আসেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য 'মনোরঞ্জনেতিহাস' এর লেখক তারাচাঁদ দত্ত বর্দ্ধমানে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের স্কুল সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মিশনারীগণ স্ত্রী শিক্ষার প্রসারেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। 'বিবি ডিয়র' নামে এক ইংরেজ শিক্ষিকা নিজ প্রচেষ্টায় কয়েকটি মেয়েদের স্কুল খুলেছিলেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জুন (১৬ আষাঢ় ১২৩৫ সাল) সংখ্যার সমাচার দর্পণে 'বালিকাদিগের বিদ্যাভাস' শীর্ষক সংবাদে দেখা যায় 'বর্দ্ধমান গ্রামেতে এইরূপ চারিটি পাঠশালা 'বিবি ডিয়ারের' তাবে আছে তাহাতে প্রায় ১০০ বালিকা পড়ে।' সমাচার দর্পণের অপর একটি সংবাদে দেখা যায়, বিবি পীরণ নামে অপর এক ইংরাজ মহিলা বর্দ্ধমানে ১২টিং মেয়েদের পাঠশালা পরিচালনা করতেন। পরে নিজ

স্বামী লণ্ডনে অসুস্থ হয়ে পড়লে 'বিবিপীরণ' লণ্ডন চলে যান ও দেখাশুনার অভাবে তিনটি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। মিশনারীদের শিক্ষা বিস্তারে বর্দ্ধমান রাজগণের কল্যাণহস্ত সব সময়ই প্রসারিত ছিল। তেজচন্দ বাহাদুরের মৃত্যুর পর বৎসর ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে সমাচার দর্পণে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্দ্ধমান রাজ সিংহাসনে তখন ত্রয়োদশ বর্ষীয় মহতাবচন্দ আসীন। সংবাদটি নিম্নরূপ:

'তাঁহাদের (বর্দ্ধমান রাজপরিবারের) দানশীলতার বিষয়ে আরো এক বিশেষ উদাহরণ দর্শয়িতব্য। এই স্থান নিবাসী মিসনারি সাহেব এই নগরের মধ্যস্থলে অতি বৃহৎ এক ইংরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়া শ্রীযুক্ত যুবরাজের জনক দেওয়ান শ্রীল প্রাণচন্দ্রবাবুর নিকট জ্ঞাপন করাতে রাজবাটিতে চাঁদা হইয়া ঐ পাঠশালা স্থাপনার্থ সহস্র মুদ্রা ঐ মিশনারী সাহেবের নিকটে অর্পিত হইল অতএব দুইশত ছাত্রধারী অত্যুত্তম এক বিদ্যামন্দির নগরের মধ্যে অবিলম্বেই দৃষ্ট হইবে'।

. বর্দ্ধমান রাজ মহতাবচন্দ এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করতে সাহেবকে একহাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন এবং পরবৎসর ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের মধ্যস্থলে ইংরাজী বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়টির বর্তমান নাম সি, এম, এস, হাইস্কুল। তখন চার্চ মিশনারী সোসাটিজ ইংলিশ স্কুল নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুলের প্রাচীন প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ আছে:

'Church Missionary Society's English School
Erected through the liberal aid of
Maharajah Matab Chand Bahadur,
and other benevolent friends by
the Revd. J. Weit brecht, 1834'

ফলকে বাংলায় উৎকীর্ণ আছে:

প্রবল প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ মাতাপচাঁদ বাহাদুরের এবং কোন ২ সাহেব লোকের অনুকূলতায় শ্রীরেবরেন্দ ওয়াইৎ ব্রেখত সাহেবের যত্নেত এই ইংরাজী বিদ্যালয় নির্মিত হইল। সন ১২৪০। 'উপরোক্ত সমাচার দর্পণে যে মিশনারী সাহেবের কথা বলা হয়েছে, তিনিই হলেন 'সি, এম, এস স্কুলের' (চার্চ মিশনারী সোসাইটিজ স্কুল) প্রতিষ্ঠাতা জার্মান পাদরী মিশনারী মোবররন্দর ওয়াইৎ ব্রেখত। উক্ত পত্রিকায় (সমাচার দর্পণ) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

'বর্দ্ধমানে নূতন বিদ্যালয়

আমরা উক্ত স্থানের এক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম যে, বর্দ্ধমানে শ্রীযুক্ত মিশনারী সাহেবদের উদ্যোগে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে বর্দ্ধমানের

শ্রীযুত জর্জসাহেবের যে স্থানে বিচার গৃহনির্ম্মাণ হইয়াছে তাহার পশ্চিমপ্রায় আটশত হস্ত অন্তরে অথচ নগরের মধ্যে খোশবাগ নামে এক উদ্যান আছে সেই উদ্যানে বিদ্যালয় নির্ম্মাণ হইতেছে এই প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে ইংরেজী পারস্য আরবী এবং সংস্কৃত এই কএক বিদ্যার শিক্ষা ও আলোচনা হইবেক শ্রীযুত হেচকিন্সন সাহেব ইংরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন অন্য ২ বিদ্যাশিক্ষা দেওন হেতু মৌলবী এবং পণ্ডিত স্থির হইয়াছেন প্রত্যেক ছাত্র জন্য দুই মুদ্রা মাসিক বেতন গ্রহণের নিয়ম হইয়াছে এই বিষয়ের সম্মতি পত্রে নগরের প্রায় ৬০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়েছেন বর্দ্ধমান নগরে যে ২ সাহেব লোক বাস করেন তাঁহাদের তাবেতেরই উক্ত বিষয়ে অভিমত আছে এবং সকলেই আনুকুল্য করিবেন এমত গতিক বটে বর্দ্ধমান দেশে পারস্য ভাষারই চর্চা ইংরেজী ভাষা অত্যল্প লোকে জানেন। যদিও আমরা জানি যে তথায় অন্য দুই এক বিদ্যালয় আছে তাহাতে বিনা বেতনে ইংরেজী পাঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তন্মধ্যে কোন বিদ্যালয় উপযুক্ত অধ্যাপক এবং নিয়ম ও বিলক্ষণ থাকিতে পারে তাহা নগর হইতে দূর এবং কোন ২ কারণে তথ্যকার হিন্দুরা যাইতে সংকোচ করেন এই বিদ্যালয় নগর মধ্যেও বটে এবং সকলেরই অনুরাগ আছে সুতরাং ইহার উন্নতি হইবার সন্দেহ করি না।'

শিক্ষা বিস্তারে জেমস ষ্টুয়ার্ট ও ওয়াইৎ ব্রেখ্ত

উক্ত সংবাদে যে দুইজন সাহেব লোক বাস করেন বলা হয়েছে, তা একজন ষ্টুয়ার্ট ও অপরজন ওয়াইৎ ব্রেখ্ত এবং 'নগর হইতে দূরে' যে বিদ্যালয়ের কথা কটাক্ষ করা হয়েছে তা হল সাধনপুরে ষ্টুয়ার্ট প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়। আর সংবাদে প্রকাশিত বিদ্যালয়টিই বর্তমানে সি, এম, এস স্কুল, কারণ বর্দ্ধমানের কাছারী প্রাঙ্গন হতে আটশত হাত বা ১২০০ ফুট পশ্চিমে খোসবাগের সন্নিকটে বর্দ্ধমান সি, এম, এস, স্কুলকেই বোঝায়। এই স্কুলে ইংরেজী, ফারসী, আরবী এবং সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শহরে যে বিনা বেতনের স্কুলের কথা বলা হয়েছে, তা হলো বর্দ্ধমান রাজ প্রতিষ্ঠিত 'রাজস্কুল'। বর্দ্ধমানরাজ এই স্কুল প্রথম অবৈতনিকরূপে চালু করেন। দূরেব সাধনপুর স্কুলে হিন্দুর মেয়েদের ও ছেলেদেরও যেতে সংকোচ ছিল, তাই শহরের মধ্যস্থলে সি, এম, এস স্কুল স্থাপনে বর্দ্ধমানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেব সম্মতি ছিল। মিশনারী সোসাইটি বর্দ্ধমানে অনেকগুলি ইংরেজী পাঠশালা খুলেছিল। সি, এম, এস এর নূতন গৃহনির্মিত হলে সব ইংরেজী পাঠশালাগুলি এখানে চলে আসে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন তিনটি সি, এম, এস স্কুলের অস্তিত্ব আছে একটি বর্দ্ধমানে, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণনগরে এবং তৃতীয়টি উত্তরবঙ্গে।

বর্দ্ধমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে বর্দ্ধমান মিশনারী সোসাইটির জেমস ষ্টুয়ার্ট ও রেভরেন্দ ব্রেখেতের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্যাপ্টেন জেমস্ ষ্টুয়ার্টের

উদ্যোগে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি প্রথম চালু হয় বর্দ্ধমানে। ক্যাপ্টেন ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী। চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটির সহযোগিতায় সমগ্র বর্দ্ধমান জেলায় মাত্র দুটি ভার্ণাকুলার স্কুল স্থাপিত হয়। দু বছরে এইরূপ স্কুল বেড়ে দশে দাঁড়ায়। তখন থেকেই ছাপা বই পড়া সুরু হয়। তার আগে পুঁথি পড়া হত। সাহিত্য, গণিত, ভূগোল ও ইতিহাসের প্রাথমিক জ্ঞান ছাড়া ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আইন কানুনের বিষয় ধারণা দেওয়া হত। নবযুগের প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহনের পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দোলনের ঢেউ বর্দ্ধমানে আছড়ে পড়ে।

কারণ রামমোহনের জন্মভূমি খানাকুল আরামবাগ তখন বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রগতিশীল বাঙালি ও কিছু ইংরেজ মিলে বর্দ্ধমানেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দোলনে মেতে ছিলেন। বর্দ্ধমানরাজগণও তার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বর্দ্ধমানে শিক্ষাবিস্তারে ক্যাপ্টেন জেমস স্টুয়ার্টের অবদান স্মরণীয়। ষ্টুয়ার্ট সৈন্যবিভাগে কাজ করতেন। কাজ ছেড়ে দিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী নিয়ে শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বাংলা ভাষা জানতেন ও পরিস্কার বাংলা বলতেন। বাংলা ভাষায় তিনি কয়েকটি বইও লিখেছিলেন—'বর্ণমালা', 'উপদেশ কথা', 'তমোনাশক' প্রভৃতি। খ্রীষ্টান ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পাঠশালায় বাঙালি ছেলেমেয়েদের আকৃষ্ট করার জন্য বাইবেল পাঠ বা বাইবেলের নীতিশিক্ষা পড়ানো হত না। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের দশটি পাঠশালায় ছাত্রসংখ্যা ছিল এক হাজারের মত। এই পাঠশালাগুলির পরিচালনার ভার ছিল চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটি কলিকাতা শাখার। বর্দ্ধমানে ষ্টুয়ার্টের পাঠশালাগুলির খুব সুনাম ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে আরও তিনটি নিয়ে মোট তেরোটি পাঠশালা চালু হয়। এই পাঠশালাগুলির ভার ছিল দুজন পাদরীর উপর— মিঃ জেটার ও মিঃ ডীয়ার। এই সময় ভালো ছাত্রদের ইংরেজী শেখানোর জন্য একটি কেন্দ্রীয় স্কুলও খোলা হয়। সম্ভবতঃ এই বিদ্যালয়টিই সি, এম, এস। বাংলা ও ইংরাজী দুই ধরণের পাঠশালা ছিল। বাংলা পাঠশালার দায়িত্বে ছিলেন ডীয়ার ও ইংরাজী পাঠশালার দায়িত্বে ছিলেন জেটার সাহেব। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ্চ মিশনারীদের হাতে ছিল মোট ৯টি পাঠশালা। এইসব পাঠশালাগুলি কেন্দ্রীয় স্কুল সি, এম, এস স্কুলে উঠে আসে।

বর্দ্ধমানে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও রামতনু লাহিড়ী

হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিওর অনুগামী পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্যতম প্রবক্তা রসিককৃষ্ণ মল্লিক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হয়ে আসেন ও অনেকদিন বর্দ্ধমানে বসবাস করেন। তাঁর নির্ভীকতা সর্বজন বিদিত। তৎকালে সুপ্রীম কোর্টে হিন্দুদের সাক্ষী দেবার সময় তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ

করতে হত: যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না। কোন একটি মোকৰ্দ্দমায় সাক্ষী যুবক রসিককৃষ্ণ মল্লিককে তামা, তুলসী, গঙ্গাজল নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করতে বললে, রসিক গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, 'I do not believe in the sacredness of the Ganges', অর্থাৎ আমি গঙ্গার পবিত্রতায় বিশ্বাস করি না। এই উত্তরে সেদিন আদালত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ই বৰ্দ্ধমানে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী সাহয্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন মিঃ জে ওয়ার্ড। এই স্কুলটি তাই 'ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন' নামে খ্যাত হয়। ওয়ার্ড সাহেব মহারাজার ভার্ণাকুলার স্কুলে পড়াতেন। ছেড়ে দিয়ে সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ওয়ার্ডের পর ওয়াট্সন ও তৃতীয় প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন স্বনামধন্য রামতনু লাহিড়ী মহাশয়। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে রামতনু লাহিড়ী বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন। বৰ্দ্ধমানে থাকাকালীন রসিককৃষ্ণ ও রামতনু দুই বন্ধুতে একত্র বাস করতেন। রসিককৃষ্ণ ছিলেন রামতনুর guide, philosopher and friend [রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ— শিবনাথ শাস্ত্রী]।

রসিককৃষ্ণের মতই রামতনু ছিলেন গোঁড়া সংস্কার মুক্ত ও পাশ্চাত্য আদর্শে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মণের ছেলে রামতনু উপবীত ত্যাগ করায় বৰ্দ্ধমানবাসী তাকে বিধর্মী বলে সামাজিক বয়কট করেন। বেগতিক দেখে রামতনু কলকাতায় চলে যান। বৰ্দ্ধমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে রসিককৃষ্ণ ও রামতনুর সহযোগিতা মিশনারীদের স্বপ্নকে সফল করতে সাহায্য করেছিল।

প্রথম প্রথম রামতনুর স্কুলটি ছিল অবৈতনিক ও সরকারী সাহায্যপুষ্ট। সেজন্য প্রচুর ছাত্রের ভীড় হয়। ছাত্রের সংখ্যা কমাবার জন্য মাসে আট আনা থেকে একটাকা বেতন চালু করলে অধিকাংশ ছাত্র সরকারী স্কুল পরিত্যাগ করে মহারাজার 'রাজস্কুলে' বিনা বেতনে ভর্তি হতে থাকে। সরকারী বিদ্যালয়টির ছাত্রসংখ্যা খুব কমে যাওয়ায় মহতাবচন্দ বাহাদুর সরকারকে লেখেন :

"......if the Government Institution were withdrawn he would place his school upon a better footing and guarantee that no one really desirous of free education in Burdwan should be deprived of it."

অবশেষে সরকারী বিদ্যালয়টি 'রাজ কলেজিয়েট স্কুলের' সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। এ বিষয়ে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর 'সম্বাদ. পূর্ণচন্দ্রোদয়' যে সংবাদ প্রকাশ করে, এখানে তা দ্রষ্টব্য : "বৰ্দ্ধমান হইতে আগত পত্রপাঠে অবগত হইল ভদ্রস্থ গভর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের বিলোপান্তর বিদ্যার্থীগণ মহারাজ প্রতাপচন্দ বাহাদুরের

প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং মহারাজার প্রযত্নে ও বিদ্যার্থী বাহুল্যে উক্ত বিদ্যালয় দিন দিন মহোন্নতিশালিনী হইতেছে। গভর্ণমেন্ট স্কুলের যে সকল টুল টেবিল ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী তাহা মহারাজের বিদ্যালয়ে গৃহীত হয় নাই, সে সকল নিলামে বিক্রীত হইতেছে। অনুমান হয় এডুকেশন কৌন্সেলে তন্মূল্যে জমা হইবেক।" চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্দ্ধমান শহরে ও সন্নিহিত অঞ্চলে (মানকরে) কয়েকটি বাংলা ও ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার এই নূতন ব্যবস্থা শিক্ষিত মানুষের অচিরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিদ্যালয়গুলির জনপ্রিয়তার জন্যও বর্দ্ধমানরাজগণ আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন। কোথাও কোথাও বিদ্যালয় গৃহনির্মাণের যাবতীয় খরচ ও ভূমি দান করেছিলেন।

বর্দ্ধমানে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র

দুই মনীষীর বর্দ্ধমানে অবস্থান কালে শিক্ষার প্রসার ত্বরান্বিত হয়। একজন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যজন হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দক্ষিণবঙ্গের সহঃ প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হয়ে (১৮৫৫-১৮৫৮ খ্রীঃ) বর্দ্ধমান এসেছিলেন ও বর্দ্ধমান পার্কাস রোডস্থিত (বর্তমান নাম মহম্মদ ইয়াসিন রোড) একটি গাড়ি বারান্দাওয়ালা বাড়িতে থাকতেন। বঙ্কিমচন্দ্র হাকিম হয়ে বর্দ্ধমান এলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা থেকে পাওয়া যায়, বঙ্কিমের গাড়ি বিদ্যাসাগরের গাড়ি বারান্দায় এসে লাগত। অল্প কিছু কথাবার্তার পর বঙ্কিম চলে যেতেন। বঙ্কিম লোকশিক্ষার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন।

ডঃ সুকুমার সেন এই গ্রন্থের গ্রন্থকারকে বলেন, বিদ্যাসাগরের আদি নিবাস ছিল গোতান থেকে ছ মাইলে দক্ষিণে হুগলী জেলার মলয়পুর গ্রামে। বিদ্যাসাগরের তিন পুরুষ আগে অর্থাৎ প্রপিতামহ মলয়পুরে বাস করতেন। মাতুলের সম্পত্তি পেয়ে বীরসিংহ গ্রামে যান।

বিদ্যাসাগর বর্দ্ধমানে বেশ কিছু স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তার মধ্যে মেয়েদের স্কুল বেশি ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট-অক্টোবরের মধ্যে তিনি পাঁচটি মডেল স্কুল এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় দফায় তিনি দশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রসুলপুর বিদ্যালয়টি প্রথম বালিকা বিদ্যালয়রূপে এই সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ আন্দোলন করতে গিয়ে বুঝেছিলেন মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা আগে না করলে এ জাতির রক্ষা নাই। তাই তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্দ্ধমান বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে তিনি নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের

কতকগুলি আদর্শ বিদ্যালয় (Model school) প্রতিষ্ঠা করেন। সে ক্ষেত্রেও মেয়েদের স্কুলই অগ্রাধিকার পেত। বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে বর্দ্ধমান শহরে চালু বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করে মোটামুটি সন্তুষ্ট হন এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই বর্দ্ধমান শহরে চালু স্কুলগুলির কথা চিন্তা করেই তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে গ্রামে প্রসারিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বর্দ্ধমানের সুদূর ও প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রসুলপুর স্কুলটি প্রথমে মেয়েদের স্কুল হিসাবে আত্মপ্রকাশ, পরে বিদ্যালয়টি মধ্য ইংরাজি (Middle English School-অধুনালুপ্ত) ও পরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত (High English School-অধুনা হাইস্কুল) হয়। বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে রসুলপুর গ্রাম নিবাসী উমেশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের গৃহে এই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। সাহিত্যসাধক চরিতমালা থেকে জানা যায় ২৬শে এপ্রিল ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্য রসুলপুর গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য মাসিক একত্রিশ টাকা অনুদান (Grant) মঞ্জুর করেন। পরবর্তীকালে তৎকালীন শিক্ষা অধিকার (Director of Public Instruction) লাটসাহেবের (Governor) কাছ থেকে স্থায়ী অনুদান মঞ্জুর করান। এইভাবে রসুলপুর বালিকা বিদ্যালয পুরোপুরি সরকারী সাহায্যের আওতায় চলে আসে। বর্দ্ধমান বিভাগের দক্ষিণবঙ্গেব সহঃ প্রধান পরিদর্শক থাকার সময় বিদ্যাসাগরকে হুগলী, নদীয়া, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান ঘুরে বেড়াতে হত। এই সময়ই শিশুদের উপযোগী 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫ খ্রীঃ) তিনি রচনা করেন। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর বন্ধু রসুলপুরের উমেশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের বাড়িতে একবার গিয়ে দেখেন, উমেশ ছুরিতে হাত কেটে ফেলেছেন। বিদ্যাসাগরকে দেখে উমেশ তাড়াতাড়ি হাতে পটি বেধেঁ তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং বললেন, ও কিছু নয়, ছুরিতে একটু হাত কেটেছে, সেরে যাবেক্ষণ। বিদ্যাসাগর পরিহাস করে বলেছিলেন, হ্যাঁ কাটা হাত সেরে যাবে, কিন্তু চিরকাল সবাই উমেশের হাত কাটা মনে রাখবে। সেই রাতেই বর্দ্ধমান ফিরে বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' প্রথমভাগে লিখলেন 'উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়াছে'। 'বর্ণপরিচয়' ছেপে শিশুদের পাঠ্যপুস্তক আকারে বেরুলে একটি কপি বিদ্যাসাগর তাঁর বন্ধু উমেশকে দিয়েছিলেন। লেখা পড়ে দুজনের সে কি হাসি! প্রথম প্রথম 'বর্ণপরিচয়ের' এমন চাহিদা হয়েছিল যে, গ্রামে মুদির দোকানী শহর থেকে বই কিনে নিয়ে যেত ও তেল নুন, মরিচ-মশলার সঙ্গে খদ্দেরদের চাহিদামত 'বর্ণপরিচয়' বিক্রয় করত।

এদেশে শিক্ষাবিস্তারে এ্যাডামের অবদান স্মরণীয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের কাছে তিনি শিক্ষা সংস্কারের কতকগুলি সুপারিশ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সেই সুপারিশগুলি গৃহীত হয়, এ্যাডামের অভিমত ছিল: 'I propose to qualify

a body of vernacular teachers to raise their character and provide for their support and to give a gradual, parmanent, and a general establishment to a system of Common Schools.' এ্যাডাম মাতৃভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কিন্তু লর্ড অকল্যাণ্ড সিদ্ধান্ত নেন ঐ সুপারিশ গ্রহণ না করার, 'Because there were no suitable text books in the vernacular which could be used in the proper schools.'

এ্যাডামের স্বপ্ন ব্যর্থ হয় নাই। পরবর্তীকালে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় 'গুরুট্রেনিং' বা নর্মাল স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলার কাজ সুরু হয়। বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনকে এক পত্রে লেখেন, মাসিক পাঁচশো টাকা খরচ করলে বছরে ১২০ জন ভাল শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরী করা যাবে। বৰ্দ্ধমান সি, এম, এস স্কুলে সকালের দিকে 'গুরুট্রেনিং' বা 'নর্মাল স্কুলের' ক্লাস হত। এই স্কুলে ট্রেনিং নিতে কলকাতা থেকে শিক্ষকরা আসতেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট থেকে১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত, বিদ্যাসাগর নদীয়া, বৰ্দ্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরে মোট কুড়িটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন। বৰ্দ্ধমান জেলায় প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট আমাদপুরে ২৭শে আগষ্ট জৌগ্রামে, ১লা সেপ্টেম্বর খণ্ডঘোষে, ৩রা সেপ্টেম্বর মানকরে ও ২৯শে অক্টোবর দাঁইহাটে। বিদ্যাসাগর কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও পালকীতে, কখনও গরুর গাড়িতে গ্রামের পর গ্রাম পরিভ্রমণ করতেন। ১৮৫৭-১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই একবছর বিদ্যাসাগর বৰ্দ্ধমানে ১১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর রাণাপাড়ায়, ১৮৫৮-র ২৫শে জানুয়ারী জামুইতে, ২৬শে জানুয়ারী শ্রীকৃষ্ণপুর ও রাজারামপুরে দুটি বালিকা বিদ্যালয় ও ২৭শে জানুয়ারী জ্যোৎশ্রীরামপুরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১লা মার্চ্চ দাঁইহাটে ও কাশীপুরে দুটি বালিকা বিদ্যালয়, ১৫ই এপ্রিল সানুইতে একটি, ২৬শে এপ্রিল রসুলপুরে একটি, ২৭শে এপ্রিল বস্তিরে ও ১লা মে বেলগাছিতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রসুলপুরে এখন যেটি ছেলেদের স্কুল, প্রথমে ঐটি মেয়েদের স্কুল ছিল। সরকারী সাহায্য মিলবে এই আশায় বিদ্যাসাগর একের পর এক বালিকা বিদ্যালয় খুলে দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার কোন সাহায্য না দেওয়ায় বিদ্যাসাগরের বদলীর সঙ্গে সঙ্গে অনেক বালিকা বিদ্যালয় উঠে যায় এবং বাকীগুলি ছেলেদের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বিদ্যালয়গুলির জন্য সাহায্য চেয়ে সরকারকে বিদ্যাসাগর যে পত্র লেখেন: "I have the honour to state that in anticipation of the sanction of Govt female shcools were opened by me in several villages in the Dist of Hugli, Burdwan, Nadia and Midnapore. The schools were opened by me on condition that the inhabitants of each village would

provide a suitable school house the expenses for their maintenance being defrayed by the Govt."[c]

কিন্তু ভারত সরকারের কাছ থেকে আশানুরূপ গ্রাণ্ট না পাওয়া অনেক বালিকা বিদ্যালয় পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকটি আবার সন্নিহিত বালক বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশে যায়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মের একখানা চিঠিতে জৌগ্রামের বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে বিদ্যাসাগর ডি. পি. আইকে লিখছেন: 'It was opened on the 15th of April last and now musters on its roels 28 girls of different ages, ranging for 4 to 11 years, the majority of whom are daughters of respectable Brahmans and Kayastha of the place.' দীর্ঘপত্রে অন্য এক জায়গায় লিখছেন: 'Having however visited it during this week I have been led to hope that their is every chance of it flourishing within a short time.' বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বঙ্গের সহঃমুখ্য বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমানে থাকাকালীন প্রায় চল্লিশটি মেয়েদের আদর্শ স্কুল স্থাপন (Model School) করেন। সেই সময় প্যাট সাহেব ছিলেন দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্যালয় পরিদর্শক। প্যাট সাহেব হঠাৎ ছুটি নিয়ে বিলেত ফিরে যান, বিদ্যাসাগর আশা করেছিলেন যে শূন্যপদে তাঁকে নিয়োগ করে উন্নীত করা হবে। কিন্তু সরকার এই শূন্যপদে হ্যালিডে লজ সাহেবকে বসালেন। একদিকে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির প্রতি সরকারী সাহায্যের বঞ্চনা, অন্যদিকে বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণবঙ্গের মুখ্য বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে উন্নীত না করায় ক্ষুদ্ধ হন ও ঐপদে ইস্তফা দেন। বিদ্যাসাগর জেলায় যে ব্যাপক স্ত্রীশিক্ষার সুত্রপাত করেন তার অনেকগুলি অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। বর্দ্ধমানে শিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগর চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শিক্ষায় বর্দ্ধমান রাজবংশের অবদান

বর্দ্ধমান রাজ পরিবার বরাবরই গুণগ্রাহীও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। একদিকে মিশনারীদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যদিকে বর্দ্ধমান রাজ পরিবারের শিক্ষা প্রচেষ্টা— এই দুই ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল বর্দ্ধমানে। তেজচন্দ নিজে বহু অর্থ অকাতরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করে গেছেন। তেজচন্দ কেবল বর্দ্ধমানেই নয়, হুগলী জেলায় রবার্ট মের পরিকল্পনায় চুঁচুড়াতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গঙ্গাতীরবর্তী চুঁচুড়া শহরটি তেজচন্দের বড় প্রিয় ছিল। এখানকার রাজপ্রাসাদে তেজচন্দ প্রায়শই বসবাস করতেন। এই শহরে রেবরেন্দ রবার্ট মে ছিলেন লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির একজন শিক্ষাব্রতী। ইনি ল্যাঙ্কাষ্টারীয় (Lancstariaon Plan) পরিকল্পনায় একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তেজচন্দ প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়টিও মে অনুসৃত পদ্ধতিতে স্থানীয় এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তেজচন্দ এই মডেলের

একটি ইংরাজী বিদ্যালয় অম্বিকা কালনাতেও প্রতিষ্ঠা করেন। তেজচন্দ জমিদার বংশের প্রতিভূ হলেও সংস্কারমুক্ত ও প্রগতিশীল মনের অধিকারী ছিলেন বলেই পাশ্চাত্য শিক্ষাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন দেশের মানুষকে সুশিক্ষিত করে তুলতে।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে বর্দ্ধমানের শিক্ষাবিস্তারের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় এ্যাডামের রিপোর্টে। Peterson সাহেবের বিবৃতি অনুযায়ী সে সময় (১৯১০ খ্রীঃ)সমগ্র জেলায় ৬২৯টি বাংলা পাঠশালা Elementary School ছিল। তারমধ্যে বাংলা স্কুল ছিল ৫৮৬টি, এছাড়া ১৮৭টি সংস্কৃত টোল, ৮৫টি ফার্সী ৮টি আরবী ও ৩টি ইংরাজী স্কুল। এর মধ্যে মাত্র চারটি বালিকা বিদ্যালয় ১টি শিশুবিদ্যালয় (নার্শারী)। এ্যাডামের রিপোর্ট থেকে আরও জানা যায় তখন বর্দ্ধমানে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। অম্বিকার মনু ও মিতাক্ষরার অনুবাদক সার্বভৌম, মেমারীর গুরুচরণ তর্ক পঞ্চানন, বড়বেলুনের ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মাহতার কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ, মারোর শিবন্দন গোস্বামী, চানকের রাধাকান্ত বাচস্পতি, এবং বর্দ্ধমানের রামকমল কবিভূষণ (তেজচন্দের সভাসদ)। বেশিরভাগ শিক্ষক ছিলেন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ। শিক্ষকতা ছাড়াও শিক্ষকগণ অন্য সময়ে চাষবাস ও গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকতেন। সমগ্র জেলায় বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৩১৯০টি। সম্পূর্ণ পাঠক্রম শেষ করতে ১১ বছর সময় লাগত। শিশু শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী। পাঠশালার পর ছিল lower primary বা নিম্ন প্রাথমিক এবং upper primary বা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়। তারপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী মিলিয়ে Middle English School বা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়। তারপর সপ্তম থেকে দশম শ্রেণীর শেষে চূড়ান্ত পরীক্ষা ছিল, নাম Entrance বা প্রবেশিকা। সব জাতি ও বর্ণের ছেলেরাই বিদ্যালয়ে আসত। তবে বর্ণহিন্দুর ছেলেরা বেশি সংখ্যায় আসত। তপশীল ছেলেরা খুব কমই আসত। মেয়েদের স্কুল না থাকায় প্রাথমিক পাঠক্রমের পর আর স্কুলে পড়া হত না। বাড়িতে পড়াতে হত। নিম্নবর্ণের ছেলেরা ও আদিবাসী সন্তানগণ বেশী যেত মিশনারীদের স্কুলে। ঐ সময় জেলায় ১৮৭টি সংস্কৃত পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৩৫৮। তেজচন্দের সময়ে বালিকা বিদ্যালয় ছিল চারটি— বর্দ্ধমান, বাঁশবেড়িয়া, কাটোয়া ও কালনায়। বর্দ্ধমানের বালিকা বিদ্যালয়টি হল তেজচন্দের বিদুষী স্ত্রী কমল কুমারীর নামানুসারে মহারাণী অধিরাণী বালিকা বিদ্যালয়। উক্ত চারটি বালিকা বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৭৫, তারমধ্যে ৩৬ জন খ্রীষ্টান এবং একজন মাত্র মুসলিম ছাত্রী ছিল। গ্রামের পাঠশালাতে পড়ুয়ারা বেশির ভাগই মেঝেতে কাঠি, খড়ি বা পেন্সিল দিয়ে অক্ষর পরিচয় সারত। বাকী ভূঁষো কালি ও শরের কলম দিয়ে তালপাতার উপর লেখা অভ্যাস করত। একটি সমীক্ষা থেকে সে সময় জানা যায় ৭১১৩ জন শিক্ষার্থী মেঝের উপর এবং ১৬১০ জন তালপাতায় লেখা অভ্যাস করত।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে শিক্ষার অগ্রগতি আশা ব্যঞ্জক ছিল। সমগ্র জেলায়

১০টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত (Aided) এবং ২টি সাহায্যহীন (Unaided) হাইস্কুল ছিল, ২২টি মিডল ইংলিশ ও আটটি ট্রেনিং স্কুল ছিল, নৈশ বিদ্যালয় ছিল ৪৩টি– এগুলিতে পড়ুয়া ছিলেন ৮৩৬ জন। তেজচন্দ সংস্কৃত শিক্ষারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৰ্দ্ধমানে পূর্বপ্রচলিত টোল, চতুষ্পাঠীগুলি রাজবংশের সাহায্যেই চলে এসেছে। ঐ সময় রাজবাড়ি হতে প্রদত্ত বৃত্তিধারী ৮৩ জন পণ্ডিত ছিলেন। যাঁরা টোল, চতুষ্পাঠিতে অধ্যাপনা করতেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর এঁরা সকলেই অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা (Pension) পেয়েছিলেন সরকার থেকে। তেজচন্দের দেওয়ান পরাণচন্দ কপুর রচিত 'হবিহর মঙ্গল সঙ্গীত' (১৮৩০ খ্রীঃ) গ্রন্থে আছে:

অধ্যাপনা অধ্যয়ন পরে কত কতজন
যোগ্যস্থান দিলা তা সভারে।
স্বদেশী বিদেশী জন ব্রাহ্মণ তনয়গণ
যেমন ইচ্ছা অধ্যয়ন করে॥
অভিধান ব্যাকরণ নাট্য অলঙ্কারগণ
সাহিত্য পিঙ্গল ভট্টি আদি।
টীকা সহ ব্যাখ্যা তার বহে যেন গঙ্গাধার
বিচারাস্তগণ বিতণ্ডাদি॥
ন্যায় সাংখ্যা পাতঞ্জল কি বেদান্ত মহাবল
বৈশেষিকী মীমাংসা দর্শন।
নানা শাস্ত্র নানা জনে পড়ে পড়ু ও আরগণে
পড়ায়েন সুপণ্ডিতগণ॥
আয়ুর্বেদিগণ সব আয়ুর্বেদ অনুভব
করেন কতেক স্থানে স্থানে।
আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী আয়ুর্বেদি স্থানে যাই
পঠন করেন জনে ২॥
কিতাবত অঙ্কশাস্ত্র হিসাব কিতাব যত
বিশারদ কত সরকার।
নানা স্থানে ছাত্রগণ সবে করে সুপঠন
একে ২ কত কব তার॥

অর্থাৎ তেজচন্দের সময় সংস্কৃত, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, সাহিত্য, ন্যায়, সাংখ্য, পতঞ্জল, বেদ্যান্ত,, মীমাংসা দর্শন, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র পড়ানো হত। পরাণচন্দ কপুরের ঐ কাব্যগ্রন্থেই দেখা যায়, তেজচন্দ মুসলামানদের জন্য আরবী-ফারসী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন:

"যাবনিক ভাষা থাকে পারসী বলয়ে লোকে
পড়ায় মৌলবী কাজীগণ।
কেতাব কোরাণ আর আরবী তাহাতে সার
স্থানে ২ শিখে কতজন॥"

বঙ্গ প্রদেশে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বর্দ্ধমান অগ্রণী ছিল। তেজচন্দের ষষ্ঠ স্ত্রী কমলকুমারী বিদূষী ও শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রতাপচন্দের দুই পুত্রবধূও আনন্দকুমারী ও প্যারীকুমারী যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন। গৌরীশংকর তর্কবাগীশ সম্পাদিত "সম্বাদ ভাস্কর"পত্রিকায় পাওয়া যায়:

"কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষালয় হইয়াছে, ইহাতে সকলেই গোলযোগ করিতেছেন, কিন্তু আমরা বারম্বার বলিয়াছি এবং বলিতেছি আরো বলিব এতদ্দেশী স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার প্রথা নবীন নহে...."

বালিকাদের শিক্ষালয় হল 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' (অধুনা বেথুন স্কুল), কলকাতায় বালিকাদের শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গোঁড়া হিন্দুগণ হৈ-চৈ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই বর্দ্ধমানে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছিল। উদাহরণ স্বরূপ 'সম্বাদ ভাস্করেই' পাওয়া যায়: '....বর্দ্ধমান রাজবাটিতে এবং নাটোরের রাজবাটীতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রথা হইয়াছে, বর্দ্ধমানাধিরাজ স্বর্গীয় মহারাজ তেজচন্দ বাহাদুরের পট্টমহিষী ৺ প্রাপ্তা মহারাণী কমলকুমারী স্বয়ং লিখিতে পড়িতে পারিতেন, বিদ্যাবলে ঐ মহারাণী মহারাজ তেজচন্দ বাহাদুরের বর্তমান কালাবধি আপনি রাজকার্য করিয়াছেন এবং মহারাজাধিরাজ প্রত্যপচন্দ বাহাদুরের দুই রাণী বর্তমান আছেন, তাঁহারাও লিখন-পঠন বিষয়ে অতি সুশিক্ষিতা।" [সংবাদপত্রে সেকালের কথা: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১ম খণ্ড)– পৃ ৪১১]

তেজচন্দের চেষ্টাতেই ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে 'ভারত প্রসিদ্ধ' একটি চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। গবেষকের মতে "বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা"। প্রতাপচন্দ এই চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠাতা। [বর্দ্ধমান রাজপরিবারও আমাদের শিক্ষাজগৎ--আব্দুস সামাদ] কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে তেজচন্দ একটি ভার্ণাকুলার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এটি উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় যার নাম 'বর্দ্ধমান রাজ কলেজিয়েট' স্কুল। এটি প্রথম ফ্রী স্কুল ছিল অর্থাৎ অবৈতনিক। কিন্তু পরে এই স্কুলেও ছাত্রের চাপ কমাতে বেতন ধার্য হল। ফ্রী স্কুল উঠে গেল।

জেলায় শিক্ষাবিস্তারে মহতাবচন্দ ছিলেন যেমন উদারহস্ত তেমনি সরকারী সাহায্য ছিলো নামমাত্র। এ সম্পর্কে 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

"....বৰ্দ্ধমানাধিপতির দানশৌণ্ডতা ও বিদ্যানুরাগে তৎপ্রদেশীয় সর্বসাধারণ জনগণ নানা বিদ্যার রসাস্বাদেনে সমর্থ হইলেন মহারাজের সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ভূরি ভূরি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাত্মজ নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই ইংরাজী পাঠশালাতেও তদ্দেশবিচ্ছেদে যাবতীয় বালক ইংরাজী বিদ্যাশিক্ষা করিতে অভিলাষী হইবেক তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে কিন্তু গবর্ণমেন্ট কি কেবল মহারাজের প্রতিই ঐ প্রদেশের প্রজাপুঞ্জের বিদ্যাশিক্ষার ভার অর্পণপূর্বক ঐ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইবেন না, এডুকেশন কৌন্সেল দ্বারা ঐ বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধারণ ও সময়ে ২ উৎসাহ প্রদানপূর্বক তত্রস্থ শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন এ বিষয়ে জ্ঞাত হয় নাই যদিও মহারাজের বদান্যতা ও শিক্ষানুরাগ প্রভাবে ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে এবং ছাত্রগণের সুশিক্ষা বিষয়ে কোন প্রকার ত্রুটি সম্ভাবনা নাই বটে তথাপি এডুকেশন কৌন্সেলে সময়ে ২ তত্ত্বাবধান করিলে বিদ্যালয় সংক্রান্ত জনগণের মহামহোৎসাহ জন্মিতে পারে অতএব এ বিষয়ে এডুকেশন কৌন্সেলেকে একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে বলিতে পারা যায় না"।

মহতাবচন্দ মেদিনীপুরে একটি ইংরাজী পাঠশালার জন্য এককালীন একহাজার টাকা ও বৰ্দ্ধমানের একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য দেড়হাজার টাকা দান করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে মহতাবচন্দের প্রচেষ্টায় রাজকলেজিয়েট স্কুলটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। এই বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তিনজন ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষালাভে উৎসাহদানের জন্য তিনটি বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন মহতাবচন্দ। এছাড়া প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি ক্লাসের প্রথম তিনজনকে পুস্তক ও অন্যান্য পারিতোষিক দিতেন।

বৰ্দ্ধমানে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে হান্টার সাহেবের রিপোর্ট প্রণিধানযোগ্য। তা নিম্নরূপ :

"এখানে Higher Schools রয়েছে এগারোটি। তারমধ্যে বৰ্দ্ধমান রাজের স্কুল দুটি। মহারাজার বিদ্যালয়ে ৫০০ জন ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করে। তবে আমি গিয়ে দেখলুম মাত্র ২০০ জন ছাত্র উপস্থিত।"

মহতাবচন্দ বৰ্দ্ধমানেও অম্বিকা কালনায় বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৰ্দ্ধমানের বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় বর্তমান শুলিপুকুরের ঈশানকোণে অবস্থিত একটি বাড়িতে। মহতাবচন্দ বেথুন স্কুলে পাঁচশত টাকা ও কেশবচন্দ সেন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে এক হাজার টাকা দান করেন। বৰ্দ্ধমান মহারাজার দানশীলতার কথা সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছে, ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে সংবাদ প্রভাকর লিখছেন : 'বিদ্যাবিষয়ে মহারাজা যেরূপ উৎসাহ প্রদান করেন তদৃষ্টান্ত বৰ্দ্ধমানস্থ ইংরাজী ও সংস্কৃত কলেজদ্বয় এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রকাশ পাইতেছে।'

সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় রাধামাধব মিত্র রচিত প্রশস্তিতেও শিক্ষার প্রতি বৰ্দ্ধমান রাজের সুদৃষ্টির উল্লেখ আছে:

ধন্য ধন্য মহারাজ, বৰ্দ্ধমানেশ্বর।
পণ্ডিত সুজনধীর বুদ্ধির সাগর॥
তাঁহার কৃপায় কতশত ছাত্রগণ।
অনায়াসে করিতেছে বিদ্যা উপার্জন।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বৰ্দ্ধমান রাজ পরিচালিত স্কুলের যে বিবরণী প্রকাশিত হয়েছে তা স্মর্তব্য:

'রাজার ইংরাজী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বাঙলা পরীক্ষা করিয়া আমার বোধ হইল, পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে ইহার কার্য উত্তম চলিতেছে। অন্যত্র রাজা এই স্কুলের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া থকেন। এক্ষণে ইহাতে ছাত্রের সংখ্যা ৪৩২, অদ্য উপস্থিত ৩৭০ জন। ছাত্ররা দশ শ্রেণীতে বিভক্ত। এখানে ইংরাজী শিক্ষক দশ ও দুইজন পণ্ডিত আছেন। ইহার অন্তর্গত বাঙগালা ডিপার্টমেন্টে ছাত্রের সংখ্যা ৫৫, অদ্য উপস্থিত ৫০। এখানে তিনজন পণ্ডিত আছেন।'

'অত্রত্য সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ন্যায় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেছেন। ইহাদিগের সংখ্যা৪০ জন। বালিকা বিদ্যালয়ে ১৫টি বালিকা আছে। ১৮৬২ সালের আগষ্ট মাসে ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান ও দ্বিতীয় শিক্ষক পরিবর্ত্তন করিয় প্রধান শিক্ষকের পদে একজন ইংরাজকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিৎ বাঙগালা জানা থাকিলে ভালো হইত।'

এই সময় বৰ্দ্ধমানের বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন কালিদাস মৈত্র ও স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭ খ্রীঃ–৯৪ খ্রীঃ)। বলা হয়েছে 'বৰ্দ্ধমানের ডেপুটি ইন্সপেক্টর কালিদাস মৈত্রের অধীনে ৩৫টি এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ৪০টি বিদ্যালয় আছে। মহারাজ পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪, পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। এগুলির মধ্যে কালনা, পাড়াতল ও জ্যোৎশ্রীরাম - এই তিনটি মৈত্রের, একটি মহারাজার এবং গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়টি ভূদেব বাবুর অধীনে আছে। তত্ত্বাবধানগুণে অনেকগুলি বিদ্যালয় উত্তম, কিন্তু বেড়গ্রাম ও গণপুরের বিদ্যালয়ের অবস্থা অতি মন্দ। মৈত্রবাবুর অধীনে যত স্কুল আছে, তন্মধ্যে আমাদপুর, জৌগ্রাম, পূর্বস্থলী, শ্রীকৃষ্ণপুর ও মানকর—এই কয়েকটি স্থানে আদর্শ বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়গুলিতে বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজী শেখাবার ব্যবস্থা আছে। মিশনারী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২০০, এগুলি সাত শ্রেণীতে বিভক্ত।'

বৰ্দ্ধমানে তখন একটি গুরুট্রেনিং স্কুলও ছিল। এটি অবস্থিত ছিল লাকুড়িডতে।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এই গুরুট্রেনিং স্কুলটির প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তখন এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৬২। উক্ত রিপোর্টে স্কুলটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়: গুরুট্রেনিং স্কুলটি সম্পর্ক প্রথমে আমাদের উচ্চ ধারণা ছিল না, কিন্তু এখানকার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্ন, পরিশ্রম ও শিক্ষা প্রণালীর গুণে আমাদের সেই সংস্কারের অন্যথা হইয়াছে। আমি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শিক্ষা প্রণালী দর্শন ও ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিয়া যারপরনাই প্রীতি হইয়াছি। এখানে সমস্ত ভূচিত্র, পশু পক্ষ্যাদির চিত্রপট, দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ, তাপমান ও তাড়িত যন্ত্র, গ্লোব, কম্পাস ও বস্তুমঞ্জুষা তদ্ভিন্ন গজ ফুট ও একটি পুস্তকালয় আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেবল মৌখিক শিক্ষা প্রদান করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, অনেক বিষয় প্রত্যক্ষ করাইয়া দেন..."[সোমপ্রকাশ—১৬ই চৈত্র ১২৭০: পৃ ৩১২]।

মহতাব চন্দের ও সরকার পরিচালিত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম শিক্ষক ও শিক্ষাবিভাগের কর্মীদের বেতন নিম্নরূপ ছিল: স্কুল সাবইন্সপেক্টার— লালমোহন বিদ্যানিধি—৭৫টা-, স্কুলের হেডমাস্টার ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—৭০টা-, সরকারী স্কুলের হেডমাষ্টার ডব্লু, সি, ডসমিয়র—১৭৫টা-, জুনিয়ার হেডমাষ্টার— মহেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য—৬০টা-, সংস্কৃত স্কুলের পণ্ডিত জে, মজুমদার— পণ্ডিত ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন— বালিকা বিদ্যালয় (মহারাজার)—৫০টা-, শিক্ষাদাত্রী মধুমতী দেবী—৪০টা-, মিশনারি স্কুলের হেডমাষ্টার ভুবন মোহন ঘোষ বি, এ—৫০টা-, এডেড স্কুলের হেডমাষ্টার চুনীলাল গুপ্ত—৪০টা-, [বর্দ্ধমান রাজ পরিবার ও আমাদের শিক্ষা জগৎ—আব্দুস সামাদ] সংবাদপত্র সোমপ্রকাশ বর্দ্ধমানের স্কুলগুলির দুরবস্থা দেখে বিরূপ সমালোচনা করেছিল: বর্দ্ধমানকে লোকে যে কারণে অবজ্ঞা করে থাকে সে কারণটি হলো বিদ্যার অভাব। এখানে মহারাজার স্কুল, মিশনারী স্কুল, ২০টি গুরুমহাশয়ী পাঠশালা—সবই আছে, তথাপি এই অভাব রয়ে গেছে। প্রতি বছর কৃষ্ণনগর, হুগলী ও ঢাকার প্রচুর ছাত্র কলকাতা গিয়ে পরীক্ষা দেয় এবং পাশ করে। কিন্তু বর্দ্ধমানের ছেলেরা বেশিরভাগই ফেল হয়। ইহা কি বর্দ্ধমানের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? [সোমপ্রকাশ: ২ ভাদ্র ১২৭০, পৃ ৫৯৫-৯৬]

সে সময় নদীয়ার রাজা শ্রীশচন্দ্র ও বর্দ্ধমান রাজ মহতাবচন্দ শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ছিলেন বলে বঙ্গের পত্র পত্রিকাগুলি ঐ দুই শিক্ষানুরাগীর ভূয়সী প্রশংসাই করতেন না, সদুপদেশও দিতেন:

"আমরা নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্র ও বর্দ্ধমানরাজ মহতাবচন্দ বাহাদুরের উপর চক্ষুকর্ণ নিযুক্ত রাখিয়াছি এবং উভয় মহারাজ যুবলোক হইয়াও সদ্ব্যবহার দ্বারা আমাদিগকে তৃপ্ত করিতেছেন। মান্য হিন্দু মহাশয়েরা চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রক্ষার্থ কাশীতে এবং অন্যান্য

স্থানে শিবস্থাপন করেন আমরা তাহা চাহিনা। আমারদিগের এই অভিলাষ শ্রীশচন্দ্র বাহাদুর, বর্দ্ধমান পতি সম্রাট বিশেষ মহতাবচন্দ বাহাদুর প্রমুখ বাংলাদেশে বিদ্যালয় স্থাপন করুন। মন্দির কালে বিনষ্ট হয়, কিন্তু বিদ্যা অক্ষয়, অবিনশ্বর।"

মহতাবচন্দ কেবল শিক্ষাদীক্ষার উপর নজর রাখতেন না, ছাত্র ও শিক্ষকদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিতেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে মহারাজার কোন একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মদ্যপান করে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন বলে মহাবাজ তাঁকে ববখাস্ত করেন। নেশা কেটে গেলে শিক্ষক নিজের কৃতকর্মের জন্য উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন।

বয়স্কদের সাক্ষর করে তুলতে মহতাবচন্দ বর্দ্ধমানে অনেকগুলি নৈশ বিদ্যালয় সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে গড়ে তোলেন। গুরু-মহাশয়ী এইরূপ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ২০টি।

এ ছাড়া বর্দ্ধমানে একটি আর্টস্কুল ও ব্যায়ামের আখড়া (Gymnasium) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতার আর্ট কলেজে তিনি এককালীন ৫০০ টাকা দান করেন, সম্বাদ ভাস্কর এই দানের জন্য মহারাজার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ ছাড়া মহতাবচন্দ হুগলীর ব্রাঞ্চ স্কুলেও অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কলকাতার মেডিকেল হাসপাতালে (তৎকালীন নাম Fever Hospital) প্রথম দিকে এককালীন সাতহাজার টাকা দেন। বর্দ্ধমান রাজপ্রতিষ্ঠিত রাজকলেজিয়েট স্কুল ও তৎপরবর্তী এফ, এ কলেজে বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে বর্দ্ধমানের বহু ব্যক্তি পরবর্তী সামাজিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে স্যার রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১ খ্রীঃ), সাংবাদিক যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯০৯ খ্রীঃ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বর্দ্ধমানে একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার চিন্তা মিশনারীদের অন্যতম অবদান: ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে মিঃ জেমস্ নামে জনৈক মিশনারী এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন ও মহতাবচন্দ এককালীন দুহাজার টাকা দান করেন: এ সম্পর্কে সম্বাদ ভাস্করে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

"....বর্দ্ধমান পুস্তকালয়ে এক সভা হইবেক, শ্রীযুক্ত জেমস্ সাহেবের উদ্যোগে ঐ পুস্তকাগার সংস্থাপিত শ্রীযুক্ত সাহেব অন্যত্র চলিলেন অতএব বর্দ্ধমানস্থ সাধারণ লোকেরা তাঁকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেবেন। তিন বৎসর পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহতাবচন্দ গোলাপবাগে 'দারুল বাহার' নামক রাজপ্রাসাদে একটি সুন্দর পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৫২ খ্রী: অব্দে "The friend of India পত্রিকায় Vernacular Libraries and the use of vernacular language of Bengali" শিরোনামে একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদক বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলের পাঠাগারের কথা না বলায় সম্পাদক তাঁর ত্রুটি স্বীকার লেখেন: We

hasten to correct the omission. Our correspondent states, that the interest in the establishment of vernacular Libraries as affording food for thought to Natives in rural district is on the increase. That ten of these have been in operation for the last two years in the Districts of Krishnanagar and Burdwan. ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দেও বর্দ্ধমানে পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল।

মহতাবচন্দের মৃত্যুর (১৮৭৯ খ্রীঃ) পরে আফতাবচন্দ মাত্র চার বছর (১৮৮১-১৮৮৫ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন। কিন্তু এই অল্পকালেই শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব বর্দ্ধমান রাজকলেজের উন্নয়ন। আফতাবচন্দই শ্যামসায়রস্থিত রাজকলেজের নূতন ভবন নির্মাণ শেষ করেন। ঐ বিদ্যালয় ভবনটির নামও 'আফতাব বিল্ডিং' নামে খ্যাত। আফতাবচন্দ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সংস্কৃত শিক্ষালয়ে 'উপাধি' পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে (১৮৩৬-১৯০৫ খ্রীঃ) আফতাবচন্দ পরীক্ষার ব্যয় ও বৃত্তির এককালীন পাঁচহাজার টাকা দান করেন। এই অর্থে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রকে বার্ষিক ৫০ টাকা হারে ও দুজন অধ্যাপককেও ঐ একই হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়। আফতাবচন্দই বর্দ্ধমান শহরে 'রাজ পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ এই পাঠাগারটির জন্য এককালীন ন হাজার টাকা দান করেন। এই পাঠাগার সে সময় বঙ্গ প্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার ছিল। বর্দ্ধমান District Gazetteer এ উল্লেখ আছে There are five public libraries in the district...... of those the Burdwan Raj Library is the largest and most important. It was established in 1881 and in 1908-1909 was visited by 70,435 persons. It is entirely supported by the Maharaja.'

বর্দ্ধমান রাজবংশের দ্বারা শিক্ষা সম্প্রসারণের সুবর্ণযুগ ছিল বিজয়চন্দ মহতাবচন্দের আমল। বিজয়চন্দ ছিলেন কবি, গীতিকার নাট্যকার ও প্রবন্ধকার। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্য ও শিল্পের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও পাশ্চাত্য ও স্বদেশীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন । তাঁর সম্পর্কে স্যার এণ্ডু ফ্রেজার লিখেছেন: 'Bijoy Chand had been well educated in his own home. His father had brought him up and had inculcated in his mind lessons of wisdom and loyalty to Government.'

বিজয়চন্দের প্রচেষ্টাতেই বর্দ্ধমান রাজকলেজটি ১৯২৭-২৮ খ্রীঃ অব্দে এফ, এ কলেজ থেকে বি, এ শ্রেণীতে উন্নীত হয়। তিনি বহিরাগত ছাত্রদের জন্য রাজকলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণ করান ও কলেজের পাঠাগার স্থাপন ও সম্প্রসারণ

করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃত শিক্ষারও তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজ চতুষ্পাঠীটির সংস্কার করে সংস্কৃত অনুরাগী ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। তাঁরই চেষ্টায় বেদান্তদর্শনের অধ্যাপক নিয়োগ করে উক্ত বিষয়টি পড়াবার ব্যবস্থা হয়। এই চতুষ্পাঠী 'বিজয়চন্দ চতুষ্পাঠী' নামে খ্যাত, এর পাঠাগারটিকেও বিজয়চন্দ বহু দুর্লভ সংস্কৃত পুস্তক দ্বারা পুষ্ট করেন ও কলেবর বৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলে দেশবরেণ্য বহু পণ্ডিত বৃত্তি পেতেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম পণ্ডিত সীতারাম তর্কতীর্থ (কাইগ্রাম), মালাধর তর্কতীর্থ (কুমারডিহি), রাধিকাপ্রসাদ তর্কতীর্থ (গোপালপুর), মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ (শ্যামবাজার, কলিকাতা), মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সসার্বভৌম (ভট্টপল্লী, ২৪ পরগণা), সিতিকণ্ঠ বাচস্পতি (সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা), মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ (কলিকাতা), হরিশচন্দ্র তর্করত্ন (নদীয়া), অজিতনাথ ন্যায়রত্ন (নবদ্বীপ, মহামহোপাধ্যায় যদুনাথ সসার্বভৌম (নবদ্বীপ), মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্ক পঞ্চানন (নবদ্বীপ) প্রমুখ।

সাহিত্য-সংস্কৃত পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেডিকেল ও টেকনিক্যাল প্রভৃতি কারিগরি শিক্ষায় বৰ্দ্ধমানের ছেলেদের সুযোগ করে দেন। বৰ্দ্ধমানে অধুনালুপ্ত মেডিকেল স্কুল (পূর্বতন এল, এম, এফ,) প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণীভূমিকা নিয়েছিলেন এবং তিনি নিজস্ব ব্যয়ে কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এখন যেখানে উদয়চাঁদ গ্রন্থাগার ওখানেই এই টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। পরে সাধনপুর কাটোয়া রোডে মহারাজা কুড়ি বিঘা ভূমি দান করেন ও সরকারী সহায়তায় টেকনিক্যাল স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়। কারিগরি বিদ্যালয়টির নাম—মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনলাজ।

কলকাতার কারমাইকেল মডেকেল কলেজে তিনি এককালীন দশ হাজার টাকা দান করেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রতিও যথেষ্ট সুনজর ছিল বিজয়চন্দের। মহারাণী অধিরাণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং বাড়ি থেকে ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য বলদে টানা পৰ্দ্দাঢাকা গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে বিদ্যালয়ে পৰ্দ্দানসীন মেয়েরা স্কুলে আসার সুযোগ পায় ও ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিজয়চন্দ। বাংলা ১৩২১ সালে ঐ প্রতিষ্ঠানে পাঁচহাজার টাকা দান করেন। বৰ্দ্ধমানে ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দে অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং দুই হাজার প্রতিনিধির আহার, বাসস্থান, যাতায়াত ও আমোদ-প্রমোদের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। বৰ্দ্ধমান সাহিত্য পরিষদের খোসবাগানের ভূমি তিনি দান করেন।

বিজয়চন্দের পর উদয়চন্দ রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন

করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হলো বর্দ্ধমানে মহিলা কলেজের পত্তন। তাঁর সুরম্য প্রাসাদ রাণীমহলে যা 'মোবারক মঞ্জিল' নামে খ্যাত 'প্রাসাদে ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দে এই সম্ভ্রান্ত মহিলা কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর নামেই এই কলেজ-মহা-রাজাধিরাজ উদয়চন্দ মহিলা কলেজ'। তখনকার দিনে এই প্রাসাদটির মূল্য ছিল সাড়ে ছ লক্ষ টাকা। উদয়চন্দের আমলেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জমিদারী প্রথা উঠে গেলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি সমুদয় গোলাপবাগ-রাজবাড়ি ও আনুসঙ্গিক সম্পত্তি বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। বর্দ্ধমানের শিক্ষাবিস্তারে রাজবংশের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।

বর্দ্ধমান শহবের স্কুলগুলির মধ্যে ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমানরাজ যে ভার্ণাকুলার স্কুল খোলেন সেটিই ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়, তার বর্তমান নাম বর্দ্ধমান রাজ কলেজিয়েট হাইস্কুল। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটিজ মিডল ইংলিশ স্কুল পরবর্তীকালে জুনিয়ার ও তারপর হাইস্কুলে উন্নীত হয় তার বর্তমান নাম সি, এম, এস (চার্চ্চ মিশনারী সোসাইটিজ) হাইস্কুল। বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা কাল ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে।

বৰ্দ্ধমানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্দ্ধমান আগমন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে মহর্ষি রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে নিয়ে দামোদরের প্রবাহ পথে নৌকাযোগে বর্দ্ধমান এসেছিলেন। তিনি গুসকরাতে রমনার আমবাগানে এসেছিলেন বর্দ্ধমানরাজের পত্তনিদার চোঙদারদের আমন্ত্রণে। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে মহর্ষি রায়পুরে আসেন সিংহ পরিবারের আমন্ত্রণে পুরাতন হুসেনশাহী সড়ক ধরে পালকি যোগে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি ভুবন মোহনের পুত্রদের কাছ থেকে কুড়িবিঘা জমি বার্ষিক পাঁচটাকা খাজনায় কিনে নেন। এই জমি বোলপুরের ভুবনডাঙ্গা গ্রামের উত্তর দিকে অবস্থিত বিশাল প্রান্তর, খোয়াই, আমানি ডোবা আর কিছু গাছ-গাছালির সমারোহ।

বর্দ্ধমানরাজ মহতাবচন্দ মহর্ষির শিষ্য, প্রায় সমবয়সী বান্ধবের মত ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে নৌকা যোগে বর্দ্ধমানে আসেন ও সদরঘাটের চড়ায় এসে বজরা ঠেকলে সেখান থেকে এক ক্রোশ পথ হেঁটে বর্দ্ধমানরাজ মহাতাবচন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পরদিন মহর্ষি বজরাতে অবস্থান করে দামোদরে স্নান সেরে নীলপট্ট বস্ত্র পরিধান করলেন ও উপাসনায় পবিত্র হলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন মহারাজ ফিটন গাড়ি পাঠিয়েছেন তাঁকে নিয়ে যেতে। মহর্ষি দ্বিপ্রহরে মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করতে ফিটনে চড়ে রাজবাড়িতে এলেন। পরদিন বর্দ্ধমানরাজও মহর্ষিকে গুরুপদে বরণ করলেন, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ

করলেন। বর্দ্ধমানরাজ মহতাবচন্দ তাঁর ভাষণে বলেন, আমি কি অকৃতজ্ঞ, তিনি আমাকে এত সম্পদ দিয়েছেন, আমি তাঁর জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞ হই না, তাঁহাকে স্মরণ করি না। কিন্তু কত শত দীন দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে অতি অল্প পাইয়াও তাঁহার কাছে কতই কৃতজ্ঞ হয়, তাঁহাকে পূজা করে। আমি কি অকৃতজ্ঞ কি অধম'। এই বলে রাজা কাঁদতে লাগলেন। এরপর রাজা [ভারতশিল্পী নন্দলাল—ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডল] মহর্ষিকে তাঁর অন্তঃপুর ও বাড়ি ঘুরে দেখান। এর তিন বৎসর পর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে বর্দ্ধমান যাত্রা বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনার (১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে) সাতবছর পরে মহর্ষি ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে আবার বর্দ্ধমান এসেছিলেন। মহর্ষি বর্দ্ধমান সম্পর্কে রাজনারায়ণকে সুন্দর একটি পত্র লেখেন, 'এখানে আইলেই তোমার সহিত সদালাপ করতঃ দামোদর নদী দিয়া যে প্রথমবার অত্রস্থলে সুখাগমন হইয়াছিল, তাহা এতদিনে বিলম্বে ও স্মরণের পথে জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ পায়। সেই সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নৌকা হইতে অবতরণ বহুদূর পর্যটন, পরে বাজারে আগমন, সেই তার মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বারী কর্ত্তৃক নিবারণ মনোহর চন্দ্রমার কিরণ দ্বারা বর্দ্ধমান পুরীদর্শন, দামোদর নদীতীরে দ্বিপ্রহর রজনীতে পুনর্বার প্রত্যাগমন, শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া তোমার সেই নৌকাতে শয়ন ও পরদিবস গোমাণীর আগমন এবং রাজার আতিথ্য গ্রহণ, এসকল যেন সেদিনের কথা মত বোধ হইতেছে'।

রাজনারায়ণ বাবুর আত্মকথা থেকে জানা যায়, এর কিছুদিন পর মহতাবচন্দ বর্দ্ধমানে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ঐ সময় ব্রাহ্মধর্ম বৈদান্তিক ধর্ম ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাতার এই বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, "গত ৩০শে আষাঢ় (১৭৭৩ শক) রবিবারে বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ বাহাদুর নিজ বাটিতে এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।" পরবর্তীকালে বর্দ্ধমানে সাধারণ নাগরিকদের নিয়েও একটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতেও বর্দ্ধমান মহারাজার অবদান ছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই বর্দ্ধমান রাজবাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। আর তার কয়েক বৎসর পরে বর্দ্ধমান মহারাজার আমন্ত্রণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার বর্দ্ধমান আসেন ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ষাড়খানাগলিতে নবাব দোস্ত কায়েম লেনে বিরাট আকারে 'ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই স্কুলটিই ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা এই বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার বহন করতে থাকেন। ১৮৮৭-৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আলবার্ট ভিক্টর ইনষ্টিটিউশন বা নিউ স্কুল নামে আর একটি বিদ্যালয় বর্দ্ধমান শহরে মহাজনটুলির একটি কুঠি বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলটির জন্মকাল থেকেই খুব নামডাক হয়। দক্ষতার সঙ্গে

চালাতেন ডঃ সুকুমার সেনের আত্মীয় বিনোদ সেন। কিন্তু পয়সার অভাবে স্কুল বেশি দিন চলল না। ঐ বাড়ি ষাট টাকায় তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান কিনে নিলেন ও স্কুলটিকে মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। তখন এইসব স্কুলকে বলা হত এনট্রান্স স্কুল। এখনকার দশম শ্রেণীকে বলা হত ফাষ্ট ক্লাস, নবম শ্রেণীকে বলা হত সেকেণ্ড ক্লাস, অষ্টম শ্রেণীকে থার্ড ক্লাস, সপ্তম শ্রেণীকে ফোর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীকে বলত ফিফ্থ্ ক্লাস। এনট্রান্স পাশ করে পড়তে হত এফ্ এ বা ফাষ্ট আটর্স এবং তারপর বি, এ বা ডিগ্রী কলেজ। সবই ইংরাজীতে পড়তে হত এনট্রান্সে, ইংরাজীতে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত। সাহিত্য বা ভাষা বলতে ছিল— মাতৃভাষা বাংলা এবং ইংরাজী। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব উপাচার্য এনট্রান্স তুলে দিয়ে নাম দিলেন ম্যাট্রিকুলেশন বা প্রবেশিকা। মিউনিসিপ্যাল স্কুল প্রথম সুরু হয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নলিনাক্ষ বসুর উদ্যোগে নলিবাবুর বাজারে। শহরের এইসব বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সি, এম, এস, ছিল সাহেবদেব বা চার্চের তত্ত্বাবধানে, রাজস্কুলের আর্থিক সাহায্য দিতেন বৰ্দ্ধমান রাজ, মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ব্যয়ভার বহন করত পৌরসভা। সব চাইতে অসুবিধা হল আলবার্ট ভিক্টর ইনষ্টিটিউশন বা নিউ স্কুলের—একে আর্থিক সাহায্য করার কেউ না থাকায় অবস্থা চরমে উঠল। অর্থকষ্টে ধুঁকতে ধুঁকতে নিউ স্কুল খোসবাগানের কুঠি বাড়িতে উঠে এল। সেখান থেকে আবার উঠে গেল মেহেদীবাগানে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি একেবারেই উঠে গেল। কিন্তু স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ ঐ বাড়িতেই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান হাইস্কুল নামে নূতন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পাঁচ বছর চলার পর এই স্কুলটিও বৰ্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান পৌর বিদ্যালয় জি, টি, রোডের ধারে বর্তমান স্থানে উঠে আসে নবনির্মিত গৃহে। বৰ্দ্ধমান শহরের অপর একটি বিদ্যালয় টাউন স্কুল ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় মূলতঃ সরকারী আনুকূল্যে। নিউ স্কুল ও বৰ্দ্ধমান হাইস্কুল উঠে গেলে আর একটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই সময় এগিয়ে এলেন লালা বংশগোপাল নন্দে ও আবুল কাসেম। নূতন টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল। বংশগোপাল জায়গা দিলেন টাউন হল ও টাউন স্কুল করার জন্য এবং আর্থিক সাহায্যও দিলেন বাড়ী তৈরীর জন্য। তখন শিক্ষা অধিকর্তা ছিলেন গ্রিফিথ, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বংশগোপালের অনুরোধে টাউন স্কুলের অনুমোদন দিলেন। এটিকে সরকারী বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এর বিস্তীর্ণ জায়গা, মাঠ, পুকুর ইত্যাদি দান করেন বংশগোপাল নন্দে ও পূর্তদপ্তর (পি, ডব্লু, ডি) এর গৃহ নির্মাণ করেন। এখনও টাউনস্কুলকে মাসিক মাত্র এক টাকা ভাড়া পি, ডব্লুকে দিতে হয়। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে এটি আর জেলা সরকারী বিদ্যালয় হিসাবে অনুমোদিত হয় না।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বৰ্দ্ধমান গেজেটিয়ারে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন

ও প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাওয়া যায় তা প্রণিধানযোগ্য। সমগ্র জেলায় তখন ১৯০টি টোল (Sanskrit School) এবং ১০১টি মাদ্রাসা ছিল (Persian & Arabic School)। এছাড়া কতকগুলি নৈশ বিদ্যালয়, শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় (Guru Training School) এবং সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসীদের জন্য নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। বৰ্দ্ধমান টেকনিক্যাল স্কুল ছিল একমাত্র বৃত্তি বা কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বৰ্দ্ধমানে সর্বনাশা ম্যালেরিয়ার উদ্ভবে (১৮৭২-৭৬ খ্রীঃ অব্দ) মিশনারীরা শিক্ষাবিস্তারে কিছুটা হাতগুটিয়ে নিয়ে অনেকেই শ্রীরামপুর ও হুগলীতে চলে যান। তখন বিত্তশালী জমিদারগণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। যেমন চকদীঘির জমিদারগণ প্রতিষ্ঠিত চকদীঘি হাইস্কুল, রানীগঞ্জ সিয়ার সোলের জমিদার প্রতিষ্ঠিত সিয়ার সোল রাজস্কুল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বৰ্দ্ধমান রাজকলেজিয়েট ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত হবার আগে বৰ্দ্ধমান জেলায় মোট ২৭টি হাইস্কুল ছিল। [বৰ্দ্ধমান গেজেটিয়ার-১৯১০]

বৰ্দ্ধমানে শিক্ষার উপর ভূমিসম্পর্কের প্রভাব

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বৰ্দ্ধমানের শিক্ষাব্যবস্থা ও তার প্রসার জেলার গ্রামীণ মানুষের ভূমিসম্পর্ক ও বিন্যাসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত। তাই বৰ্দ্ধমানে ভূমি-সম্পর্কের বিভাজন বা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে। মুর্শিদকুলি খাঁ (১৭১৭ খ্রীঃ) সুবে বাংলার নবাব হয়ে বঙ্গপ্রদেশকে তেরোটি চাকলায় বিভক্ত করে প্রত্যেকটি চাকলার ক্ষেত্রেই তিনি একটি চিরস্থায়ী সুনির্দিষ্ট সীমানা বেঁধে দেন। শাসনকাজের সুবিধার জন্য একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত করেন। বৰ্দ্ধমান এই চাকলাগুলির একটি। জমিদারের কাজ ছিল খাজনা আদায় করা ও ফৌজদারের কাজ ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই দুটি কাজ অন্যান্য চাকলাতে দুই ভিন্ন প্রশাসকের হাতে থাকলেও বৰ্দ্ধমানরাজের বিশেষ মর্যাদার জন্য দিল্লীশ্বর এই দুটি কাজই বৰ্দ্ধমান মহারাজার উপর ন্যস্ত করেন।পূর্বেই বলা হয়েছে বৰ্দ্ধমান রাজ প্রায় স্বাধীন নৃপতির মর্যাদা পেতেন। চিত্রসেন রায় ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপভূমি (বর্তমান কাঁকসা ও আউসগ্রাম ব্লক) অধিকার করে বৰ্দ্ধমান চাকলার যে সীমানা বিস্তৃত করেন তাই আজকের বৰ্দ্ধমান জেলার সীমানা। এই জেলার শতকরা নব্বই ভাগ অধিবাসীই কৃষি নির্ভর। জাতিগত বৃত্তি যাই থাকুক না কেন একটা বিষয়ে মিল ছিল, প্রত্যেকেই ছিল কৃষি নির্ভর। মোগল আমল থেকে বৃত্তিধারী ব্যক্তিকে নগদ তঙ্কা না দিয়ে পরিবর্তে খাজনামুক্ত ভূমির উপসত্ব ভোগ করতে দেওয়া হত। প্রকৃতপক্ষে শতকরা আশি ভাগ জমিই এইভাবে খাজনা মুক্ত উপসত্বভোগে ব্যবহৃত হত। খাজনা মুক্ত বা নিস্কর জমিকে লাখেরাজ বলা হত। ভোগকারী বৃত্তি অনুযায়ী এর ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল, যেমন—যে সব কর্মচারী খাজনা আদায় করত তাদের দেওয়া জমির

নাম ছিল নান কর, তেমনি পুলিশের বা সৈনিকের কাজের জন্য দেওয়া জমিকে চাকরান, পাইক-পেয়াদার জমিকে পাইকান, ঘাট বা সীমান্ত প্রহরীর জমিকে ঘাটোয়াল, পূজা, যাজন ও ধর্মচর্চ্চার জন্য দেওয়া জমিকে লাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর জমি এবং ভাটেরও আয়মাদারের দেওয়া জমিকে ভাটোত্তর আয়মা জমি বলত।

এছাড়া শিক্ষক, কারিগরি, কামার, কুমার, ছুতোর, নাপিত, ধোবা, পুরোহিত, ঢাকী, বাজনদার, স্যাকরা, বৈদ্য প্রভৃতি বৃত্তির জন্যও লাখেরাজ জমি দেওয়া থাকত। খাজনামুক্ত বহুজমি বৃত্তিধারীদের দেওয়া হলেও কিছু পরিমাণ জমি খাস, শরিফা ও রায়তী সত্ত্বে সত্ত্ববান কৃষকের হাতে থাকত। এবং জমির সঙ্গে বাস্তবপক্ষে যুক্ত থাকলেও কৃষি শ্রমিক দিয়ে বেশিরভাগ কাজ করাতো ও ফসল ভোগ করত। তাই জীবিকার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে হত না। কেবল উচ্চবর্ণের বৃত্তিধারী ব্যক্তিগণই নিজ তাগিদে শিক্ষালয়ে আসতেন। ফলে বর্দ্ধমানের গ্রামীণ মানুষের জীবিকা ও অর্থার্জনের জন্য শিক্ষার উপর নির্ভর করতে হত না। তাই মিশনারী ও জমিদার শ্রেণী এগিয়ে এলেও শিক্ষার প্রসার জেলায় যেভাবে হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নাই।

মোগল আমলের ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি সর্ম্পকের সঙ্গে এভাবে যুক্ত থাকায় প্রায় একশ বছর ধরে শিক্ষা প্রসারে জড়ত্ব এসে যায়। শহরে গড়ে ওঠা কিছু প্রতিষ্ঠান ও সমৃদ্ধ গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এক আধটি বিদ্যালয় জমিদার শ্রেণীর নামমাত্র অর্থানুকূল্যে কোনরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চলেছিল। বস্তুতপক্ষে কতিপয় আদর্শবান শিক্ষক ও গ্রামের দু একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বুকে করে ধরে রেখেছিলেন। অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ কোন অর্থ ব্যয় করতেন না। যেমন কাগজের বদলে ছিল— তালপাতা, কলাপাতা এবং মেঝেতে খড়ি বা কাঠি দিয়ে লেখা। কালি ছিল মুড়িভাজার মাটির খাবরিতে জমা ভূঁষো, কলম ছিল শরকাঠির বা কঞ্চির, দোয়াত ছিল বাড়ির পরিত্যক্ত ছোট কোন পাত্র। জেলার সমৃদ্ধ গ্রামে যেমন: অম্বিকা, বাগুণ্যা, বড়বেলুন মাহাতো, পোৎনা, মাড়ো, চাণক, মঙ্গলকোট, চক্রদীঘি, সিয়ারসোল, মানকর, কাটোয়া প্রভৃতি বর্ধিষ্ণু গ্রামগুলি শিক্ষাব্যাপারে খ্যাতিলাভ করেছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার গভর্ণর হ্যালিডে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের দিকে মন দেন। সে সময় জেলায় মোট পাঠশালা ও স্কুলের সংখ্যা ছিল ৭০০। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বর্দ্ধমান জেলায় ১৩টি থানা এবং প্রতি থানায় গড়ে ৭২টি স্কুল ও পাঠশালা মিলে মোট ৯২৫টি ছিল। বেশিরভাগ পাঠশালাতেই একজন করে শিক্ষক এবং প্রতি পাঠশালায় গড়ে কুড়িজন ছাত্র ছিল। গড়পড়তা বয়স ছয় থেকে ষোলর মধ্যে। পাঠশালার পড়াই শেষ পড়া ছিল শতকরা নব্বইজন ছাত্রের। শতকরা ৫জন নিকটের কোন স্কুলে পড়া চালিয়ে যেত এবং ৫জন পড়তে পড়তে ছেড়ে দিত পড়া। পাঠ্যবিষয় ছিল

শুভঙ্করী, আর্যা, গণিত, সাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি। বাংলা পড়ানো হত ৬২৯টিতে, ফারসী ৯০টিতে, সংস্কৃত ১৯০টিতে, আরবী ১১টিতে এবং ইংরাজী মাত্র ৩টি স্কুলে পড়ানো হত। [দর্পনে অন্যমুখ—অজিত হালদার] জেলার প্রায় চার লক্ষ জন সংখ্যার মধ্যে মাত্র দশ হাজার দু'শটি ছাত্র লেখাপড়া করত অর্থাৎ ছাত্রসংখ্যা ছিল জনসংখ্যার তিন শতাংশ প্রায়। বর্দ্ধমানের ছাত্রগণ পড়ত ৯৩০টি বিদ্যালয় ও পাঠশালায়। শিক্ষক ছিলেন ৯৪০ জন— এর মধ্যে ৬টি বিদ্যালয়ের ৭জন শিক্ষকের বেতন দিতেন মহারাজা, ৯টি মিশনারী বিদ্যালয়ের ১৮জন শিক্ষকের বেতন দিতেন মিশনারী কর্তৃপক্ষ। বাকী ৯১৫জন শিক্ষকের ভাগ্যে নিয়মিত বেতন জুটত না। পাঠশালার পণ্ডিতদের নামমাত্র বেতন দিত ছাত্ররা, ছাত্রদের দেওয়া সাপ্তাহিক সিধা— চাল, আলু, কুমড়ো ও বেগুন প্রভৃতি খাদ্যবস্তু থেকেই পণ্ডিতের অন্নসংস্থান হত। বেতন ছাত্ররা সব সময় দিতে পারত না। সবকিছু মিলিয়ে পাঠশালার পণ্ডিতদের মাসে চার/পাঁচ টাকার বেশি জুটত না। এতে সংসার চলত না, তাই তাঁদের অন্য কাজ করতে হত— এমন কাজ যার সঙ্গে শিক্ষার কোন যোগ ছিল না। যেমন— মুদিখানার দোকান, তাঁতবোনা, চাষ করা, কবিরাজী করা, সুদের কারবার, মনিহারী দোকান প্রভৃতি চালানো। পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পৃথক গৃহ খুব কমই ছিল— বেশির ভাগ পাঠশালা বসত গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, শিবতলায়, দুর্গাতলায় আর মক্তব বা মাদ্রাসা বসত মসজিদে বা লোকের বৈঠকখানায় বা পণ্ডিতের নিজের বাড়িতেই পাঠশালা বসত। গোটা বর্দ্ধমান জেলায় তখন মাত্র দুজন শিক্ষক ভূমির উপসত্ত্ব ভোগ করতেন—একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৈদ্য। প্রথম জন আট বিঘা জমি ভোগ করতেন যার উপসত্ত্ব বছরে পনের টাকা। কারণ চাষী আট বিঘা জমিতে ব্রাহ্মণকে পনের মণ ধান ভাগ দিত। টাকায় একমণ ধানের দাম হিসেবে প্রাপ্ত ধানের মোট মূল্য পনের টাকা। আর দ্বিতীয় জন দশ বিঘা জমি ভোগ করতেন। তিনি উপসত্ত্ব পেতেন আঠার মণ ধান, যার দাম আঠার টাকা। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষকদের বেতন, ছাত্রদের বৃত্তি, বাড়িঘর, বইখাতা মিলিয়ে শিক্ষাখাতে বর্দ্ধমানরাজ প্রতিবছর ব্যয় করতেন মোটে দেড় হাজার টাকা। অথচ ঐ সময় মহারাজার প্রাসাদে নিযুক্ত কর্মচারী ও দেহরক্ষীর বেতন বাবদ বছরে খরচ হত এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা।

কোম্পানীর কব্জায় যখন পুরো শাসনব্যবস্থা চলে যায় তখন গ্রামবাংলায় এই শিক্ষাবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটে। প্রয়োজন অনুভূত হয় ইংরাজী শিক্ষার, যেমন ফারসী শিক্ষার অনুভূত হয়েছিল পাঠান ও মোগল শাসনের সুরুতে। শাসনকাজে, অফিসে, আদালতে, চাকুরীতে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের সংযোগ স্থাপনে ইংরাজী অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্বে বলেছি উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বর্দ্ধমান জেলায় বাংলা স্কুল ছিল ৬১৯টি। ফারসী শেখানোর বিদ্যালয় ছিল ৯২টি আর ইংরাজী শিক্ষার স্কুল মাত্র তিনটি। তখন থেকেই সংস্কৃত বাস্তবে প্রয়োজনীয়তা

হারিয়ে হয় কেবলই দেবভাষা, তাও পড়ানো হত ১৯০টি টোলে। এইসব ছেলেরা বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ও সাধারণ পরিবার থেকে আসত। রাজা মহারাজা বা জমিদার শ্রেণীর ছেলেরা বেশীর ভাগই এইসব পাঠশালা বা স্কুলে পড়ত না, তখনও দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কৃষ্ণনগর ও কলকাতায় নামীদামী স্কুল চালু হয় নি। রাজামহারাজাগণ ছেলেদের বাড়িতে অধ্যাপক রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করতেন। এ্যাডামের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৩২০০ ছাত্রের মধ্যে মোট ৭৪৩ জন ছাত্র ছিল— কলু, বাগ্দী, সুনুরী, ডোম, চাঁড়াল, জেলে, ধোপা, মুচি, তিওর, কাহার, দুলে প্রভৃতি। তথাকথিত অন্ত্যজ বর্ণের আর্থিক দিক থেকে এই শ্রেণীর মানুষ ছিল একেবারে নিঃস্ব। তার অর্থ রাজা মহারাজার ঘর থেকে ছেলেরা যেমন এই স্কুলে একেবারেই আসত না, তেমনি নিম্ন দরিদ্র শ্রেণীর সংসার থেকেও খুব কম ছেলেরা পড়তে আসত—শতকরা ছয় শতাংশেরও কম। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বেনের ঘর থেকে চল্লিশ শতাংশের বেশি ছাত্র স্কুলে আসত না। অতএব নিঃসন্দেহে এটা বলা যায় যে ছাত্রদের একটি গরিষ্ঠ অংশ, ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি ছাত্র আসত আগুবি, তিলি, তাম্বুলি, সদগোপ প্রভৃতি ভূমিজ উদ্বৃত্তভোগী মধ্য শ্রেণীজাত পরিবারের ঘব থেকে এবং গ্রামাঞ্চলে জমিদার শ্রেণী ছাড়া এই মধ্যবিত্ত সম্পত্তিভোগী পরিবারই বেশির ভাগ স্কুল গড়ে তুলেছিলেন। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বর্দ্ধমান জেলায় ১১৪টি ইংরাজী হাইস্কুল ছিল, এর মধ্যে ৭৪টি স্কুল বড়জোতের মালিক উচ্চবিত্তদেব দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। মাত্র ৮টি স্কুল রাজা মহারাজা ও জমিদাদের সাহায্যপুষ্ট ছিল। বাকী ৩২টি স্কুল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে চলত যেমন মিশনারী, চার্চ্চ, পৌরসমিতি প্রভৃতি। এছাড়া জেলায় ১৩৭টি মধ্য ইংরাজী স্কুলের (এম, ই) সব কয়টিই গ্রামের সম্পত্তিশালী উচ্চবিত্তদের সাহায্যে পুষ্ট ছিল।

বর্দ্ধমান শহরে পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে যে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হল জিতেন্দ্রনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত বর্দ্ধমান বাণীপীঠ স্কুল, বিদ্যার্থীভবন, খাজা আনোয়ার বেড়, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা নৈমিষারণ্য ও শ্যামসায়রস্থিত, বর্দ্ধমান রেলওয়ে বিদ্যাপীঠ, সাধনপুর হাই, কাঞ্চননগর ডি. এন. দাস, বড়নীলপুর এ, ডি, পি, শিবকুমার হরিজন, রামাশিস হিন্দি, সেন্টজেভিয়ার্স, ইছলাবাদ হাই, ভারতী বালিকা, বিদ্যার্থী বালিকা, কাঞ্চননগর রথতলা হাই, বর্দ্ধমান হাই মাদ্রাসা, নেহরু বিদ্যামন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য হাইস্কুল। আর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় বর্দ্ধমান রাজকলেজ, মহিলা কলেজ, বিবেকানন্দ কলেজ ও সাধনপুর কারিগরি স্কুলের কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলির সময়ানুক্রমিক তালিকা :

(১) মহাবাজার স্কুল ১৮১৭, পরে এটি বর্দ্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুলে পরিণত হয় ১৮৫৪ খ্রীঃ

(২) সি, এম, এস ১৮৩৪, হাইস্কুলে উন্নীত হয় ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে।

(৩) অ্যাংলো ভার্ণাকুলার স্কুল ১৮৪৮ পর্যন্ত—রাজকলেজিয়েট হাইস্কুলে মিশে যায় ১৮৫৪ তে।

(৪) ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল ১৮৮০ এটি মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে মিশে যায় ১৮৮৩ অব্দে।

(৫)বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল—১৮৮৩ খ্রীঃ

(৬) চকদীঘি হাইস্কুল—১৮৫৭, (৭) তোড়কোনা (রাসবিহারী ঘোষ প্রতিষ্ঠিত) ১৮৯৩, (৮) মেমাবী বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল—১৯০০, (৯) ভৈটা ডি, কে—১৮৭৮, (১০) রায়না এস, বি ১৮৯৪, (১১) দিসের গড় এ, সি—১৮৯৬, (১২) সিযাবসোল রাজ হাই—১৮৫৬, (১৩) রাণীগঞ্জ হাই—১৮৯১, (১৪) কালনা মহারাজা হাই—১৮৬৮, (১৫) বাদলা হাই স্কুল—১৮৫৬, (১৬)আমড়া জুনিয়ার হাই- ১৮৯৮, (এখনও হাইস্কুল হয নি) জেলায় ১৯৯০ পর্যন্ত উচ্চতর বিদ্যালয়ের সংখ্যা—১০১, উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৫৭, জুনিয়ার হাই স্কুল—২৪৪টি, মাদ্রাসা হাই ৭টি, জুনিযার মাদ্রাসা—১০টি, হিন্দি হাই—৬টি, উর্দু হাই—১টি: মোট ৮২৬টি, সাধারণ পাঠাগারের সংখ্যা: ৬০৫টি, বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ: ১২২৫টি। সরাসরি শিক্ষা অধিকর্ত্তার স্পনসর্ড স্কুল ৫টি—দুর্গাপুর প্রজেক্ট বয়েজ, দুর্গাপুর গার্লস, সাগরভাঙ্গা হাই, দুর্গাপুর আর, ই, মডেল এবং বামলাল আদর্শ বিদ্যালয়। এছাড়া সেন্টজেভিয়ার্স ও দিল্লী বোর্ডের আই. সি. এস . সি স্কুল আছে ৩টি—বর্দ্ধমান সেন্ট জেভিয়ার্স, দুর্গাপুর ও আসানসোল সেন্টজেভিয়ার্স হাই। ১৯০৪ খ্রীঃ অব্দে জেলায় সাক্ষরতার হার ছিল ৮৫% যা তখনকার দিনে উল্লেখ করার মত। [বর্দ্ধমান চর্চা—শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু]

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এই সময় জেলার মক্তব ও মাদ্রাসার সংখ্যা ৭৮, কলেজ ১টি, নৈশ বিদ্যালয় ৪৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১৩৮, বালিকা বিদ্যালয় ৭৬, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ১৮, এর মধ্যে ১৬টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত। মোট বিদ্যালয় ১৩৬৪টি।

কলেজ ২৮টি—সেগুলি হলো :—

বর্দ্ধমান শহরে রাজকলেজ, বিবেকানন্দ কলেজ, উদয়চন্দ মহিলা কলেজ ও মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনলজি এবং মেডিকেল কলেজ, মেমারী কলেজ, ল কলেজ, কমার্স কলেজ (নৈশ) শ্যামসুন্দর কলেজ, গুসকরা কলেজ, কালনা কলেজ, কাটোয়া কলেজ, মন্তেশ্বর গৌর মোহন কলেজ, দুর্গাপুর গভর্ণমেন্ট কলেজ, রাণীগঞ্জ টি, ডি, ভি কলেজ, আসনসোল বি, বি

কলেজ, মানকর কলেজ, চিত্তরঞ্জন কলেজ, কাঁন্দরা কলেজ, আসানসোল মণিমালা গার্লস কলেজ, দুর্গাপুর আর, ই কলেজ, আই, টি, আই কলেজ দুর্গাপুর।

ট্রেনিং কলেজ ৭টি: গভর্ণমেন্ট কলেজ অব এডুকেশন, বর্দ্ধমান, কাটোয়া বি, টি কলেজ, কালনা বি. টি কলেজ, বড়শুল বেসিক ট্রেনিং কলেজ, কলানবগ্রাম বেসিক ট্রেনিং কলেজ, লাউদোহা বেসিক ট্রেনিং কলেজ ও বিদ্যানগর বেসিক ট্রেনিং কলেজ।

সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় একটি: পদ্মজা নাইডু সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় একটি: বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে.১৫ই জুন। অধীনস্থ কলেজ বর্দ্ধমান, বীবভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও হুগলী জেলায় মোট ৮১টি কলেজ।

বর্দ্ধমান জেলার স্কুল ১৯৮৮ পর্যন্ত (মহকুমা ভিত্তিক)

সদর মহকুমা:
(ক) উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়—১৭১টি
(খ) ঐ মেয়েদের—২৮টি
(গ) জুনিয়ার হাই—৮০টি
(ঘ) মাদ্রাসা হাই—৬টি
(ঙ) মাদ্রাসা জুনিয়ার হাই—৯টি

আসানসোল মহকুমা:
(ক) উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়—৬১টি
(খ) ঐ মেয়েদের—২৭টি
(গ) জুনিয়ার হাইস্কুল—৩২টি
(ঘ) হিন্দি হাই—৪টি

দুর্গাপুর মহকুমা:
(ক) উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়—৬১টি
(খ) ঐ মেয়েদের—৪টি
(গ) জুনিয়াব হাই—২৫টি

কালনা মহকুমা:
(ক) উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়—৫৬টি
(খ) ঐ মেয়েদের—১১টি
(গ) জুনিয়ার হাই—৪৫টি

কাটোয়া মহকুমা:
(ক) উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়—৬৩টি
(খ) ঐ মেয়েদের—৭টি
(গ) জুনিয়ার হাই—৩৪টি
(ঘ) মাদ্রাসা হাই—১টি
(ঙ) জুনিয়ার মাদ্রাসা—৪টি

গ্রন্থপঞ্জী

1. সার্ধশতবর্ষ স্মরণিকা– বর্দ্ধমান সি. এম. এস. হাইস্কুল ১৯৮৪
2. বর্দ্ধমান রাজকলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা– ১৯৮১
3. চর্যাগীতি পদাবলী-সম্পাদনা– ডঃ সুকুমার সেন
4. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ– বিনয় ঘোষ
5. বাঙলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর– অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
6. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ– শিবনাথ শাস্ত্রী
7. অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও পুঁথি– দামুন্যা কবিকঙ্কণ স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক রক্ষিত
8. পীরবাহারাম ও বর্দ্ধমানে নূরজাহান– আব্দুল গণিখান
9. পুরাতন চিঠিপত্র– ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল
10. রাজবংশানুচরিত– রাখালদাস মুখোপাধ্যায়
11. Adam's Report– 1835
12. রসুলপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্মরণিকা
13. বর্দ্ধমান চর্চা– সম্পাদনা শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু
14. Dist Gazetteers, Burdwan 1910– J. K. C. Peterson
15. ভারতশিল্পী নন্দলাল– ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল
16. সোমপ্রকাশ– ২রা ভাদ্র ১২৭০, ১৬ই চৈত্র, ১২৭০
17. সংবাদ প্রভাকর– ১৮৫৪
18. Statistical Accounts of Bengal– W. Hunter
19. সংবাদ পত্রে সে কালের কথা (১ম) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
20. Old records of Burdwan C. M. S. High School
21. বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ-সাক্ষরতা প্রকাশন ১৯৭৩

পঞ্চম পর্ব

বর্দ্ধমানের গ্রামদেবতা ও মেলা

"রাঢ়বঙ্গে বর্দ্ধমান যেন মধ্যমণি।" বস্তুতঃ রাঢ়বঙ্গে বর্দ্ধমান একটি শিরোনাম। প্রাচীনকাল থেকেই রাঢ় বর্দ্ধমান দেবারাধনায় গ্রামজীবনকে ভক্তিরসের বন্যায় প্লাবিত করেছে। জেলা বর্দ্ধমানও প্রাচীনকালের বর্দ্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রামে দেব-দেবীর বাস ছিল। এক একটি গ্রামের দেব-দেবীর বিশিষ্টতা এক এক রকমের। দেব-দেবীর মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন দুর্গা, শিব, ধর্মঠাকুর, কালী, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী। ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন পদ্ধতিতে পূজানুষ্ঠান হয়। বহু দেব-দেবীর পূজায় বসে মেলা বা জাত। গ্রামজীবনে এই দেব-দেবীর প্রভাব অপরিসীম। গ্রাম্যজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছেন এই সব দেব-দেবী। শত দুঃখ, কষ্ট, লাঞ্ছনা ও নিরানন্দের মধ্যেও গ্রাম্য মানুষ দেব-দেবীর সেই বিশেষ পূজার দিনে সবকিছু ভুলে লোক উৎসবে মেতে ওঠেন। দেব-দেবীর চরণে নিবেদন করেন অঞ্জলি। দুঃখ-দারিদ্র্যে মানুষ সবকিছু হারাতে পারেন, কিন্তু কখনও হারাতে প্রস্তুত নন অন্তরের ভক্তি-অর্ঘের ডালি। ষষ্ঠ শতাব্দীর "মল্ল সারুল" তাম্রশাসনে (তাম্র লিপি) বর্দ্ধমান এবং বর্দ্ধমানভুক্তির সেই ভক্তিরসে আপ্লুত পুণ্যার্থী জনের পরিচয় রয়েছে।

পুণ্যোত্তরজনপদাধ্যাসিতায়াং সতত-ধর্ম-ক্রিয়া-বর্দ্ধমানায়াং বর্দ্ধমানভুক্তৌ"

এই দেব-দেবীগুলি গ্রামীণ মানুষের আপনজন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সুন্দর করে কাব্যে তা উপহার দিয়েছেন:

"দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি।"

শুধু হিন্দুদের দেব-দেবী নয় মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মুসলমান সংস্কৃতির যে জোয়ার এসেছিল গ্রামীণ সংস্কৃতি তাকেও অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। পীর পয়গম্বর, মোল্লা, মৌলবীর কোরাণ-শরিফের বাণী যে মানব-প্রেমের ভিন্নরূপ তা বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে বিলম্ব ঘটেনি রাঢ় বর্দ্ধমানের মানুষের। তাই গড়ে উঠেছে বহু স্থানে মসজিদ, দরগা, মাদ্রাসা, মক্তব। পীর-পয়গম্বরদের তিরোধানের পর সেখানে গড়ে উঠেছে অলৌকিক পীরত্বের লৌকিক মেলা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সেই মেলায় ভক্তির ডালি নিয়ে সমবেত হন, ছড়িয়ে দেন পীর-পয়গম্বরের কবরের উপর ফুল,মালা। প্রসাদী-শিণী নিয়ে ভক্তি গদ-গদ

চিত্তে বাড়ি ফেরেন। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত স্রোত যেন সমুদ্র। বহু পুষ্পে গাঁথা মালা "মালিকা পরিলে গলে, প্রতিফুলে কেবা মনে রাখে।"

ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম চক্রবর্তী হিন্দু দেব-দেবীর সঙ্গে মুসলমান পীর-গাজীর বন্দনা করেছেন। এ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নমুনা।

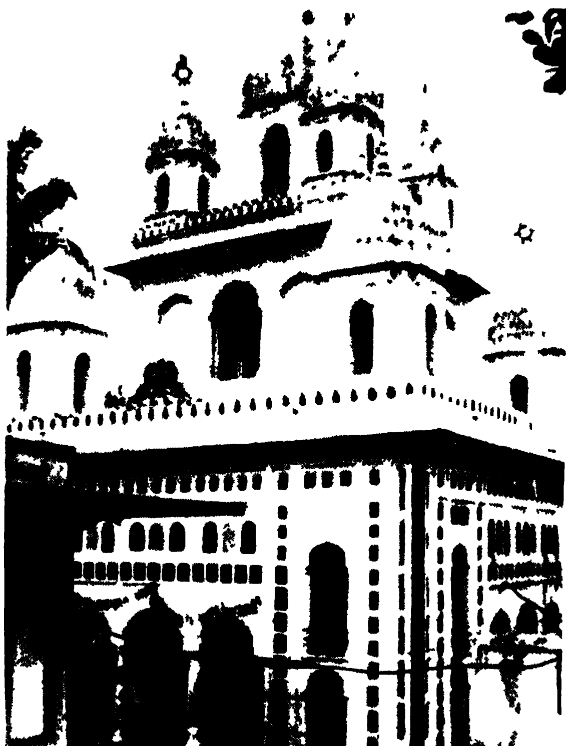
মান্দারণ গড়ে বন্দি পীর ইসমাইলি,
পীর ইসমাইলি সঙরিয়া পথ চলি যায়,
মৈষে নাহি মারে তারে বাঘে নাহি খায়।
বন্দিব বড় খাঁ গাজী রিসিবাটি গাঁ
নিজ বাটি বন্দিব পেঁড়োর শুভি খাঁ।
ত্রিপাণির ঘাটে বন্দো দফর খাঁ গাজী
তাঁহার মোকামে বন্দ ষোল শত কাজি।

সত্যনারায়ণ হিন্দুর দেবতা, পীর মুসলমানের। কিন্তু পয়গম্বরের মেলার দিনে দুই দেবতাই একাত্ম হয়েছে "সত্যপীরে"। এই দেবতাগুলিই গ্রামদেবতা। দেব-দেবী পীর। একথা অনস্বীকার্য যে পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন থেকেই গ্রাম-দেবতা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। গ্রাম বা জনপদ পুরাতন হলে হাজার হাজার বছরের সামাজিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আদান প্রদানের পরম্পরায় বিধৃত হয়ে থাকে দেবতাগুলির পূজানুষ্ঠানের মধ্যে। রাঢ় বর্দ্ধমানের আদি বাসিন্দা অনার্য, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্য ও ইন্দো-মোঙ্গল ধারার সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে গঠিত বর্দ্ধমান জীবনধারার পরিচয় সেই গ্রামদেবতার বিভিন্ন অনুকর্মের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। রাঢ় বঙ্গের একটি ধর্মীয় ও সামাজিক বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি রাঢ় বর্দ্ধমানে আমরা পাই। এই সব গ্রাম্য দেবদেবী ও তাদের বাৎসরিক ও সাময়িক উৎসবের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করেই জেলার লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ধর্মের গাজন, মনসার ঝাপান, চণ্ডীর ব্রত, শিবের চড়ক—এই উৎসবগুলিই গ্রাম বর্দ্ধমানের লোক সংস্কৃতিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে যাত্রা, নাট্যগীতি, লেটো, কথকতা, পাঁচালি, কবিগান, ভাদু, তোষলা প্রভৃতি গাওনার মধ্যে দেশের প্রাচীন ও নবীন জীবনের যোগসূত্র গাঁথা হ'ত।

সদর মহকুমা

শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলা দেবী

বর্দ্ধমান শহরের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিতা শ্রী শ্রীসর্বমঙ্গলা দেবী সর্বজনপূজিতা দেবতা। শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলা ট্রাষ্ট বোর্ড একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, যাতে বলা হয়, কে কবে এই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আদি পূজাবেদী কোথায়



সর্বমঙ্গলা মন্দিব

ছিল তার কোন ইতিহাস জানা যায় নি। তবে কয়েকটি প্রচলিত গল্প থেকে তথ্যেব কিছু জানা যায়। এই মূর্তি পুরাতত্ত্বের একটি আশ্চর্য বস্তু। প্রায় সাত, আটশ বছবের প্রাচীন। মঙ্গল কাব্যে সর্বমঙ্গলা দেবীব উল্লেখ পাওয়া যায়।

"রাঢ় মধ্যে পূণ্য নাম হল বৰ্দ্ধমান
সর্বমঙ্গলাকে নিয়ে যার যশোগান।"

বর্দ্ধমানের উত্তবদিকে "বাহির সর্বমঙ্গলা" পল্লীতে দেবমূর্তিটি এক বাগ্দী বাড়ীতে ছিলেন। বাগ্দীবা এই প্রস্তব খণ্ডের উপর গুগলি, ঝিনুক ও শামুক ভাঙ্গত। চুনুরিরা ঐ গুগলি, শামুকের খোলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে যেত চুন করবার জন্য। একদিন চুনুরীরা গুগলি, শামুক ও ঝিনুকের সঙ্গে ঐ প্রস্তর খণ্ডটিও নিয়ে যায় এবং আগুনে দেয়। তারা দেখতে পায় গুগলি শামুকে খোল পুড়ে চূর্ণ হয়ে গেলেও একটি কৃষ্ণবর্ণ পাথর অবিকৃত আছে। চুনুরীরা চুনের স্তূপ থেকে পাথরটি স্থানীয় ব্রাহ্মণের হাতে দেয়। ব্রাহ্মণ সেটি জলে ধুয়ে পরিস্কার করে দেখেন, অপূর্ব দেবীমূর্তি।

ইতিমধ্যে বর্দ্ধমান মহারাজ চিত্তসেন রায় স্বপ্ন দেখেন যে এক দেবমূর্তি তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিচ্ছেন, দামোদরের জলে তিনি অবহেলিত অবস্থায় রয়েছেন। মহারাজ যেন তাঁকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন। পরদিন সকালেই ঘোড়ায় চড়ে মহারাজ চিত্রসেন দামোদবেব তীরে যান। দেখতে পান এক ব্রাহ্মণ মূর্তিটি জলে ধুচ্ছেন।



সর্বমঙ্গলা মায়ের মূর্তি

মহারাজ মূর্তিটি চাইলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই মূর্তিটি দিতে রাজী হলেন না। তখন মহারাজ প্রতিশ্রুতি দিলেন, ঐ ব্রাহ্মণই বিগ্রহের নিত্য নৈমিত্তিক পূজারীর অধিকারী থাকবেন, মহারাজ কেবল মূর্তি পূজার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবেন। তখন ব্রাহ্মণ সম্মত হলে মহারাজ চিত্রসেন বর্তমান সর্বমঙ্গলা মন্দির তৈরী করে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে।

শ্রী শ্রী সর্বমঙ্গলা দেবী অষ্টাদশভুজা কৃষ্ণ প্রস্তরে গড়া। মূর্তির চরণতলে মহিষ এবং তার নিকট অসুর শায়িত আছেন। দেবী শূলাঘাতে মহিষাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করছেন। এই মূর্তিকে মন্বন্তরা মূর্তি বলে। মহারাজ রূপার সিংহাসনে দেবীকে অধিষ্ঠিত করেন। মূর্তির তলদেশে অস্পষ্ট কি লেখা আছে তা কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি। পৈশাচী ভাষার সহিত সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু কেউ লিপিপাঠ

করতে পারেন নি। সর্বমঙ্গলা মায়ের মন্দিরে আর একটি মূর্তি আছে যা সূর্যমূর্তি নামে খ্যাত।

পুরোহিতরা বলেন, তাঁর অঙ্গ হতে সূর্যের ছটা বের হয়। দুর্গাপূজার সময় নবমীর শেষে পাঁঠা, মহিষ, ও মেষ বলি হয়। অর্থ, কাম, ক্রোধ ও লোভকে মায়ের কাছে বলি দেওয়া হয়। পাঁঠা হল কামের প্রতীক, মহিষ হল ক্রোধ ও মেষ হল লোভের প্রতীক। বৰ্দ্ধমান শহরের আপন দেবতা হলেন এই শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলা। যে কোন উৎসবে, অনুষ্ঠানে, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, নূতন খাতায় এবং শুভ সূচনায় সর্বমঙ্গলা মাতার আশীর্বাদ গ্রহণ বৰ্দ্ধমান শহরবাসীর কাছে একান্ত কাম্য।

বর্দ্ধমানরাজের রাজ্য অধিগ্রহণের পর বর্তমানে শ্রী শ্রীসর্বমঙ্গলা দেবীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে একটি ট্রাষ্ট বোর্ড। বৰ্দ্ধমান শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রীকুমার মিত্রের প্রচেষ্টায় এটি গঠিত হয়। রাজ্য অধিগ্রহণের পর মহারাজ উদয়চাঁদ মাহতাব ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর বৰ্দ্ধমান ত্যাগের আগে রাজবাড়ির ৫২টি কামানের লাইসেন্স সরকারকে জমা দেন সরকারী ঠিকাদার এসে সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সামনে ৫ ফুট লম্বা কামানটি তুলতে গেলে শ্রীকুমার মিত্র ঐ কাজে বাধা দেন ও অবস্থান সত্যাগ্রহ করেন। কারণ এই কামানটি থেকে প্রতি বৎসর সন্ধিপূজার ক্ষণে তোপধ্বনি করা হয়। রাজবাড়ির তোপ শুনে পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় শতাধিক পূজামণ্ডপে সন্ধিপূজার ক্ষণ নির্দ্ধারিত হয়। অবশেষে জনসাধারণের আবেদনক্রমে মায়ের মন্দিরের সামনে ঐ কামানটি রেখে দেওয়া হয় ও লাইসেন্স ফী মুক্ত করা হয়। মহারাজা উদয়চাঁদ কর্তৃক সম্পাদিত রেজিষ্টারী দলিল মূলে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন ট্রাষ্ট বোর্ড গঠিত হয় এবং শ্রী কুমার মিত্র উক্ত ট্রাষ্ট বোর্ডের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তৎকালীন জেলা শাসক শ্রী এস. আর. দাস. কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিক্রমে ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর কামানটির লাইসেন্স ফী মুকুব করেন।

দুর্গাপূজার সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত জাঁকজমকে মায়ের পূজা হয়। সেই সময় মন্দিরের চতুর্দিকে পাঁচদিন ব্যাপী মেলা বসে যায়। এছাড়া সপ্তাহের প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে শত শত ভক্ত ও যাত্রী আসেন। ১লা বৈশাখ ও অক্ষয় তৃতীয়া ব্যবসায়ীদের নূতন খাতার পূজায় প্রচণ্ড ভীড় হয়। এখন নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য পূজা হয় মায়ের। রাঢ়ের জাগ্রতা এই দেবী সকল মানুষের প্রাণস্পর্শে চৈতন্যস্বরূপা, বরাভয়দাত্রী, অগতির গতি। মাতা সর্বমঙ্গলা ঠাকুর বাড়ি যেন বৰ্দ্ধমানের নিত্য তীর্থক্ষেত্র।

বৰ্দ্ধমানে সর্বমঙ্গলার বন্দি পদদ্বয়।
দর্শনে কলুষনাশ চতুর্বর্গ হয়॥

সোনার কালী

বর্দ্ধমান শহরে মিঠাপুকুরে রয়েছে নারায়ণী শক্তিবাড়ি। এখানে রয়েছেন শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী মূর্তি যার দক্ষিণে অবস্থিত কালীমূর্তি এবং পঞ্চমুণ্ডির আসন। পঞ্চমুণ্ডির আসনের পূর্ব্বদিকের কামরায় রয়েছেন শ্রীশ্রীচণ্ডিকা দেবী। তার দক্ষিণে শিবমন্দির। এই মন্দির সোনার কালীবাড়ি নামে প্রসিদ্ধ। প্রবেশপথে তোরণদ্বারের উপর নহবৎখানা। সামনে ফাঁকা চত্বর, মাঝখানে ফোয়ারা। চতুর্দিকে বাহারী ফুলের গাছগাছালি। মন্দিরের সামনে নাটমন্দির—বিশাল ও সুদৃশ্য। এখানে প্রতিদিন 'অন্নভোগ' ও 'মৎস' ভোগ হত। প্রতি অমাবস্যায় প্রচুর পাঁঠা বলি হত। রাত্রে পাঁঠার মাংস রান্না করে ভোগ হত, সঙ্গে মিষ্টান্ন ও পুরি পরিবেশন করা হত। অতিথিরা নিয়মিত প্রসাদ পেতেন। নহবৎখানায় বসত নহবৎদার। শানাই এর মিষ্টি সুরে, ডুগির মিঠা আওয়াজে ভোর বেলায় ঘুম ভাঙত পল্লীবাসীর। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও কীর্ত্তন গান হত। কাঠের সুন্দর জাফরির আড়ালে মহারাণী অধিরাণী নারায়ণ কুমারী রাজপরিবারের মহিলাদের নিয়ে শুনতে বসতেন সেখানে। নারায়ণ কুমারী ছিলেন মহতাব চন্দের দ্বিতীয়া মহিষী। ঠাকুরবাড়ির মূল প্রবেশ পথে মর্মবফলকে রয়েছে:

শ্রীদুর্গাশরণম্

হিজহাইনেস মহতাব নৃপতেষু মহিষী শ্রীল নারায়ণাদি
শব্দা দেবকুমারী বিজয়নরপতি, শ্রীমতস্তামাতা।
শাকে প্লাবক্ষি বহ্নিন্দুম ইহ ওর্ণশিং শক্তিমদ্যাং ঘটান্তে
সংস্থাপ্যাস্যৈ সুহর্মং বিপুলগৃহর্ম্মা প্রাদদম্ভক্তি বক্তা।

মহারাজ অধিরাজ হিজহাইনেস,
স্বর্গীয় মহতাবচন্দ বিখ্যাত নরেশ
শ্রীশ্রীচণ্ডী নারাযণ কুমারী বিখ্যাতা।
শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র নৃপ পিতামহী
যাহার সুজশোগান সদা করে মহী।
শাকে অষ্টদশ শত একবিংশ মানে
কুম্ভ ছাড়ি দিনেশের মীনে অধিষ্ঠানে।
স্থাপিয়া শ্রীআদ্যাশক্তি ভক্তি সহকারে
এ বিপুল সহর্মটি অর্পিলেন তাঁরে॥

শকাব্দ ১৮২১/বঙ্গাব্দ ১৩০৬/৩০ ফাল্গুন

মহারাজ মহতাব চন্দ (১৮৮১-১৯৪১ খ্রীঃ) এই বিখ্যাত মন্দিরটি নির্মাণ করান। মহাধুমধামে এই মন্দিরে পূজা হত। নাটমন্দিরে ও চত্বরে সমবেত হতেন শত শত পুণ্যার্থী। প্রসাদ না নিয়ে কেউ ফিরতেন না। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের

পর মন্দির এখন অন্ধকার। সে রামও নেই , সে অযোধ্যাও নেই। তবু ভক্তির ডালি নিয়ে আজও যাত্রীরা আসেন, ভক্তি অর্ঘ্য দান করেন।

দেবী কঙ্কালেশ্বরী

বর্দ্ধমান শহরের পশ্চিমে কাঞ্চন নগরে বাঁকা নদী ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী স্থানে দেবী কঙ্কালেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। প্রচলিত প্রবাদ যে দামোদর নদের গর্ভে বালিচাপা ছিল এই মূর্তি। কিছুটা বাইরে বেরিয়েছিল তার উপর রজকেরা কাপড় কাচত। আনুমানিক ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে একজন রাজকর্মচারী দামোদর তীর ধরে যেতে যেতে পাথরটি দেখতে পায়। তাঁর সন্দেহ হয় এটি একটি প্রস্তর মূর্তি। তিনি স্থানীয় লোকজনকে ডেকে বালির স্তূপ খুঁড়ে দেখেন এটি একটি মূর্তি। পরে পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী ডমুরদহের কমলানন্দ ঠাকুর এটিকে দামোদর গর্ভ থেকে তুলে কাঞ্চন নগরের একটি বিষ্ণু মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকে অনুমান করেন মূর্তিটি আরো বহু পূর্ব্ব হতেই স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা পূজিতা হতেন। দামোদরের প্রলয়ঙ্করী বন্যায় গ্রাম ও পল্লী সহ মন্দির ভেসে যায় ও মূর্তিটি প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট গর্ভে বালি চাপা পড়ে যায়।

মূর্তিটি পাথরের উপর কুঁদে তৈরী করা অষ্টভুজা চামুণ্ডা মূর্তি। মূর্তির বৈশিষ্ট্য হল—দেহের কঙ্কাল ও ধমনি, শিরা, উপশিরা, স্নায়ু পাথরে খোদাই করা। উচ্চতায় সাড়ে ছ'ফুট। মূর্তির মাথায় হস্তী ও পদতলে শায়িত শিব। এক হাতে নরমুণ্ড অন্য হাতে খড়্গ। শিল্পীর শারীর বিজ্ঞানে প্রগাঢ় জ্ঞান দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই মূর্তি কত দিনের তা কেউ বলতে পারেন না। কিন্তু পাথরের রঙ ও মূর্তি দেখে মনে হয়, এটি বৌদ্ধতন্ত্রের ভাস্কর্য। আবার কেউ কেউ বলেন, এই মূর্তি তামসিক তন্ত্রসাধনার যুগের মূর্তি।

জৈনধর্মের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমান যখন বর্দ্ধমানে আসেন, তখন এই কাঞ্চননগরে আদিবাসী বোড়, কিরাত, নিষাদ ও ডোম বাস করতেন। বোড়ো জাতি মৃতদেহ আগুনে ভষ্মীভূত করত না। একটা জায়গায় স্তূপীকৃত করে রেখে দিত। সেই জায়গায় মৃতদেহের পচনের পর শুধু হাড় পড়ে থাকত। এইভাবে এই অঞ্চলের একটা জায়গা কঙ্কালের স্তূপ জমে পর্ব্বত প্রমাণ হয়। সেজন্য এই অঞ্চলকে অস্থিক গ্রাম বলত। কালক্রমে আদিবাসীগণ এই কঙ্কালের উপর যক্ষের মন্দির নির্মাণ করে। তান্ত্রিক আদিবাসীদের সৃষ্ট এই মূর্তিটি হয়ত যক্ষিণীর মূর্তিও হয়ে থাকবে। তাহ'লে এই কঙ্কালেশ্বরীর বয়স প্রাক-জৈন পর্ব হতে অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালে এই তামসিক তন্ত্র সাধনার প্রতিচ্ছবি আমরা পাই বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে:

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকাচুরি পরগৃহে দহে অনুক্ষণ।।

কবি জয়ানন্দের কাব্যেও সেই তান্ত্রিক সাধনার চিত্র পাওয়া যায়—

উদয়াস্ত জ্ঞান নাহি মদিরা ভোক্ষণে।
ঘূর্ণিত লোচন চারু পূর্ণা সত্রাসনে।।

কবি লোচন দাসও তামসিক তান্ত্রিকতার চিত্র অংকন করেছেন:

ব্রাহ্মণ যবনী স্তর্বসনা নাহি এড়ে।
ব্রহ্ম বধ, গো বধ, স্ত্রী বধ শত শত মত।

তাই অনেকে অনুমান করেন কঙ্কালেশ্বরীর মূর্তি প্রাক চৈতন্য পর্বের অর্থাৎ মূর্তির নির্মাণ খ্রীঃ পূর্ব চারশ বছর থেকে খ্রীষ্ট পরবর্তী হাজার বছরের মধ্যে ধরা যায়। ডুমুরদহেব আশ্রমের সাধুরা এখনও এর পূজা-আর্চার ব্যবস্থা করেন। এই মূর্তি জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুতন্ত্রের এক সমন্বয়। দৈনিক পূজার সময় দূর দূরান্ত থেকে যাত্রী ও ভক্তরা আসেন। দর্শনীয় বস্তু হিসাবে জ্ঞান পিপাসু ইতিহাসের ছাত্ররাও আসেন। যে মন্দিবে কঙ্কালেশ্বরী প্রতিষ্ঠিতা সে মন্দিরটি একটি দর্শনীয়। গ্রাম বাংলার খড়ের চার চালাব ধাঁচে এটির ছাদ গঠিত। মধ্যস্থানে একটি দেউল। দেওয়ালের গায়ে পোড়া মাটি বা টেরাকোটার কাজ। স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। মন্দিটির পোড়ামাটির কাজ দেখে মনে হয় নির্মাণ কাল দশম-একাদশ শতাব্দীব। কার্তিক মাসে মহাসমারোহে কালীপূজার দিন পূজা ও পাঁঠাবলি হয় এবং মেলা বসে।

কমলাকান্ত কালী

বর্দ্ধমান শহরের কোটালহাটে কমলাকান্ত কালীবাড়ি। বর্দ্ধমান রাজ প্রতাপ চন্দ এই মন্দির তৈরী করান। কমলাকান্ত ছিলেন সাধক কবি। পৈতৃক নিবাস কালনায়। পিতৃবিয়োগ হলে মামাবাড়ি চান্নায় চলে আসেন। এখানেই তিনি প্রতিপালিত হন। বর্দ্ধমানরাজ তেজচন্দ কমলাকান্তকে বর্দ্ধমানে নিয়ে আসেন ও সভাকবির পদে বরণ করেন। পুত্র প্রতাপচন্দের শিক্ষার ভার সাধক কমলাকান্তর উপর অর্পণ করেন তেজচন্দ। কোটালহাটে পঞ্চমুণ্ডির আসন বসিয়ে তার উপর প্রত্যেক অমাবস্যায় সাধনা করতেন কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। রামপ্রসাদের পরই সাধক কবি হিসাবে কমলাকান্ত বিখ্যাত।

পুরাতন মন্দিরের সম্মুখে একটি নাটমন্দির কালীমন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করেছে। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজা আরাধনার জন্য একটি ট্রাষ্ট কমিটি আছে। মূর্তি মাটির তৈরী বিরাটকায় চতুর্ভুজা। প্রতিবৎসর অঙ্গ রাগ হয় এবং কার্তিক মাসে শ্যামা মায়ের বিরাট উৎসব হয়। সাধক রামপ্রসাদের মতই কমলাকান্তের জীবন অলৌকিক গল্পেভরা। যে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে তিনি সাধনা করতেন তা আজও আছে।

শাক্ত কবি হিসাবেও কমলাকান্ত বাংলা সাহিত্যে সমাদৃত। ভক্তদের দানে এখন নিত্যসেবা ও পূজানুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে হয়ে থাকে। তবে কার্তিক মাসে শ্যামাপূজার সময় খুব ধুম ধামে পূজা হয়। এই উপলক্ষে তিন দিন ধরে মেলা বসে যায়। বহু পাঁঠা বলি হয়, দূর দূরান্ত থেকে "কমলাকান্ত-কালী" বাড়িতে পূজা আসে। ঐ সময় কালীকীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতে 'কালীর' পূজা হয় বলে কমলাকান্ত-কালীর গুরুত্ব রয়েছে জেলাবাসীর কাছে।

নবাব হাটের একশ আট শিব

বৰ্দ্ধমান শহরের উত্তর পশ্চিমে দু কিলোমিটার দূরে নবাবহাট গ্রামে ১০৮টি শিবমন্দির বৰ্দ্ধমানের একটি ঐতিহাসিক দর্শনীয় জিনিস। এই মন্দিরগুলির মধ্যে যে শিবলিঙ্গ আছে তা এখন বৰ্দ্ধমানের অন্যতম গ্রামদেবতা হিসাবে পূজিত হচ্ছেন। নামেই ১০৮, আসলে ১০৯টি শিবমন্দির আছে।



১০৮ শিব মন্দির

বৰ্দ্ধমান মহারাজা তিলকচন্দের মৃত্যুর পর মহারাণী বিষণকুমারী ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে

নাবালক পুত্র তেজচন্দের অভিভাবিকা হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেন ও দক্ষতার সঙ্গে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে থাকেন। এই সময়ই রাণী এক স্বপ্নাদেশ পেয়ে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ১০৮টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠার সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত এক লক্ষেরও বেশি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পদ প্রক্ষালন করে পদধুলি গ্রহণ করেছিলেন রাজা। এই উপলক্ষ্যে যে সব অতিথি এসেছিলেন তাঁদের সকলকেই রাজকীয় আপ্যায়নে তৃপ্ত করেছিলেন। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদরজ রাজবাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে রক্ষিত ছিল। একটুকরো শ্বেতপাথরে খোদাই করা ফলক সেই স্মরণীয় মুহূর্তকে ইতিহাস সচেতন মানুষের কাছে এখনও জীবন্ত করে রেখেছে।

কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে নবাবহাটের এই শিবমন্দিরগুলি অযত্নের কবলে পড়ে ও সংরক্ষণের অভাবে অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়। ১৯৬৮ খ্রীঃ বিড়লা ট্রাষ্ট কমিটি মন্দিরগুলির সংস্কাবের কাজে এগিয়ে আসেন। নূতন করে মন্দির সংস্কার ও রঙ্চঙ্ করার পর পুনরায় মন্দির প্রাঙ্গণে নিত্য পূজার ব্যবস্থা হয়। বিরাট এলাকা জুড়ে আয়তাকার প্রাঙ্গণের ধাবে ধারে মন্দিরগুলি প্রাচীরের মত মনোরম স্থানটিকে বেষ্টন করে রেখেছে। মন্দিরের সম্মুখ ভাগ ভিতরে চতুর্দিকে সামনে অপ্রশস্ত বারান্দা। মাঝখানে একটি রাস্তা তার দুপাশে দুটি আয়তাকার পুষ্করিণী এবং তার চতুর্দিকে পথ চলার লন। পাশে বিভিন্ন রকম কেয়ারী করা বাহারী গাছ। বাইরে মন্দিরেব পিছনে সাবিবন্দী বেলগাছ।

মন্দির সংরক্ষণ ও পূজা উপলক্ষে গঠিত ট্রাষ্ট কমিটি প্রতি বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতে সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলার আয়োজন করেন। সেই সময় দূর দূরান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিবলিঙ্গের মাথায় জল ও বিল্বপত্র দানের জন্য ভীড় করেন। এই মেলা বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠতম মেলা। এখানে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। হোম, মন্ত্রপাঠ, শাস্ত্রপাঠ, যজ্ঞ, ধর্মালোচনা, কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন, বাউল, বোলান, রামায়ণ প্রভৃতি গানের ব্যবস্থা করা হয়। বছরের প্রতি রবিবার বর্দ্ধমানের বাইরে থেকে দর্শনার্থীদের আসতে দেখা যায়। মনোরম ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবেও ১০৮ শিবমন্দির আকর্ষণীয়।

বোড়ো বলরাম

সদর মহকুমার রায়না থানার বোড়ো গাঁয়ের নাম গ্রামদেবতা বলরামকে যুক্ত করে হয়েছে "বোড়ো বলরাম।" দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে অনেকগুলি 'বোড়ো' বা 'বোড়া' গ্রাম থাকায় একটি করে উপসর্গ হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম, নয়তো ঠাকুর দেবতার নাম যুক্ত করে গ্রামের পরিচয় দেওয়া হয়। যেমন—কোণা-বোড়া,

জুংলী-বোড়া, রাতড়া-বোড়া, তেমনিই 'বোড়ো বলরাম'। আমি নিজে দক্ষিণ দামোদরের গ্রামগুলি ঘুরে দেখেছি আমার মনে হয়েছে জেলার আর্য সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমানের আদি বাসিন্দা বোড়ো, ডোম, কিরাত, নিষাদ প্রভৃতি দামোদর অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দুর্গম স্থানে আশ্রয় নেয়। রায়না থানার বোড়ো গ্রামটি সেইরকমই একটি গ্রাম গ্রীষ্মকালেই এই গ্রামে যাওয়া দুষ্কর, বর্ষাকালে দুর্গম। বোড়ো নামটিও সে কথাই বলে।

এই গ্রামেরই গ্রামদেবতা হলেন বলরাম। ইনি পৌরাণিক দেবতা শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। এখানেও ইনি বিষ্ণুর অন্যরূপ—কিন্তু মূর্তিতে বৌদ্ধ ও হিন্দুর কল্পনা মিশে এক নূতন সৃষ্টি। পৌরাণিক বিষ্ণু বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ একত্রে পূজা পান। এর আরম্ভ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম দ্বিতীয় শতাব্দে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বন্দনাখণ্ডে আছে, 'বোড়োগ্রামের বলরামের নতকৈনুশির।' বাংলায় গুপ্ত বা পাল যুগে এর পত্তন। পৌরাণিক বলররামের অনুরূপ কতকগুলি প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে গড়ুই, গয়েসাবাদ, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Eastern Indian School of Mediaeval Sculpture গ্রন্থে ঐ মূর্তিগুলিকে 'লোকেশ্বর বিষ্ণু' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ডঃ সুকুমাব সেন মনে করেন, ঐ মূর্তিগুলি পৌরাণিক "সঙ্কর্ষণ" বলরামের। বাঘনাপাড়ার বলরাম এই মূর্তি নন। বলরামের অনা নাম হলধর অর্থাৎ ইনি চাষাবাদের দেবতা সেজন্য হাতে হল। মূর্তিটি কাঠের তৈরী দশহাত উঁচু, চৌদ্দটি হাত। মাথায় তেরটি সাপ ফণা তুলে আছে। মূর্তির তিনটি চোখ, মুখটি হাসি হাসি। নিত্য পূজা হয়। বছরে তিনবার উৎসব হয়, তিনটি তিথিতে—ভাদ্রমাসে অনন্ত চতুর্দশীতে, পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তিতে, এবং মাঘ মাসে মাকড়ি সপ্তমী তিথিতে। শেষোক্ত উৎসবে মেলা বসে এগারো দিন ধরে এবং বৈশাখ মাসে গাজন হয়। গাজনে বেশ জাঁকজমক হয়। এই সময় যাত্রাগানও হয়। তিনটি তিথিতে উৎসবের তাৎপর্য আছে। অনন্ত চতুর্দ্দশীতে পূজার কারণ মাথায় অনন্ত নাগ, চৌদ্দটি হাত হল চতুর্দ্দশ ভুবন ধারণের প্রতীক। অনন্তদেবকে তুষ্ট রাখতেই পূজা। তিনটি চোখ হল, তিনি চাষ-আবাদের দেবতা, উৎপন্ন ফসলকে স্বাগত জানানো। আর মাঘ মাসে পূজার কারণ উত্তরায়ণ সুরু হচ্ছে গঙ্গা স্নানের যুগ। স্থানীয় উপকথা দামোদরের প্রবাহ ধরে গঙ্গা এসেছিলেন এবং সেদিন সকলেই গঙ্গা স্নান করেছিলেন। এটা হল রুদ্রের পূজা। একাদশ রুদ্রের পূজা এগারো দিন ধরে হয়। বৈশাখ মাসে হয় চক্ষুদান গাজন। গাজনেও বেশ জাঁক জমক হয়। সন্ন্যাসীদের দণ্ডী খাটা, ঝাঁপ খাওয়া, শূলে ভর প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশী হল নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর দিন। নৃসিংহ কৃষ্ণ অবতার হলেন কৃষিদেবতা সংকর্ষণ বা বলরাম। মাথায় সাপ বা মনসা, আকৃতিতে বলরাম বা বিষ্ণুর রূপভেদ এবং গাজনের অর্থ শিবের পূজা। অর্থাৎ মনসা, বলরাম ও শিব—এই তিনের সমন্বয়।

অর্থাৎ বৈদিক, প্রাগবৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগের সমন্বয়। কৃষি সভ্যতার উন্মেষের সাক্ষী হয়ে রয়েছেন এই কৃষি দেবতা বলরাম।

বলরাম-মন্দির একটি উঁচু স্তূপের উপর অবস্থিত। দামোদরের বন্যায় প্রায়ই ডুবে যেত, তাই মাটির ঢিবির উপর অবস্থিত। বলরামের মন্দিরটি বেশ প্রাচীন—'জগমোহন' মন্দিরের তোরণে কুটির পদ্ধতির আদল। পঞ্চদশ শতকের স্থাপত্য আত্মগোপন করে আছে। গ্রামের পাশেই দামোদরের দক্ষিণকূলে বাসুদেব পুকুর। প্রবাদ এখানে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রে নিমকাঠ ভেসে এসেছিল। সেই নিম কাঠেই এই বলরামের মূর্তি। সমুদ্র চলে গেছে দূরে, রেখে গেছে দামোদরের ধারাকে। এই জলা জায়গার উপর যে 'বোড়ো বলরাম' গ্রামটির পত্তন হয়েছে তা দেখলে ধরা যাবে। হয়ত 'বলরাম' মন্দিরের স্তূপের ভিতর প্রাচীন কাহিনী আত্মগোপন করে আছে। বোড়ো গ্রামে মুসলমানদের বাস নিষিদ্ধ, কারণ তখনকার আদিবাসী ডোম-শবর-কিরাত এঁরা পাঠানদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়নি। পাঠানরাও এই দুর্গমস্থানে কোন দিন প্রবেশ করেনি, কিম্বা বোড়ো সর্দ্দারগণ তাদের হটিয়ে দিয়ে থাকবে। গ্রামে কামার, কুমোর, ও রজকের বাসও নিষিদ্ধ—তার কারণ বোড়ো জাতির সঙ্গে অপর বৃত্তিয় গোষ্ঠীর লড়াই মৌলিক বিরোধ। ব্যাস মনুর অনুশাসন আছে, "পাকচক্র-চক্রাকার" অর্থাৎ কুম্ভকার ও তেলকার ধর্মস্থানে বাস করবে না। আর্যদের এই নীতি অনার্যদের মানতে হয়েছে দ্বন্দ্বের পর আপোস রফার সূত্র হিসেবে। বহু স্থানে এই নিয়ম আছে। বোড়ো জাতির বৃত্তি হল চাষাবাদ এবং এটা প্রতিষ্ঠা করতেই বিশাল এই 'বলরামের' মূর্তি।

কুলীন গ্রামের মদনগোপাল ও গোপেশ্বর

বর্দ্ধমান-হাওড়া কর্ডলাইনের জৌগ্রাম ষ্টেশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে জামালপুর ব্লকের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কুলীন গ্রাম। এই গ্রামের গ্রামদেবতা হলেন শ্রীমদনগোপাল। দেবমন্দিরটি বেশ পুরাতন। পূর্ব্বে মন্দিরের ভিতর-ত্রিভঙ্গীতে দাঁড়ানো পাথরের বিগ্রহ ছিল। পরে শ্রী মদনগোপালের দুদিকে শ্রীরাধিকা ও ললিতার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামের সবচাইতে প্রাচীন এই দেবতা। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পার্ষদ রামানন্দ বসুর সঙ্গে এখানে এই মন্দিরে এসেছিলেন। মন্দিরের মধ্যে নাড়ুগোপাল, চণ্ডী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বহু মূর্তি ও দেবশিলা আছে।

প্রতি বছর শ্রাবণে ঝুলন, ফাল্গুনে দোল ও কার্তিকে রাসউৎসব বেশ ধূমধামে হয়। শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বলে সেইমত পূজা হয়। মদনগোপালের উৎসব-ও পূজার শ্রেষ্ঠতম বিষয় হল—'দর্শনের মেলা'। মাঘমাসে শ্রী পঞ্চমী তিথি থেকে সংক্রান্তি অবধি বিশ দিনের মেলা উৎসবে কুলীনগ্রাম ও পাশ্ববর্তী এলাকা জেগে ওঠে। মদনগোপালের মন্দিরের সামনে গোপালদীঘি নামে বিরাট পুকুরে মাঘ উত্তরায়ণে

প্রায় হাজার পাঁচেক লোক পুণ্যস্নান করেন। মালাধর বসু, সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসুর জন্মভূমি এ শ্রীচৈতন্যের পাদস্পর্শে ধন্য এই গ্রাম প্রাজ্ঞব্যক্তিদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। গোপেশ্বর মন্দির, দেবতা ও প্রাচীন মন্দিরের গায়ে খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, ১৬৬৬ শকে অর্থাৎ ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কুলীন গ্রামের অন্তর্গত চৈতন্যপুর নিবাসী নারায়ণ দাস নামে এক ব্যক্তি মন্দিরের সংস্কার করান। অর্থাৎ আড়াইশ বছর আগেকার এই সংস্কার। মন্দির কতদিনের প্রাচীন সহজেই অনুমেয়। ফলকের উৎকীর্ণ: 'শকাব্দা ১৬৬৬' এর পরের শব্দটি ভেঙে গেছে। তারপর আছে 'শ্রীঠাকুর আলয়'। পরের তিনটি শব্দ খুবই অস্পষ্ট। তাপরে লিপি হল "বেত্রপাল শ্রীসত্যরাজ খাঁ তস্যপুত্র শ্রী রামানন্দ বসু ঠাকুরের গড়বাড়ি।" এখান থেকেই জানা যায়, সত্যরাজ খাঁ এর পুত্র রামানন্দ বসু।

মন্দিরের মধ্যে প্রায় আড়াইফুট লম্বা দেড়ফুট উঁচু পাথরের একটি বৃষমূর্তি আছে। এই বৃষের গলকম্বলে খোদিত সংস্কৃত শ্লোক থেকে এটুকু বোঝা যায়, মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ এই বৃষের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি এখন জীর্ণ প্রায়, বাংলার আটচালার ধাঁচে তৈরী, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে পড়েছে। মন্দিরের দেওয়ালে পোড়ামাটির কাজগুলি ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। বৃষটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সত্যরাজ খাঁ ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। মালাধর তখন গতাসু হয়েছেন বলে অনুমান করা যায়। বৃষ প্রতিষ্ঠাকালে সত্যরাজের বয়স আনুমানিক ৪০ বৎসর। গ্রামের এইসব প্রমাণ থেকে ধরা যায় মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খান ও তার পুত্র রামানন্দ বসু। বৃষের গায়ে যে শ্লোকটি আছে তা হল:

শাকে বিংশতি বেদৈকে মুক্ত্যর্থং শিব সন্নিধৌ।
খাঁন শ্রীসত্যরাজেন স্থাপিত্যোয়ং শিলাবৃষঃ

সত্যরাজ খাঁন-ই কুলীন গ্রামের মধ্যমণি। তিনি প্রথমে ছিলেন শৈব, পরে বৈষ্ণব হয়েছিলেন। শৈব সত্যরাজ খান কুলীন গ্রামে শিবমূর্তির প্রতিষ্ঠা করে মন্দিরে স্থাপন করেছিলেন। এই শিবই হলেন গোপেশ্বর। শিবলিঙ্গটি কালো পাথরের। মন্দির অভ্যন্তরে থামের মত বসানো। গৌরীপটহীন একলিঙ্গ শিব। বাংলার বেশির ভাগই গৌরীপট যুক্ত শিবলিঙ্গ। একলিঙ্গ শিব সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন বলেন, 'আমাদের দেশে যুক্তলিঙ্গ প্রতীকের পূজা দেখতে পাই গৌরীপট যুক্ত শিবলিঙ্গে। যে সব প্রাচীন শিবলিঙ্গ সেগুলি থাম বা থামের মত, সেগুলি যথার্থ শিবলিঙ্গ। এগুলি কৃত্রিম আছে, স্বাভাবিকও আছে। যুক্তলিঙ্গগুলি সবই কৃত্রিম ও আধুনিক। [সুকুমার সেন,'মহাদেবী নিত্যা'—বিভাব, বৈশাখ, ১৩৮৮ কলিকাতা] নীলাচলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গমনের পরই কুলীন গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে এবং সেই যোগসূত্র হলেন সত্যরাজ খান। [কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ রামানন্দ—ডঃ রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়,

বর্দ্ধমান স্মরণিকা/৪১] তারপরই মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য পরিচিত হয়ে ওঠে। তাই কুলীন গ্রামে পুরীর স্মৃতিচিহ্ন অনেক কিছু আছে। যথা—কুলীন গ্রামের গোপাল মন্দিরের গঠনশৈলী জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের অনুরূপ। প্রাচীন জগন্নাথের আদলে মন্দিরের ভিতর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্তি রয়েছে। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও অপরটি গরুড়ের মূর্তি আছে। কালো পাথরে খোদাই করা হয়েছে সত্যরাজ খাঁন রামানন্দ বসুর উপাধি। যেমন মালাধর বসুর উপাধি গুণরাজ খান। কিন্তু কুলীন গ্রামে এসে এইসব তথ্য থেকে জানতে পারা যায়, সত্যরাজ ও রামানন্দ দুই পৃথক ব্যক্তি। মালাধর বসু উক্ত পরিবারের ত্রয়োদশ পুরুষ এবং সত্যরাজ চতুর্দশ পুরুয এবং রামানন্দ পঞ্চদশ।

বোঁয়াই এর বসন্তচণ্ডী

সদর মহকুমার দক্ষিণ দামোদর এলাকার খণ্ডঘোষ ব্লক। এই ব্লকের গ্রাম বোঁয়াইচণ্ডী। গ্রামদেবতা বসন্তচণ্ডীর নামেই গ্রামের নাম। রায়না-বাঁকুড়া বি, ডি, আর রেলস্টেশন বোঁয়াই। তিনকোণিয়া বাসস্ট্যাণ্ড থেকে সোজা গ্রাম পর্যন্ত বাস যায়। স্থানীয় লোকের ধাবণা বসন্তচণ্ডী জাগ্রতাদেবী।

উঁচু জমির উপর বিরাট দালান চত্বর। মন্দির দরদালানওয়ালা— ভিতরে চণ্ডীমূর্তি। দুপাশে— নীলকণ্ঠ এবং ভৈরব সমাসীন, চণ্ডীর পাহারায় নিযুক্ত। এই মন্দিরটি বর্দ্ধমান মহারাজার দান। শুধু তাই নয়, মায়ের নিত্য পূজা ও মন্দির সংস্কারাদি ব্যয় নির্বাহ নিমিত্ত কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি বর্দ্ধমান মহারাজ দান করে গেছেন। প্রতি মঙ্গল ও শনিবারে যাত্রীদের ভীড় হয়। যাত্রীরা পূজা দেন এবং মন্দিরের সামনে পুস্করিণীতে স্নান করেন। বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী, পুরুলিয়া ও কলকাতা থেকে ভক্তরা আসেন ও মানত করেন। প্রতি গ্রামের জন্য আলাদা আলাদা পুরোহিত আছেন বোঁয়াইচণ্ডীতে। বড় মেলা ও জাঁকজমক হয় আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী তিথিতে এবং শারদীয়া নবমীতে। অম্বুবাচী থেকে তিনদিন ও শারদীয়া নবমীতে একদিন বিরাট মেলা বসে। পাঁঠা বলি হয় অনেক।

জনরব, যে দেবী ছিলেন, কুলে গ্রামের রায়কাদীঘির 'অগ্নিকোণে'— একটি শেওড়া গাছের নীচে। জনৈক ভক্ত স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মাকে তুলে আনেন এবং বসন্তচণ্ডীনামে প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও বোঁয়াই গ্রামের পূজারীদের ঘরে সেই প্রাচীন চতুর্দোলাটি বর্তমান। যাতে করে শিলারূপী দেবীকে কুলে গ্রাম থেকে বহন করে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রায় তিনশ বছর আগেকার এ ঘটনা।

পহলানপুরের পীরপালান

রায়না ১না ব্লকের শ্যামসুন্দর (পূর্ব্বনাম আহার বেলমা) থেকে সোজা দক্ষিণে

যে বাদশাহী সড়ক, তার সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত বর্ধিষ্ণু ও প্রাচীন গ্রাম পহ্লানপুর। এই গ্রামে জনশ্রুতি যে, সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি পহ্লান শাহ বিদ্রোহ দমন করতে গৌড় থেকে রাঙামাটি (বর্তমান হুগলী জেলা) যাচ্ছিলেন এই বাদশাহী সড়ক দিয়ে। হঠাৎ দামোদরের দক্ষিণে গুপ্তঘাতক শাহ পহলানকে আক্রমণ করে পিছন দিক থেকে ও এক কোপে শাহ পহ্লানের মুণ্ডটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু পহ্লানের বিশ্বস্ত ঘোড়া মুণ্ডহীন দেহটা নিয়েই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে থাকে ও এই গ্রামে এসে থামে। হোসেন শাহের লোকজন এই গ্রামেই শাহ পহ্লানের মুণ্ডহীন দেহ সমাধিস্থ করে। পহ্লান নিজে ছিলেন সাধু প্রকৃতির তাই পরবর্তীকালে তাঁর সমাধিকে পীরের সম্মান দেন মুসলমান ও হিন্দু সকলেই। সেনাপতির নামানুসারে গ্রামেরও নামকরণ হয় পহ্লানপুর।

পহলান পীরের ফয়তা ও শীর্ণি দেওয়া হয় এখন। ২রা মাঘ থেকে ৫ই মাঘ চারদিন বিরাট মেলা বসে। বহু মৌলবী আসেন—কোরাণ, শরিফ ও পীরের কথা পাঁচালীর সুরে গাওয়া হয়। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বছরের।

একলক্ষীর শা-চাঁদপীর

রায়না ও খণ্ডঘোষ ব্লকের দক্ষিণ প্রান্তের সীমারেখা টেনেছে দ্বারকেশ্বর নদী। নদীর বাঁকে অবস্থিত গাছ-গাছালি ও মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিকদৃশ্যে ভরপুর একলক্ষী গ্রাম। এই গ্রামের প্রবেশপথে উচালন-একলক্ষী সড়কের পাশে বিখ্যাত শা-চাঁদ পীর। এককালে এই পীরের দরগায় বহু মুসলমান ফকিরের সমাগম হত। এখনও দরগার ভেঙেপড়া একটু অংশ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আশে পাশে ঘুরলে প্রচুর পাথরকুচো-ইঁটের টুকরো ও দরগার পাশে স্তূপিকৃত পোড়ামাটির ঘোড়া দেখতে পাওয়া যাবে। কেউ কেউ বলেন এটি ছিল বৌদ্ধস্তূপ, মুসলমান আমলে কালাপাহাড়ি আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়, তারপর এসেছেন শা-চাঁদ, এখানে তিনি সাধনভজন করতেন। দেহান্তের পর পীরের আস্তানায় পরিণত হয়। সেও প্রায় তিন শ বছর আগের কথা।

এককালে একলক্ষী ছিল বিরাট গঞ্জ। নদীপথে জাহাজ ও ষ্টীমার আসত। গঞ্জে লক্ষ লক্ষ টাকার কেনা-বেচা চলত, তাই গ্রামের নাম একলক্ষী। দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণে হুগলী, পশ্চিমে বাঁকুড়া—তিন জেলার লোক এখানে এখনও হাট-বাজার করতে আসে। মাঘ মাসের পূর্ণিমা রাতে পীরের তলায় বসে পীরের গান, ফয়তাওশীর্ণি দেয় ফকির ও মৌলবীরা। মুরগী মানসিক পড়ে অনেক। জবাই করে রাত্রে হয় ভোগ। সারারাত ধরে চলে জমজমাট মেলা। ভোরে মেলা ও গান শেষ হয়।

গোপালবেড়ার মকদম পীর

খণ্ডঘোষ ব্লকেব গোপালবেড়া অঞ্চলের গোপালবেড়া গ্রামের পূর্বপ্রান্তে, মুইধারা গ্রামের দক্ষিণে ও উচালনের পশ্চিমে রয়েছেন বিখ্যাত মকদম পীর। পীরের আস্তানাটি এখন ঝোপে ভর্তি। তারই মধ্যে একটু জায়গা পবিস্কার করা, বহু পোড়ামাটির হাতি ও ঘোড়াব স্তূপ। এইখানেই বাবা মকদম পীব দেহ রেখেছিলেন। প্রায় শ চারেক বছর আগে শাদা আলখাল্লা ও শাদা চুল ও দাড়ি নিয়ে এই মকদম সাহেব ফকির এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিলেন। ধূল-ফুল ও তাবিজ-কবজ দিয়ে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি ভাল করতেন ও আল্লার নামগান করতেন। গাইতেন সত্যপীরের গান। সেই গান শুনতে লোকসমাগম হত প্রচুর। তারপর একদিন সবাই দেখল, শ্বেতশুভ্র সেই ফকিরের বদলে পড়ে আছে কতকগুলি ফুল আর মাটির ঘোড়া। সেই থেকে ১লা মাঘ বাবা মকদম সাহেবের তিরোভাব দিবসে বসে বিরাট মেলা। পৌষ সংক্রান্তির দিন বিকাল থেকেই মৌলভী ও ফকির সাহেবরা আসেন পীরের গান করতে। তিনটি গ্রাম থেকে আসে চাল, আলু, দুধ, গুড়, মুরগী ও ছাগল। পীরের ফয়তা ও শীর্ণি দেওযা হয়। সারা রাত চলে গান, পরদিন মেলা। প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার লোক হয়।

মুইধাড়ার ঝড়ো রায়

পাশ্ববর্তী মুইধাড়া গ্রামের ঝড়ো রায ঐ গ্রামের গ্রামদেবতা। এই গ্রন্থের লেখকের জন্মভূমি এই মুইধাড়া। শোনা যায়, ঝড়ো রায় ছিলেন পাঁচভাই। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন স্বীয়রাজ্য শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে। পঞ্চপাণ্ডবের মতই অসীম বীরত্ব দেখিয়েছিলেন রাঢ়ের অনার্য অধ্যুষিত এই এলাকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য। কালক্রমে পাঁচভাই দেবত্বে রূপান্তরিত হন গ্রামবাসীদের দ্বারা। কিম্বদন্তী, দেবতা হিসেবে পূজিত হবার সময় পাঁচভাই রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে সেই সেকালের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। পুরোহিত ঠাকুর সকালবেলায় পূজা করতে এসে দেখতে পেতেন— পাঁচভাই রাস্তায় এখানে সেখানে ছিটকে পড়ে আছেন। মূর্তিগুলি আকৃতিতে ক্রমশ ছোট পাঁচখণ্ড পাথর। পুরোহিত ঠাকুর পাঁচভাইকে কুড়িয়ে আবার ঘরে এনে রাখতেন। একদিন পুরোহিত ঠাকুর দেখলেন রাত্রের লড়াইএ 'ঝড়ো রায়ের' ঘরও ভেঙে গেছে। সেই রাতেই পঞ্চভ্রাতার স্বপ্নাদেশ হল— তাঁরা নিজেদের ঘরে থাকবেন না, তাই পুনরায় গৃহনির্মাণের প্রয়োজন নেই। অবশেষে পুরোহিত মহাশয় পঞ্চভ্রাতাকে শিবঘরে এনে রাখেন। তারপর থেকে আর কোন অঘটন ঘটেনি। 'ঝড়ো রায়' এখন শিবঘরেই থাকেন, পূর্বে ঝোড়ে বাস করতেন, তাই 'ঝড়ো রায়' নাম।

কাঠের সিংহাসনে পাঁচটি প্রস্তর খণ্ড। রাঢ়ের আদি দেবতা ধর্মরাজের যেমন

কোন মূর্তি নেই, এও তাই। নিত্যপূজা হয়। ঠাকুরের সম্পত্তি, পুকুর গোপালবেড়ার পুরোহিতদের নামে দান করা ছিল, পুরোহিতরা তার থেকেই নিত্যপূজার খরচ যোগান। অনেকের বাত-বেদনা ও দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করেন ঝড়ো রায়। ঝড়ো রায়ের যে পুকুর আছে সেখান থেকে মাছধরা হয়। গ্রামের সব বাড়ি থেকে আসে চাল, আলু, তেল। ভোগের সামগ্রী মাছ, ভাত, তরকারী এইভাবেই প্রস্তুত হয়। শ্রাবণ মাসে ঠাকুরের ভোগ হয়— তপশীল, বর্ণহিন্দু সকলে একসঙ্গে বসে ভোগের অন্নগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ গণদেবতার অপর নাম মুইধাড়ার 'ঝড়ো রায়'।

রামচন্দ্রপুর ও পারহাটে ধর্মপূজা

ভাতাড় ব্লকের রামচন্দ্রপুর ও পারহাটে রাঢ়ের আদি দেবতা ধর্মরাজের পূজা হয় খুব ধূমধামে। রামচন্দ্রপুরে বৈশাখী পূর্ণিমায় এই পূজা হয়। একে স্থানীয় লোকেরা বলে, কটরা পূজা। ধর্মবাজের পূজায় পাঁঠা বলিদান হয় একসঙ্গে নটি—এটাই এর বিশেষত্ব।

পারহাট গ্রামেও ধর্মপূজা অনুরূপভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে কাটোয়া যাবার পথে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিত পারহাটে এই মন্দিরটি ধ্বংস করেছিলেন এবং বামুনাড়া মাঠে বর্গী সৈন্যদের শিবির স্থাপন করেছিলেন। এখানেও ধর্মরাজের গাজন উপলক্ষে মেলাও বসে দুদিনের। মেলাটি অবশ্য দেড়শ বছরের প্রাচীন।

এরুয়ারের কালী ও মদনগোপাল জিউ

ভাতাড় ব্লকের বর্ধিষ্ণু গ্রাম এরুয়ার। এরুয়াবের গ্রামদেবতা হলেন কালী ও মদনগোপাল জিউ। কার্ত্তিক মাসে নয়, প্রতি বছর শ্রাবণ মাসের অমাবস্যায় কালীমাতার সাড়ম্বরে পূজা হয়।

কিম্বদন্তী, প্রায় পাঁচশ বছর আগে এরুয়ারে এসেছিলেন এক 'সন্ন্যাসী গোঁসাই'। তিনি লোকালয় থেকে দূরে একটি কুঁড়েঘর বানিয়ে প্রায় একফুট উঁচু দুটি ধাতুর কালী ও মদনগোপাল জিউ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুদিন পর গোঁসাই ঠাকুর দেহ রাখলে তাঁর সমাধির উপর মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। ভক্তগণ কুঁড়েঘরের পরিবর্তে একটি সুন্দর মন্দির তৈরী করে দিয়েছেন। তাতে কালী ও মদন গোপালের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দুই দেবতার নিত্যপূজা হয়। শারদীয়া নবমী তিথি ও কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়। গোঁসাই ঠাকুরের দেহান্তর ঘটে শ্রাবণী অমাবস্যায়। তাই ঐদিনই বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়। এই উপলক্ষে মেলা বসে, চলে সপ্তাহ কাল ধরে। গোঁসাই ঠাকুর একদিকে কালী সাধক ও অন্যদিকে মদনগোপাল অর্থাৎ বিষ্ণুসাধক ছিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবের এই সম্মিলন এক আশ্চর্য নজির।

বড়শুলের রসুল পীর

বর্দ্ধমান শহর থেকে ১৯ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্ব্বে জি, টি, রোডের সন্নিকটে বড়শুল একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ গ্রাম। মধ্যযুগের গাঙ্গুর নদী এখন ক্ষীণকায়া, গ্রামের পাশ দিয়ে আজও অতীতের সাক্ষীর মতই বহমান। এই নদীতেই বহে গিয়েছিল বেহুলা-লখিন্দরের ভেলা। মধ্যযুগের পর মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রামে ইসলামীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। তারই নিদর্শন এই গ্রামের বিখ্যাত পীর বাবা। বড়শুল বাস ষ্ট্যাণ্ডের উত্তরে সুবিশাল এই পীরবাবার আস্তানাকে ঘিরে ঘুরে বেড়ায় কিম্বদন্তী।

প্রায় চারশ বছর আগে এই গ্রামে এসেছিলেন এক বড়সড় পয়গম্বর-বড়রসুল। পীরের অপর নাম রসুল। জাতি ধর্ম্মনির্বিশেষে সবাই পীর-পয়গম্বরের কাছে ধর্ম্মোপদেশ শুনতে আসতেন। বাবার দেহান্ত হলে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়। এখন যেখানে পীরের আস্তানা দেখলে মনে হবে, এটা কোন ভগ্নস্তূপের উপর অবস্থিত। খনন করলে কোন প্রাচীন ইতিহাস পুরাকীর্তির মধ্যে জেগে উঠতে পারে। এখন সন্ধ্যায় সবাই পীরবাবার স্থানে গিয়ে ধূপ, ধূনা ও শীর্ণি উৎসর্গ করেন। বড় রসুলের নাম থেকেই কি বড়শুল নাম? অনেকে বলেন তাই।

সুয়াতার বহমান পীর

আউশগ্রাম ২নং ব্লকের একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম সুয়াতা। এই গ্রামের বহমান সাহেব পীর জেলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীর। এক ডাকে সবাই এই পীরকে চিনতে পারেন। মেহালা দীঘির পশ্চিমদিকে বহমান বা বম্মান সাহেব পীরের সমাধি। পীরসাহেবের আসল নাম ছিল সৈয়দ মেহমুদ বাহমণি। সম্ভবতঃ বাহমণি রাজ্যের রাজপুরুষ। ধর্মচর্চা করতে করতে বাঙলা মুলুকে এসে এই গোপভূমিতেই বসবাস করেন। কিম্বদন্তী, মেহালা দীঘির অপর দিকে ছিল গোপরাজাদের দেবী শিবাক্ষ্যার মন্দির। এই দেবীর পূজায় নাকি নরবলি প্রচলন ছিল। পয়গম্বর বাহমণি সাহেব দেবীর পূজায় নাকি নরবলির বন্ধ করেন। এতে গোপরাজারা ক্ষেপে যান ও একযোগে বাহমণি সাহেবকে আক্রমণও নিহত করেন। বাহমণির নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র গৌড়ের সুলতান সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করেন গোপরাজাদের বেয়াদপির শাস্তি দিতে। সুলতানী সৈন্যের আগমনের খবর পেয়ে শিবাক্ষ্যার মন্দির থেকে দেবীকে সরিয়ে নেন গোপরাজা। মূর্তিকে অমরারগড়ে নিয়ে যাবার সময় নাক ভেঙে যায়। এখনও অমরারগড়ে সেই নাকভাঙা দেবী মূর্তি রয়েছে।

বহমান পীরের সমাধি মন্দিরটি আজ জীর্ণ কিন্তু প্রাচীন। মসজিদের প্রবেশ দ্বারে পাথরের গায়ে খোদাই করা কোরাণ শরিফের আয়াৎ। বাংলায় খোদাই করা

আছে, 'আবুল মজঃফর আলাউদ্দীন' সন '৯১৬ হিজরি'। অর্থাৎ হিজরি দশম শতকে গৌড়ের সুলতান ছিলেন সৈয়দ আলাউদ্দীন শাহ। তিনিই বাহমণির মৃত্যুর পর এই মসজিদ দশম শতাব্দী হিজরীতে তৈয়ার করান।

পৌষের সংক্রান্তি ও ১লা মাঘ শহীদ বাম্মান পীরের উরস উৎসব ও বড় মেলা বসে। সকাল সন্ধ্যায় বড় দামামা বাজিযে জানিয়ে দেওয়া হয় উৎসবের সূচনা ও সমাপ্তি। কাতারে কাতারে পূণ্যলোভী মানুষ আসেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে। পীরের পুকুরে স্নান করে দরগায় শীর্ণি ও হাজত দেন সকলে। কয়েকদিন ধরে মেলা চলে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক জমায়েত হয়। হুগলীর ফুরফুরা শরিফের পর বাম্মান পীরের জমাযেতই সবচাইতে বড়।

গন্তারের চণ্ডীকা

মেমারী ১নং ব্লকের মেমারী-মন্তেশ্বর রাস্তার ধারে 'গন্তার' একটি প্রাচীন ও জমকালো গ্রাম। এই গাঁয়েব গ্রামদেবতা হলেন দেবী চণ্ডীকা। স্থানীয় গ্রামবাসী দাবি করেন একান্নপীঠের একটি শাক্তপীঠ এই গন্তার। এখানে নাকি দেবীর কর্ণ পতিত হয়েছিল। 'কাণতার' থেকে অপভ্রংশিত হয়ে কান্তার>গন্তার হয়েছে। দেবী চণ্ডীকার মন্দির আছে খুবই সুন্দর, দেখে মনে হয় প্রাচীন। মন্দিরের গায়ে রয়েছে অপূর্ব পোড়ামাটির কাজ, মূর্তি পাথরের দেবীমূর্তি।

প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সীতানবমী তিথিতে চণ্ডীপূজা হয় খুব জাঁকজমকে। গ্রামের সমস্ত লোক পূজা নিয়ে আসেন। সারাদিনের এই পূজাকে কেন্দ্র করে চণ্ডীতলায় মেলা বসে। চলে এক সপ্তাহ ধরে। গন্তারের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে চার-পাঁচ হাজার লোক জমায়েত হয় এই মেলায়।

অমরারগড়ের শিবাক্ষ্যা দেবী

আউসগ্রাম ২নং ব্লকের অধীন অমরারগড় একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ গঞ্জ। গোপরাজাদের রাজধানী ছিল এই অমরারড়। সে খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর কথা। গোপরাজাদের উল্লেখযোগ্য রাজা মহেন্দ্রনাথ এই সময় গোপভূমে রাজত্ব করতেন।

এখানে একটি গড় বা দুর্গ ছিল। অমরারগড়ের চতুর্দিকে এখনও দুর্গের প্রাচীর ও তার ভগ্নাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। মাটির গাঁথনিতে পাথর ও সরু ইঁটের তৈরী দেওয়াল রয়েছে গড়ের চতুর্দিকে। গড়ের আয়তন এক বর্গমাইলের মত। এই রাজাদের আরাধ্য দেবী হলেন শিবাক্ষ্যা, নাক ভাঙা অবস্থায় এখনও মন্দিরে অধিষ্ঠিতা।

মন্দিরটি নির্মাণ করেন দশম শতাব্দীতে রাজা ভল্লুপদ। তাঁর নামেই এই রাজ্যের রাজধানীর নাম হয় ভাল্লী এবং এই শব্দটি অপ্রভ্রংশিত হয়েছে ভালকী। এখনও

অমরারগড়ের পাশে ভাল্কীগ্রাম সেই প্রচীন স্মৃতি বুকে নিয়ে রয়েছে। ভল্লপদের নামের উৎপত্তি সর্ম্পকেও একটি উপকথা চালু আছে। অমরাবতী নগরীতে (অমরার গড়) এক পূর্ণগর্ভা সদগোপ মহিলা এক বন্য ভালুক দ্বারা আক্রান্ত হন। ভালুক মহিলাকে না মেরে,তাকে মুখে করে নিয়ে গভীর অরণ্যে চলে যায়। সেখানে একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে মহিলা মারা যান। ভালুক নবজাত শিশুটিকে নিজের গর্তে রেখে দেয়। এক ব্রাহ্মণ একদিন ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় শিশুর কান্না শুনতে পায় এবং ভালুকের গর্ত থেকে শিশুকে নিয়ে যেয়ে মানুষ করেন। ভালুকের গর্ত থেকে শিশুকে পাওয়া গিয়েছিল বলে এই শিশুর নাম হয় ভল্লুপাদ-গোপরাজাদের পূর্বপুরুষ। ভল্লুপাদ এক সদগোপ কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর কুলদেবী হলেন শিবাক্ষ্যা। শোনা যায় শিবাক্ষ্যার মন্দিরে নরবলি হত, মেহালা দীঘির দক্ষিণপূর্ব কোণে ছিল সে মন্দির। বহমান পীর সাহেব এই নরবলি বন্ধ করতে চাইলে হিন্দু গোপদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ সুরু হয়। এই সংবাদ পেয়ে সুলতানী সৈন্যদল আসে। ফলে গোপরাজা দেবী শিবাক্ষ্যাকে সরিয়ে অমরারগড়ে নিয়ে যান। ভল্লুপদ এই মন্দিরটিকে নির্মাণ করে শিবাক্ষ্যার প্রতিষ্ঠা করেন। মেহালা মন্দির থেকে দেবীকে তুলে নিয়ে যাবার সময় মূর্তিটি পড়ে গিয়ে নাক ভেঙে যায়। এখনও সেই অবস্থায় দেবী পূজিতা হন।

শ্রীপাট পালসিটে বৈষ্ণব মেলা

প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে বর্তমান সদর মহকুমা পালসিট গ্রামের উত্তরদিক দিয়ে বল্লুকা নদী বইত। এই গ্রামের মদনগোপালকে কেন্দ্র করে পালসিট গ্রামে বৈষ্ণবদের মেলা ও ভক্তদের সমাগম হয়। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র জৈষ্ঠ শুক্লা প্রতিপদ হতে তৃতীয়া পর্যন্ত, মহোৎসব, মদনগোপালের পূজা ও বৈষ্ণব মেলায় বাউল ও লীলা কীর্তন গান হয়। বল্লুকা নদীর ক্ষীণ কায়া পালসিটের উত্তর দিকে এখনও অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না। প্রায় পাঁচশত বৎসর আগে এই গ্রামে এসেছিলেন শ্যামাদাস আচার্য দেব। ডঃ সুকুমার সেনের বাঙলা সাহিত্যর ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইনি রাঢ়দেশের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন।

"শ্যামাদাস আচার্য হল রাঢ়দেশ বাসী
রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সেই সব ক্ষুদ্রবাসি
শাস্ত্র পড়িয়াছেন করিয়া যতন
ভক্তি শাস্ত্র নাহি দেখে উদ্ধত তার মন।
যাঁহা তাঁহা ফিরেন বিচার করিতে
সর্বশাস্ত্র জিনে হারে ভক্তিতে"

[বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন]

শ্যামাদাস ছিলেন বৈষ্ণব কবিও। 'অদ্বৈতমঙ্গল' তাঁর রচনা। প্রথম জীবনে শ্যামাদাস কাশীতে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে 'চূড়ামণি' উপাধি লাভ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের পরাস্ত করতে করতে অবশেষে নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের অধিবাসী শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অদ্বৈতার্যের কাছে শ্রীকৃষ্ণ অর্চনা প্রণালী ও শ্রীমদ্ ভাগবত শিক্ষা শেষ করে দেশে ফিরে আসেন শ্যামাদাস। অদ্বৈতপ্রভু তাঁকে ভাগবতার্য উপাধি দিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অদ্বৈত শাখার মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। শ্যামাদাসকে ভক্তিশাস্ত্রে পরাভূত করেছিলেন বলেই তাঁর নাম অদ্বৈতাচার্য হয়, আগের নাম ছিল কমলাক্ষ।

জৌগ্রামের জলেশ্বরনাথ

বৰ্দ্ধমান হাওড়া কর্ডলাইনের ষ্টেশন জৌগ্রাম। সেখান থেকে পাকা সড়ক ধরে মাইল দেড়েক উত্তর দিকে গেলেই গ্রামের দক্ষিণে প্রবেশ মুখে বিশাল প্রাচীন স্তূপের উপর গ্রামদেবতা জলেশ্বরনাথের মন্দির। শিখরাকৃতি প্রবেশ দ্বার এবং চূড়া সুউচ্চ। জৈন আমলের এই মন্দিরটি একহাজার বছর আগেরকার। কালে কালে বার বার নির্মান ও পুনর্নির্মাণের ফলে ইটের পরিমাপ ৩' থেকে ৩" আয়তনে দাঁড়িয়েছে। জলেশ্বরনাথের মন্দিরের পূর্বদিকে দেবকুণ্ড, উত্তরদিকে সাঁওতা দীঘি, দক্ষিণে বেলে নদী বর্তমান নাম কংস। হিরণ্যগ্রামে দামোদর নদের পুরাতন খাত থেকে নির্গত। বর্তমান কংস নদী স্রোতহীন, তীরে শ্মশান। পাশেই বর্তমানের ইডেন ক্যানেল। দেবকুণ্ড পুকুরটি 'বেলে সোঁতার' উপর খনন করা হয়েছে বলা হয়। কংস নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডিকা-দেবীর' অভয় দেউল প্রসঙ্গে। প্রবাদ, প্রাচীনকালে জলেশ্বরনাথের লিঙ্গমূর্তি ভূপ্রোথিত ছিল অরণ্যে। কামধেনু এসে নিয়মিত ঐ বনে জলেশ্বরনাথের মাথায় দুধ ঢালত। তারপর গোপগণ ঐস্থানে জলেশ্বরনাথের পূজার ব্যবস্থা করেন। গোপ অর্থাৎ গোয়ালাগণের দেবপ্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার এটি হল সাধারণ সূত্র।

মন্দির সংলগ্ন এলাকায় প্রস্তর নির্মিত একটি কূপ আছে। প্রায় নব্বই ফুট খনন করার পর জল পাওয়া যায়। কোলসরা গ্রামটি ছিল বালিয়া নদীর চড়ার উপর অবস্থিত। সেকালের বালিয়া নদী একালের কংসনদী বলে স্থানীয় অধিবাসীগণ অনুমান করেন। ঐ দেবকুণ্ডে একদা অনেকগুলি জিনমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল। দেবকুণ্ড ব্যতীত এখানে সাঁওতা, কামদীঘি, নূতনপুকুর ও বেণেপুকুর আছে। পূর্ব্বে মন্দির এলাকা শ্মশানভূমি ও অরণ্য ছিল। এই শ্মশানে থাকতেন জনৈক 'নেংটা গোঁসাই'। ইনি জৈনতীর্থঙ্কর ছাড়া আর কেউ নন। সম্ভবতঃ চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর এখানে এসেছিলেন এবং সেদিনের খজুকুলা নদীর তীরে কৈবল্যলাভ করেছিলেন। জৌগ্রামে

প্রচুর শিবমন্দির, কালীমন্দির ও বহু দেবদেবীর মন্দির ছড়িয়ে রয়েছে। গ্রামের লোকেরা বলেন, এই গ্রামের নাম ছিল, 'যোগগ্রাম'। বহুযোগী, সাধক ও সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল। তাঁরা যোগ সাধনা করতেন। 'নেংটা গোঁসাই' যোগ সাধনার জন্যই এসেছিলেন। স্তূপ খনন করলে খ্রীষ্টপূর্ব ছশত অব্দের ইতিহাস জেগে উঠতে পারে।

জলেশ্বরনাথের নিত্যপূজা হয়, সন্ধ্যায় আরতি হয়। ফাল্গুনের শিবরাত্রি তিথিতে বিশেষ পূজা হয়। নীলপূজায় উৎসব হয়। শিব লিঙ্গটি স্বয়ম্ভু। এর পরিধি নিচের দিকে ক্রমশ বেড়ে গেছে। মন্দিরের প্রবেশপথ পর্বতের শিখরাকৃতি দেখে মনে হয় পুরাতন মন্দিরের স্তূপের উপর জৈনরা বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেছেন। মূল মন্দিরের পিছনদিকে অর্ধপ্রোথিত একটি মন্দিরের ভূগর্ভস্থ মেঝেতে তান্ত্রিক সাধনার পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। মন্দিরেব দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী মাতা। মন্দির গহ্বরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে আর একটি প্রবেশ পথ ছিল। এই ভূগর্ভের সুড়ঙ্গ দিয়ে মূল মন্দির ও মঠের ধ্বংসাবশেষের দিকে যাওয়া যেত। কিন্তু দুর্ঘটনার জন্য তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জলেশ্বরনাথের লিঙ্গ মূর্তিটি শিখরাকৃতি। নিম্নদেশে বিশাল আয়তনের 'গৌরীপট'। জলেশ্বরনাথ হলেন জৃম্ভক অসুর, জলের দেবতা। জৃম্ভক বা বর্তমানের জৌগ্রাম প্রাচীনকালের কিরাত, ডোম ও বোড়ো গোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল ছিল। প্রাচীনতর বাসিন্দা অস্ট্রিক-কোল-ভীলদের হটিয়ে দিয়ে এরা বসতি স্থাপন করেছিল। এই বোড়ো গোষ্ঠিরই দেবতা হলেন জংভয় বা জৃম্ভক অসুর। আধুনিককালের আর্য ও বৈদিক গোষ্ঠীর জলেশ্বরনাথ-শিবঠাকুর। ধনরত্ন সংগ্রহকারী দেবতা। বর্তমানে একাশিরা বা অণ্ডকোষ বৃদ্ধির আরোগ্যকারী দেবতা।

শিবরাত্রি ও নীলপূজায় মেলা বসে। বহু দূরদূরান্ত থেকে লোকজন আসেন। জলেশ্বরনাথ সে সময় জাগ্রত হয়ে ওঠেন। বহু দোকান, পসারি, নাগরদোলা, পুতুলনাচের আসর বসে।

মণ্ডল গ্রামের জগৎগৌরী

মেমারী থেকে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত মণ্ডল গ্রামের গ্রামদেবতা হলেন মনসাদেবী জগৎগৌরী। আষাঢ় মাসে দশহরার পর প্রথম পঞ্চমী তিথিতে এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগৎগৌরীর পূজা ও এই উপলক্ষে বিরাট মেলা হয়। দেবীর মূর্তি পাথরের, চতুর্ভুজা মা মনসার মূর্তি। এই দেবীমূর্তি যে কতদিনের তা কেউ বলতে পারে না। তবে প্রবাদ আছে যে, দেবী নরপাল রাজার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় নরপাল রাজা এই দেবীকে গ্রামের দক্ষিণপার্শ্বে 'বিশেপুকুর' নামে এক পুষ্করিণীতে লুকিয়ে রাখেন। বেশ কিছুদিন পর এক কৈবর্ত ঐ পুষ্করিণীতে জাল ফেলবার সময় পুষ্করিণী হতে ঐ মূর্তি উদ্ধার করেন এবং নিকটেই এক বৃক্ষতলে

রেখে যান। সেই রাত্রেই দেবী গ্রামের কয়েকজনকে স্বপ্নাদেশ দেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে কয়েকজন গ্রামবাসী দেবীকে গাছতলা থেকে নিয়ে গ্রামের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন।

ভল্লুকা, কুনুর, খড়ি ও বেহুলা নদীর তীরে তীরে ছোটবড় বহুগ্রামে মনসাপূজার চল দেখে মনে হয়, এইসব অঞ্চলে সাপের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে এবং তাদের তুষ্ট করতে 'মনসাপূজার' আয়োজন করা হয়। মূর্তিগুলি বেশির ভাগই পাষাণ নির্মিত চতুর্ভুজা। মেলা উপলক্ষে 'ঝাপান' উৎসব এর প্রধান অঙ্গ।

শ্রীশ্রীবাবা বর্দ্ধমানেশ্বর

সন ১৩৭৯ সালের ২৫শে শ্রাবণ, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। বর্দ্ধমানের প্রাচীন পল্লী বাঁকা নদী ও দামোদরের মধ্যবর্তী আলমগঞ্জ মহল্লায় কতিপয় শ্রমিক ডাঙ্গাজমিকে চাযযোগ্য কবার খননকার্য করছিলেন। হঠাৎ কুলিদের কোদালে পাথবেব আওয়াজ শুনে সকলেই কাজ বন্ধ কবে, সেই জায়গাটি খোঁড়া সুরু কবলেন।



বর্দ্ধমানেশ্বর

দেখা গেল মাটির তলায় রয়েছে বিরাট এক কালো পাথরের চাঙ। জমির মালিক চারুচন্দ্র দে। তাঁর পুত্রদের সংবাদ দেওয়া হল। জ্যেষ্ঠ পুত্র অনাথশরণ দে তখন কলকাতার নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য রয়েছেন। অন্যপুত্র ঘটনাস্থলে এলেন পাথরটি দেখতে। আরও বেশি মজুর লাগিয়ে পাথরের চতুর্দিকে খনন করা হল। চারপাশে

খনন করে মাটি সরাতে দেখা গেল এক বৃহৎ শিবলিঙ্গ কাৎ হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত স্থানটি পুকুরের মত খনন করে দেখা গেল, একটি বৃহদাকার শিবলিঙ্গ গৌরীপট সহ মাটির ভিতর চাপা ছিল।

এই ঘটনা বিদ্যুৎ প্রবাহের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে, দলে দলে লোকজন আসে এবং স্থানটি মেলাতলা হয়ে যায়। বহু চেষ্টা করেও শিবলিঙ্গটি সোজা করা গেল না। তখন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ক্রেন নিয়ে এসে এই বিরাট শিবলিঙ্গটি বর্তমান স্থানে বসানো হল। এর ওজন সাড়ে বারো টন (৩৫০ মন)। তলা থেকে মাথা পর্যন্ত মূর্তিটি (লিঙ্গটি)র উচ্চতা পাঁচফুট ন ইঞ্চি। গৌরীপটের বেড় আঠারো ফুট। কালোপাথরের তৈরী এতবড় শিবলিঙ্গ ভারতবর্ষের কোথাও দেখা যায় না। মূর্তির নামকরণ হল: শ্রীশ্রীবাবা বর্দ্ধমানেশ্বর।

ঐতিহাসিকদের বিচারে এই শিবলিঙ্গ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত। খুব সম্ভবতঃ দামোদর নদের তীরে নির্মল ঝিলের কাছাকাছি কোন স্থানে এটি স্থাপিত ছিল, নদীর স্রোতে মন্দির বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং স্রোতের টানে শিবলিঙ্গটি ভেসে এসেছে। কারণ যেখানে এই লিঙ্গটি পাওয়া গেছে সেখানে কোন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নেই। ঐ স্থানটিকে আরও খনন করা হয়েছে, সে সময় একটি ছোট কালো পাথরের বিষ্ণুমূর্তি ও লক্ষ্মীমূর্তি ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় নাই। এখন ঐ স্থানটি পুস্করিণীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শ্মশান ঘাটের দু দিকে দুটি পাথরের বিরাট ষাড় পাওয়া গেছে। শ্মশানঘাটে ও লাকুড্ডিতে ঐ দুটি ষাঁড় রয়েছে। শিবচতুর্দশী থেকে মেলা ও ভক্তদের সমাগমে বাবার স্থানটি জমজমাট হয়। বর্দ্ধমানের বাইরে থেকে জৈন্যরা আসেন দলে দলে, অবশ্য অন্যান্য সব হিন্দুরাও আসেন। শিবরাত্রিতে এবং ২৫শে শ্রাবণ সারারাত মেয়েরা জল ঢালেন বাবার মাথায়। দে-মহাশয়রা স্থানটিতে একটি টিনের চালা করে দিয়েছেন। বাবার মাথায় কেবল ছাউনী। চতুর্দিক ফাঁকা। এতবড় শিব দাঁড়িয়ে দেখবার।

কালনা মহকুমা বাঘনাপাড়ার গোপীশ্বর

বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় বাঁঘনাপাড়ার জাগ্রত দেবতা হলেন, 'গোপীশ্বর'। 'বলরাম-কৃষ্ণ' মন্দিরের পাশেই বিরাজিত। গোপীশ্বর মূলত শিব, কিন্তু প্রত্নতত্ত্বের এক অমূল্য সম্পদ। মন্দির বিশেষজ্ঞ David Mecutchion এর মতে মন্দিরের নির্মাণকাল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। মন্দিরের বিগ্রহ কিন্তু আরও পাঁচশত বছরের প্রাচীন। গোস্বামী প্রধান বৈষ্ণব শ্রীপাটে 'গোপীশ্বর' শিব পূজিত হচ্ছেন—এ এক আশ্চর্য সহাবস্থান। এই শিব এখানে 'সদাশিব' রূপে বিরাজিত। সদাশিবের অবতার হলেন অদ্বৈত আচার্য। একাধারে শিব, অন্যাধারে তিনি বিষ্ণু অর্থাৎ গোপীশ্বর।

এই গোপীশ্বর নামকরণ হয়েছে বৃন্দাবনের 'গোপীশ্বরের' আদলে। একদিকে বৈষ্ণব অন্যদিকে শৈব। এই দুই মিলনে বাঘনাপাড়ার 'গোপীশ্বর শিব'। বৃন্দাবনের 'গোপীশ্বর' শিবকে গোপীবেশ ধারণ করিয়ে রাখা হয়, শাড়ি ও ওড়না দিয়ে লিঙ্গকে সাজিয়ে রাখা হয়। বাঘনাপাড়ার গোপীশ্বর কিন্তু এই পরিচ্ছদ ধারণ করেন না। কোন স্ত্রীবেশ তাঁর নেই। মূর্তিটি বিচিত্র। মূর্তির 'রুদ্রভাগ' বা পূজাভাগে Relief পদ্ধতিতে একটি দশভুজা.মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। ঐ মূর্তিটিকে দশভুজা মনে করে সারা বৎসর তেলসিন্দুর তুলে ফেলা হয় ও মহাদেব হিসাবে লিঙ্গের পূজা হয়। মূর্তিটির উচ্চতা ছয় ফিট এবং কালো কষ্টি পাথরের। মূর্তিটির তিনটি খণ্ড— পীঠভাগ, গৌরীপট্ট এবং রুদ্রভাগ, প্রত্যেকটি আলাদা করা যায়। অগ্রভাগে অঙ্কিত দশভুজা 'বদ্ধ-পদ্মাসন' ভঙ্গীতে আসীন, হস্তে দশ প্রহরণ। বিভিন্নস্থানে প্রজ্ঞাপারমিতা, ভ্রূকুটি, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন দেবীমূর্তির 'বদ্ধ পদ্মাসন' দেখা যায় না—বিশেষতঃ গৌরী বা দুর্গামূর্তির। এই মূর্তির মুখ আঁকা আছে। অর্থাৎ 'গোপীশ্বর' এই শিবের লিঙ্গে দশভূজা এবং পুরুষ মূর্তি মহাদেবের বলে ধরে নেওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, এই 'গোপীশ্বর' সেনরাজাগণের কুলদেবতা ছিলেন। প্রথমে ছিলেন শৈব ও পরে সেনরাজাগণ বৈষ্ণব হয়েছিলেন। তাহলে বাঘনাপাড়ার ইতিহাস হাজার বছরের পুরাতন বলে ধরা যায়।

গোপীশ্বর বেশ জাগ্রত দেবতা। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজনের সঙ্গে গোপীশ্বরেরও গাজন ও মেলা হয়। গাজন উপলক্ষে বর্দ্ধমান জেলায় নানা প্রান্ত থেকে সন্ন্যাসীরা বাঘনাপাড়ায় আসেন ও ব্রত-উপবাস পালন করে উত্তরীয় ধারণ করেন। বিভিন্ন প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন ও কষ্টসাধ্য উপাসনা— যেমন কাঁটা ঝাঁপ, আগুন ঝাঁপ ও কপালীবাণে এরা অংশ গ্রহণ করেন। চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচদিন পূর্ব্বে মূল মন্দির থেকে গোপীশ্বর বিগ্রহ কাছের গাজন মন্দিরে যাত্রা করেন এবং ১লা বৈশাখ নিজমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। শিবরাত্রির দিনও মেলা বসে। মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে শিবরাত্রি উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা ও উৎসব হয়। রাত্রে হয় শিবের সমারোহ পূজা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে Burdwan District Gazetteer গ্রন্থে J. C. K. Peterson লিখছেন, Bagnapara, a village in the Kalna sub-division containing a Shiva linga temple known as Gopeswar. The Vaisnabas visit thc temple in considerable numbers on the occasion of the shivaratri festival (Page-185).

'গোপীশ্বর' মন্দির চারচালারীতির ইষ্টক নির্মিত। মন্দিরটি গোস্বামীদের দ্বারা নির্মিত, পোড়ামাটির ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত। মন্দিরের উত্তরদিকে প্রবেশপথের উর্ধে টেরাকোটার Rosette অলংকরণ আছে। প্রবেশ দ্বারটি cusped বা কয়েকটি ত্রিপত্রাকৃতি খিলানযুক্ত। মূল মন্দির সংলগ্ন নাট্যমন্দিরটি সাধারণ ছাদবিশিষ্ট। সামনেই কষ্টি পাথরের একটি নন্দীবৃষ আছে। মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

জামালপুরের বুড়োরাজ

হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল হয়ে কাটোয়া লাইন। কালনা ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী ষ্টেশন কালনা মহকুমার পাটুলী। এখান থেকে পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে যেতে হয় জামালপুর। গঙ্গাস্নান সেরে সবাই আসেন জামালপুরের জাগ্রত দেবতা বাবা বুড়োরাজের থানে। চারদিক 'জার্ম্মানী' লতাগুল্ম ও বেতবনে ঘেরা পুরাতন ও ছোট্ট একটি গ্রাম জামালপুর। আদিবাসিন্দা কেউ নেই। স্থায়ী বাসিন্দা হলেন, এই 'বাবা বুড়োরাজ' আর আছে পুরুষানুক্রমের পূজারীরা। বাবার ঘরটি খড়ের চাল, বর্ষার বৃষ্টির জল আটকায় না। পূজারীর ঘরটি মন্দের ভাল। পাকা দালান। বাবার প্রাঙ্গণে দু-চারটি মুড়ি, মুড়কি ও বাতাসার দোকান। দু-চার ঘর বাসিন্দা। বাকী জঙ্গলে ভর্তি। দিন দুপুরেই শিয়াল ডাকে, বাইরে থেকে যাত্রী গেলে ভয় ছম্ ছম্ হৃদয়ে বাবার পূজা সেরে বেলাবেলি ফিরে আসেন পাটুলী ষ্টেশনে। কিন্তু এক নজরে বোঝা যাবে লোকালয় থেকে বহু দূরে গঙ্গার তীরে সাধনভজনের এক ছায়াসুনিবিড় তপস্যাভূমি। আগে ছিল চিতাবাঘ, ময়াল সাপ ও বন্যবরাহ। এদের দাপটে মানুষ ভয়ে এখানে আসত না।

প্রবাদ, বহুপূর্বে পার্শ্ববর্তী নিমদহের খাল ছিল গঙ্গা। মা গঙ্গা এখান দিয়ে বইত, এখন চলে গেছে বহুদূরে। কিন্তু আদি গঙ্গা নামটা রয়ে গেছে। এই গঙ্গার তীরে বাস করত মা ও মেয়ে। মেয়েটা ছিল অপূর্ব সুন্দরী। এমন রূপ যেন মনে হত সাক্ষাৎ 'মা দুর্গা'। কিন্তু গরীব ঘর। তাই গরীব ঘরে বিয়েও হল এবং দু চারদিন পর মেয়েটি বিধবা হল। বুড়িমায়ের কাছে এসে কাঁদত মেয়েটা, লোকে যা তা বলে, টিটকারী দেয়। একদিন গোবর কুড়োতে এই বাবার থানে এল। সেদিন রাতে ঘরে ফেরেনি। পরদিন বাড়ি ফিরতেই সমাজ ঐ মেয়েকে 'পতিতা' বলে ঘোষণা করল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এই জামালপুরের দিকে ছুটছে, পিছনে বদমাস, শয়তান ও লম্পট ছেলেরা। এই জামালপুরে আসতেই এক বিশাল দেহী ত্রিশূল হাতে জটাধারী সন্ন্যাসী হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। সন্ন্যাসীর গলায় ঝুলছে মস্ত একটা সাপ। দস্যুগুলো ভয়ে পালাল। সন্ন্যাসী বললেন, আমিই এলাম ধর্মরাজ, সতীর ইজ্জত বাঁচাতে। জামালপুরে হবে আমার অধিষ্ঠান। বৈশাখী পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হয়ে আমার মাথায় ঢেলে দিবি জল। হয়ত এ উপকথা, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। গবেষণার মাল মশলা সংগ্রহের জন্য পণ্ডিত প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ গাঁয়ে এসেছিলেন।

পার্শ্ববর্তী নিমদহের গোপবালকগণ এই বনাঞ্চলটি পশুদের গোচারণ ভূমি হিসেবে ব্যবহার করত। এই গ্রামের আদি বাসিন্দা ছিলেন পণ্ডিত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সারাদিন পূজা, জপ, তপ নিয়েই সময় কাটান। নিমদহ গ্রামের যদু ঘোষের

শ্যামলী নামের একটি গাই এই বনভূমিতে গোচরণের সময় বাবাকে সবার অজান্তে দুধ পান করাত। মধুসূদন স্বপ্নাদেশ পেলেন, তার পর দিন জামালপুরের জঙ্গলে অনুসন্ধান করে পেলেন বাবা বুড়োরাজকে। আতপচাল আর সেই শ্যামলীর দুধ দিয়ে নিবেদন করলেন নৈবেদ্য। গ্রামের বাগ্দীদের সাহায্যে জঙ্গলের মধ্যে গড়ে তুললেন কুটির-বাবার আস্তানা। নিমদহের জমিদার চারুচন্দ্র সাহা চৌধুরী কুঁড়ে ঘরের সম্মুখে যাত্রীদের জন্য একটি নাটমন্দির তৈরী করে দিয়েছেন।

জামালপুরের বুড়োরাজ গ্রামদেবতা, খুবই জাগ্রত। মূর্তিটি পাথরের লিঙ্গ এবং তার মাথায় বিরাট একটি সাপ ফণা তুলে দণ্ডায়মান। পাশেই ত্রিশূল। শিবের পূজার মত যাবতীয় অনুষ্ঠানও হয় আবার আদ্যাশক্তির পূজা এবং পাঁঠাবলিও হয়, মহাশক্তির নামে বলিদান হয়। নিত্যপূজা হয়– আতপচাল, ফলমূল, মিষ্টান্ন ও দুধ দিয়ে। সন্ধ্যায় আরতি হয় কেবল দুধ দিয়ে। বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায় বাবার উত্থানের দিন থেকে পূজা ও গাজন সুরু হয়। এই সময় হাজার হাজার সন্ন্যাসী, ভক্ত ও যাত্রীগণ আসেন। শত শত মানতকারী ভক্ত পাঁঠা মানসিক করেন ও সেই পাঁঠা বলিদান দেওয়া হয়। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের শেষ বংশধর হারাণ চট্টোপাধ্যায়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর কন্যার বিবাহ হয়েছিল ধর্মদহে বন্দ্যোপাধ্যায়দের বাড়িতে। ঐ দৌহিত্র বংশের গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সাধক। তিনি বাবার আরতি করতে করতে সমাহিত হয়ে পড়তেন। সেই বন্দ্যোপাধ্যায়গণই আজ বাবার সেবাইত। সেই বংশের বর্তমান সেবাইত ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভক্তগণ পাঁঠা মানসিক করে বাবার মন্দিরে পাঁঠা বেঁধে দেন। কিন্তু প্রসাদ প্রার্থী ভক্তগণের জন্য আদ্যাশক্তির নামে তা উৎসর্গীকৃত ও বলি প্রদত্ত হয়। জীবন বিনিময়ে জীবন ধারণ, এই হচ্ছে সৃষ্টির মূলকথা।

যেসব সন্ন্যাসী বাবার গাজনে উত্তরীয় ধারণ করেন, তাঁরা সাতদিনের জন্য নিজ গোত্র পরিত্যাগ করে শিবগোত্র ধারণ করেন। তাঁদের সে সময় কোন জাতি বা ধর্ম থাকে না। গাজনের সাতদিন ধরে এখানে মেলা বসে, কদিনের জন্য নির্জন গ্রাম হয়ে ওঠে গঞ্জ। দোকান-পসারির সারি। দাঁইহাটের পিতল কাঁসারী, গঙ্গার তীরের কুমোর, কামার, কাপড়ের দোকানী, তাঁতি সব দোকান বসায় জাঁকিয়ে। ময়রার ভিয়েনের ও তেলেভাজার গন্ধে মাতিয়ে তোলে মেলার লোকদের। জামা সেলাই এর কল থেকে ছুচ-সুতা, ঘুড়ি ও ছেলেদের হরেকরকম খেলনার দোকান সঙ্গে হাটবাজারের পসারি-দেখে মনে হয় সত্যই বাবা বুড়োরাজ জাগ্রত।

নারিকেলডাঙ্গার জগৎগৌরী

কালনা মহকুমার একটি প্রাচীন গ্রাম বৈদ্যপুর। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ক্ষেমানন্দ

কেতকাদাস মনসার ভাসানে মৃত স্বামী লখিন্দর সহ বেহুলার যাত্রাপথের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বৈদ্যপুরের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ বৈদ্যপুরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত বেহুলা নদীর ক্ষীণ স্রোত এখনও তার সাক্ষী। বৈদ্যপুরের জনৈক বৈদ্য বেহুলাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর অবস্থানরূপে বৈদ্যপুরের উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কন। বৈদ্যপুরের পশ্চিমে নারিকেল ডাঙ্গা, পূর্বে পাতিল পাড়া এবং উত্তরে মীরহাট। এই সমস্ত অঞ্চল মিলে ছিল বৈদ্যপুর রাজ্য। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন কিংকর মাধব সেন। সেনরাজগণ লক্ষ্মণ সেনের বংশধর কিনা তা জানা না গেলেও সেনরাজগণ বৈদ্যপুরে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কিংকর মাধব সেন সম্ভবতঃ সামন্ত রাজা ছিলেন। বৈদ্যদের বাস ছিল বলে সমগ্র রাজ্যের নাম হয় বৈদ্যপুর। বৈদ্যপুর থেকে প্রায় দুমাইল পূর্বে আছে 'সেনের ডাঙ্গা', পশ্চিমে আছে ষোলডাঙ্গা এবং দক্ষিণে গড়ের ডাঙ্গা। আর আছে— রাজডাঙ্গা। এই সবই বৈদ্যপুরের সেন রাজাদের স্মৃতিচিহ্ন।

এই রাজ্যেরই একটি অংশ নারিকেল ডাঙ্গা। এই গ্রামের ও অঞ্চলের গ্রামদেবতা হলেন জগৎগৌরী, রাজা কিংকর মাধবের গৃহদেবতা ছিলেন। কিম্বদন্তী বলে, কালাপাহাড় এই অঞ্চল আক্রমণ করে মন্দির বিধ্বস্ত করেন ও জগৎগৌরীকে বেহুলা নদীর জলে নিক্ষেপ করেন। পরবর্তীকালে কোন একসময় এক জেলের জালে নদীগর্ভ থেকে বিগ্রহ উঠে আসে। নারিকেল ডাঙ্গার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের লোক এক পূর্বপুরুষ জগৎগৌরীকে নিজগৃহে প্রতিষ্ঠা করেন। জগৎগৌরী মূর্তিটি কষ্টিপাথরে তৈরী সুন্দর ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে (দশহরার পরের পঞ্চমী) নারিকেল ডাঙ্গা গ্রামের উত্তরে মীরহাটের পশ্চিমে রামনগর ও হাসনাহালীর দক্ষিণে 'ঝাপানতলা' নামে প্রসিদ্ধ জায়গাতে 'জগৎগৌরীর' ঝাপান হয়। এই উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে।

কথিত আছে, ঝাপানতলা স্থানটি ছিল মহাশ্মশান এবং রাজা কিংকর মাধবের মশান বা বধ্যভূমি।

দেবীর সম্মুখে নরবলির প্রচলন ছিল। যে সব অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত তাদের দোষ ও অপরাধ স্খালনের জন্য দেবীর কাছে বলি দিয়ে বধ্যভূমির পাশে মৃতদেহ পুঁতে দেওয়া হত। পঞ্চাশ বৎসর আগে ঝাপানতলায় কূপ খননকালে নরদেহের কঙ্কাল ও চিতাভস্ম পাওয়া গেছে। [বৈদ্যপুরের বৈদ্যরাজা কিংকর মাধব সেন— ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য]

ঝাপানতলার পাশেই এখনও তেমোহনার শ্মশান বিদ্যমান। বেহুলা নদী, গাঙ্গুর নদী এবং ঐ দুই নদীর সংযোগরক্ষাকারী একটি শাখানদীর অস্তিত্ব আছে, সে স্থানের নাম হয়েছে— তেমোহানা।

জগৎগৌরী হলেন চতুর্ভুজা মনসা দেবী। বৰ্দ্ধমানের খড়ি, বাঁকা, ভালকো (ভল্লুকা), বেউলো (বেহুলা) প্রভৃতি নদীগুলির তীরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকা মনসা পূজার পীঠস্থান। যেমন কেজ্যা, মণ্ডল গ্রাম, হাসনাহাটি, নারিকেল ডাঙ্গা, ঝাপানডাঙ্গা প্রভৃতি। এই অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে মনসা বিভিন্ন নামে পূজিতা হন। নারিকেল ডাঙ্গার দেবী জগৎগৌরী নামে পূজিতা হচ্ছেন। এই উপলক্ষ্যে মনসার ঝাপান উৎসব হয়। এটি মনসা পূজার শ্রেষ্ঠতম গ্রাম উৎসব। প্রায় দু'শ বছর আগের একটি ঝাপান মেলার বর্ণনা আছে যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীতে। জৌগ্রামের কাছে এই মেলা বসত। এখন জায়গার নামই হয়ে গেছে– ঝাপানডাঙ্গা। [বৰ্দ্ধমানের ইতিহাস– ডঃ সুকুমার সেন]

উদয়পুরের বেহুলা

কালনা মহকুমার বৈদ্যপুরের পাশ দিয়ে বহে গেছে ক্ষীণস্রোতা বেহুলা নদী। মনসামঙ্গলের রোমাঞ্চকর বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। এই বেহুলা নদীর তীরে উদয়পুর গ্রাম, তার গ্রামদেবতা হলেন 'বেহুলাদেবী'। কথিত আছে প্রায় তিনশ বছর আগে এই গ্রামের এক মুসলমান পরিবারে দেবী সুন্দরী নারীর রূপ ধরে দেখা দেন। পরে পাষাণ হয়ে যান ও এক বাগ্দী পরিবারে স্বপ্নে দেখা দেন। নদীর তীরে এক বিরাট বটগাছের নীচ থেকে সেই পাষাণমূর্তি এনে বাগ্দীরা মা বেহুলার পূজা করেন।

সেজন্য লোকে মাকে বাগ্দীর ঠাকুর বলে। পাথরে খোদাই করা একটি নারীমুখ, তার দুপাশে আরও দুটি নারী মুখ্ল-একটি মনসা ও অন্যটি নেতা ধোপানী। কোন এক ভক্ত মায়ের চোখ দুটি সোনার পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। নিত্যপূজা-আরতি হয়। আষাঢ় মাসের হোরা পঞ্চমী তিথিতে বিশেষ পূজা ও ঝাঁপান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পূজা হয় সেই মুসলমান ফকিরের, যেখানে মা বেহুলা উদিতা হয়েছিলেন। তারপর মন্দিরে পূজা। মন্দিরটি গ্রামের মধ্যে, বয়স প্রায় তিনশ বছর। পূজার সময় মাকে সেই বেহুলা নদীর তীরে বটগাছের তলায় আদিস্থানে রাখা হয় ঝাপান পর্ব্বের সুরুতে। তারপর মন্দিরে আনা হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে দলে দলে লোকে পূজা দিতে আসে। আগে মহিষ, ভেড়া বলিদান দেওয়া হত, এখন শুধু ছাগ বলি হয়। রাতে দেবীকে নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা করা হয়। গ্রামের 'এয়ো' (সধবা) মেয়েরা শাঁখ বাজিয়ে দেবীকে আবাহন করেন। ঝাঁপান উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে। সাপখেলা, লেটো গান, তরজা, কবিগানের আসর বসে। এখানে উল্লেখ্য মনসা, নেতা ধোপানী থাকলেও লখিন্দরের নাম গন্ধ নেই-কেন কে জানে!

বৈদ্যপুরের রাজরাজেশ্বর ও বৃন্দাবনচন্দ্র

কালনা মহকুমার প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম বৈদ্যপুর বৈঁচি-কালনা রোডের ধারে

মহকুমা শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। রাজরাজেশ্বর ও বৃন্দাবন চন্দ্র বৈদ্যপুরের গ্রাম দেবতা। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামের এক তিলি ধনাঢ্য ব্যক্তি শিশুরাম নন্দীর স্ত্রী দ্রৌপদী দেবী এক সন্ন্যাসীর থেকে একটি শালগ্রাম শিলা লাভ করেন। সন্ন্যাসীর উক্তিমত এই শালগ্রাম শিলাই রাজ রাজেশ্বর হিসাবে পূজিত হতে থাকেন। ধীরে ধীরে এই পূজা নন্দী পরিবার ছাড়িয়ে গ্রামের সবার পূজায় পরিণত হয়।

এই বংশেরই মধুসূদন নন্দী ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন কষ্টিপাথরের ত্রিভঙ্গমুরারী, বংশীধারী এবং পিতলের নির্মিত শ্রীরাধার মূর্তি (কালো বোঝাতে কষ্টিপাথর ও গোরা রঙের জন্য পিতল), যার যুগল নাম হল বৃন্দাবনচন্দ্র। রাজরাজেশ্বর ও বৃন্দাবন চন্দ্রের যৌথ উৎসবে গ্রামের সবাই মেতে যান। সারা বছরে তিনটি উৎসবই প্রধান—রাস, পঞ্চমদোল আর রথ। রাসের জন্য রয়েছে দেড়শ বছরের পুরাতন মন্দির রাসমঞ্চ, মাথায় নটি চূড়া। কাঠের তৈরী গোলাকার রাসমঞ্চে রয়েছে আটজোড়া রাধাকৃষ্ণের মাটির মূর্তি, আর একটি মূর্তি বড়াই বুড়ির। রাস পূর্ণিমার দিন রাজরাজেশ্বর ও বৃন্দাবনচন্দ্র আরোহণ করেন রাসমঞ্চে। রাত্রে পূজা, আরতি হয়। প্রচুর লোকজন আসে রাসমেলায়, চলে তিন দিন।ভারী রাতে যাত্রা ও থিয়েটার হয়।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হয় দোল পূর্ণিমার পর পঞ্চম দিনে—বেলা হয় পঞ্চম দোল। একটি পুকুরপাড়ে অশত্থতলায় বেদী বানিয়ে তাতে এই দোল অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান কেবল গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

তৃতীয় অনুষ্ঠান হল রথযাত্রা—যা দেখতে বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসে প্রায় পাঁচ-সাত হাজার। আসেন বহু বৈষ্ণব ভক্ত ; আসেন নবদ্বীপ, কাটোয়া, বাঘনাপাড়া, পূর্ব্বস্থলী, পাটুলী থেকে। রথটি বেশ বড়, উচ্চতা ৩৮ ফুট। রথটি তৈরী হয় ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে (সন ১২০৪ সালে), কাঠের এই রথের বাইরে পটুয়াদের আঁকা অসংখ্য ছবি ও খোদাই করা সুন্দর কারুকার্য আছে। বিভিন্ন স্থানে কাঠের পুতুল বসানো। ২৬টি কাঠের চাকা ও সামনে দুটি বিরাট কাঠের ঘোড়া লাগানো। ওপরে নটি চূড়া—প্রত্যেকটিতে ধ্বজা উড়ছে। রাজরাজেশ্বর ও বৃন্দাবন চন্দ্রকে রথে চড়িয়ে রশি দিয়ে রথ টানা হয়। রথের দিন যেমন বিরাট রথের মেলা বসে তেমনি উল্টো রথের দিন ও হাজার হাজার লোক মেলা দেখতে আসেন। আগে বহু সন্ন্যাসীও রথ টানতে আসতেন, এখন তাদের দেখা যায় না।

কালনার মহিষমর্দিনী ও সিদ্ধেশ্বরী অম্বিকা

বর্দ্ধমান জেলার কালনা শহর বর্দ্ধমান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পূর্ব্বে গঙ্গার তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর। ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের একটি রেল ষ্টেশনও।

জামালপুরে আরে একটি কালনা থাকায় এই কালনাকে অম্বিকা-কালনা বলে। কালনার গ্রাম দেবতা হলেন মহিষমর্দিনী। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কালনার ঘাটে ভেসে আসে মহিষমর্দিনী মূর্তির কয়েকখানা ভাঙাচোরা কাঠ। অনেকের ধারণা, কৃষ্ণনগরের পালচৌধুরী পরিবারের গৃহদেবতা চঞ্চলা হয়ে কালনায় এসেছেন। কালনার ষ্টীমারঘাট থেকে ব্যবসায়ীদের মাল নামছে। জৈনক ব্যবসায়ী এই ভাঙা কাঠ ক-খানিকে ডাঙ্গায় তুলে রঙ-চঙ ধরিয়ে মূর্তি বানালেন। নাম দিলেন মহিষমর্দিনী। এখন এই দেবীই কালনার গ্রামদেবতা মহিষমর্দিনী।

আষাঢ় মাসের রথের পর শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি থেকে সুরু করে দশমী পর্যন্ত চারদিন দেবীর দুর্গার মত পূজা হয় খুব ধূমধামে। সমস্ত ব্যবসায়ী এর আয়োজক। তিনদিন অন্নসত্র হয়। ভোগ রান্না হয়—গরীব, দুঃখী, আর্ত ও ভক্তদের খাওয়ানো হয়। নবমীতে কমপক্ষে ১০৮টি পাঁঠা বলি হয়, কখনও কখনও মানত করা পাঁঠা নিয়ে তার বেশীও হয়। পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম-যজ্ঞ হয়। পূজার কয়দিন আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। স্থানটির নাম দেবীর নামে মহিষমর্দিনীতলা।

এই উপলক্ষ্যে সপ্তমী থেকে চারদিন বসে বিশাল মেলা। গঙ্গার ওপার থেকেও বহু লোকজন আসে। কালনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে জনসমুদ্র ভেঙে পড়ে এই মেলার প্রাঙ্গণে।

কালনা শহবেব আর একটি জাগ্রতা গ্রাম দেবতা হলেন সিদ্ধেশ্বরী অম্বিকা। যাঁর নামে শহবেব নাম অম্বিকা কালনা। সিদ্ধেশ্বরী চতুর্ভুজা কালীমূর্তি। খুব উঁচু বেদীতে বাংলার খড়ের ধাঁচে দোচালা মন্দির। তাকে ঘিরে রয়েছে কতকগুলি শিব মন্দির। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরটি প্রাচীন, আড়াইশ বছরের পুরাতন—তার গায়ে পোড়ামাটির কারুকার্য দেখলেই ধরা যায়। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৬৬১ শকাব্দে) এটি নির্মাণ করেন বৰ্দ্ধমানরাজ চিত্রসেন রায়। প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের স্তূপের উপর বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত। শোনা যায়, এই এলাকা ঘন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদিন মহারাজ চিত্রসেন রায় ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে জঙ্গলের মধ্যে ঘন্টাবাদ্য শুনে এখানে এসে দেখেন, কেউ কোথাও নেই কিন্তু কালীপূজার নৈবদ্য ও উপকরণ রয়েছে, দেবীও রয়েছেন একা ভাঙা মন্দিরের মধ্যে। মহারাজ এই স্থানেই নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। কার্ত্তিকমাসে শ্যামাপূজায় বিশেষ জাঁকজমকে দেবীর পূজা হয়। মানসিক পাঁঠা নিয়ে অনেক ছাগ বলি হয়। সব বাড়ি থেকে পূজা আসে। মেয়েরা উপবাস করেন অমাবস্যায়। হোমযাগ, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। দেবীর এই পল্লীর নাম হয় সিদ্ধেশ্বরী পাড়া।

গোপালদাসপুরের রাখালরাজা

কালনা মহকুমার বর্ধিষ্ণু গ্রাম বৈদ্যপুর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে

গোপালদাসপুর গ্রাম। এই গ্রামের গ্রামদেবতা হলেন রাখালরাজা। প্রবাদ, কাটোয়া মহকুমার খোট্রে গ্রামের এক বৈষ্ণব রামকাণু-গোস্বামী কোনে এক শূদ্র ব্যক্তিকে দীক্ষা দিলে, রামকানুর বড় ভাই তাকে খুব লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করেন। তাই মনের দুঃখে স্ত্রী ও ইষ্টদেবতা গোপীনাথকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন। পথে তাঁর বিঘ্ন ঘটায় তিনি গোপালদাসপুরেই বাস করতে থাকেন এবং গোপীনাথের পূজা-আর্চা করতে থাকেন। এই পথ দিয়ে একদিন যাচ্ছিলেন মুর্শিদাবাদের দেওয়ান। রামকাণু দেওয়ানকে প্রসাদ দিয়ে সমাদর করেন। এতে আনন্দিত হয়ে দেওয়ান গৌড়ের নবাবের কাছ থেকে রামকাণুর জন্য সাতশ বিঘের সমগ্র গোপালদাসপুর মৌজা নিষ্কর ও দেবোত্তর করে দান করেন। কয়েকদিন পর রামকাণুর শিশুপুত্রটি মারা যায়। তিনি তখন বিবাগী হয়ে পত্নীসহ বৃন্দাবন যাত্রা করেন। কিছুদূর গিয়েই স্বপ্নাদেশ পান যে গোপালদাসপুরই নববৃন্দাবনে পরিণত হবে, স্বয়ং রাধাকান্তদেব আবির্ভূত হবেন, এটাই হবে রামকাণুর বৃন্দাবন। আশ্চর্য, এই ঘটনার পরদিনই গাঙ্গুরে ভেসে এল একটি কাঠ, তাই খোদাই করে রাধাকান্তর বিগ্রহ হল—গোচারণরত কৃষ্ণ—ডানহাতে পাঁচন ও বাঁ হাতে কোন খাদ্য ধারণের ভঙ্গী। রাখাল রাজা। কিন্তু আশ্চর্য কোথাও শ্রীরাধার মূর্তি নাই। অনেকে বলেন এ হচ্ছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের সার। শ্রীকৃষ্ণ এক এবং আদি। জগতের ভক্তজন তাঁর শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধিকার স্ত্রীমূর্তি সবই কল্পনার।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাখালরাজার অঙ্গরাগ হয়। পরে হয় অভিষেক। জন্মাষ্টমীতেও উৎসব হয় অন্ন ভোগ। যে সব ভক্ত এখানে আসেন ও উৎসবে যোগ দেন তাদের সকলকে খাওয়ানো হয়। রাখালরাজা ১লা বৈশাখ যান গোষ্ঠযাত্রায় যার জন্য ঐদিন বিগ্রহকে বাইরে রাখা হয়। আর হয় দোলযাত্রা, ঐদিন বিগ্রহকে রাজবেশে সাজানো হয়। দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে মেলা বসে। দু'তিন হাজার ভক্তের উপস্থিতিতে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে। রামকাণু গোঁসাই এর বংশধরগণ এখনও রাখালরাজার নিত্যসেবা দিয়ে আসছেন।

শুশুনিয়ার তারাখ্যা দেবী

মন্তেশ্বর ব্লকের ভাতার-নাসিগ্রাম রাস্তার ধারে গণ্ডগ্রাম শুশুনিয়া অবস্থিত। এই গ্রামের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'তারাখ্যা' হলেন গ্রামদেবতা। মন্দিরটিও বেশ প্রাচীন। শোনা যায় শুশুনিয়া ছিল স্থানীয় 'খাঁ' বংশের বড় জমিদারী। এই জমিদারগণ বহু জনহিতকর কাজ যেমন দীঘি, পুকুর কাটিয়েছিলেন, পথ-ঘাট ও দেবমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই খাঁ পরিবারের স্মৃতিবাহী বহু স্থান ও পুকুরের নাম সে কথাই বলে। এমনি একটি দীঘি রয়েছে 'তারা খাঁ' দীঘি। সেই দীঘি থেকে দেবীমূর্তি

পাওয়া গিয়েছিল বলে দেবীর নিজস্ব নাম হারিয়ে যায়, নূতন 'তারা খাঁ' বা 'তারাখ্যা' নামে দেবী পূজিতা হচ্ছেন।

কালো কষ্টিপাথরে তৈরী এইমূর্তি। পালযুগের শিল্প বলে স্থানীয় লোকের ধারণা। দেবী চতুর্ভুজা, ত্রি-নয়নী ও পদ্মাসীনা। সঙ্গে আছেন মহাদেব। দেবী মহাদেবকে আলিঙ্গন করে বামদিকের হাত দিয়ে মহাদেবকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। ডানদিকের নীচের হাতে গদা। দেবীর উর্দ্ধাঙ্গ নিরাবরণ, নিম্নাঙ্গে রক্ত পট্টবস্ত্র। দেবীর দুদিকে দুই সঙ্গিনী জয়া ও বিজয়ার মূর্তি। পিছনে চালচিত্রের মত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। এই মন্দিরে আর একটি পাথরের মূর্তি আছে যাকে বলা হয়, 'কমলে কামিনী' বা 'গজলক্ষ্মী'। দুপাশে দুটি হস্তি জল সিঞ্চনরত মাঝে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী। এটির কোন পূজা হয় না।

বর্দ্ধমান মহারাজাগণ যেমন বারে বারে জেলার প্রসিদ্ধ দেব-দেবীর মন্দির নির্মাণ ও নিত্যসেবার ব্যবস্থা করেছেন, এই শুশুনিয়ার 'তারাখ্যা' দেবী তা থেকে বঞ্চিতা নন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান মহারাজ কয়েকশ একর ভূমি দান করে দেবীর পূজা ও উৎসবের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করেন। দেবীর আদি পুরোহিতদের কোন বংশধর নেই। দৌহিত্র বংশ এখন পূজারী। দুর্গাপূজার সময় দেবীর পূজা ও মেলা হয়।

বাঘনার পাড়ার বলরাম-কৃষ্ণ

বর্দ্ধমানের পূর্বে কালনা মহকুমার অম্বিকা কালনা থেকে প্রায় ছ মাইল পশ্চিমে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীপাট বাঘনাপাড়া গ্রাম। এই গ্রামের গ্রামদেবতা হলেন 'বলরাম-কৃষ্ণ'। বিগ্রহ দুটি দারুনির্মিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক আচার্য রামচন্দ্র গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে এই কাষ্ঠনির্মিত বলরাম-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি নিয়ে আসেন ও বাঘনা পাড়ায় প্রতিষ্ঠা করেন আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে। মন্দিরের ফলকে উৎকীর্ণ আছে:

শকে নাগাগ্নি কামেষু বিধৌ শ্রীরামচন্দ্রতঃ।
আর্বিরাসীদিষ্টস্তম্ভং কার্য্যেহস্মিন্ শ্রীরমাপতে।

উক্ত শ্লোকে শকাব্দ কাল এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—নাগ (৮), অগ্নি (৩), কামেষু (৫), বিধু (১), শকে অর্থাৎ ১৫৩৮ শকাব্দ (অর্থাৎ ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীরামচন্দ্রের পরবর্তী কীর্তিমান রমাপতির কার্যে এই ইষ্টকস্তম্ভ শোভিত হয়। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বলরাম-কৃষ্ণ মন্দির নির্মিত হয়। প্রায় চারশত বৎসরের পুরাতন এই মন্দির। মূল মন্দির বাংলার খড়ো আটচালা ধাঁচের কিন্তু মন্দির সংলগ্ন জগমোহন চারচালা রীতির তৈরী। কথিত আছে রামচন্দ্র গোস্বামী 'বলরাম-কৃষ্ণ' মূর্তি বৃন্দাবন থেকে এনে অম্বিকার নিকটবর্তী অরণ্যে এক পর্ণকুটিরে রাখেন। অরণ্য

ছিল ব্যাঘ্র সংকুল। কিন্তু রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক শক্তিতে ও কৃষ্ণ নাম গানে হিংস্র বাঘও বশীভূত হয় এবং এই সব হিংস্র জন্তুর পশুদেহ উদ্ধার লাভ করে। তাই এই গ্রামের নাম হয়—বাঘনা-পাড়া। 'বলরাম-কৃষ্ণ' ইচ্ছায় শ্বাপদ সংকুল অরণ্য রূপান্তরিত হয় প্রখ্যাত বৈষ্ণব শ্রীপাটে। নবদ্বীপে বৈষ্ণব সমাজের প্রসিদ্ধ খেতরী উৎসবে যোগ দেন রামচন্দ্র। এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবী। অপুত্রক জাহ্নবী দেবী রামচন্দ্রকে পালিত পুত্ররূপে গ্রহণ করেন ও দীক্ষা দেন। খেতরীর উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে। রামচন্দ্র গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজবল্লভ গোস্বামী রচিত 'মুরলী বিলাস' থেকে জানা যায়, ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জাহ্নবী দেবী রামচন্দ্রকে নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেখানে পাঁচ বৎসর থাকার পর গৌড় প্রত্যাবর্তন করেন। হাজীপুরের পথে গঙ্গা পার হয়ে তিনি কণ্টকনগর বা কাটোয়া পেরিয়ে অম্বিকা কালনার পশ্চিম তীরে অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হন ও সেখানেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং বাঘনা পাড়ার প্রতিষ্ঠা কাল আনুমানিক ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ। [বাঘনা পাড়ার মন্দির বিগ্রহ ও সাহিত্য—কানন বিহারী গোস্বামী]

বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরটি পূর্ব ভারতের মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ। মন্দিরের পুর্ব্বাশা প্রবেশ দ্বারটি আটটি Cusped বা পত্রাকৃতি খিলানযুক্ত। প্রবেশদ্বারের দুপাশের স্তম্ভ খিলানের উপরে লতার অলংকরণ এবং পুষ্পবৃত্ত বা Rosette আছে। এর গঠনরীতি গৌড়ে 'আদিনা' এবং ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ 'মিহ্‌বারের' মত। [বাংলাদেশের ইতিহাস (২য় খণ্ড) পৃ ৪৫২—রমেশচন্দ্র মজুমদার ও বাংলার ইতিহাস (২য় ভাগ) পৃঃ ৩৩৩ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়] মন্দিরের দক্ষিণাংশ্য প্রবেশ পথটিও পত্রাকৃতি খিলানযুক্ত। মন্দিরের বহির্গাত্রে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক স্বর্ণমারীচ সন্ধানে চিত্র টেরাকোটার অলংকারে ভূষিত, তার চারপাশে যে সমস্ত জ্যামিতিক নকশা আছে, সেগুলি Saracenic প্রভাবে চিত্রিত বলে মনে হয়। এর কিছুটা উপরে মন্দিরের বঙ্কিম কার্ণিসের নিম্নে দুটি পুষ্পবৃত্তের মাঝখানে রয়েছে দুটি অপূর্ব টেরাকোটার অলংকরণ। তার ডানদিকের মৃৎফলকটিতে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে একটি পুষ্পিত লতাগুচ্ছ আর বামদিকে রয়েছে লতাগুল্ম তলে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ ও ত্রিভঙ্গিমভাবে দাঁড়ানো শ্রীরাধিকার যুগল মূর্তি। মন্দিরের পূর্বাস্য প্রবেশ দ্বারের উর্দ্ধে একটি প্যানেলে জয়দেবের গীতগোবিন্দম কাব্যে বর্ণিত দশাবতার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। জগমোহনটির প্রবেশ দ্বার তিনটি ও স্তম্ভ চারটি। স্তম্ভগুলিতে প্রচুর টেরাকোটার কাজ আছে— তার বিষয় বস্তু হল কৃষ্ণলীলা, চণ্ডীর মহিষাসুর নিধন, রামায়ণের সীতা উদ্ধার ও বানরদের রণসজ্জা ইত্যাদি। চুনকাম ও রঙ দেওয়ার ফলে এগুলি নষ্ট হতে বসেছে Late Mediaebal Temple of Bengal–page 72–David Mecutchion গ্রন্থে জগমোহনের পরিমাপ রয়েছে 23′ × 22′ + 21′ × 10′ ফুট। মন্দিরের গর্ভ গৃহের চূড়াতল অষ্টকোণ সমন্বিত। 'মূরলী বিলাস' গ্রন্থে

আছে ক্ষত্রিয় রাজার দানে ঐ মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু ঐ রাজা বর্দ্ধমানরাজ নয়।

কারণ বর্দ্ধমান রাজের আদিপুরুষ আবু রায় বর্দ্ধমানের কতোয়াল ও চৌধুরী নিযুক্ত হন ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, কিন্তু মন্দির ফলকে নির্মাণ কাল দেওয়া আছে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দ, মনে হয় তৎকালীন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ ঐ আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন রামচন্দ্র গোস্বামীকে। ধর্মমঙ্গলকাব্যের বন্দনা খণ্ডে বলরামের বন্দনায় আছে, 'বাঘনাপাড়া বলরামে বন্দি ভক্তি করি'। বাঘনাপাড়ায় বলরাম 'গোপবেশী'। পৌরাণিক বলরামের দক্ষিণ হস্তে 'মুষল' ও বামহস্তে 'হল' আছে। কিন্তু এই বলরামের হস্তে কোন প্রহরণ নেই। হস্তযুগল অধোবিলম্বিত ও কটিসং লগ্ন। নেত্র যুগল স্নিগ্ধ এবং কর্ণকুণ্ডল শোভিত। প্রতিবৎসর মূর্তির অঙ্গরাগ হয়, কিন্তু নবকলেবর হয় না।

বলরাম-কৃষ্ণ মন্দিরের সামনে আছে সুপ্রশস্ত নাটমন্দির। এই নাটমন্দিরটি একচাল, সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের প্রথমে এটি নির্মিত হয়। নাটমন্দির ছাড়াও এখানে আছে দ্বিতল নহবৎখানা, প্রাচীন অষ্টকোণ "ঘড়িঘর", জগন্নাথের গুণ্ডিচাঘর, রন্ধনশালা, দুর্গামণ্ডপ, গাজন মন্দির এবং দেবমঞ্চ। সমস্ত দেবস্থানকে 'ঠাকুর বাড়ি' বলা হয়। পাশে 'রেবতী-রাধারাণী' ও জগন্নাথ মন্দির আছে। বাঘনা পাড়ার প্রধান উৎসব শ্রীপাট প্রতিষ্ঠাতা রামচন্দ্র গোস্বামীর তিরোভাব মহোৎসব। প্রতিবৎসর মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ায় মেলার সূচনা হয় এবং অষ্টমীতে শেষ হয়। এই উপলক্ষ্যে বাংলা ও বাংলার বাইরের বহু বৈষ্ণব বাঘনাপাড়ায় সমবেত হন। রামচন্দ্রের ব্যবহৃত পিত্তল-করঙ্গার ভিক্ষাপাত্র পূজার পর খোলমঙ্গল সহ কীর্তন, অধিবাস ও মহোৎসব-অধিবাস হয়। রামচন্দ্র ছিলেন অকৃতদার। তাই বলরাম-কৃষ্ণ বিগ্রহে কাছাপরিয়ে পুত্রকৃত্য ও শ্রাদ্ধকর্ম পালন করানো হয়—এ এক অভিনব ব্যাপার। অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষের তিরোভাব মহোৎসবেও 'গোপীনাথের' একই ক্রিয়া কর্ম দেখতে পাই। উৎসবের প্রতিদিন 'বলরাম-কৃষ্ণের' অন্নকূট এবং চৌষট্টি মহান্তের বিশেষ ভোগ দান করা হয়। নাটমন্দিরে পালাকীর্তন ও নামগান হয় সপ্তাহব্যাপী। দ্বিতীয়ায় মহোৎসবে 'অধিবাস', তৃতীয়ায় কর্মযজ্ঞ এবং অষ্টমীতে 'প্রেমবিতরণ ধূলোট' এইদিন নগর সংকীর্তন করা হয়। অন্নকূট উৎসবে হাজার হাজার ভক্ত প্রসাদ লাভ করেন। এক একদিনের 'বলরামকৃষ্ণের ' বেশবাস পরিবর্তন করা হয়। নবীনবেশ, নটবরবেশ, রাজবেশ এবং ধূলোটের দিন ধারণ করেন বিচিত্র ফকির বেশ। পরণে কালো আলখাল্লা ও মাথায় কালো টুপি। ভক্তরা বলেন সাতদিনের অন্নকূট উৎসব পালন করে প্রভু নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে যান। তাই ফকির বেশে পথে পথে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেন। এই সমাবেশে বৈষ্ণব, হিন্দু, মুসলমান-দরবেশদের যে সমন্বয় ঘটেছিল তারই পুরাতন স্মৃতি চিহ্ন এই উৎসবের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে।

উৎসবের আর একটি অংশ হল 'নেড়া-নেড়ি' বিদায়। চতুর্থী থেকে নবমী পর্যন্ত দৈনিক মহোৎসবে আগত আউল, দরবেশ, ফকির বিশেষতঃ, মুণ্ডিতমস্তক শিখাধারী 'নেড়া-নেড়ি' দের সর্মান দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করা হয়। 'নেড়া-নেড়ী'দের দেবতত্ত্ব ও ভজন সাধনমূলক সঙ্গীতাদি এই সময় পরিবেশন করা হয়। এই নেড়া-নেড়িগণ ধর্মান্তরিত অপভ্রষ্ট বৌদ্ধ। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র তাদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষাদান করে হিন্দু সমাজে আশ্রয় দান করেন। সেই থেকে এই মহোৎসবেও নেড়ানেড়িদের স্বীকৃতি ও সম্মানদান পর্বটি রয়ে গেছে।

সারগড়িয়ার শীতলা

কালনা শহরের কাছেই প্রায় এক কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করলেই সারগড়িয়া গ্রাম। শীতলাদেবী এই গ্রামের গ্রামদেবতা। সার্বজনীন এবং তিনশ বছরের পুরাতন। বৈশাখের শুক্লা চতুর্দশীতে শীতলার প্রতিমা তৈরী করা হয় মাটির। অদ্ভুত ধরণের মূর্তি—শীতলাদেবী গাধার পিঠে বসে আছেন, চতুর্ভুজা, রক্তবসনা, মহারুদ্রাণী ও উগ্রচণ্ডী মূর্তি। অন্যহাতে অস্ত্র, কিন্তু ডানহাতের একটিতে ঝাঁটা। অর্থাৎ দেবী হলেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকর্ত্রী।

দেবীর অধিষ্ঠান মনসাগাছের তলায় এক বাঁধানো বেদীতে। দুদিকে দুটি নিমগাছ, মাঝে বেদী ও মন্দির। লোকের বিশ্বাস শীতলা দেবী এইভাবেই অধিষ্ঠিতা হতে ভালবাসেন।

দেবীর পূজা উপলক্ষে মেলা বসে দুদিন। গ্রামবাসীরা পূজা দেন, মানত করেন। ছাগ বলি হয় অনেক। সারারাত ধরে চণ্ডীপাঠ ও পূজা হয় এবং শেষকালে হোমযজ্ঞ। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে হোমের ফোঁটা নিয়ে দেবীর আশীর্ব্বাদ পেতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়।

রাণীবন্দের চণ্ডিকা

কালনা থেকে বেশ দূরে রাণীবন্দ গ্রাম। জঙ্গলে পূর্ণ রাণীবন্দ একসময় ছিল মনুষ্যবসতিহীন। প্রবাদ, প্রাচীনকালে এক অজ্ঞাতনামা তান্ত্রিক সাধক এই জঙ্গলে এসে তন্ত্রসাধনা করতে থাকেন। সেও প্রায় আড়াইশ বছর আগের কথা। তান্ত্রিক সাধক প্রথম তৈরী করান কষ্টিপাথরের খোদাই করা প্রায় দেড় ফুট উচ্চতার চণ্ডীমূর্তি। সেটি চুরি হয়ে যাওয়ায় পুনরায় স্থাপন করা হয় পিতলের মূর্তি। কেউ কেউ বলেন, বর্দ্ধমান মহারাজা এই পিতলের মূর্তির প্রতিষ্ঠাতা। তান্ত্রিক সাধকের এখন আর কোন অস্তিত্বও নেই। এই চণ্ডীকাই এখন গ্রামদেবতা রাণীবন্দের। বন কেটে বসত, যার নাম রাণীবন্দ গ্রাম।

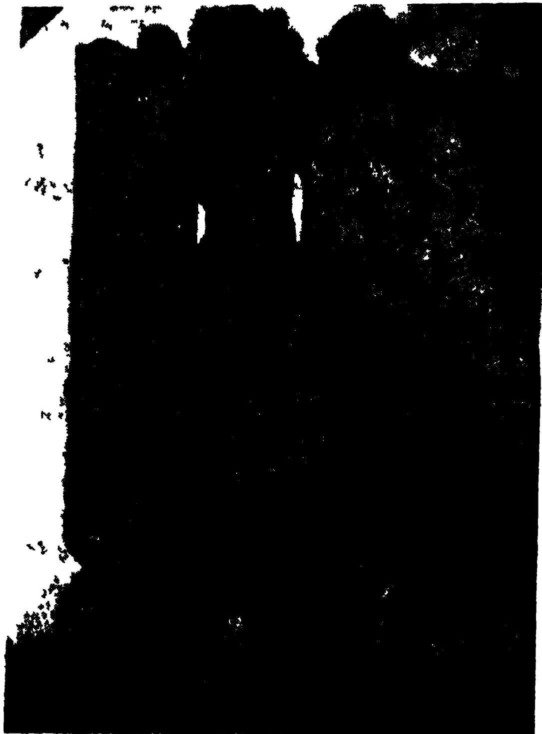
আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে চণ্ডীর উৎসব ও পূজা হয়। অষ্টমীর দিন

বাজি পুড়িযে পূজাব উদ্বোধন হয। আষাঢ়ে নবমী চণ্ডীপূজাব জন্য পাঁচ-সাতদিনেব জন্য বিবাট মেলা বসে। মনোবাঞ্ছাপূর্ণকাবিণী চণ্ডীকাকে মানত কবে পাঁঠা বলি দেন অনেক ভক্ত। দূব দূবান্ত থেকে মেলা দেখতে লোক আসেন। কয়েক হাজাব লোক সমাগম হয এই মেলাতে।

কাটোয়া মহকুমা

কড়ুই গ্রামেব বুড়ো শিব ও হবগৌবী

বর্দ্ধমানেব প্রায প্রত্যেকটি গ্রামে শিব বা ধর্মঠাকুব আছে। এইসব গ্রামগুলি খুবই পুবাতন। পুবানো গ্রামেব ঐতিহ্যে প্রাচীন দেবতাব স্মৃতি বিজড়িত। সেকালে দেব-দ্বিজ নিযেই ছিল প্রাচীনত্বেব মর্যাদা। ব্রাহ্মণদেব চিহ্ন পাওযা যায ভূমিদান পত্রে। অনেক ক্ষেত্রে পদবীব মধ্যে তা লুকিযে আছে। অনেক গাঁযে দেবতা না



হবগৌবীব কল্যাণসুন্দব রূপ

থাকলেও বিভিন্ন স্মৃতিতে সেই আদি দেবতারা বেঁচে আছেন। নেপালে পাওয়া

কতকগুলি অতি প্রাচীন (খ্রীঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে লেখা) বৌদ্ধ মহাযান শাস্ত্রের পুঁথিতে স্থানীয় বৌদ্ধ দেবদেবীর ও পীঠের নাম ও চিত্র আছে। প্রাচীন শাস্ত্র ও পত্রিকায় নাম পাওয়া যায় 'কড়য়ি'। গ্রামের ঐতিহ্য লুকিয়ে ছিল একটি ধ্বংস স্তূপের মধ্যে। পালরাজদের আমলে এটি ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতির একটি পীঠস্থান। এই গ্রামের উগ্রক্ষত্রিয় রাজা ধর্মকুণ্ড ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এই গ্রামের নাম কড়ুই।

বৌদ্ধদের 'বুদ্ধদেব' পরবর্তীকালে লৌকিক দেবতা ধর্মরাজে পরিণত হলেন। তখন থেকে প্রতি বৎসর বুদ্ধ-উৎসবে চৈত্র সংক্রান্তি বৈশাখী পূর্ণিমাতে তিনি পূজিত হতেন। পরবর্তীকালে ধর্মরাজ হিন্দুদেবতা বুড়োশিবে পরিণত হয়েছেন। এই বুড়োশিবই হলেন কড়ুই গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেবতা—গ্রামদেবতা। কালাপাহাড়ের ভয়ে সারা বৎসর বুড়োশিবকে শিবপুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হত। চৈত্র সংক্রান্তির সময় তাঁকে জল থেকে তুলে পূজা করা হয়। এই সময় শিবের পূজা, উৎসব ও গাজনের মেলা হয়। বুড়োশিবের সঙ্গে পৌরাণিক উপাখ্যানকে অনুসরণ করে 'হরগৌরী'ও এখানে পূজিতা হন। শিব, পার্বতী বা মহাদেব ও গৌরী—পুরাণের এই কাহিনী কড়ুই গ্রামের লৌকিক পূজা অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ঐ বুড়োশিবের সঙ্গে হর-গৌরীকেও জল থেকে তুলে এনে গাজনের সময় বেদীতে বসানো হয়। যেন শিব-পার্বতীর মিলন চড়ক ও গাজন—দুই পর্ব একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় সমারোহে।

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা

পৌরাণিক কাহিনী হল, পিতা দক্ষের গৃহে দক্ষরাজ কর্তৃক স্বামী নিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী দেহত্যাগ করেন। শিব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে উন্মত্তের মত নৃত্য করতে থাকেন। এই অবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য মহাশক্তি সতীর অবয়ব বিষ্ণুচক্রে একান্ন অংশে খণ্ডিত হয়ে ভারতের একান্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এই একান্নটি স্থানই পীঠস্থান নামে খ্যাত। এই পীঠগুলিতে যথাকালে পীঠ-দেবী ও পীঠ-ভৈরব আবির্ভূত হয়ে ভক্তজনের পূজা গ্রহণ করেন। কাটোয়া মহকুমার মঙ্গলকোট ব্লকের ক্ষীরগ্রাম সেইরূপ একটি মহাপীঠ সিদ্ধপীঠ। পীঠদেবী বর্তমানে যোগাদ্যা এবং পীঠভৈরব এখন ক্ষীরেশ্বর নামে সুপরিচিত। কখনও কখনও ক্ষীরকন্টক ভৈরবও বলা হয়। এর থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে ক্ষীরগ্রাম। সংস্কৃত পীঠমালাতে আছে:

ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকন্টকঃ
যোগাদ্যা সা মহাদেবী দক্ষ অঙ্গুষ্ঠ পদে নমঃ

অন্নদামঙ্গলে এই সিদ্ধপীঠের উল্লেখ আছে:

ক্ষীরগ্রামে ডানিপার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব
যোগাদ্যাতা দেবতা ক্ষীরকন্টক ভৈরব।

পীঠস্থানের নাম ছিল যুগাদ্যা, পীঠদেবী ছিলেন ভূতধাত্রী মহামায়া, পীঠভৈরব হলেন ক্ষীরকন্টক। সতীর ডানপার অঙ্গুষ্ঠ পতিত হয়েছে এই পীঠস্থানে। ক্ষীরগ্রামের কবি বাঞ্ছারামের যোগাদ্যা বন্দনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়: কনৌজ থেকে আগত ভট্টনারায়ণের পুত্র বিকণ হতে সপ্তদশ পুরুষ এই বাঞ্ছারাম ভট্টাচার্য বিদ্যারত্ন। বর্দ্ধমানের মহারাজা তর্কবাগীশ মহাশয়কে দেবোত্তর দিয়ে যোগাদ্যা দেবীর চণ্ডীপাঠে নিযুক্ত করেন। এঁরা চানক হতে ক্ষীরগ্রামে এসেছিলেন।

নিত্য ভোগ পূজাদির বর্তমান অধিকারী হলেন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক রাজকুমাব চক্রবর্তী। বঞ্ছারামের বন্দনা এইভাবে সুরু হয়েছে:

"বন্দিব যে যোগাদ্যা যুগে আদ্যা শক্তিমাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুবর্গদাতা
ভয়ঙ্কর ঘোর মূর্তি তীক্ষ্ন খড়্গ হাতে।
প্রচণ্ডা নামেতে দেবী আছিলা লক্ষ্মীতে॥"

মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে দেবী মহামায়ার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য কবি বাঞ্ছারাম অলৌকিক লীলার আশ্রয় নিযেছেন। রামলক্ষ্মণকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে মহীরাবণ পাতালে দেবীর সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত হলেন। হনুমান দেবীর বরে বলীয়ান হয়ে মহীরাবণকে বধ করে রাম-লক্ষ্মণকে উদ্ধার করলেন। শ্রীরাম হনুমানের সহায়তায় দেবীকে নিয়ে এলেন ক্ষীরগ্রামে। আর একটি কাহিনী আছে, ক্ষীরগ্রামের রাজা হরি দত্ত। দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিলেন, নিত্য নববলি দিয়ে তাঁর যেন পূজা করা হয় এবং কতকগুলি বিধিনিষেধ মানতে বলেন। রাজা তাঁর সাত পুত্রকে একে একে বলি দিলেন এবং ঘরে ঘরে পালা করে দিলেন। এক ব্রাহ্মণ নিজের মুণ্ড ছেদন করতে গেলে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে রাজার ছেলেদের প্রাণদান করলেন।

'বিশ্বকর্মা রামাঞ্জায় হয়ে আগুয়ান।
বিচিত্র দেউল এক করিল নির্ম্মাণ
মহাপীঠে মহামায়া করিয়া স্থাপনা।
যোগাদ্যা বলিয়া নাম করিল ঘোষণা

একদিন ধামাচিয়ার ঘাটে এক শাঁখারীকে যেতে দেখে বধূ কন্যা বেশে তার কাছে শাঁখা পরার ইচ্ছা প্রকাশ করল। শ্রীরামনামের দুটি শাঁখা দেবীর খুব পছন্দ। কিন্তু শাঁখারির বড় ভয়,

'কাহার বহুড়ি তুমি কাহার ঝিয়ারী"

শাঁখা যে পরছ, টাকা কে দেবে? কন্যা জানালেন, পূজারী ব্রাহ্মণ তার পিতা, গম্ভীরের' কোলঙ্গীতে পাঁচতঙ্কা আছে, তাঁকে চাইলেই শাঁখারী পেয়ে যাবেন। একথা শুনে শাঁখারী শাঁখা পরাতে লাগলেন। কিন্তু কন্যার 'হাতে পদ্ম, পায়ে পদ্ম,

পদ্মগন্ধ গায়' শাঁখারীকে বিচলিত করল। সে কন্যার সঠিক পরিচয় জানতে চাইল। তখন কন্যা বললেন:

'ব্রাহ্মণের কন্যা আমি নাম ভগবতী।
পাগল আমার স্বামী, দ্বন্দ্ব দিবারাতি॥
দুই পুত্র লয়ে আমি আছি বাপ ঘরে।
দরিদ্র আমার স্বামী অন্ন দিতে না পারে।"

শাঁখা পবিয়ে শাঁখারী ব্রাহ্মণকে কোলঙ্গী থেকে পাঁচতঙ্কা এনে দিতে বললেন। ব্রাহ্মণ কোলঙ্গী থেকে টাকা পেয়ে অবাক। তাঁর একটি মাত্র পুত্র, কোন কন্যাতো নাই। সঙ্গে সঙ্গে পূজাবী ছুটলেন ধামাচিয়ার ঘাটে:

"যদি দরশন মাগো না দিবে আমারে।
ব্রহ্মহত্যা হব আমি তোমারি উপরে।"

দেবী জল হতে হাত তুলে 'দুইবাহু শঙ্খ' দেখালেন। এইভাবে ক্ষীরগ্রামে দেবী তার একলীলা প্রকাশ করলেন:

"ভণে দ্বিজ বাঞ্ছারাম স্মরিয়া ভবানী।
সমাপ্ত বন্দনা হল, কর হরিধ্বনি॥"

ব্রাহ্মণ কন্যার শাঁখা পরার গল্পকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "যোগাদ্যা"কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত কবেছেন:

"শাঁখা চাই। ভাল শাঁখা নেবে? ওগো মেয়ে!
তোমার হাতে মা খাসা মানাবে এ শাঁখা,
ভারি কারিকুরি, দেখ চেয়ে,
এ শাঁখা যে পরে হয় না সে দুর্ভাগা।"

যোগাদ্যার বর্তমান মন্দিরটি একাদশ শতকের। বরেন্দ্র গবেষণার বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক নীরদবন্ধু সান্যাল এই মত ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান মন্দিরটির পূর্বে এখানে দেবীর অন্যমন্দির ছিল। বৰ্দ্ধমান মহারাজ একটি মন্দির প্রস্তুত করে দিয়েছেন। যোগাদ্যা প্রস্তর নির্মিত মূর্তি সিংহবাহিনী দশভুজা মহিষমর্দিনী। এটি দাঁইহাটের এক ভাস্করের নির্মাণ। কালো কঠিন পাথরে অনায়াস লব্ধ সাবলীল দশভুজার এমন সিদ্ধমূর্তি কদাচ দেখা যায়। একাদশ শতকের ভাস্কর্যের অপূর্ব্ব শিল্পকলাকে ফুটিয়ে তুলেছেন উনবিংশ শতাব্দীর দাঁইহাটের এক নবীন ভাস্কর। বজ্রমিত্রের ভাষায়: সাতটি পল তোলা সপ্তরথ পীঠ, তার উপরে মহাপদ্ম। এই মহাপদ্মের উপর মহিষমর্দিনীর মূর্তি উৎকীর্ণ। পিছনে পৃষ্ঠপটের উর্দ্ধে কীর্তিমুখ আকাশচারী মাল্যবাহী বিদ্যাধরের অলঙ্করণ। নীচে দেবীর দুপাশে অসি চর্মধারিণী দুটি মূর্তি, সম্ভবতঃ দেবীর সঙ্গিনী। পীঠস্থানের ইতিবৃত্ত আছে, ভৈরব

মহাদেব শিলাভূত হয়ে সতীর অঙ্গ রক্ষা করছেন। মহাশক্তি যোগদ্যাদেবীর অনতিদূরেই ক্ষীরগ্রামের মধ্যস্থলে সুউচ্চ মন্দির শিলাময় ক্ষীর কণ্টক ভৈরব অবস্থান করছেন।

যোগাদ্যা মাতার নিত্যপূজা কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে তা কেউ জানে না। দুর্গাপূজার আগে ও পরে নানা অনুষ্ঠান হয়। ১৫ই বৈশাখ উৎসবের লগ্ন। মহাপূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় এদিন হতে। জ্যোতিষ মতে রাশির উদয়কাল এবং নির্ধারিত শুভ সময় হল—লগ্ন। লগ্ন উৎসবের দুটি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। এক—যোগাদ্যা পূজায় আদিবাসীদের অংশগ্রহণ। যেমন, যে বাঁশের ঝাঁপি পূজাপর্বে ব্যবহৃত হয়, স্থানীয় ডোমেরা সেই ঝাঁপি তৈরী করে ভাণ্ডারীকে দেবেন এই লগ্ন দিনে। দুই— দেবীর বলিদান অনুষ্ঠানে এই ডোমরাই অংশ নেন। এর থেকে অনুমান, বর্দ্ধমানের আদিবাসী হলেন ডোমগণ এবং এই পূজায় তাদের স্বীকৃতিই হল ঐসব অনুষ্ঠান। আগে নরবলি হত, এখন পশুবলি হয়—বৈশাখী সংক্রান্তিতে এবং দুর্গানবমীতে। এছাড়া মেষ বলিও হয়। উৎসব লগ্নের শেষ দিনে ধামাচিয়ার বিশাল পুষ্করিণীতে যোগাদ্যার সলিল সমাসীন হয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায বলেন, 'ভাষাতত্ত্ব' হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় বাঙলা দেশে আর্যভাষা আসিবার পূর্বে এ দেশের লোকেরা কোল বা অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা দ্রাবিড় ভাষা বলিত তার পরিচয় জাতিধর্মে আছে। আর্যধর্মে মূর্তি পূজা ও মন্দিব ছিল না। আর্যগণ এখানে এসে স্থানীয় আর্যেতর জাতির বিশিষ্ট দেবদেবীর উপর আর্য প্রলেপ দিয়ে পৌরাণিক দেব-দেবী রূপে এদের গ্রহণ করেছেন। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা এই প্রকারের দেবী। অষ্ট্রিকাদি আর্যেতর জাতির প্রতিনিধি ডোমগণের স্বীকৃতির মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার মিশ্রণও রয়েছে। যোগাদ্যা বন্দনায় দেবীনির্দেশিত যে বিধিনিষেধ আছে সম্ভবতঃ সেগুলি সবই আর্যেতর জাতির সংস্কার। আর্য-অনার্যদ্বয়ের পর সম্ভবতঃ আর্যগণ স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে আপোস করে সেগুলি মেনে নিয়েছেন।

যেমন: শুভদিনে বৈশাখ মাসে সলতে পাকালে সন্তান রুগ্ন হবে, অন্নে কাঠি দিলে গৃহী অন্নহীন হবে, পাকচক্রে চক্রাকার ধর্মস্থানে বাস করবে না, হলকর্ষণ নিষেধ, ছত্রবর্জন, বৈশাখে প্রথম ও শেষ পাঁচদিন করে ও লগনের দিন (১৫ ই বৈশাখ) কর্মবিরতি, লিখন বন্ধ, বৈশাখের অন্যদিনগুলিতে আলতায় লেখা, কালিতে লেখা নিষেধ। এই নিষেধের বিধি বহু গ্রামে আছে গ্রামদেবতার নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী। আর একটা, যোগাদ্যাদেবী শুধু ক্ষীরগ্রামেই নেই, বহু উগ্রক্ষত্রিয় প্রধান গ্রামে পুকুরের পাড়ে বা ডাঙায় ঝোপের মধ্যে এই দেবীর অবস্থান—যেমন লেখকেরা নিজগ্রাম মুইধাড়ায় দক্ষিণ দামোদরের যোগদ্যা দেবী একটি পুকুরের পাড়ে আছেন। সেখানেও হলকর্ষণ নিষেধ। ক্ষীরগ্রামে থাকলে নরবলি দিতে হবে এই ভয়ে বহু লোক পালিয়ে গিয়ে থাকবেন। তাঁরা যে যে গ্রামে গেছেন সেখানে যোগাদ্যার পূজা করেন, পাঁঠা বলি দেন। কিন্তু সেখানে যোগাদ্যা পূজা কেবল উগ্রক্ষত্রিয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা পূজার শেষে 'গুয়া ডাকার' অনুষ্ঠানটিও বিশেষ

তাৎপর্যপূর্ণ। মন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একটি উচুঁ বেদীর উপর ঘটস্থাপন করে পুরোহিত ও যোগাদ্যার পূজার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীকে সাক্ষী রেখে মালাকার হাতে পান-সুপারী নিয়ে 'গুয়া ডাকে'। যেমন 'ফোপল মশায়ের গুয়ো', ভরতদত্ত শাসমলের গুয়ো, নাসগাঁযের আগুরী কেউ আছ? কোলগাঁয়ের আগুরী কেউ আছ? কুড়মুনের আগুরী কেউ আছ—বলে মালাকার উচ্চৈস্বরে ডাকে এবং সাড়া দিলে তার হাতে পান-সুপারী দিয়ে দেয়। একে 'গুয়ো-ডাকা' বলে, এর অর্থ আগুরী(উগ্রক্ষত্রিয়) সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে গাঁওয়ারী সম্মান জানানো। বিভিন্ন জায়গায় পান-সুপারী দিয়ে সম্মান জানাবার রীতি আছে। এখানে মেলায় বহু দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রী আসেন। স্থানীয় অধিবাসীরা একে সর্বসাধারণের মিলনমেলায় পরিণত করেছেন।

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ

কাটোয়া মহকুমাব অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী একটি রমনীয় জনপদ অগ্রদ্বীপ। শ্রীচৈতন্য পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন অগ্রদ্বীপের 'গোপীনাথকে'। তীর্থমঙ্গলে আছে:

অগ্রদ্বীপ আসি নৌকা হৈল উপস্থিত
সেইস্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর,
অপূর্ব নির্ম্মাণ বাটি দেখিতে সুন্দর॥

নবদ্বীপের ১৫ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত বৈষ্ণব পাদপীঠ। পূরাণে উল্লেখ আছে:— সপ্তদ্বীপের একদ্বীপ।
নাম অগ্রদ্বীপ।

গৌড়াধিপতি হুসেনশাহ নীলাচলগামী চৈতন্যমহাপ্রভুর নামগানে মুগ্ধ হয়ে মহাপ্রভুকে বলে ছিলেন, সয়্যাসী তোমার ভক্তি রসের নাম গানে আমি মুগ্ধ, বল, কী চাও তুমি? ধন-দৌলত, বিষয়-সম্পত্তি যা চাইবে, তাই দেব। স্মিতহাস্যে মহাপ্রভু বলেছিলেন, সন্ন্যাসী ধন-দৌলত নিয়ে কী করবে নবাব? যদি দিতে চাও তো তোমার সিংহদরজার ঐ কালো পাথরখানা আমাকে দাও। সকলে স্তম্ভিত, অবাক। ধন-দৌলত ছেড়ে শেষকালে সামান্য একটা কালো পাথর? ওর উপর প্রভুর এত লোভ কেন? কৃষ্ণবর্ণ ঐ পাথরে মহাপ্রভু দেখেছিলেন প্রাণের কৃষ্ণকে, তাঁর দেহের বর্ণে। শ্রীচৈতন্যকে পাথর দিতেই মহাপ্রভু সেই পাথর গঙ্গার জলে ফেলে দেলেন। এই পাথর সাধারণ পাথর নয়—এ হল ব্রহ্মশিলা। সে এক অলৌকিক লীলা। শ্রীচৈতন্য পার্শ্বচর গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর। ভোজন সেরে মহাপ্রভু গোবিন্দকে মুখশুদ্ধি দিতে বললে, গোবিন্দ ভিক্ষার·থেকে হরিতকী বের করে প্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভু গোবিন্দকে বললেন, তোমার সঞ্চয় বাসনা এখনও যায় নাই, গোবিন্দ তুমি আমার সঙ্গে চল। গোবিন্দ কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

একদিন গোবিন্দ ঠাকুর গঙ্গায় জপতপ করছেন একবুক জলে, এমন সময় একটা ভাসমান কাঠ এসে তাঁর গায়ে লাগল। জপতপে ব্যাঘাত ঘটছে দেখে কাঠখানিকে তিনি গঙ্গাতীরে ফেলে দিয়ে আবার জপে মনোনিবেশ করলেন। সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখলেন গোবিন্দ, গৈরিক বসনাবৃত সুন্দর এক বালক বলছেন, আমি কাষ্ঠখণ্ড নই, আমি গোপীনাথ। যাকে কাষ্ঠ বলে ফেলে দিয়েছ, সেটা ব্রহ্মশিলা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই ব্রহ্মশিলাকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই শিলা জলে ভাসে। ঐ শিলা থেকেই তৈরী হল গোপীনাথ। ভাগীরথীর তীরে মন্দির প্রস্তুত হল, প্রতিষ্ঠিত হল গোপীনাথের মূর্তি। তাই অগ্রদ্বীপ বৈষ্ণবদের পাদপীঠ। গোবিন্দঘোষ ঠাকুর এই গোপীনাথের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভজনা করতেন। এই সৌভাগ্য মহাপ্রভুর শিষ্যদের মধ্যে আর কারও ভাগ্যে জোটেনি।

গেবিন্দ ঘোষের একমাত্র পুত্র মাবা গেলে সংসারের বন্ধন একেবারে ঘুচে গেল। অভিমানে গোবিন্দ গোপীনাথের পূজা বন্ধ করে দিলেন। ঠাকুরের কাছে কাঁদেন, তোমাকে পূজা করার ফল আমার সন্তানের মৃত্যু! আমার আত্মা এক গণ্ডুষ জলও পাবে না? পরদিন ঘোয ঠাকুর স্বপ্নে দেখলেন, গোপীনাথ বলছেন, আমিই তোমার সন্তান, সন্তানের মত আমিই তোমার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করব।

গোবিন্দ ঘোয ঠাকুরের প্রয়াণের পরদিন থেকে আমবারুণীর আগের একাদশী তীথিতে গোপীনাথ বালকবেশে গলায় কাছা পরিধান করে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হওয়ার পরই গোপীনাথের হাত থেকে পিণ্ডটুকু আপনি মাটিতে পড়ে যায়। প্রতি বৎসর তাই ঘটে। এই উপলক্ষ্যে অগ্রদ্বীপে বিরাট মেলা বসে। বৈষ্ণব রীতি অনুযায়ী মেলায় প্রথম দিনে হয় চিঁড়েভোগ, দ্বিতীয় দিনে হয় অন্নভোগ, তৃতীয় দিনে হয় বারুণী স্নান। বহুদূর থেকে এই বৈষ্ণবতীর্থ অগ্রদ্বীপে আসেন যাত্রীরা, আখড়া বসে, নামসংকীর্তনের আসর চলে সারারাত সারাদিন। বহু বৈষ্ণব আসেন দূরদূরান্ত থেকে। আগে নদীয়ার রাজা এই মেলায় ও গোপীন্যথের রক্ষণা বেক্ষণ করতেন। কিন্তু সন ১২৬১ সালে অর্থাৎ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রদ্বীপের মল্লিকরা নদীয়ার মহারাজার কাছ থেকে অগ্রদ্বীপ মহালটি কিনে নেবার পর থেকে এই মেলার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন মল্লিক জমিদার। ১৫দিন ধরে মেলা চলে। মেলার শেষে গঙ্গাস্নান সেরে গোপীনাথের মন্দিরে ভক্তজনেরা উপুড় হয়ে প্রণাম সারেন। দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে আছে,

ধরাধামে হরি মল্লিক বংশ ধন্য
অগ্রদ্বীপ অগ্রগণ্য,
যেথায় গোপীনাথের লীলা।

গাজনের ঐ অঞ্চলে ঢাকের বাদ্যি বোল তোলে—

শিব শিব ভোলানাথ
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ
বল মন শিবদুর্গা।

ঐ মেলার কদিন অগ্রদ্বীপ হরিনাম সংকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবতীর্থ আশ্চর্যজনকভাবে সাধনপীঠের জীবনধারা সকল মানুষকে জোগায় প্রেরণা। এ বর্দ্ধমানের গৌরব।

'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে আছে বারাণসীর গঙ্গায় স্নান করলে যে পুণ্য হয়, বারুণীর দিন কাটোয়ার এই অগ্রদ্বীপের গঙ্গা স্নান করলেও সেইরকম পুণ্যলাভ হয়। জনশ্রুতি, এখানকার ফলমাহাত্ম্যের জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য নাকি এখানে গঙ্গাস্নান করতে আসতেন। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ১১৭১ বঙ্গাব্দে ত্রিস্থলী থেকে ফেরবার পথে অগ্রদ্বীপে নামেন।

মাজিগ্রামের শাকম্ভরী

মঙ্গলকোটে বর্দ্ধমান কাটোয়া রোডের উপর অবস্থিত সমৃদ্ধ চটি কৈচর। এই কৈচর থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মাজিগ্রাম। প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু-প্রবাদ, মঙ্গলকাব্যের চাঁদ সদাগর এইগ্রামে তাঁর নৌকার মাজি (মাঝি) দের এখানে বাস করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই থেকে গ্রামের নাম মাজিগ্রাম। আবার কেউ বলেন, মাজিগ্রামের 'গ্রাম দেবতা' শাকম্ভরী দেবী। তাঁকে গ্রামের মানুষ মা-জি ডাকতে ডাকতে গ্রামের নাম ও তাই হয়ে গেছে।

শ্রীশ্রী চণ্ডীতে শাকম্ভরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। চণ্ডীতে যে শাকম্ভরীর বর্ণনা আছে তা হলো—উমা, সতী, গৌরী, চণ্ডী, কালিকা ও পার্বতীরূপে। বিভিন্ন নামে শাকম্ভরী প্রকাশিতা। লক্ষ্মীতন্ত্রেও 'শাকম্ভরী' দেবীর উল্লেখ রয়েছে। হিমালয়ে ত্রিযুগীনারায়ণের পথে প্রায় আটহাজার ফুট উঁচু 'শাকম্ভরী' পর্ব্বতচূড়া রয়েছে। শিব ও পার্বতীর বিয়ে নিয়ে যে উপাখ্যান প্রচলিত সেই স্থানের নাম ও এই শাকম্ভরী। 'শাকম্ভরী' দেবী হলেন চতুর্ভুজা, সিংহবাহিনী। চারটি হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, ত্রিশূল ও কৃপাণ। কৃষ্ণবর্ণ পাথরের মূর্তিটি কাঠের সিংহাসনে বসিয়ে পূজার দিন নিজমন্দির থেকে 'শাকম্ভরী' তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। আষাঢ় মাসের শুক্লা নবমীতে হয় প্রধান উৎসব। শাকম্ভরীর পূজার উপকরণে বেশ বৈচিত্র্য আছে মাছ, শাক, আর পায়েস। এছাড়া যাগযজ্ঞ, হোম ও পাঁঠাবলি হয় বহু, শাকম্ভরী তলায় মেলাও বসে। বহু আগে বাইরে থেকে বহু সাধুসন্ত ও সন্ন্যাসী আসত এখন এই মেলায়

পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে লোকজন আসে। দোকানপসারী ও কয়েকশ লোকের মেলা জমে ওঠে।

দেবীর আর একটি উৎসব মদন চতুর্দশী। দেউলেশ্বর শিবের সঙ্গে বিয়ে হয় শাকম্ভরীর। শাকম্ভরীর সেবাইত 'বটব্যাল' ব্রাহ্মণ এবং বরপক্ষ হলেন দেউলেশ্বর শিবের সেবাইত ভট্টাচার্যগণ। বর ও কন্যা পক্ষ উপবাস থাকেন বিয়ের দিন, সব কিছু অনুষ্ঠানও হয়, আসল বিয়েতে যা হয়। কিন্তু শেষকালে বিয়ে আর হয় না। কারণ কন্যাপক্ষ অভিযোগ তোলেন, বর বুড়ো সুতারাং বিয়ে হবে না। আর বরপক্ষ বলেন, মেয়ে কালো, আমাদের পছন্দ নয়। বেশ হাসি, ঠাট্টা ও নির্মল আনন্দের মধ্য দিয়ে উৎসব শেষ হয়। খাওয়া দাওয়া হয় ঠিক প্রীতিভোজের মত। এখন কালের কুটিল গতিতে এই পর্বটা দায়সারা গোছের হয়।

কাঁকোড়ার কর্কটনাগ

কাটোয়া থেকে উত্তর পশ্চিম বীরভূমের সীমানায় অবস্থিত ছোট্ট গ্রাম কাঁকোড়া। পুরাতন দলিল দস্তাবেজে নাম আছে কঙ্কননগর বা কর্কট নগর। চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখিন্দরেব কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই ছোট্ট গ্রামের নাম।

এই গ্রামের গ্রামদেবতা হলেন নাগ দেবতা কর্কটনাগ। প্রবাদ, গরুড়ের অত্যাচারে সর্পকুল যখন ভীত ও ত্রস্ত তখন নাগরাজ বাসুকী এই কর্কটনাগকে আদেশ করলেন পক্ষীরাজ গরুড়কে নিধন করতে। কিন্তু গরুড়কে নিহত করতে রাজী হলেন না অষ্টনাগের এক নাগ কর্কটনাগ। নাগরাজ বাসুকী তখন অভিশাপ দিলেন, কর্কটনাগের স্থান হবে মর্তে। আর তাই এই কাঁকোড়ার পূর্ব প্রান্তে একটি প্রচীন বটবৃক্ষেই রয়ে গেছেন অভিশপ্ত নাগদেবতা কর্কটনাগ। এই কর্কটনাগের শক্তি হলেন উত্তরে মধুপুর গ্রামের বিষহরি (মনসা) এবং পশ্চিমে মাঝিগ্রামের শাকম্ভরী দেবী।

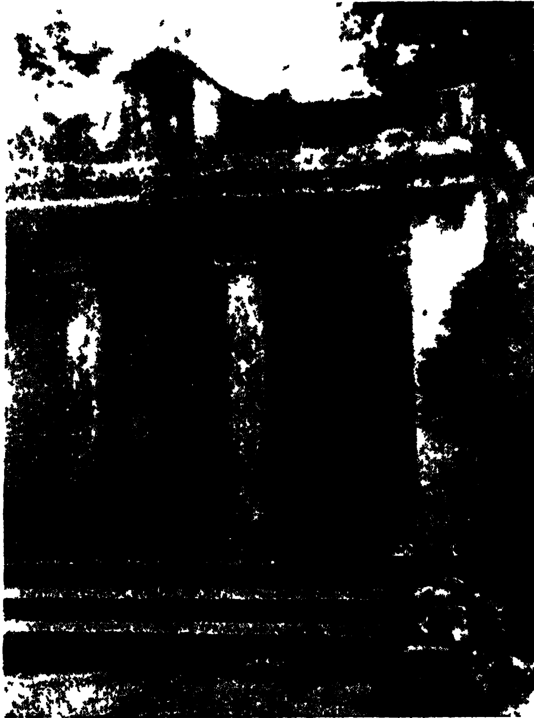
দশহরার পরেই যে নাগপঞ্চমী সেই তিথিতে পূজো হয় কর্কটনাগের। ইনি ছিলেন বাগ্দীদের দেবতা, বাগ্দীর ব্রাহ্মণ এর পূজা করেন, বর্তমানে অবশ্য ব্রাহ্মণরাই অন্যসব পূজা সেরে কর্কটনাগের পূজা করেন। বর্ণ হিন্দু সমাজে এখনও নাগ দেবতা অচ্ছুৎ। চাল, আলু, কলা ও দুধ নাগদেবতার পূজার উপকরণ। লোকে মানত করেন, পাঁঠাবলি দেন, দণ্ডী খাটেন। নুতন জামা কাপড় পরে বাচ্চারা উৎসবে মেতে ওঠে। নাগপঞ্চমীর পূজা জেলায় বিশেষ নেই, তাই এটি একটি বৈচিত্র্যমূলক।

দক্ষিণডিহির অট্টহাস দেবী

কেতুগ্রাম ব্লক—২ এর অন্তর্গত নিরোল মৌজায় অবস্থিত দক্ষিণডিহি গ্রাম। আহ্মদপুর-কাটোয়া ছোট লাইনের পাঁচন্দী ষ্টেশনে নেমে এক কিলোমিটার দূরে

দক্ষিণডিহি। এই গ্রামেব 'গ্রাম দেবতা' অট্টহাস দেবী। একান্ন পীঠেব অন্যতম, বৰ্দ্ধমানে যে পাঁচটি পীঠ আছে তাবমধ্যে অট্টহাস একটি। এখানে দেবীব ওষ্ঠ পতিত হয়েছিল, তাই একে সতী পীঠ বা শাক্তপীঠও বলে এবং শাক্ত সম্প্রদাযেব কাছে দেবী খুবই জাগ্রতা। মহাবাজ তেজচন্দ বৰ্দ্ধমানেব পাঁচটি পীঠেব মন্দিব সংস্কাব বা পুনর্নির্মাণ কবেন। অট্টহাসেব মন্দিবটিও তাই পুবাতন। কিন্তু বছব পঞ্চাশেক আগে এটিব সংস্কাব কবা হয।

দেবীব কোন মূর্তি নেই। ভৈবব আছেন বিশ্বেসা শিব। কেউ কেউ দেবীকে 'ফুল্লেবা অট্টহাস' দেবীও বলেন। মাঘমাসে বটন্তী চতুর্দশী থেকে তিন দিন ধবে অট্টহাস দেবীব বার্ষিক উৎসব হয। দেবীব পূজা দেন গ্রামেব ও পার্শ্ববর্তী গ্রামেব সকল মানুষ। আব এই পূজা উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। লোক সমাগম হয় তিন দিন ধবে। জেলাব প্রান্তে অট্টহাসদেবীব মন্দিব বলে অন্য ব্লকেব সঙ্গে খুব একটা যোগসূত্র নেই। আহমদপুব কাটোযা ছোট লাইনেব পাঁচন্দী ষ্টেশনে নেমে বিক্সা নিযে বা হেঁটে যাওযা যায অট্টহাস দেবীব মন্দিব। ঐ বাস্তাটিবও নাম অট্টহাস বোড।



শ্রীমন্তের চণ্ডীমন্দিব

কোগ্রামের মঙ্গলচণ্ডী

মঙ্গলকাব্যের মনোহর উজানি নগরী আজকে অজয়ের তীরে কোগ্রাম। একান্ন পীঠের অন্যতম একটি পীঠ। এখানে দেবীর কনুই পতিত হয়েছিল। তাই শাক্ত সম্প্রদায়ের কাছে কোগ্রাম একটি শক্তিপীঠ। কেউ কেউ বলেন কোগ্রামের এই চণ্ডী হলেন শ্রীমন্তেব চণ্ডী দেবী। শ্রীমন্ত নাকি পিতার খোঁজে সিংহল যাত্রা করার পূর্বে এই উজানি নগবে দেবীপূজা করেছিলেন।

দেবীর মন্দিরটি খুবই প্রাচীন। দেওয়াল ছোট ছোট ইঁট ও ছাদ খিলান দিয়ে চুন সুরকি দিয়ে গাঁথা। মূর্তি হলো বহুভুজা ধাতুমূর্তি। মন্দিরের ভিতর এক কোণে একটি কাঠের বেদী, তার উপর আছে এক পাথরের লিঙ্গ শিব। এটি হলেন দেবীর ভৈরব। দেবী শক্তি থাকলেই তার ভৈরব থাকে। বৰ্দ্ধমানের পাঁচটি পীঠের প্রত্যেকটাতেই এই ভৈরব বিভিন্ন নামে বিরাজমান। এই গ্রামে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মস্থান। অজয় ও কুনুরের সঙ্গমস্থল এখানেই। দেবীর সেবাইতরা মন্দিরের পাশেই থাকেন। নিত্যপূজা হয় এবং দুর্গাপূজার সময় দেবীর ধূমধামে পূজা হয়। তখন গ্রামদেবতার' রূপ নেয়।

দধিয়ার গোপালদাস ও রঘুনাথ জিউ

কেতুগ্রাম ১নং ব্লকের দধিয়া একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্ণী-মা কাঁদড়ের (ছোট নদী বা খাল) উত্তরে অবস্থিত। বৰ্দ্ধমান থেকে পালিটা-বাকলসা রুটের বাসে রতনপুর-পীরতলায় নেমে হেঁটে বা রিক্সাতে দু কিলোমিটার গেলেই দধিয়া পাওয়া যাবে। এই গ্রামেব প্রেমময় গোপালদাস প্রতিষ্ঠিত 'রঘুনাথ জউ' এই দধিয়ার গ্রামদেবতা। এখন অবশ্য ভক্তরা ঠাকুর গোপাল দাসকেও স্মরণ করেন, পূজা করেন যুগ্মভাবে।

গোপালদাস বাবাজী পরম বৈষ্ণব, জন্ম ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে। তখন কোপাই নদীর অববাহিকা এই পূর্ণী-মা কাঁদড়ের চতুঃস্পার্শ্বস্থ কেতুগ্রাম এলাকা ছিল ঘন বন জঙ্গলে পূর্ণ। এখানে এসে বন কেটে বসত করলেন ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গোপালদাসজি। গোপালদাসের পিতৃস্থান হল বৃন্দবন। পরে মুর্শিদাবাদের সৈদাবাদে এই বংশের পূর্বপুরুষ এসে বসবাস করেন। প্রথম তিনি সন্তেরাম আউলিয়ার কাছে দীক্ষা নেন। পরে তীর্থ পরিক্রমায় বের হয়ে গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখন্ড, ঝামাটপুর নানুর ঘুরে এই দধিয়ার নির্জন অরণ্যে আসেন ও এই স্থানটিকে তিনি সাধন ভজনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে এখানেই কুটির বাঁধেন। বৰ্দ্ধমানের রাজা তিলকচন্দ এই বৈষ্ণব সাধক বৈরাগীকে পঁচিশ একর জমি দান করেন। এ বছরই গোপাল দাস 'রঘুনাথ জিউ' দেবতার মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা শেষে অন্নোৎসব হয়। গোপাল দাসের নামগানে ও প্রেমের আকর্ষণে শত শত বৈষ্ণব

ও ভক্ত অসতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে লাগল গ্রাম। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় গোপালদাস শিষ্যদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে অন্নভিক্ষা করে এই আশ্রমে নিরন্ন, ক্ষুধার্ত ও আর্তের মুখে তা তুলে দিয়েছিলেন তাই তিনি 'প্রমময়'। এখানে গোপালদাসের সমাধিও আছে। রঘুনাথ জিউ'-র প্রতিষ্ঠাকালে সেই থেকে সরস্বতী পূজাব পরের শুক্লা সপ্তমীতে প্রতিবৎসর তিন দিনের এক বিরাট উৎসব ও মেলা হয়। আর্ত্ত, পীড়িত ও ভক্তদের অন্নদান করা হয়। অনুষ্ঠান ও মেলা হয়। অনুষ্ঠান তিনদিনের হলেও প্রায় মাঘের শেষ পর্যন্ত চলে। এলাকাটির নাম হয়ে যায় দধিয়া-বৈরাগীতলা। কীর্তন, বাউল, রামায়ণ গানের আসর বসে। লক্ষাধিক লোক সমাগম হয়, এই এলাকার 'দধেবোরেগী'র মেলাই সবচেয়ে বৃহৎ। প্রেমের ঠাকুর প্রেমময় গোপালদাসজী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'রঘুনাথ জিউ' সব শ্রেণীর মানুষের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র।

উদ্ধারণপুরের দ্বাদশ গোপাল

কেতুগ্রাম ব্লকের ভাগীরথীর তীরে প্রাচীন একটি গ্রাম উদ্ধারণপুর। পূর্ব্বনাম নৈহাটি গড়। পাঁচশ বছর আগে চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্যদ উদ্ধারণ দত্ত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কৃপালাভ করে সাধন ভজনেব জন্য নৈহাটি গ্রামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তার নাম বৈষ্ণব খন্ড। প্রথম জীবনে উদ্ধারণ দত্ত ছিলেন পার্শ্ববর্তী নৈরাজার মন্ত্রী, বাড়ি সপ্তগ্রামে। নৈরাজার রাজধানী ছিল নৈহাটিগড়ে।'নৈরাজার' কোন সন্তানাদি না থাকায় উদ্ধারণ দত্তই রাজ্যর সর্বে সর্বা হয়ে পড়েন। এই সময়ই তিনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভ করে দীক্ষা নেন এবং শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের সঙ্গে পরিক্রমায় বের হন। তারপর উদ্ধারণ দত্তের জীবন নূতন খাতে প্রবাহিত হয় এবং উদ্ধারণ দত্ত বৈষ্ণব সাধকে পরিণত হন। ভাগিরথীর তীরে ভক্তগণ যে ঘাট নির্মাণ করে ছিলেন সাধক উদ্ধারণের নামে তা আজ 'উদ্ধারণপুরের ঘাট' নামে খ্যাত। আর বৈষ্ণবখন্ডে আশ্রমে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ সহ দাদ্বাশ গোপাল আজও বিরাজমান। দ্বাদশ গোপালের অন্যতম হলেন উদ্ধারণ দত্ত।

ঠাকুর উদ্ধারণ সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী জড়িয়ে আছে। ঠাকুর আহ্বানে নাকি মা গঙ্গা কুমারীর বেশে দেখা দিয়েছিলেন এবং যেখানে শাঁখারীর কাছে শাঁখা পড়েছিলেন— গঙ্গাতীরে সে গ্রামের নাম হয়ে যায় শাঁখাই। উদ্ধারণপুর নামটি উদ্ধারণ দত্তের নামানুযায়ী বলে মনে করলেও আনেকে বলেন গঙ্গারতীরে এই স্থানটি রমনীয় উদ্যানের মত ছায়া সুনিবিড় ছিল। তার থেকে অপভ্রংশিত হয়ে উদ্যানপুর-উদ্ধাণপুর-উদ্ধারণপুর হয়েছে। উদ্ধারণ দত্তের সঙ্গে গ্রামের নামটির মিল কাকতালীয়। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে নদীপথে চাঁদসদাগরের যাত্রাপথের যে বর্ণনা পাই, তাতে ভাগীরথীর তীরে তীরে অনেক প্রাচিন গ্রামের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে নৈহাটি ও উদ্যানপুরের নাম পাওয়া যায়।

দ্বাদশ গোপালের বিগ্রহ দারুনির্মিত। ঠাকুর উদ্ধারণ সেই গোপালদের অন্যতম। তাঁর আবির্ভাব উৎসব খুব ধূমধামে হয়। উত্তরায়নে মাঘমাসের প্রথম তারিখে আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। যেখানে ঠাকুর উদ্ধারণের সমাধি আছে সেখানে পৌষ সংক্রান্তির দিন ঠাকুরের শ্রাদ্ধ হয়। দই-চিঁড়ে ও ফলমূল ভোগ হয়। বহু বৈষ্ণবভক্ত দেশ বিদেশ থেকে এখানে আসেন। সাতদিন ধরে মেলা হয়। দৈনিক অন্নকূট ভোগ হয়— ভক্তরা তার প্রসাদ পান। কীর্ত্তনিয়া, বাউল গান গেয়ে মাতিয়ে তোলেন। তাই এটি একটি বৈষ্ণবপীঠ।

কান্দরার কোঁদড়া 'রাধাগোবিন্দ' ও 'সা-সাহেব'

কেতুগ্রাম ১নং ব্লকের অধীন কান্দারা বা কাঁদড়া একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কাটোয়া আহমদপুর ছোটলাইনের ষ্টেশন জ্ঞানদাস কাঁদড়া। এখানে নেমে এক কিলোমিটার হাঁটলেই কাঁদড়া। বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের জন্মভূমি এই কাঁদড়া। চৈতন্যোত্তর কালে ষোড়শ শতাশব্দীর মধ্যভাগে যে কয়জন পদকর্তা স্মরণীয় ও বরণীয়, তাদের মধ্যে জ্ঞানদাস একটি উজ্জ্বল নাম। জ্ঞানদাস বর্দ্ধমানের শুধু নয়, বৈষ্ণব কাব্যকাননে একটি স্মরণীয় নাম।

অনেক অলৌকিক কাহিনী জ্ঞানদাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কাঁদড়াতে জ্ঞানদাসের সাধনপীঠ 'জ্ঞানদাসপাট' নামে এখন পরিচিত। জ্ঞানদাস প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের মূর্তি আছে। ভক্তগণ বিগ্রহেব পূজা কবেন।

পৌষ সংক্রান্তিতে তিনদিন জ্ঞানদাস তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে ধূমধামে রাধাগোবিন্দজির পূজা হয়। বহু বৈষ্ণবভক্ত নবদ্বীপ, কাটোয়া ও বীরভুম থেকে আসেন। ছোট আকারের মেলা জমে ওঠে। সারাদিন ধরে হরিনাম সংকীর্তন, ধর্মালোচনা, ভগবত পাঠ প্রভৃতি হয়। নামকরা কীর্তনের দল আসে, পদাবলী গায়ক ও কদিন বৈষ্ণবভক্তির প্লাবনে ভেসে যায় কাঁদড়া।

কাঁদড়ার মঙ্গলঠাকুরের 'রাধাকৃষ্ণের' র যুগলমূর্তি উল্লেখযোগ্য দেবতা। মঙ্গল ঠাকুরের আদি নিবাস মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে। সেখান থেকে বৈরাগী হয়ে গ্রাম ছাড়েন। এ দেশ, সে দেশ ঘুরে অবশেষে এই নির্জন কাঁদড়ের ধারে কুটির বেঁধে সাধনভজন সুরু করেন। এই গ্রামেই পুকুর কাটার সময় রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সাধনভজন করতে থকেন। স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ দেব ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে কাটোয়াতে কেশব ভারতীর কছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেবার পর রাঢ় বর্দ্ধমান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি ভাগিরথীর তীরে ধরে কেতুগ্রাম অতিক্রম করে কাঁদড়ায় এসে পৌছান ৩রা মাঘ। ঐদিন রাত্রে তিনি মঙ্গলঠাকুরের আশ্রমে আশ্রয় নেন। সঙ্গে ছিলেন গদাধর, উৎসব হয়, সাড়াম্বরে। গৌরাঙ্গের নামানুসারে স্থানটির নাম 'গৌরাঙ্গপাড়া'।

আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল বৈষ্ণবদের 'সাঁঝি পরব' মঙ্গলঠাকুর ৬০০ বছর আগে বৈষ্ণবদের নিয়ে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে সন্ধ্যেবেলায় এই উৎসব শুরু করেছিলেন, শেষ হত মহালায়ার দিন। এখন ও মন্দিরের মাঝে বালি দিয়ে মন্ডপ সজ্জা হয় কলাগাছ, আমশাখা আর ফুল দিয়ে। সেই সঙ্গে ভাগবত পাঠ ও খোল করতাল বাদ্যে কীর্তন উৎসব প্রাঙ্গণে জোয়ার আনে। মাতিয়ে দেয় বৈষ্ণবদের। সাঁঝবেলার পরব বলে এর নাম সাঁঝি পরব।

আর আছে 'সা-সাহেব' পীর সিউড়ি কাটোয়া রাস্তার ধারে এক প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নীচে আছেন 'সা-সাহেব' পীর। 'সা-সাহেব' ছিলেন মুসলমান, সিদ্ধ ফকির। আড়াইশ বছর আগে কাঁদড়ায় এসেছিলেন, তখন নাম ছিল নয়নশা দরবেশ। এই বুড়ো পীর নাকি শিবঠাকুর ছিলেন। সোবাইতরা সবাই মুসলমান হয়ে যাওয়ায় ঠাকুরও হয়ে যনে বুড়ো পীর। অনেক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায় বুড়ো শিবের।বুড়ো শিবের সেবাইত ছিলেন গ্রামের খাদিম বংশধরগণ। খাদিমরা মুসলমান ধর্ম গ্রহন করেন কি কারণে তা কেউ বলতে পরেন না। অনেক বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনায় বুড়ো ঠাকুরের কাছে মানত করে পুত্রবতী হয়েছেন। তাই 'বুড়ো পীর' হিন্দু-মুসলমান সবার পুজো পান– এ এক আশ্চর্য সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি।

শ্রীপুরের ধর্মরাজ

কেতুগ্রাম ১নং ব্লকের ছেট্ট একটি গ্রাম শ্রীপুর, আনেক কিম্বদন্তী বুকে করে বেঁচে আছে। এই গ্রামের উত্তর পশ্চিমে 'বাণনাগরার মাঠ' বা 'আয়মার মাঠ' নামে এক বিশাল প্রান্তর ও অরণ্য আছে। কথিত আছে প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে এখানে রাজত্ব করতেন এক পরাক্রমশালী রাজা—'বাণ'। তাঁর নাম থেকেই এই মাঠের নাম 'বাণনাগরার' মাঠ। কোন দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেই রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং মাটির তলায় সম্ভবতঃ চাপা পড়ে যায়ে। কালক্রমে জঙ্গলে পূর্ণ একটি ডাঙ্গায় পরিণত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করলে নিশ্চয়ই পুরাতন শহর জেগে উঠবে। এখন বনজঙ্গল কেটে শ্রীপুর গ্রামের পত্তন হয়েছে। পাশাপাশি ছোট ছোট কয়েকটি গ্রাম রয়েছে।

এই বাণনাগরার জঙ্গলে বহু বছর আগে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়। অনুমান করা হয়, ভগ্নমন্দির ও ধ্বংসস্তূপ পঞ্চদশ ষোড়শ শতকের পূর্বেকার বৌদ্ধদের ধর্মরাজ ও শিব। রাণীভবানী এই ধ্বংস স্তূপের পাশেই নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করে 'শিব ও কালীমূর্তি' স্থাপন করেন। প্রাচীন কালের ধর্মরাজের পূজা এখনও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় আষাঢ় মাসে। আষাঢ়ের নবমী তিথি থেকে পূজা ও মেলা হয় দুদিন ধরে বেশ ধূমধামে। আর ২৫ শে চৈত্র থেকে সুরু

হয় শিবের গাজন, চলে চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত। ২৭ শে ও ২৮শে চৈত্র 'বোলান' গানের আসর বসে। কাটোয়া ও কেতুগ্রামে 'বোলনগান' হল প্রধান লোক সংস্কৃতি। এখন এই গান ক্রমশঃ চর্চা ও আগ্রহের অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। আর সংক্রান্তির দিন বেরোয় 'গাজনের সঙ'। সে এক হৈ-হৈ ব্যাপার। রামায়ণ, মহাভারত ও রূপকথার গল্প ও চরিত্র নিয়ে রচিত হয় এই সঙ। চরিত্র গুলির বিভিন্ন ধরণেব মুখোস তাদের চটুল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমা ও পরিহাস রসিকতাই সঙের বিষয়বস্তু।

সিঙ্গির ক্ষেত্রপাল ও বুড়োশিব

কাটোয়া ২নং ব্লকের অন্তর্গত 'সিঙ্গি' বর্ধিষ্ণু ও প্রাচীন গ্রাম। বর্দ্ধমান থেকে দাঁইহাট ভায়া কাটোয়া বাসে সিঙ্গি যাওয়া যায়। বাংলায় মহাভারত রচয়িতা কাশীরাম দাসের জন্মস্থান এই সিঙ্গি গ্রামে। এই গ্রামের গ্রামদেবতা 'ক্ষেত্রপাল' হালেন একটি প্রাচীন বটগাছ। 'ক্ষেত্রপালেব' কোন মূর্তি ছিল না, সম্ভবতঃ একটি বেদীতে ঘটে পূজা হত। কালক্রমে সেই বেদীর উপর বটগাছ লগানো হয়, এখন ঐ বটগাছই 'ক্ষেত্রপাল' দেব। ক্ষেত্রপাল যে বহুপ্রাচীন তা কাশীরাম দাসের মহাভারতের রাজসূয় যজ্ঞে উল্লেখ আছে: 'ঊনকোটি দানা লয়ে আসে ক্ষেত্রপাল'।

ক্ষেত্রপালের পূজো চারশ বছরের প্রাচীন। সপ্তাহের শনি ও মঙ্গলে পাঁঠা বলি হয়। কিন্তু বড় ধরণের উৎসব হয়, আষাঢ় মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে। ষোড়শ উপচারে ধূমধামে পূজা হয়। মানতের ছাগল, ভেড়া, শূয়োর,পাঁঠা বলি হয় বহু। সকালে পূজা হয় বটগাছের চতুর্দিকে ঘট স্থাপন করে। পুজা করেন সিঙ্গি গ্রামের শুড়ি সম্প্রদাযভুক্ত 'সাহা' পদবীধারী। তাঁরাই ঘট আনেন, পুজা করেন, আরতি করেন। এক সপ্তাহ ধরে বিরাট মেলা বসে। প্রাচীন ইন্দ্রানী পরগণার অন্তর্গত এই সিঙ্গিগ্রাম। সিঙ্গিতে আর এক গ্রামদেবতা হলেন 'বুড়োশিব'। কথিত আছে প্রায় পাঁচশ বছর আগে দাঁইহাট ও নাওপাড়ার কাছে আগ্রা নামে এক বিশাল জঙ্গল ছিল। এই জঙ্গলের মধ্যে 'সরবেশ' নামে এক দীঘির মধ্যে অবস্থান করছিলেন বৃদ্ধশিব। সিঙ্গি গ্রামের কয়েকজন ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ঐ দীঘির গর্ভ থেকে বুড়ো শিবকে উদ্ধার করে সিঙ্গি গ্রামে, প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাড়ার উত্তর পশ্চিম কোণে এক মাটির ঘরে। নিত্য সেবার ও ব্যবস্থা আছে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক ভক্ত গঙ্গানন্দ বন্দ্যোপাধায় গ্রামের মধ্যস্থলে নয় চূড়ার এক বিশাল শিবমন্দির তৈরী করান।

গাজনের দিন শিবকে এই মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। আড়াই ফুট উচু কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গকে এইভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ঘটনা বিরল। বুড়ো শিবের গাজন হয় ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে তিন চার

দিন ধরে মেলা বসে—লোক সমাগমে অঞ্চলটি কেঁপে ওঠে। কয়েক হাজার লোক মেলায় কেনাবেচা ও পুণ্য সঞ্চয় করেন।

চৈতন্যপুরের শৈলেশ্বর শিব

এই মহাকুমায় চৈতন্যপুর গ্রামটি সমৃদ্ধ। এর গ্রামদেবতা হলেন 'শৈলেশ্বর'। কথিতে আছে, প্রায় চারশ বছর আগে এই গ্রামে হরিঘোষ নামে এক গোয়ালা বাস করতেন। তার একটি দুধেল কালো রঙের গাভী ছিল, দুধ দিত প্রচুর। একদিন হরিঘোষ দেখলেন, গাভির বাঁট থেকে দুধ পাওয়া গেল না । কে যেন সব দুধ টেনে নিয়েছে বাঁট থেকে। পরদিন গাভীর পিছু পিছু অনুসরণ করে হরিঘোষ দেখলেন, বনের মধ্যে শিবলিঙ্গের উপর গাভী দাঁড়িয়ে এবং বাঁট থেকে ঝড়ে পড়ছে দুধ সেই শিবলিঙ্গের উপরে। হরিঘোষ বেগে অগ্নিশর্মা হয়ে পাথর নিয়ে ঐ শিবলিঙ্গের মাথায় আঘাত করে চুবমাব করতে থাকেন লিঙ্গটি। সঙ্গে সঙ্গে শিব মনুষ্য মূর্তি ধারণ করেন, হরিঘোষ ঠাকুরের চরণে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও কাঁদতে থাকেনঃ

একসের মাপি দুগ্ধ দিব প্রতিদিন।।
মদন চর্তুদশীতে আঘাত কারণ।
শিরেতে ঢালিব তব দুগ্ধ একমণ।।

সেই থেকে হরিঘোষের বংশধররা একমণ দুধ ঢেলে থাকেন মদন চর্তুদশীতে। বেশ কিছুদিন বাদে ঐ দেবস্থানে গ্রামবাসীগণ যেয়ে দেখেন বাবার দেউল ভেঙ্গে খান খান হয়েছে এবং বহু সর্প ফণাতুলে ফুঁসছে। সেই রাত্রেই রায়চৌধুরী পরিবারে স্বপ্নাদেশ হল :

"ছাদহীন বেদী হবে চতুর্দিকে ফাঁকা।
উন্মুক্ত দরজা লয়ে থাকিব রে একা।
তালের ছাতা, বাঁশের বাঁট বর্ষায় দিবি।
শীতেতে দোলাই করে গায়েতে পরাবি।।

সেই থেকে বাবার মন্দিরের ছাদ খোলা। প্রায় কুড়ি ফুট উচুঁ স্তূপের উপর বাবাকে স্থাপন করা হয়েছে, সেই কারণেই নম 'শৈলেশ্বর'। রায়চৌধুরী পরিবারের তৎকালীন রাজা এই ভাবে মন্দির নির্মাণ করান।

পূজা হয় মদন চতুর্দশীতে ধূমধামে। হরিঘোষের বংশধরগণ পূর্বে বাবার মাথায় বত্রিশ সের দুধ ঢালতেন। এখন দুধের আকাল, নামমাত্র একঘটি দুধ বাবার মাথায় ঢালা হয়। শিবচতুর্দশীতে খুব ধূমধামে মেলা হয়। বর্ষাকালে বাঁশের বাঁট ও তালপাতার বড় ছাতা বানিয়ে মাথার উপর দেওয়া হয়। বাবার মাহাত্ম্য আছে—আনেক দুরারোগ্য

ব্যাধি যেমন,অম্ল-পিত্ত জনিত অসুখ, হাঁপানী, সর্দি, বাত-বেদনা উপশম হয়। বন্ধ্যা নারীর পুত্র-সন্তানও নাকি সম্ভব হয়। বর্তমান মন্দিরটি সংস্কার করেছেন কিরণময়ী দেবী।

হাতে দেওয়া হয় বেলগাছের দণ্ড ও কাঁধে বৈরাগীর ঝোলা—সন্ন্যাসীর যে বেশে গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেছিলেন। ২রা মাঘ আবার শ্রীগৌরাঙ্গকে রাজবেশ পরানো হয়। প্রতি তিন বছর অন্তর অঙ্গরাগ হয়, সে সময় মন্দির বন্ধ থাকে। এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা গদাধর গোস্বামীর তিরোভাব দিবসটিও নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণবরা পালন করেন। শ্রী গৌরাঙ্গের ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা ও সন্ন্যাস গ্রহণ পর্ব্বোপলক্ষে কাটোয়ায় বহু ভক্তের ও বৈষ্ণব সাধকের সমাবেশ ঘটে। দিবারাত্র নাম সংকীর্ত্তন হয়, বড় বড় কীর্ত্তনীয়ার দল আসেন। হরিনাম সঙ্কীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে গৌরাঙ্গ পাড়া। মেলাও বসে তিন দিনের।

কাটোয়া-দাঁইহাট রাস্তার ধারে কাটোয়া থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে মাধাইতলা আশ্রম। যেখানে জগাই-মাধাই শ্রীগৌরাঙ্গকে কলসীর কানা ছুঁড়ে মেরেছিলেন। সেখানে একটি মন্দিব রীত করে জগাই-মাধাইকে পূজা করার ব্যবস্থা হয়েছে। দস্যু জগাই-মাধাই শেষকালে মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ শিষ্য হয়ে এখন দেবতা রূপে পূজিত হচ্ছেন। মন্দিরেব প্রবেশ পথটি সিংহদ্বার। গৌরাঙ্গ মন্দির প্রাঙ্গণের মত এখানেও অনেকগুলি সমাধি আছে—ত্রিভঙ্গ দাস, চরণ দাস বৈষ্ণব সাধকদের অখণ্ড নাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা আছে। যেদিন জগাই-মাধাই প্রভুকে কলসীর কানা মেরে আবার পায়ে লুটিযে পড়েছিলেন—সেই দিনটিতে উৎসব হয়। পাশ দিয়ে বহে চলেছে ভাগীরথী।

দুর্গাপুর মহকুমা

পাণ্ডবেশ্বরের পাণ্ডবনাথ

অণ্ডাল-সাঁইথিযা লাইনের একটি ষ্টেশন পাণ্ডবেশ্বর। অজয়নদের তীরে, মনোরম একটি গ্রাম। কথিত আছে, মাতা কুন্তী পঞ্চপাণ্ডব সহ এই গ্রামে বাস করেছিলেন এবং পঞ্চভ্রাতা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে জীবিকার অন্ন ভিক্ষে করে আনতেন। প্রত্যেকভাই এর নামে একটি করে পাঁচটি ও মাতা কুন্তীর জন্য একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই গ্রামে পাঁচটি শিবলিঙ্গকে একসঙ্গে বলা হয় পাণ্ডবনাথ। মন্দিরে শিব ছাড়াও ভৈরব ও হনুমানের মূর্তি আছে। পুরাতন আম, জাম, কাঁঠাল, তমালের বনে ভর্তি এই পাণ্ডবেশ্বর নির্জন ও নয়নমুগ্ধকর। পাণ্ডবনাথের সেবা ও নিত্যপূজার ভার নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মোহন্তজীর উপর। প্রায় চারশ বছর আগে বর্দ্ধমান মহারাজ মন্দির সংস্কার করিয়ে মোহন্তদের উপর এই দায়িত্ব দেন। প্রাচীন কাগজপত্র এর সাক্ষী। প্রতি

বছর পৌষ সংক্রান্তিতে ধুমধামে পূজা হয়। চতুর্দিক থেকে লোকজনের আনাগোনায় নির্জন গ্রাম গমগম করে। আর বড় মেলাও বসে। দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা পঞ্চপাণ্ডবের আবাসস্থলে এসে ভীড় জমান। যেহেতু পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীর স্মৃতি বিজড়িত সেহেতু গ্রামখানি শিহরণ জাগায়।

ভরতপুরের ধর্মরাজ

বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে শিব ও ধর্মরাজ। রাঢ় বৰ্দ্ধমানের প্রত্যেকটি গ্রামে হয় শিব, নয় ধর্মঠাকুর বিরাজ করছেন অতীত স্মৃতি বুকে নিয়ে। রাঢ়ের অধিদেব ছিলেন ধর্মরাজ ও ধর্মঠাকুর, আর অধিদেবী ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী-কোথাও কেতকা, কোথাও বহুলা, কোথাও বাশুলি, কোথাও রঙ্কিনী, কোথাও চণ্ডী বা মনসা। এই ধর্মরাজই গ্রামদেবতা কেননা তিনি রাজশক্তির প্রতীক। মল্লসারুল তাম্রপটের সীলে যে মূর্তি আছে তা ধর্মের মূর্তি। তাম্রপটের প্রথম শ্লোকে ধর্মঠাকুরের বন্দনা আছে। এই সব লক্ষ্য করেই ধর্মমঙ্গল কাব্যে কবি বলেছেন :

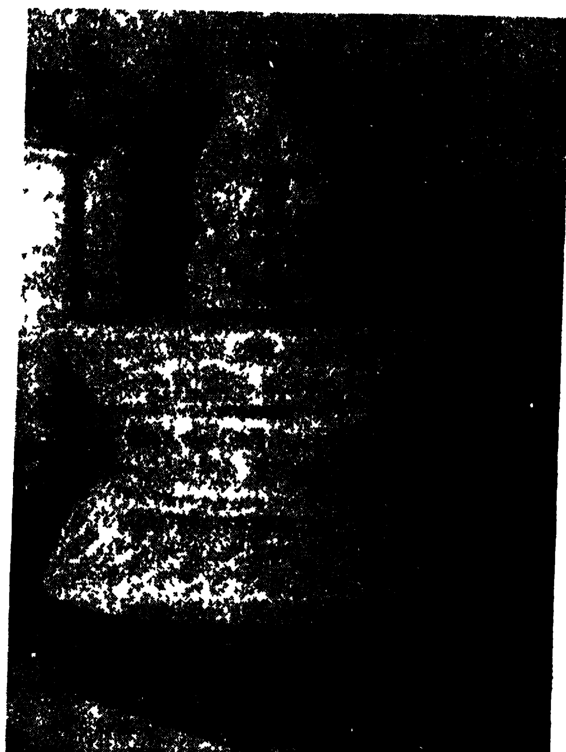
'বৰ্দ্ধমান দেশভাই সবাকার নাভি'

একথার প্রমাণ মিলেছে দামোদরের তীরে অবস্থিত কাঁকসা ব্লকের ভরতপুরের বৌদ্ধস্তূপ আবিষ্কারের ফলে। আর আশ্চর্য, এই গ্রামের লৌকিক দেবতা হলেন ধর্মরাজ। ধর্মরাজের শিলামূর্তি রয়েছে ভরতপুরের ধর্মরাজের চারদিকে—গণেশ, শিব, দুর্গা ভৈরব, ছিন্নমস্তা, কালী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি শিলামূর্তি আছে। ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন বাবা ধর্মরাজ।

বৈশাখের বুদ্ধ পূর্ণিমায় অন্যান্য জায়গার মত ধর্মরাজের গাজন হয় এবং তিনদিন ধরে বিরাট মেলা বসে। সে সময় পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে দু-তিন হাজার লোক এই মেলায় জমায়েত হয়।

রাঢ়েশ্বরের শিবঠাকুর

দুর্গাপুর মহকুমার অন্তর্গত কাঁকসা থানার গোপালপুর এবং আড়রা গ্রামের কাছে রাঢ়েশ্বরের শিবমন্দির। রাঢ়রাজ ভুবনেশ্বর রায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভুবনেশ্বর ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। দুর্ধর্ষ মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতকে কোনরকমে এঁটে উঠতে না পারে ভুবনেশ্বর এই বিরাট শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে প্রোথিত করেন এক বিরাট শিবলিঙ্গ। তারপর মহাধুমধামে শিবের পূজা করে তাঁর নাম নিয়ে ভাস্করকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতও ছিলেন শিবভক্ত। তিনি শিবভক্ত হয়ে কেমন করে অপর শিবভক্তের সঙ্গে যুদ্ধ করেন? কাজে কাজেই রাঢ়রাজ ভুবনেশ্বরের সঙ্গে সন্ধি করলেন। জনশ্রুতি, কৌশলে দুর্ধর্ষ মারাঠা পণ্ডিতকে



অষ্টমুখ লিঙ্গ শিব

লুটতরাজ, সন্ত্রাস ও হামলাবাজি থেকে এভাবে নিবৃত্ত করেন রাঢ়রাজ। সেই থেকে রাঢ়রাজ রাঢ়েশ্বরেব নামেই রাজ্য চালাতে থাকেন। এই হিসেব ধরলে মন্দিরটি সাড়ে চারশ বছরের পুবাতন। আবার কেউ কেউ বলেন আউসগ্রাম থানার অমরার গড়েব ভল্লুপদ ঘোষ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কাঁকসা ও আউস গ্রাম মিলে ছিল গোপভূমি। গোপরাজাদের পরাক্রম ঘোষণাই হল রাঢ়েশ্বরের শিব মন্দির। গোপরাজাগণ দশম-একাদশ শতাব্দীর গোপভূমির অধীশ্বর ছিলেন। এই হিসেব ধরলে মন্দিরটি হাজার বছবের পুরাতন। রাঢ়েশ্বর হলেন রাঢ়ভূমির ইষ্ট দেবতা। মন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত। উত্তর ভারতীয় ধাঁচে 'ল্যাটেরাইট' এবং 'বেলে' পাথর দিয়ে তৈরী। শিবলিঙ্গটি বেশ বড়। গঠনে আয়তকার—সাতটি ভাগে বিভক্ত, শিখরের শীর্ষদেশ গোলাকার না হয়ে তীক্ষ্ণ। মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় পঞ্চাশফুট ও প্রশস্ত পঁচিশ ফুট। প্রাচীন প্রস্তর স্থাপত্যের একটি সাক্ষী।

যেহেতু শিব সেহেতু চৈত্রমাসে মহাধুমধামে গাজন হয়। তাছাড়া শিবরাত্রিতে

মাঘী চতুর্দশীতে বিরাট মেলা বসে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে সাধু সন্ন্যাসীরাও আসেন। কিম্বদন্তী, মন্দিরের পাশেই পড়েল দীঘিতে প্রাচীনকালে শিবঠাকুর নিজের পূজার উপকরণ নিজেই জুগিয়ে দিত। কালের গতিতে সেসব কাহিনী বর্তমানের চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে। রাঢ়েশ্বরের কাছে মানত করলে মনোবাঞ্ছা নাকি পূর্ণ হয়। তাই ভক্তগণ গাজনে সন্ন্যাসী হয়ে এবং দণ্ডী খেটে শিবকে তুষ্ট করেন। এখন চতুর্দিকে জঙ্গল, তবু নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে।

দেবী শ্যামারূপা

দুর্গাপুর মহকুমার অন্তর্গত কাঁকসা থানার বিষ্ণুপুর মৌজার প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে শ্যামারূপার মন্দির অবস্থিত। শ্যামারূপার দক্ষিণে গোপালপুর গ্রাম এবং কাছেই রাঢ়েশ্বর শিবমন্দির। দুর্গাপুর নগরীর প্রবেশ পথের মুচিপাড়া থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে মুচিপাড়া-শিবপুর পাকা রাস্তার ধারে বাঢ়েশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত। কাজেই এই পথে গেলে রাঢ়েশ্বর ও শ্যামারূপা দর্শনের সুযোগ হবে। শ্যামারূপার মন্দিরটিও ঘন জঙ্গলের মধ্যে, শাল পিয়ালের বনে মনোরম ও দর্শনীয়। বাংলার পাল রাজত্বের শেষ দিকে এই মন্দির নির্মাণ করেন ইছাই ঘোষ। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' থেকে জানা যায়, গোপরাজ সোম ঘোষের (মতান্তরে ধবল ঘোষ) পুত্র ইছাই ঘোষ নিজ শৌর্য ও পরাক্রমে গোপরাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি তাঁর রাজধানী পত্তন করেন, নাম হয় ঢেকুর গড়। ইছাই ছিলেন শ্যামাভক্ত। তাই তাঁর আরাধ্য দেবী শ্যামারূপা। দেবীর আরাধনা করে যুদ্ধে গেলে ইছাই ঘোষকে হারানো ছিল দুঃসাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাউসেনের কাছে ইছাই ঘোষ হেরে যান। লাউসেন ছিলেন বৌদ্ধ এবং ইছাই ছিলেন শাক্ত—এই দুই ধর্মের দ্বন্দ্বে ইছাই ঘোষের সেনাপতি কালু ও স্ত্রী লক্ষ্মী শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

মন্দিরটি প্রায় সাত শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের দেওয়াল পোড়ামাটির ইটে তৈরী। ছাদ খিলানযুক্ত। শ্যামারূপার মূর্তি দশভূজার শ্বেত পাথরে তৈরী, উচ্চতায় এক ফুটের কিছু কম, দেওয়ালের সঙ্গে মূর্তি গাঁথা আছে। প্রায় হাজার বছরের প্রাচীন এই মন্দিরটি তখন ছিল অজয়নদের তীরে সেখান থেকে অজয় এখন প্রায় দু কিলোমিটার দূর দিয়ে বহে যাচ্ছে। মন্দির এলাকায় ধ্বংসাবশেষ থেকে অনুমান করা যায় যে মন্দিরটি বড় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। মন্দির থেকে সুরঙ্গপথ দুর্গাপুরের জঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এখন তা মজে গেছে। মন্দিরের ক্ষয় রোধের জন্য অজয় নদের দিকে বেলেপাথরের বাঁধ ছিল। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায় বিরাট উৎসব হয়। শ্যামারূপার পূজারী ও ভক্তরা এই উৎসবের আয়োজন করেন। দূর দূরান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থী আসেন, সে সময় মেলা জমজমাট হয়। জনশ্রুতি প্রাচীনকালে

দেবীপূজার মহাঅষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে দেবীর কৃপায় অলৌকিক তোপধ্বনি হত। এত পাঁঠা ও মহিষ বলি দেওয়া হত যে রক্তে নদীর ঢেউ খেলে যেত। তাই থেকে ইছাই ঘোষের এই গড়ের নাম হয় ঢেউ গড় বা ঢেকুর গড়। মা শ্যামারূপা এখন মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী। মানত করে পুণ্য লোভীরা মন্দিবের পাশে গাছের ডালে ইট বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে যান। এই-ই হচ্ছে রীতি।

মুচিপাড়-শিবপুর রাস্তা থেকে জামডোবা যাবার যে সড়ক তাই দিয়েই এখন জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরে আসেন লোকজন। রাঢ় বর্দ্ধমানে এই মন্দিরটি প্রাচীন স্থাপত্যের এক দুর্লভ নিদর্শন। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আর বেশিদিন এই মন্দির অক্ষত থাকবে না।

আসানসোল মহকুমা

বরাকরের কল্যাণেশ্বরী

বর্দ্ধমানের উত্তর পশ্চিমে শেষ প্রান্তের শহর বরাকর। আসানসোল থেকে ছাব্বিশ কিলোমিটার দূরে মাইথন পাঞ্চেত যাবার পথেই হাদলা পাহাড়ে রয়েছেন দেবী কল্যাণেশ্বরী। এই মন্দিরের নাম কল্যাণেশ্বরীর মন্দির। প্রায় পাঁচশত বৎসরেব পুরাতন এই দেবীমূর্তি পাথবের তৈরী।

পাঞ্চেতের রাজা কল্যাণ সিংহ পঞ্চদশ শতকে এই দেবী কল্যাণেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্মাণ করেন। রাজা কল্যাণের নামানুযায়ী দেবীর নাম হয় কল্যাণেশ্বরী। কথিত আছে, রাজা কল্যাণ সিংহ দেবীর স্বপ্নাদেশ পান, এক খালের জল থেকে বেরিয়ে আছে আভরণময় দুটি হাত। জনৈক ব্রাহ্মণ যেন এইকথা তাঁকে বলছেন। পরদিন রাজা নির্দিষ্ট একটি পাথর পান। এই পাথরের গায়ে দেবীমূর্তি খোদাই করা হয়। রাজা দেবীকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্চেত রাজা কল্যাণ সিংহ গড়জঙ্গলের সেনপাহাড়ীর রাজা লাউসেনের মেয়েকে বিবাহ করেন।

কল্যাণেশ্বরীর মন্দির এখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সামনেই রয়েছে পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধার। এই কল্যাণেশ্বরীর 'মায়ের স্থান' থেকেই উক্ত স্থানের নাম হয়েছে মাইথন যেসব পর্যটক ড্যাম দেখতে আসেন, তাঁদের কাছে কল্যাণেশ্বরী অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থান। এছাড়া স্থানীয় লোকজন যাঁরা ভক্ত তাঁরা দৈনিক পূজো দিতে আসেন। বছরের সব সময়েই মন্দিরে ভীড় লেগে থাকে। বিশেষ উৎসব হয় কার্তিকমাসে শ্যামাপূজার সময়। এই দেবীর কাছে মানত করে বহু বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হয়েছেন। এই লোক বিশ্বাসই দেবীকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। বলির পাঁঠা, সোনার গহনা

প্রভৃতি মানত করে থাকেন। তাই সব সময়ই মন্দির প্রাঙ্গণ ভক্তদের আনাগোনায় জম জমাট। বরাকর ষ্টেশন থেকে অটোরিক্সায় কল্যাণেশ্বরী সহজে যাওয়া যায়।

দামোদরপুরের ছাতাঠাকুর

জামুরিয়া ব্লকের ঝুমুরিয়া বাজার থেকে অণ্ডাল যাবার পথে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে এই দামোদরপুর। আদিবাসী সাঁওতালে ভরা এই অঞ্চলের গ্রামদেবতা হল ছাতাঠাকুর। মাঝি, মাণ্ডি, সরেণ প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত এই আদিবাসীগণ বহুদিন আগে সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর থেকে এসেছিলেন বেঙ্গল কোল কোম্পানীর কয়লা খনিতে কাজ করার জন্য। সম্ভবতঃ সেখানের এই 'পরবটি' বাংলা মুলুকে এনে এরা নূতন করে চালু করেছেন, যেমন দিল্লীতে বা আজমীড়ে বাঙালীরা পত্তন করেছেন কালীপূজার।

প্রতি বছর ১লা আশ্বিন এই ছাতাঠাকুরের পূজো হয়। প্রায় চল্লিশ ফুট বাঁশের টঙে একটি ছাতাকে বাঁধা হয়, কল্পনা করা হয় এটি বিশ্বকর্মার মাথার ছাতা। পার্শ্ববর্তী আদিবাসী ধাওড়া (কুলিদের চটি) থেকে পিল পিল করে আদিবাসী মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, বুড়ো সকলেই দল বেঁধে নাচতে নাচতে উৎসবে যোগ দেয়। এই মেলা পরিচালনা করেন আদিবাসী কল্যাণ সমিতি। মেয়েরা কোমর ধরাধরি করে ধূম্‌সোর তালে তালে নাচে ও গান গায়। তার সামনের সারিতে পুরুষরাও। সারা রাত ধরে হাঁড়িয়ার ফোয়ারা ছোটে। ছাতাঠাকুরের নীচে চতুর্দিক নাচ-গান ও ঢোল-মাদল-ধূমসোর বাজনায় মাতোয়ারা হত। পরদিন অর্থাৎ ২রা আশ্বিন ছাতা নামানো হয় এবং উৎসব ও শেষ হয়। ছাতাঠাকুরের কাছে যে যা মানত করে, পূজার সময় সে সব নিবেদন করা হয়। মানত হয় পাঁঠা, মুরগী, ছাগল ইত্যাদি। তাই পূজায় বলিও হয় খুব। ছাতাঠাকুরের পূজোয় লাগে একটি পাঁঠা, লাল মুরগী, লাল শালুর কাপড়, সাদা থান, দুধ, চিঁড়ে, গাঁজা, গাঁজার কল্কে, সামান্য মদ, ও মেটে সিঁদুর। দামোদরপুরের 'মারাডি' (মোড়ল) এসে পূজা করেন। পূজার শেষে হয় বলিদান। জমজমাট মেলার বৈশিষ্ট্য হল আদিবাসীদের হাতের কাজ। মাটির হাঁড়ি, কলসী, বাঁশের চুপড়ি, ফুলদানি, বেতের চেয়ার, টেবিল, সোফা প্রভৃতি। রাত্রে সাঁওতালী যাত্রার আসর বসে। সাঁওতালী নাটক খুবই ছোট ও ঘরোয়া কথোপকথনের মত।। পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমান কারিগরেরা ছাতা তৈরী করে দেন। কয়লাখনির বয়স যদি দুশ বছর ধরা যায়, তবে ছাতাঠাকুরেরও তাই।

রঘুনাথবাটির রাধেশ্যাম

আসানসোল শহরের কাছে রঘুনাথবাটি, জি, টি, রোডের বাইপাশ থেকে

এথোড়া যাবার রাস্তায় পড়বে রঘুনাথবাটি। এই গ্রামের রাধেশ্যাম হ্লেন গ্রামদেবতা। কাশীপুর মহারাজ নীলমণি সিং দেও এর বংশের কোন্ পূর্বপুরুষ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। রাধেশ্যামের অপর নাম রঘুনাথ জিউ—তাই গ্রামের নাম রঘুনাথবাটি। মন্দিরটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের পুরাতন। গ্রামে আছেন ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব, গোয়ালা, হরিজন। সবার দেবতা এই রাধেশ্যাম। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে মন্দিরটি, তাই গ্রামের সমস্ত পূজা-পার্বণ এই মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। নবান্ন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, হাতেখড়ি, উপনয়ন প্রভৃতি সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান রাধেশ্যামের মন্দিরে পুজো দিয়ে সুরু হয়। বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়।

মন্দিরটি দেখতে সুন্দর। গঠনশৈলী অপূর্ব। ছোট পাতলা পোড়া ইঁটে তৈরী। একটিই মাত্র চূড়া বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের ভাস্কর্যের ছোঁয়া আছে। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ২৬ ফুট, গায়ে টেরাকোটার কাজ আছে। সংস্কারের অভাবে জায়গায় জায়গায় ফেটে গেছে। সরকার যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করেন তবে অচিরেই কালের গর্ভে হারিয়ে যাবে।

গাড়ুই-এর বিষ্ণুমন্দির

আসানসোলের শহর থেকে উত্তর-পশ্চিমে পাঁচ কিলোমিটার গেলেই গাড়ুই গ্রাম। এই গ্রামে রয়েছেন গ্রামদেবতা বিষ্ণু। আসানসোল মহকুমায় এটিই একমাত্র পাথরের তৈরী মন্দির। বেলে পাথরে তৈরী, আকারে চতুষ্কোণ। উপরে ছাদের অংশ ক্রমশ হ্রাস হতে হতে খড়ের কুঁড়েঘরের চারচালার অবস্থা নিয়েছে। উচ্চতা প্রায় ৩৬ ফুট। বড় বড় চৌকো পাথর গেঁথে তৈরী হয়েছে দেওয়ালও মেঝে। চাতালটি বর্গাকৃতি, ২৫ ফুট হবে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে। মন্দিরের দক্ষিণের দরজায় কুলুঙ্গী ধরণের নক্সা।

বিগ্রহ নারায়ণ শিলা, মন্দিরের ভিতর পিতলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। নিত্যপূজা হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলে বিশেষ পাল পার্বণে যেমন অক্ষয় তৃতীয়া, দোলযাত্রা, ঝুলন পূর্ণিমায় জাঁকজমকে পূজা হয়। গ্রামবাসী সকলেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হন।

যেহেতু মন্দিরটি পাথরের, সেইহেতু প্রাচীন এবং সেদিক থেকে প্রাচীন স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে মন্দিরটি। সম্ভবতঃ পাল যুগের সময় এটি কোন সামন্ত রাজা তৈরী করেছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি সংস্কার করে পুরাতত্ত্ব বিভাগ গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. রাঢ়ের গ্রাম দেবতা– ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা
2. বর্দ্ধমান জেলার পুরাকীর্তি ও সংস্কৃতি– বর্দ্ধমান জেলা পরিষদ
3. বর্দ্ধমানের ইতিহাস– বলাই দেব শর্ম্মা
4. Bengal Dist Gazetteers, Burdwan– J. C. K. Peterson 1910
5. History of Bengal– J. Stewart
6. বাঙলার লোক সাহিত্য– (১ম খণ্ড) আশুতোষ ভট্টাচার্য
7. পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (৫ম খণ্ড)– সম্পাদনা– অশোক মিত্র ১৯৮২
8. বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত– অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৫
9. Statistical Account of Bengal– W. Hunter
10. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি– বিনয় ঘোষ
11. লোকসাহিত্য– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
12. পালসিট ভাবগত সমাজ– স্মরণিকা- ১৯৮৪
13. বর্দ্ধমান সম্মিলনী হীরকজয়ন্তী স্মরণিকা– ১৯৭৪

ষষ্ঠ পর্ব

প্রথম অধ্যায়

বর্দ্ধমানের পত্র-পত্রিকা

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সংবাদপত্র প্রকাশনায় বর্তমান ভারতের গর্ব। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় বাংলায়। সেই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্রটির নাম "বাঙ্গাল গেজেটি" এবং সেই পত্রিকার সম্পাদক হলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। যাঁর বাড়ি বর্দ্ধমানের পূর্বস্থলী থানার বহড়া গ্রামে। এ কম গৌরবের কথা নয়। সংবাদপত্রটি ছিল সাপ্তাহিক, বোধ হয় তৎকালীন ইংরাজীতে প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট' এর অনুকরণে গঙ্গাকিশোর নিজ পত্রিকার নাম রাখেন 'বাঙ্গাল গেজেটি'। কলিকাতার ১৪৫ নম্বর চোরবাগান ষ্ট্রীট থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে প্রকাশিত হয় এবং ১৫ই শুক্রবার বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাড়া হয়। তখন পত্রিকাটির মূল্য ছিল মাসিক দু টাকা। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের ৯ই জুলাই 'গভর্ণমেন্ট গেজেটে' গঙ্গাকিশোরের সহকর্মী হরচন্দ্র রায় যে দুটি বিজ্ঞাপন প্রচার করেন তাতে এই তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছিল। চোরবাগান ষ্ট্রীটের মুদ্রণ যন্ত্রটি পরিচালনা করতেন গঙ্গা কিশোরের উক্ত সহযোগী হরচন্দ্র রায়। এর পূর্বে দাবি করা হত, ভারতীয় ভাষায় প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা হল বাংলা ভাষায় মিশনারী পাদ্রী মার্শম্যান সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "সমাচার দর্পণ" (১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে ২৩ মে)। "সম্বাদ প্রভাকর" পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে এ বিষয়ে আলোকপাত করেন যে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই বাংলা ভাষায় সংবাদ পত্রের প্রবর্তক, "বাঙ্গাল গেজেটি" প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে ১৫ই মে শুক্রবার অর্থাৎ 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের আটদিন পূর্বে। ঈশ্বর গুপ্তের ঐ প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মের "ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারী ক্রনিকেল" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাদ্রী লঙ্ 'দি ক্যালকাটা রিভিউ ফর ১৮৫০' এ সমাচার দর্পণকে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র বলেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁর 'লঙস ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ বেঙ্গলী ওয়ার্কস' গ্রন্থে সেই মত পরিবর্তন করে উল্লেখ করেন যে গঙ্গাকিশোর সম্পাদিত 'বাঙ্গাল গেজেটি'ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

ভারতীয় ভাষায় প্রথম প্রকাশিত বাংলার এই সংবাদপত্রটি কতদিন চ'লেছিল তার কোন তথ্য প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কারণ উক্ত পত্রিকার একটি সংখ্যাও আজ পর্যন্ত কারো হস্তগত হয় নাই। ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ডস্

অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, "সর্বপ্রথম বাবুরাম নামে একজন হিন্দু কলিকাতায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দেখাদেখি শ্রীরামপুর প্রেসের একজন কর্মচারী গঙ্গাকিশোর হিন্দু সাধারণের জন্য বাংলা ভাষায় কিছু পুস্তক প্রকাশ করেন ও নিজস্ব কার্যালয় ও পুস্তকের দোকান খুলে বসেন। ছয় বৎসরের অধিক কাল তিনি কলিকাতায় বাংলা ভাষার বিবিধ পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তারপর সম্ভবতঃ অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় উক্ত পুস্তকের দোকানটি তুলে দিয়ে নিজস্ব ছাপাখানাটি তাঁর জন্ম পল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। এই অংশীদার হলেন হরচন্দ্র রায়।

গঙ্গাকিশোরের এই পল্লী নিবাসটি কোথায় ছিল তা এতদিন ধূম্রজালে আচ্ছন্ন ছিল। বৰ্দ্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক কালীপদ সিংহ 'দামোদর' পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি গঙ্গাকিশোর কে বাংলা সংবাদপত্রের জনক ব'লে উল্লেখ করেন। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের চিকিৎসার্ণব পুস্তক থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন,

সুরধনি তিরে ধাম ধন্য সে বহরা গ্রাম।
গঙ্গাকিশোর নাম দ্বিজ দিন অতি॥
চন্দ্রতেজ করি চুর তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর।
ভূবনে দ্বিতীয় শূর মহারাজা তাঁর
অধিকারে বসতি॥

এর থেকে গঙ্গাকিশোরের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গার তীরে বহরা গ্রামে বাস, জাতিতে ব্রাহ্মণ। কিন্তু তিনি কোন জেলার লোক? একটু ইঙ্গিত আছে "তেজচন্দ্র বাহাদুর" অর্থাৎ বৰ্দ্ধমান মহারাজার। কিন্তু তার থেকে সঠিকভাবে বলা যায় না তিনি বৰ্দ্ধমানের লোক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য" পুস্তিকায় লিখেছেন, গঙ্গাকিশোরের বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী বহরা গ্রামে। তিনি কিন্তু পারিবারিক পরিচয় দিতে পারেননি এবং এই গ্রামটি শ্রীরামপুরের কোথায় তাও উল্লেখ করেন নি। শ্রীদাশরথি তা প্রথম ১৩৮১ সালের দৈনিক দামোদর পত্রিকায় এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন যে, গঙ্গাকিশোরের বাড়ি ছিল বৰ্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার পূর্বস্থলী থানার বহড়া গ্রামে। গঙ্গাকিশোরের উল্লেখিত 'বহরা' এখন 'বহড়া' তে রূপান্তরিত হয়েছে। অগ্রদ্বীপ ষ্টেশন থেকে দু কিলোমিটার দূরে এই 'বহড়া' গ্রাম অবস্থিত। গঙ্গা তখন বহড়ার কোল ঘেঁষে বইত তাই গঙ্গাকিশোর উল্লেখ করেছেন "সুরধনি তিরে ধাম ধন্য সে বহরা গ্রাম।' গ্রামটি ছিল বর্ধিষ্ণু ও গঙ্গাকিশোর ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান।

গঙ্গাকিশোরের ছাপাখানার নাম ছিল 'বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়'। ১৮১৯ খ্রীঃ

অব্দে কলকাতা হতে এই ছাপাখানাটি বহড়া গ্রামে গঙ্গার জলপথে নৌকাযোগে তিনি নিয়ে আসেন। সরকারী নথিপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দামোদর সম্পাদক সহকর্মীগণ সহ উক্ত বহড়া গ্রামে গিয়ে গঙ্গাকিশোরের পৈতৃক ভিটায় বসবাসরত উত্তরাধিকারী ভাগিনেয় বংশের শ্রীভূপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সযত্নে রক্ষিত ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে চিহ্নিত কাউন্সিল চেম্বারের চীফ সেক্রেটারীর স্বাক্ষরিত মূল আদেশনামাটি উদ্ধার করেন। পত্র সংখ্যা ৬০০। আদেশটির বয়ান নিম্নরূপ;

"M. L. Bayley having submitted to Government Ganga Keysore Bhattacharji's application to be permitted to carry with him, to Buhurraw near Moorshidabad his printing Press , has been authorised to inform Gangakeysore that Government are not aware of any objection to his carrying his intentions into effect."

মুদ্রণ যন্ত্রটি কলকাতা থেকে বহড়াতে নিয়ে আসার আদেশ পত্রে বহড়াকে মুর্শিদাবাদের নিকটে বলার আশ্চর্য হবার কারণ নাই। 'কারণ মুর্শিদাবাদ নবাবী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল এবং কলিকাতা অপেক্ষা মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব ছিল বেশি। আর শ্রীরামপুরের গুরুত্ব ছিল মিশনারীদের শিক্ষা-বিস্তারের দৌলতে। তখন মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতা ও শ্রীরামপুর যোগাযোগ ছিল জলপথে ভাগীরথী দিয়ে। বহড়া গ্রামটি এখনো ভাগীরথী তীরবর্তী এবং কলিকাতা ও শ্রীরামপুর থেকে মুর্শিদাবাদ যাবার পথে পড়ে। 'বহড়া' গ্রামটির অবস্থান (Location) বোঝাতে মুর্শিদাবাদের কাছে ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ছাপাখানাটি স্থানান্তরিত করার কোন অসুবিধা নাই—তাই অনায়াসেই স্থানান্তরণের অনুমতি মিলেছে। গ্রামটি বর্তমানে ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া রেলপথের অগ্রদ্বীপ ষ্টেশনের অদূরে অবস্থিত। তখন এই রেলপথ হয় নাই। তাই ভাগীরথী জলপথে ছাপাখানাটি আনতে হয়েছিল। পশ্চিমভারত থেকে কেউ যদি বর্দ্ধমানের অবস্থান কলিকাতার সন্নিকট বলে উল্লেখ করেন—সেটা যেমন সমীচিন, তেমনি সমীচিন বহড়ার অবস্থান মুর্শিদাবাদের কাছে উল্লেখ করা। এই বহড়া গ্রামে গঙ্গাকিশোরের পাকা বসতবাটি, দেবালয় ভগ্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়েছিল। বহু পুরাতন নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষাদি আজিও বিদ্যমান। যে স্থানে ছাপাখানা নিয়ে এসে বসানো হয়েছিল ও ছাপার কাজ চলেছিল সেই পতিত ভিটেটি ছাপাখানা ডাঙ্গা নামে অভিহিত হয়ে আসছে। ঐ ডাঙ্গাতে এখন পাটচাষ হয়। কাউন্সিল চেম্বার হ'তে প্রদত্ত দলিলের সঙ্গে হরচন্দ রায়ের আবেদনক্রমে ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই জুন ৯৮৮ নম্বরের আর একটি হস্তলিখিত মুদ্রণ সংক্রান্ত আদেশনামাও পাওয়া গিয়েছে। শ্রীরামপুর নিবাসী এই হরচন্দ্র রায় ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ। বহড়া গ্রামবাসীগণ দাবি করেন, গঙ্গাকিশোর এখানে ছাপাখানা তুলে এনে 'বাঙ্গাল

গেজেটি' প্রকাশ করতেন ও ভাগীরথী জলপথে কলিকাতা, শ্রীরামপুর ও অন্যান্য স্থানে বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 'বাঙ্গাল গেজেটির' কোন কপি কোথাও পাওয়া যায় নাই। গঙ্গাকিশোর নিজেই এই পত্রিকা ছাপতেন। তাঁর জন্মতারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। তাঁর ভাগিনেয় মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাকিশোরের উত্তরাধিকারী হন, ইনি বর্দ্ধমান রাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই ছাপাখানা চালাতে পারেন নি। তাঁর পুত্র নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই মার্চ ফোর্ট উইলিয়মের আদেশ নামায় বহড়া গ্রামে ঐ প্রেস চালিয়েছিলেন, তার প্রমাণ রয়েছে। উক্ত আদেশনামাটি ইংরাজীতে ছাপা ফরমে দেওয়া হয়েছিল। তার পূর্ণ বয়ান দেওয়া হ'ল: Nilmoney Banerjee of Buherah, Thana poobthul in Zilla Burdwan Printer having applied to the Magistrate of Burdwan for sanction and License to keep and use a Printing Press. Types and other materials and articles for printing and his application having been verified by solemn declaration as required by law, the Lieutenant Governor does hereby authorise and empower the said Nilmoney Banerjee to keep and use a Printing Press Types and other materials or articles for printing at Buherah Thana Poobthul in Zilla Burdwan and not elsewhere.

নীলমণির মৃত্যুর পর ছাপাখানা বন্ধ হয়ে যায়। নীলমণির পুত্র ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর চতুর্থপুত্র ভূপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর সৌজন্যে এই সব মহামূল্য দলিল পাওয়া গিয়েছিল। উত্তরাধিকারী ভাগিনেয় বংশধরগণ গঙ্গাকিশোরের ভগ্ন বাড়ি পরিত্যাগ করে বর্তমানে বহড়া গ্রামের ভিতর বসবাস করছেন। গঙ্গাকিশোরের পরিত্যক্ত ভগ্নবাড়ির পাশে একটি শিবমন্দির থাকলেও তাঁর বাড়ি থেকে একটি ছ'ফুট দীর্ঘ পাঁঠা কাটার খাঁড়া পাওয়া যায়। তাই প্রশ্ন জাগে গঙ্গাকিশোর শৈব না শাক্ত ছিলেন?

গ্রামটি বর্তমান অগ্রদ্বীপ রেলষ্টেশন থেকে মাত্র পনেরো মিনিটের পথ। গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়ে রেল লাইন, উত্তরে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত। তারই পাশ দিয়ে গেছে বাদশাহী সড়ক। আদেশ নামায় বর্ণিত 'পুবথুল' পূর্বস্থলীর প্রাচীন নাম। ভাগীরথীর একটি শাখানদী ছিল শঙ্খিনী। বহড়া গ্রামকে রক্ষার জন্য ভাগীরথী ও শঙ্খিনীর মুখে দশদুয়ারী বাঁধ বাঁধা হয়। এখন শঙ্খিনী কেবলই একটা মজে যাওয়া খাল। নাম শাইনী। এই খাল দশদুয়ারী হতে শুরু হয়ে গাজিপুর, বহড়া, পলতাগাছি, গড়াগাছি পর্যন্ত গিয়ে হ্মমদপুর বিলে মিশেছে। সেখান থেকে খরদন্তপাড়া, হরিশপুর, নাকাদা হয়ে জামালপুরে বুড়োরাজতলা পর্যন্ত গিয়েছে।

প্রবীণ গ্রামবাসীদের মতে বহড়া গ্রামটি ১৮ পাড়ার। তারমধ্যে বামুন পাড়া,

বুনোপাতা, গোয়াল পাড়া, সেকরা পাড়া, গাঁড়াল পাড়া, (পেশা—চিঁড়া কুটা), বাউরীপাড়া, কায়স্থপাড়া, কৈবর্ত্ত পাড়া, চুনোটপাড়া, আরমা পাড়া, ধোবাপাড়া, কলুপাড়া, বৈরাগ্য পাড়া, নাপিত পাড়া, বারুইপাড়া, রুইদাস পাড়া, এই ষোলটির অস্তিত্ব আছে। বাকী দুটি পাড়ার কোন হদিস নাই।

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্রের সম্পাদক গঙ্গাকিশোর তাই ভারতীয় সম্বাদপত্রের জনক। সে হিসাবে বহড়া সাংবাদিকতীর্থ। [দৈনিক দামোদর ১৩৮১—দাশরথিতা বার্ষিক সংখ্যা]

যদিও ভারতীয় ভাষায় প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রের জন্য বৰ্দ্ধমান গর্ব করতে পারে, তবু পরবর্ত্তী কালে সংবাদপত্র ও সাময়িকী দ্বিতীয় পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য বৰ্দ্ধমানকে সাতাশ বছব অপেক্ষা করতে হয়। বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৰ্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' এবং রামতারণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বৰ্দ্ধমান চন্দ্রোদয়' ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে বৰ্দ্ধমানের দ্বিতীয় সংবাদপত্রের আসনটি অধিকার করে। তারপর থেকে বিংশশতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে অজস্র পত্র, পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে এই বৰ্দ্ধমানে যা অন্য জেলার তুলনায় সংখ্যায় বেশি ও বিস্ময়কর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত এই পত্র পত্রিকাগুলির মধ্যে কোন পত্রিকায় দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ পর্বে প্রকাশিত "বৰ্দ্ধমান সঞ্জিবনী" বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রকাশিত "পল্লীবাসী" কালনা থেকে প্রকাশিত হয়ে আজও বেঁচে আছে। খুব শীঘ্রই অর্থাৎ ১৯৯৬ খ্রীঃ অব্দে তার শতবর্ষ জয়ন্ত্রী অনুষ্ঠান হবে। এটিই গৌরবের। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাময়িক পত্র (১ম খণ্ড) থেকে জানতে পারা যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ 'বৰ্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী' এবং "বৰ্দ্ধমান চন্দ্রোদয়" পত্রিকা দুটির প্রকাশ কাল ১৮৪৯ খ্রীঃঅব্দ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বৰ্দ্ধমানের সাংবাদিক বলাই দেব শর্মা বৰ্দ্ধমানের ইতিহাস (পৃঃ৮১) গ্রন্থে এবং দাশরথি তা লোকভারতী—সন ১৩৮৩ (মাঘ-চৈত্র) সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে ঐ দুটি প্রত্রিকার প্রকাশ কাল ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। ১৮৫০ খ্রীঃঅব্দে বৰ্দ্ধমান মহারাজার অর্থানুকূল্যে তৃতীয় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়—কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদ বৰ্দ্ধমান", চতুর্থ পত্রিকাটি হ'ল 'অরুণোদয়' সম্পাদক রেভঃ লালবিহারী দে; অম্বিকা কালনায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হত কারণ রেভঃ লালবিহারী মিশনারীর কাজে সে সময় অম্বিকা কালনায় থাকতেন। পত্রিকাটি মুদ্রিত হত কলকাতা থেকে, কিন্তু প্রকাশ স্থান ছিল অম্বিকা কালনায়। প্রকাশ কাল ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির কোনটাই বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। আর্থিক অনটনই ছিল তার মূল কারণ। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে "বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা" প্রকাশিত হয়, কিন্তু একবছর পর ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা

'শিক্ষাদর্পণের'' সঙ্গে মিশে যায়। পরবর্তী পত্রিকাটি হ'ল ''বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা'' প্রকাশ কাল ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দ। বলাই দেবশর্মার মতে পত্রিকাটির নাম ছিল ''বৰ্দ্ধমান পত্রিকা ও বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজ''। এর চার বছর পর প্যারীলাল সিংহ সম্পাদিত 'প্রচারিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হয ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। আর ছ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে তিনখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেগুলি হল-- 'ভারত ভাতি', 'দিবাকর' ও 'জ্ঞান দীপিকা', সম্পাদক যথাক্রমে রাজেন্দ্রলাল সিংহ ও রাখাল দাস হাজরা। ১৮৭৭ অব্দে প্রকাশিত হয় দুটি পত্রিকা– 'আর্য প্রতিভা' ও 'কালনা প্রকাশ'। 'অর্থপ্রতিভার' সম্পাদক ছিলেন কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ। 'কালনা প্রকাশ' কালনা মহকুমার প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৮ অব্দে প্রকাশিত হয় 'বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী'। এটি ছিল বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র, সম্পাদনার ভার দেওয়া হয়েছিল যোগেশ চন্দ্র সরকারকে। শুধু ব্রাহ্ম সমাজেই নয় বৰ্দ্ধমানের সাধারণের মধ্যেও পত্রিকাটি সমাদৃত হয়েছিল এবং অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত. এটি বেঁচে ছিল। ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা খারাপ হলে এবং বহু ব্রাহ্ম বৰ্দ্ধমান ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে আর্থিক দুরবস্থায় 'বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনীকে' আর জীবিত রাখা সম্ভপর হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যে পত্রিকাটি কালনা থেকে শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল,—একমাত্র সেটিই আজও বেঁচে আছে। ১৯৯৬ অব্দে তার শতবর্ষ উৎসব হবে– সেই পত্রিকাটির নাম ''পল্লীবাসী''। পত্রিকাটি বৰ্দ্ধমানের গৌরব। বর্তমানে অমূল্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর সম্পাদক। একমাত্র ''পল্লীবাসী'' সেই পুরাতন সংখ্যা থেকে একশ বছর আগের বৰ্দ্ধমানের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কালিকাপুর গেজেট' আত্মপ্রকাশ করে। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার জ্যোতিরত্ন। কাটোয়া মহকুমার প্রথম পত্রিকাটি হল– 'প্রসূন', সম্পাদক মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশ কাল ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দ। দীর্ঘদিন ধ'রে পত্রিকাটি চলেছিল তারপর অন্য পাঁচটি পত্রিকার যা পরিণতি হয়, এর বেলাতেও সেই একই অকাল মৃত্যু ঘটেছে। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত আর কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা নেই, যদিও ঐ বছরই 'নবারুণ' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এটিও খুব বেশিদিন চলেনি। অর্থাভাবই এর অপমৃত্যুর কারণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পত্রপত্রিকার তালিকা

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পত্রিকা প্রচারের দিক থেকে বৰ্দ্ধমান শীর্ষে রয়েছে। বৰ্দ্ধমানবাসীর পক্ষে এটি কম গৌরবের নয়। নিম্নে পত্রিকা গুলির কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশিত হল :

ঊনবিংশ শতক :

১. বাঙ্গাল গেজেটি (১৮১৮) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। বাড়ি—বৰ্দ্ধমান জেলায় পূর্বস্থলী থানার অগ্রদ্বীপের নিকট রহড়া গ্রামে। কলিকাতা অফিস– ৪৫ চোর বাগান ষ্ট্রীটে। তাঁর গ্রাম যেখানে বাড়ি ও প্রেস ছিল তার নাম ছাপা ডাঙ্গা।

২. বৰ্দ্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী (১৮৪৫) বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. বৰ্দ্ধমান চন্দ্রোদয় (১৮৪৫) রামতারণ ভট্টাচার্য

৪. সংবাদ বৰ্দ্ধমান (১৮৫০) বৰ্দ্ধমান মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায়। কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫. অরুণোদয় (১৮৫০) রেভাঃ লালবিহারী দে। কালনা থেকে প্রকাশিত বলে ধারণা। কিন্তু আসলে প্রকাশ কলকাতা থেকে।

৬. বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা(১৮৬৬) ভূদেব মুখোপাধ্যায়। পরে এর নাম হয় বৰ্দ্ধমান মাসিক পত্রিকা ও বৰ্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ।

৭. প্রচারিকা (১৮৭০) প্যারীলাল সিংহ।

৮-১০ জ্ঞানদীপিকা, ভারত ভীতি, দিবাকর (১৮৭৬) রাখালদাস হাজরা, রাজেন্দ্র লাল সিংহ

১১. আর্য প্রতিভা (১৮৭৭) কৈলাস সিংহ

১২. কালনা প্রকাশ (১৮৭৭) কালনার প্রথম পত্রিকা

১৩. বৰ্দ্ধমান সঞ্জীবনী (১৮৭৮) যোগেশ সরকার। ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা।

১৪. পল্লীবাসী (১৮৯৬) শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এখন. তারঁ পুত্র অমূল্য ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা করেন।)

১৫. বৰ্দ্ধমান চর্চা (১৮৯৭) পাঁচু গোপাল রায়

১৬. বৰ্দ্ধমান সংবাদ (১৮৯৭) ধনপতি ভট্টাচার্য

বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর

১. কালিকাপুর গেজেটি (১৯০০) কালীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অক্ষয় কুমার জ্যোতিরত্ন।
২. প্রসূন (১৯০৩) কাটোয়ার প্রথম পত্রিকা। মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩. নবারুণ (১৯১৯) মাসিক। চণ্ডীদাস মজুমদার
৪. বর্দ্ধমান (১৯২২) স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।
৫. শক্তি (১৯২৩) বলাইদেব শর্মা। প্রথম পত্রিকা।
৬. বর্দ্ধমানবাসী (১৯২৭) নাজিরুদ্দিন আহাম্মদ।
৭. ডিমরুল (১৯২৭)
৮. তরুণ (১৯৯০)
৯. আসানসোল হিতৈষী (১৯৩১) গোপেন্দু ভূষণ সংগীতার্য। ১ম পত্রিকা।
১০. সাম্য (১৯৩২)
১১. শান্তিজল (১৯৩০) ভূজঙ্গ ভূষণ সেন। প্রথম পত্রিকা।
১২. দেশপ্রিয় (১৯৩৪) সুধাংশু মোহন ভট্টাচার্য
১৩. সংবাদ (১৯৩৬) ভূজঙ্গ ভূষণ সেন। ২য় পত্রিকা।
১৪. দামোদর (১৯৩৬) দাশরথি তা।
১৫. বর্দ্ধমানের বিজয়বার্তা (১৯৩৮) সুশীল কুমার খাঁ।
১৬. দাগ (১৯৩৯) অজিত কুমার রায়।
১৭. শ্রী (১৯৪১) বলাইদেব শর্মা। ২য় পত্রিকা।
১৮. দৃষ্টি (১৯৪৪) কৃষ্ণ কিশোর রায়।
১৯. আর্য পত্রিকা (১৯৪৬) বলাই দেবশর্মা ৩য় পত্রিকা।
২০. বর্দ্ধমান (১৯৪৮) নারায়ণ চৌধুরী।
২১. বর্দ্ধমানের ডাক (১৯৪৯) রাধা গোবিন্দ দত্ত।

১৯৫১-৬০

১৯৫৩	জি. টি রোড	বিনয় কৃষ্ণ রায় (আসানসোল)
১৯৫৩	শ্রীলেখা	গীতাময় রায় (আসানসোল)
১৯৫৩	সর্বোদয়	নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কাটোয়া)
১৯৫৪	মৈত্রী	চিত্ত ভট্টাচার্য (বর্দ্ধমান)
১৯৫৯	স্বগত	মধু চট্টোপাধ্যায় (দুর্গাপুর)

১৯৬১-৭০

১৯৬২	পত্রপুট .	বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ।

১৯৬২	আসানসোলবাণী	সুধাকৃষ্ণ গুপ্ত (আসানসোল)
১৯৬২	খোলাকথা	সদানন্দ দাস (বর্দ্ধমান)
১৯৬৩	দুর্গাপুরবাসী	কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (দুর্গাপুর)
১৯৬৩	কোল্ডফিল্ড ট্রিবিউন	দামোদর গুপ্ত (আসানসোল)
১৯৬৪	পর্যবেক্ষক	সুশীল মালখণ্ডী (আসানসোল)
১৯৬৫	সাপ্তাহিক কাটোয়া	শশাঙ্ক শেখর চট্টোপাধ্যায় (কাটোয়া)
১৯৬৬	সাহিত্যসানাই	বিশ্বনাথ ঘোষ (বর্দ্ধমান)
১৯৬৭	সাহিত্য জগৎ	মিহির চৌধুরী কামিল্যা (১৯৬৬ কামারপুকুর)
১৯৬৭	উদয় অভিযান	সমীরণ চৌধুরী (বর্দ্ধমান)
১৯৬৮	চলমান	সচ্চিদানন্দ মণ্ডল
১৯৬৮	আলিকালি পত্রিকা	সুভাষ দেবরায়
১৯৬৮	চেতনার রং	কামাখ্যা চরণ মুখোপাধ্যায়
১৯৬৯	সেতু	বাংলাবিভাগ (বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)
১৯৬৯	আশ্বিন	চিত্ত ভট্টাচার্য (বর্দ্ধমান)
১৯৭০	পূর্বক্ষণ	তারকনাথ রায় (বর্দ্ধমান)
১৯৭০	বর্দ্ধমান জ্যোতি	মদন দাস (বর্দ্ধমান)

১৯৭১-৮০

১৯৭১	বিজয়তোরণ	সুধীর চন্দ্র দাঁ (বর্দ্ধমান)
১৯৭২	পল্লীবর্দ্ধমান	সুকুমার সেন (বর্দ্ধমান)
১৯৭২	বনসভা	সন্তোষ রায় (রায়না)
১৯৭৩	ভাবনচিন্তা	শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু (বর্দ্ধমান)
১৯৭৩	পানাগড় বার্তা	নির্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১ম পত্রিকা।
১৯৭৩	কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস	সুবীর ঘটক (পানাগড়)
১৯৭৩	সীমায়ন	গোবিন্দ রায় (কালনা)
১৯৭৪	এবং কবিতা	কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় (বর্দ্ধমান)
১৯৭৫	ধ্বনি	সুধীর অধিকারী (বর্দ্ধমান)
১৯৭৫	সময়ের ভীড়	শম্ভু কর্মকার (বর্দ্ধমান)
১৯৭৫	মুক্তি চাই	শ্যামাপদ চৌধুরী (বর্দ্ধমান)
১৯৭৫	সংগীত শিল্পতীর্থ	কমল মুখোপাধ্যায় (কালনা)
১৯৭৬	বর্ধমান রিপোর্টার	নীহারেন্দু আদিত্য (বর্দ্ধমান)
১৯৭৬	দুর্গাপুর সংবাদ	বিন্ধ্যনাথ ঘোষ (দুর্গাপুর)
১৯৭৬	আসানসোল কথা	জগদীশ প্রসাদ কেডিয়া (আসানসোল)

১৯৭৬	চিন্তা	সমীর ঘোষ (কালনা)
১৯৭৬	সাম্প্রতিক	তপন রায় (দুর্গাপুর)
১৯৭৬	বৰ্দ্ধমান শ্রুতি	গোবিন্দ দাস (বৰ্দ্ধমান)
১৯৭৭	বৰ্দ্ধমানের ডায়েরী	সন্ধ্যা ভট্টাচার্য (বৰ্দ্ধমান)
১৯৭৭	গণচিন্তা	নারায়ণ ব্যানার্জী (বৰ্দ্ধমান)
১৯৭৭	নতুন চিঠি	অশোক ব্যানার্জী (বর্তমান সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য)
১৯৭৭	খণ্ডঘোষ সমাচার	দেশবন্ধু হাজরা
১৯৭৭	কাটোয়ার কলম	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (কাটোয়া)
১৯৭৭	কাটোয় হিতৈষী	মদন চৌধুরী (কাটোয়া)
১৯৭৭	দাঁইহাট বিচিত্রা	অজয় আইচ (কাটোয়া)
১৯৭৭	কথা বলো	তুষার সবকার
১৯৭৮	সংস্কৃতি সংবাদ	অলক চ্যাটার্জী
১৯৭৮	সুইট ইণ্ডিয়া	সমীর ঘোষ চৌধুরী
১৯৭৮	সাম্য সমাচার	ভজন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৭৮	চাষ আবাদ	বিশ্বনাথ ঘোষ। ২য় পত্রিকা।
১৯৭৮	বৰ্দ্ধমান দুর্গাপুর হেরাল্ড	পি. কে. রায় (দুর্গাপুর)
১৯৭৮	ইনডাসট্রি লাইফ	গৌরাঙ্গ সাহা
১৯৭৮	মেয়েদের বার্তা	তৃপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়।

১৯৭৯ থেকে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত আরো বহু বিচিত্র পত্রিকার নিম্নোক্ত তালিকা সন্নিবেশিত হল।

ইস্পাতের চিঠি	পৃথ্বীশ চক্রবর্তী (অণ্ডাল)
বোবাযুদ্ধ	(আসানসোল)
লোকায়ত	দীনেশ চট্টোপাধ্যায় (দুর্গাপুর)
স্বকাল	প্রকাশ দাস (পানাগড়)
মঞ্জুভাষ	ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (বৰ্দ্ধমান)
কবিতার কাল	কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় (বৰ্দ্ধমান)
নতুন সংস্কৃতি	অনিলেন্দু ভট্টাচার্য (বৰ্দ্ধমান)
মনসিজ	রাজকুমার রায়চৌধুরী (বৰ্দ্ধমান)
কোমল দুর্গ	নীলা কর (বৰ্দ্ধমান)
নতুন চোখ	সামসের আলম (বৰ্দ্ধমান)
অভিযান সাময়িকী	সমীরণ চৌধুরী (বৰ্দ্ধমান)
বৰ্দ্ধমান সমাচার	শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু (বৰ্দ্ধমান)

স্বনন	সন্দীপ নন্দী (বৰ্দ্ধমান)
এইসব	বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (বৰ্দ্ধমান)
বাল্মীকি	শ্যামলবরণ সাহা (বৰ্দ্ধমান)
জয়ধ্বনি	বলরাম পাল (বৰ্দ্ধমান)
আন্তর্জাতিক সুচেতনা	তপন চক্রবর্তী (বৰ্দ্ধমান)
শকাব্দ	অসীম ব্যানার্জী (বৰ্দ্ধমান)
বয়ুসাস	গৌতম কুমার ভট্টাচার্য ও সৌমিত্র ভট্টাচার্য (বৰ্দ্ধমান) ১ম পত্রিকা
কার্ণিশ	গৌতম কুমার ভট্টাচার্য (বৰ্দ্ধমান) ২য় পত্রিকা
সরেজমিনে	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়ন্ত সোম (বৰ্দ্ধমান)
উজানী	উদয় বাগ (বৰ্দ্ধমান)
রবিবারের সকাল	কল্যাণ দত্ত (বৰ্দ্ধমান)
মুক্ত বাংলা	পুরুষোত্তম সামন্ত (বৰ্দ্ধমান)
বৰ্দ্ধমান মজদুর	সৈয়দ ইমদাদ আলি (বৰ্দ্ধমান)
যুবজোয়ার	আবুল হায়াত (দুর্গাপুর)
মধ্যনগর.	অশোক মজুমদার (দুর্গাপুর)
অম্বু কণ্ঠ	অসীম ঘোষ (কালনা)
সাম্প্রতিক	দোল গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (কালনা)
সীমায়ন	গোবিন্দ চন্দ্র রায় (কালনা)
হোত্রী	গোবিন্দ চন্দ্র রায় (কালনা)
সেবিকা	আশুতোষ বিশ্বাস (এরুয়ার, সাহেবগঞ্জ)
চিত্রলেখা	রতনলাল দত্ত (বৰ্দ্ধমান)
কান্তসার	মহঃ হাফিজুর রহমান (বৰ্দ্ধমান)
কালোমেঘ	সুখরঞ্জন হালদার (বৰ্দ্ধমান)
আঞ্চলিক সংহতি	সুবিমল দাশ (চিত্তরঞ্জন)
কুলটি বার্তা	শ্রীমতী রত্না লাহিড়ী (কুলটি)
এই মুহূর্ত	মহম্মদ রফিক (বৰ্দ্ধমান)
শনিবারের লোকাল	অলোক চ্যাটার্জী (বৰ্দ্ধমান)
জামুরিয়া দর্পণ	অজিত কুমার কর্মকার (জামুরিয়া)
ধূলামন্দির	শ্রীমতী লক্ষ্মী ব্যানার্জী (কাটোয়া)
কথার কথা	শ্রীমতী মিলন প্রামানিক (কাটোয়া)
তোমাদের কথা	নিমাই চন্দ্র প্রামানিক (কাটোয়া)

বঙ্গদেশ সমাচার	দিলীপ কুমার বসু (কালনা)
পাক্ষিক দেশমাতৃকা	শ্রী সুধাংশু (বৰ্দ্ধমান)
সোচ্চার	মধুসূদন হাজরা চৌধুরী (বৰ্দ্ধমান)
বৰ্দ্ধমান দর্পণ	সত্যনারায়ণ মাজিলা (বৰ্দ্ধমান)
পল্লীবাসী	অমলেন্দু ব্যানার্জী (কালনা)
অম্বিকা সমাচার	তরুণ রায় (কালনা)
তথ্য দর্পণ	শ্রীমতী শীলা ঘোষাল (কাটোয়া)
কাটোয়া দর্পণ	হরিগোপাল ঘোষাল (কাটোয়া)
জনচিন্তা	প্রদীপ কুমার ঘোষ (দুর্গাপুর)
দুর্গাপুর জনজীবন	শ্রীমতী ইরা ব্যানার্জী (দুর্গাপুর)
কোল্ডফিল্ড টাইমস	প্রবীর কুমার সরকার (বৰ্দ্ধমান)
কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস	সুধীর ঘটক (উখরা)
বিষাণ	শ্রীমতী কৃষ্ণা সরকার (খাধরা)
হালচাল রাজনৈতিক	চিরানজিলাল আগরওয়াল (বুদবুদ)
ইনডাসট্রিয়াল অরগান	রতন চ্যাটার্জী (আসানসোল)
আসানসোল অবজারভার	মীর্জা ইউসুফ আহমদ বেগ (আসানসোল)
আসানসোল হিতৈষী	শ্রীমতী মিনতি মিত্র (আসানসোল)
দৈনিক লিপি	সত্যরঞ্জন কর্মকার (আসানসোল)
দৃষ্টিকোণ	শৌনক চৌধুরী (বৰ্দ্ধমান)
ধন্যভূমি	তাপস সরকার (বৰ্দ্ধমান)
সময়ের কথা	শম্ভু কর্মকার (বৰ্দ্ধমান)
র‍্যাডার	গৌর পালিত (বৰ্দ্ধমান)
শুভ লিপিকা	প্রণয় কুমার ভট্টাচার্য (বৰ্দ্ধমান)
বৰ্দ্ধমানের কথা	মহাদেব সেনগুপ্ত (বৰ্দ্ধমান)
প্রয়াস ও প্রতীতী	মানিকলাল অধিকারী ও সত্যদর্শন দত্ত (বৰ্দ্ধমান)
চলার পথে	উদয়কুমার সাঁই (বৰ্দ্ধমান)
ছোটদের কথা	কল্পনা সুর ও ধীরেন্দ্রনাথ সুর (বৰ্দ্ধমান)
মনীষা	শ্রীমতী ভারতী মণ্ডল (বৰ্দ্ধমান)
সূর্যমুখী	সম্পাদকমণ্ডলী (বৰ্দ্ধমান)
কৃষি সমন্বয় পত্রিকা	সদানন্দ দাস (বৰ্দ্ধমান)
শিক্ষা সমাচার	কল্যাণ রায় (বৰ্দ্ধমান জেলা স্কুল বোর্ড)
ডাকশক্তি	ননী ব্যানার্জী ও লক্ষ্মী চক্রবর্তী (বৰ্দ্ধমান)

সপ্তম পর্ব

পরিশিষ্ট— ১

মানচিত্রের বিবর্তন

বর্দ্ধমানের মানচিত্র বহু বিবর্তন ও ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রামাণ্য সূত্র প্রথম পাওয়া যায় আইন-ই-আকবরীতে। মোগল সম্রাট আকবর তার সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় ভাগ করেন। এরই একটি সুবা হল বাংলা। আবার এই বাংলা সুবাকে ১৯টি সরকারে ভাগ করা হয়। জেলা বর্দ্ধমান যে চারটি সরকার নিয়ে গড়ে উঠেছিল তা হল,—সরিফাবাদ, সুলেমানবাদ, সাতগাঁও ও মাদারণ। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দের রাজস্ব মানচিত্রে উক্ত চারটি সরকারের অধীনস্থ পরগণাগুলি পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেব পর্যন্ত উপবোক্ত চারটি সরকার ও তার অধীনস্থ পরগণা গুলির মানচিত্র অপরিবর্তিত ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ ও জাফর আলি খাঁর সময়ে বাংলা সুবাকে ১৩টি চাকলায় ভাগ করা হয় এবং ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এই চাকলা গুলির মানচিত্র ও আয়তন অক্ষত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে চাকলা গুলির আয়তন কমিয়ে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য 'জেলা' করা হয়। 'জেলার' আগে 'বর্দ্ধমান' চাকলা ছিল অন্যতম বৃহত্তম— সমগ্র সরিফাবাদ, সুলেমানাবাদের কিয়দংশ, সাতগাঁও এর কয়েকটি পরগণা এবং মাদারণের অর্ধেক নিয়ে 'চাকলা বর্দ্ধমান' ছিল। West Bengal Districts records, Burdwan থেকে চাকলা বর্দ্ধমানের পরগণা সমূহেব নামের তালিকা পাওয়া যায় সেগুলি হল:

বর্দ্ধমান, খণ্ডঘোষ, সেরগড়, ছুটিপুর, বাণীহাটি, রাইপুর, ইন্দ্রানী, চন্দ্রকোনা, ভুরশুট, সাতসৈকা, বালিগাড়ি, বন্দিপুর, সাহবাদ, বাঘা, গোপভূম, নলহি, হাভেলী, অম্বোয়া, ধেত্রেত, বরদা, চিতুয়া, বোড়ো পাণ্ডুয়া, বৈনান, পাটুলী, সমরশাহী, সেলামপুব, বগড়ী, মনোহরসাহী, পলাশী, মহম্মদপুর, বান্ধণভূম,জাহানাবাদ, বয়ড়া, একতারপুর, খোসলপুর, কুবিজপুর, সেনপাহাড়ী, চম্পানগরী, মজ: ফরশাহী, আজমৎসাহী, ফৈজলপুর, আমিয়াবাদ, জাহাঙ্গীরাবাদ, মণ্ডলঘাট, পাটমহল, সেলিমা বাদ, হাবেলী মাদারণ, চৌমহ, পাইকান, ধাড়সা, বালীটুঙ্গা, আরসা, হাতীকান্দা, শিখরভূম, বালিয়া, চন্দননগর, খালোড়, মজফরপুর, শাহাসিলামপুর, জয়পুর।

উক্ত পরগণাগুলির মধ্যে— ইন্দ্রানী-কাটোয়া, চন্দ্রকোণা, চিতুয়া, বরদা-মেদিনীপুর, ভুরশুট বর্তমান হুগলীতে অবস্থিত। মনোহরশাহী বর্তমান কেতুগ্রাম, গোপভূম ও সেনপাহাড়ী বর্তমান কাঁকসা থানা, জাহানাবাদ বর্তমান আরামবাগ, সেলিমাবাদ অধুনা জামালপুর— অর্থাৎ চাকলা বর্দ্ধমানের আয়তন মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্দ্ধমান নিয়ে ছিল বিশাল। ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে মেজর রেণেলের সার্ভে রিপোর্ট ও মানচিত্র থেকে

পাওয়া যায় চাকলার আয়তন ৫১৮৪ বর্গ মাইল। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে লেঃ জ্যাকসনের নেতৃত্বে জেলার থানা ও মহকুমার জরীপ করে জেলায় সীমানা বিন্যাস করা হয়। বর্দ্ধমান চাকলা থেকে ভেঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়া জেলার সৃষ্টি হয় ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে বুদবুদ, ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে কাটোয়া, রাণীগঞ্জ, জাহানাবাদ ও বর্দ্ধমান সদর মহকুমা ও ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে কালনা এই ৬টি মহকুমা গঠিত হয়। ৬টি মহকুমার লোকসংখ্যা ১৮,৬১,৬৬৩ ও আয়তন ছিল ৩৫১৩ বর্গমাইল। পরগণা নাম পরিবর্তন করে "থানা" রাখা হয়। মহকুমার অন্তগর্ত নিম্নলিখিত থানা গুলি ছিল :-

বর্দ্ধমান সদর মহকুমা–	বর্দ্ধমান, খণ্ডঘোষ, ইন্দাস, সেলিমাবাদ, গাঙ্গুরিয়া ও সাহেবগঞ্জ থানা।
কাটোয়া মহকুমা–	কাটোয়া, কেতুগ্রাম ও মঙ্গলকোট থানা।
কালনা মহকুমা–	কালনা, ভাতুরিয়া ও মন্তেশ্বর থানা।
জাহানাবাদ মহকুমা–	জাহানাবাদ, কোতলপুর, গোঘাট ও রায়না।
বুদবুদ মহকুমা–	বুদবুদ, আউসগ্রাম ও সোনামুখী থানা।
রাণীগঞ্জ মহকুমা–	রাণীগঞ্জ, কাঁকসা ও নিয়ামতপুর থানা

১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে রাণীগঞ্জের পরিবর্তে আসানসোল মহকুমায় রূপান্তরিত হয়।

১৯১০ খ্রীঃ অব্দে জেলা গেজেটিয়ারে ৪টি মহকুমাসহ ২৩টি থানার উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি হল :-

বর্দ্ধমান মহকুমা–	বর্দ্ধমান, মেমারী, জামালপুর, রায়না, খণ্ডঘোষ, গলসী, কাঁকসা ও আউসগ্রাম।
আসানসোল মহকুমা–	আসানসোল, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল, জামুরিয়া, ফরিদপুর, দুর্গাপুর, কুলটি, বরাবণি ও সালানপুর।
কাটোয়া মহকুমা–	কাটোয়া, মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম।
কালনা মহকুমা–	কালনা, পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বর।

জেলার রেকর্ড থেকে দেখা যায় ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দ থেকে ১৮৯৬ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত যে ৬টি পৌরসভা গঠিত হয় এখনও সেই ৬টি পৌরসভাই রয়েছে। সে গুলি হল : বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া, দাঁইহাট, রাণীগঞ্জ ও আসানসোল। বেড়েছে মাত্র একটি গুসকরা পৌরসভা। দুর্গাপুর পরবর্তীকালে (ডঃ বিধান রায় মুখ্যমন্ত্রী থাকা কালে) শিল্পনগরীতে পরিণত হয় ও এখন নোটিফায়েড এরিয়া হিসাবে চিহ্নিত। বুদবুদ মহকুমার অন্তর্গত সোনামুখী বাঁকুড়া জেলার অর্ন্তভুক্ত হয় ও বুদবুদ এবং আউসগ্রাম সদর ও কিয়দংশ দুর্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়। বর্তমানে এই গ্রন্থরচনাকালে

(১৯৯১ খ্রীঃ অব্দে) বর্দ্ধমান জেলার মোট মহকুমা ৬টি— বর্দ্ধমান উত্তর, বর্দ্ধমান দক্ষিণ, কালনা, কাটোয়া, দুর্গাপুর ও আসানসোল। ১৯৮৮ খ্রীঃ অব্দে বর্দ্ধমান সদরকে দুটি মহকুমায় বিভক্ত করা হয়।

বর্দ্ধমান জেলার মানচিত্রের বিবর্তনটি আইন-ই-আকবরী থেকে আন্দাজ করা যায়। আইন-ই-আকবরী-তে চারটি সরকারের যে মহল বা পরগণার উল্লেখ আছে তা নিম্নরূপ।

সরকার সুলেমানাবাদ বা সেলিমাবাদ

এই সরকারের সদর দপ্তর ছিল জামালপুরের সেলিমাবাদ গ্রামে। শাহজাদা সেলিমের নামানুযাযী সরকারেব নাম হয় সেলিমাবাদ। এখনও জামালপুরে সেলিমাবাদ গ্রামে পুরাতন ধংসাবশেষ সেই চিহ্ন বহন করছে। এই সরকারের ৩১টি পরগণার নাম পাওয়া যায়। সেগুলি হল: ইন্দ্রায়িন, ইসমাইলপুর, আনুল্যা, উলা, ভুরশুট, বসুন্ধরী, পাণ্ডুয়া, পাচলোর, বালিটুঙ্গা, ছুটিপুর, চৌমহা, জয়পুর, হোসেনপুর, ধারসা, রায়না, হাভেলী, সেলিমাবাদ, সাতসৈকা, শাহসপুর, সঙ্গেলি, উমরপুর, সুলতানপুর, আলামপুর, কুবুজপুব, নাগিন, গোবিন্দ, মহম্মদপুর, মুলঘর, নাইয়া, নসঙ্গ, নবিয়, তালুক।

সরকার সরিফাবাদ

এই সরিফাবাদের মধ্যেই ছিল বর্দ্ধমান পরগণা। এ ছাড়া আরও পঁচিশটি পরগণা ছিল। সেগুলি হল: বর্দ্ধমান, বহরব, বরবাকশাহী, ভুরকুণ্ডা, আকবরশাহী, ভাতছালা, বাক্কি, খঙ্গ, ধেয়া, মহলন্দ, সোনিয়া, আজমৎপুর, ফতেসিং, বাঘাড়, খারগ্রাম, কিরিটপুর, খণ্ডঘোষ, নসুক, কোদরা, কোটমকন্দ, মনোহরশাহী, মজঃফরশাহী, সুলেমানশাহী, নন্তরণ, হোসেন আজিযুল, বাজার।

সরকার মাদারণ

বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের সীমান্তবর্তী পরগণা নিয়ে মাদারণ গঠিত হয়েছিল। আইন-ই-আকবরীতে ১৬টি পরগণার উল্লেখ পাই। সেগুলি হল:- পাণিহাটি, বলাগড়, বীরভূম, ধওলভূম, চিতুয়া, চম্পানগরী, হাভেলী, মাদারণ, সিংভূম, সেরগড়, সাহাপুর, কেট, মণ্ডলঘাট, নাগর, মিনকবাগ, হেসোলী ও সমরশাহী।

সরকার সাতগাঁও

সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও এর নামানুসারে এই সরকারের নাম হুগলী, হাওড়া,

নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ নিয়ে ৫৩টি পরগণায় এই বৃহত্তম সরকার বিভক্ত ছিল। Statistical Account of Bengal- H. Blockman (Vol-I Page 360-64)। সেগুলি হল : অম্বুয়া, আরসা, পৈনান, ব্রহ্মার, বঙ্গাবাড়ি, হাভেলী শহর, বাববকপুর, সকোটা, শাকহাট, বকোয়া, কলরায়া, মজফরপুর, শান্তিপুর, হাতিয়াগড়, ফরাসতগড়, সাতগাঁও, সেলিমপুর, বেলগাঁও, বালিয়া, হোসেনপুর, ধুলিয়াপুর, শ্রীরাজপুর, কাটশাল, মগরা, মুণ্ডাগাদা, হেলফী, উখড়া, আকবরপুর, পুড়া, কালিন্দা, ফলকা, তুরতরিয়া, রাণীহাটি, বন্দরবান, ফতেপুর, খারড, মাহ্যিারী, নাইহাটি, হাতীকান্দা, আনোয়ারপুর, বোরণ বোধন, মাণিক হাট, বাগোয়ান, বরিদহাটি, হাজিপুর, সাদঘাটি, মন্দাই, কলিকাতা, কন্দালিয়া, মেদিনীমল, নদীয়া, কাতোয়ালী।

উপরোক্ত চারটি সরকারের মধ্যে সেলিমাবাদ ও সরিফাবাদের সব পরগণাগুলি বর্তমান বর্দ্ধমান মানচিত্রের মধ্যে অবস্থিত ছিল। মাদারণের উত্তরাংশ ও সাতগাঁও এর পশ্চিমাংশ বর্তমান বর্দ্ধমানের মধ্যে ছিল। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের আমলে এই সেলিমাবাদে সরকার পরিচালনা করতেন ডিহিদার মামুদশরিফ। মুকুন্দরামকে তার রোষদৃষ্টিতে পড়তে হযেছিল, ফলে কবিকে গৃহত্যাগ করতে হয়।

বাংলার প্রাচীন মানচিত্র ফন-ডেন-ব্রোক কৃত (১৬৬০ খ্রীঃ অব্দে) থেকে আজকের বর্দ্ধমানকে চিহ্নিত করা খুবই মুস্কিল। কাবণ বহু জনপদ ধ্বংস হয়ে নূতন গ্রাম পত্তন হয়েছে। পরবর্তীকালে রেনেলের মানচিত্র (১৭৬৪-৭৯) থেকে নদ-নদীগুলি মাত্র চিহ্নিত করা যায় এবং জনপদের অধিকাংশই অপরিচিত নাম। বর্দ্ধমান, দিকনগর, সেলিমাবাদ, মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ, কালনা, আমবোনা, সিলামপুর প্রভৃতি জনপদগুলিকে এই মানচিত্রে চিহ্নিত করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জী

১) A draft out line of Eighth five year plan (1990-95), Burdwan by Dist. Planning Committee.

২) Statistical Accounts of Bengal- W. W. Hunters Vol. IV

৩) Statistical Accounts of Bengal- H. Blockman Vol-I

৪) Bengal Dist Gazetteers, Burdwan- J. C. K. Peterson.

৫) Aini Akbari- Vol 2

৬) West Bengal Dist records Burdwan

৭) Maps on Revenue Survey of India 1854-57

৮) Maps of Development and Planning (T. C. P) department- Govt. of West Bengal

৯) বাঙ্গালীর ইতিহাস-আদিপর্ব- ডঃ নীহার রঞ্জন রায়

১০) Rennels' ATlas

পরিশিষ্ট—২

একনজরে বর্দ্ধমান

[এক] প্রশাসনিক

আয়তন—৭০২৪ বর্গকিলোমিটাব
অক্ষাংশ—২২°৫৬′ এবং ২৩°৫৩′ উত্তব
দ্রাঘিমাংশ—৮৬°৪৮′ এবং ৮৮°২৫′ পূর্ব
জনসংখ্যা—৪৮,৩৫,৩৮৮ (১৯৮১ এব আদমসুমাবী)
শহর—২২
গ্রাম—২৬৭৯
মৌজা—২৪২৫
মহকুমা—৬
উন্নয়ন ব্লক—৩৩
পঞ্চায়েত সমিতি—৩১
গ্রাম পঞ্চাযেত—২৯৩
পৌরসভা—৭
নোটিফাযেড এবিযা—৫
বিধানসভা—২৬
লোকসভা ক্ষেত্র—৪
থানা (পুলিশ ষ্টেশন)—৩০
সাধারণ হাট—১৬৫
নিয়ন্ত্রিত হাট—৬৮
মেলা—৩৬৪

[দুই] জনবিন্যাস

জনসংখ্যা (গ্রাম)—৩৪,১৪,২১৯ (৭০.৬১%)
জনসংখ্যা (শহর)—১৪,২১,১৬৯ (২৯.৩৯%)
জনসংখ্যা (পুরুষ)—২৫,৪৮,৬০৩ (৫২.৭০%)
জনসংখ্যা (স্ত্রী)—২২,৮৬,৭৮৫ (৪৭.০৯%)
জন ঘনত্ব—৬৮৮ জন প্রতি বর্গ কিলোমিটার (রাজ্যের গড় ৬১৫)
সাক্ষরতা হার—৪২.৮৪% (রাজ্যের হার—৪০.৮৮%)
হিন্দু—৩৯,৩৮,৩৭৬

মুসলমান-৮,৫০,৯৫১
বৌদ্ধ—৭৬৮
খ্রীষ্টান—২২,৯৭০
শিখ—১৪,১০৬
জৈন—১,৪৩২
অন্যান্য—৬,৭৮৬
জন্মহাব (১৯৭১ ৮১) ২৩.৪৭%

[তিন] পরিবাব ও বৃত্তি

কৃষি পবিবাব—৩,১৭,১৬০
কৃষি শ্রমিক—৪,১৬,৭৯০
কুটিব শিল্পী ৪৩,৭০৭
অন্যান্য -৫,৮৬,০১৯
কৃষি পবিবাব: (১ হেক্টব পর্যন্ত)- ১,৬০,৯০৯ (৫১.৩৪%)
(১ হেক্টব হতে ৩ হেক্টব)- ৭৬,৯৭৩ (২৪.৫৫%)
(৩ হেক্টব হতে ৫ হেক্টব)- ৫৬,৩১১ (১৭.৯৬%)
(৪ হেক্টব এব উর্দ্ধে)- ১৯,২৮২ (৬.১৫%)

[চার] কৃষি ও সেচ

তাপমাত্রা: সর্বোচ্চ—৩৬°C (১৯৮৮-৮৯)
সর্বনিম্ন—৫°C
বৃষ্টিপাত—১৫০০ মিলিমিটাব (বার্ষিক)
মৃত্তিকা— ক) গঙ্গা অববাহিকায- পলি
খ) দামোদব অজয মধ্যবর্তী- এঁটেল
গ) পশ্চিমাঞ্চল; ল্যাটেবাইট [এসিড ৬৩%]
বনভূমি—২৭,১২৮ হেঃ (মাত্র ৩.৯৪% অংশ)
পতিত জমি—১,৪৭,১০০ হেঃ
গোচারণ—৩,৫০০ হেঃ
চাষযোগ্য জমি (পতিত)—১১,১০০ হেক্টব
নীট চাষযোগ্য জমি—৭,১৪,২৪৫ হেক্টব
দোফসলী জমি—২,৪৬,৮৭১ হেক্টব
বাগান ইত্যাদি—৮,০৮৭ হেক্টর
শস্যের ঘনত্ব—১৫৪%

উৎপন্ন ফসল :	ক্ষেত্র	পরিমাণ
আউশ—	২৯,৪৯৩ হেঃ	৫৮.৭৬ মেঃ টন
আমন—	৪,১৫,৪৫৯ হেঃ	৭৫৭.৫৬ মেঃ টন
বোরো—	১,৪০,৯৮২ হেঃ	৪২৪.৭৯ মেঃ টন
গম—	১২,৫৯৩ হেঃ	২৫.৫১ মেঃ টন
আলু—	৩৬,৭৮০ হেঃ	৮৯৮.৯০ মেঃ টন
সরিষা—	৪৯,৪৭২ হেঃ	৭১.০৫ মেঃ টন
আখ—	১,৪৫৯ হেঃ	৭৩.৭৫ মেঃ টন
সব্জি—	৪৯,১৯৫ হেঃ	৬৫৬.৫২' মেঃ টন
পাট—	১২,০০০ হেঃ	৮৭.০০০ বেল*

॥ সেচ ব্যবস্থা ॥

	সংখ্যা	সেচ এলাকা
গভীর নলকূপ—	৩৬০	৩৩,৯১৫ হেঃ
অগভীর নলকূপ—	৩৭,১০৩	১১,৭০০ হেঃ
কূপ—	৩৯১	৬৬ হেঃ
জলাধার—	১,৫৬০	১৬.৬৭ হেঃ
নদী উত্তোলক—		
সেচ পাম্প—	২৪,০৯৬	৬৬.৪২ হেঃ
ক্যানেল ডি, ভি, সি ও ময়ূরাক্ষী—		৩,০৪,৯০৩ হেঃ

হিমঘরের সংখ্যা— ৬৫ (ক্ষমতা— ৪৫ লক্ষ মেঃ টন)

সরকারী কৃষিক্ষেত্র :

জেলা কৃষি খামার—২

ঐ রাজ্যে—১

ব্লক বীজ খামার—১৪

আদর্শ খামার—১

মহকুমা গবেষণা খামার—৪

পশু চিকিৎসালয়—১১

ঐ ডাক্তারখানা—৫২

ঐ প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র—৫৭

সমবায় সমিতি—২,১৭৭

সদস্য সংখ্যা—৬,২৪,৮৯

[পাঁচ] মৎস্য ও শিল্প :
জলক্ষেত্রে– ৩১,১৪৪ হেক্টব
বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তি– ১১,১৮,৫৩০
বাৎসবিক উৎপাদন–২৪,৫০০ মেঃ টন
মৎস্য সমবায় সমিতি–৩৭
বেজিষ্টার্ড কাবখানা (শিল্প) – ৪৩৪
ঐ ক্ষুদ্র শিল্প–১১,১০০
তাঁত–২৮,৭৭৯
নিযুক্ত ব্যক্তি–২১,৯৪২

[ছয়] বৈদ্যুতিকবণ :
গ্রামীণ বৈদ্যুতিকবণেব আওতায় গ্রাম–২৫৭০
বৈদ্যুতিকৃত গ্রাম–২২২২ (৪৬.৪৬%)
হবিজন বস্তী বৈদ্যুতিকৃত–১৭
উপজাতি গ্রাম বৈদ্যুতিকৃত–৩৪
গৃহস্থ বাড়ি ও কাবখানা বৈদ্যুতিকৃত ১,২৭,২৯১

[সাত] যানবাহন ও যোগাযোগ :
পাকা বাস্তা– ৫০৪ কি. মি. (পি. ডবলু. ডি)
১১,৩০০ কি. মি. ঐ বোডস
২,৩১১ কি. মি. পৌবসভা
৩৪২ কি. মি. জিলা পবিষদ
১,৫৬৮ কি. মি. অন্যান্য
বেলপথ ব্রডগেজ–৪৭৪ কি. মি.
মিটাব গেজ–৫০ কি. মি.
ন্যাবো গেজ–৮৮ কি. মি.
বেলষ্টেশন সংখ্যা–৯৪
ডাকঘব–৬০২
টেলিগ্রাফ অফিস–৪৩

[আট] শিক্ষা ও স্বাস্থ্য
প্রাথামিক বিদ্যালয–৩৭৯০
উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয–৫২২
স্পনর্সড হাইস্কুল–৫

জুনিয়র হাইস্কুল—২৩৫
হাই মাদ্রাসা—১২
জুনিয়র মাদ্রাসা—১৪
হিন্দী স্কুল—৬
উর্দু স্কুল—১
বেসিক ট্রেনিং কলেজ—৪
বি. এড কলেজ—৪
মহাবিদ্যালয়—২৮
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ—১
পলিটেকনিক—১ আই, টি, আই—১
মেডিকেল কলেজ—১
বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র—১৪৬২
সাক্ষরতা কেন্দ্র—৬০
গ্রামীণ গ্রন্থাগার—১৯২
জেলা গ্রন্থাগার—২
মহকুমা গ্রন্থাগার—৩
শহর গ্রন্থাগার—৩
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল—১ শয্যা ১০৪৯
রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল—৪ শয্যা ৬১১
প্রাথমিক গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র—৪
ব্লক হাসপাতাল—৩০
প্রাচীন স্বাস্থ্যকেন্দ্র—৯০
শিশু ও মহিলা কল্যাণ—১
স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র—১৪৮৯
ঐ উপজাতি—৬
ব্যাঙ্ক ও শাখা—২৭৯
ঐ সমবায়—৩৬
গ্রামীণ ব্যাঙ্ক—৭০
সিনেমা হল—৫৫
ঐ অস্থায়ী—১৩

[নয়] জনতত্ত্ব : প্রতি দশ বৎসব অন্তব আদমসুমাবী অনুযাযী লোকসংখ্যা

খ্রীঃ অঃ	লোকসংখ্যা	খ্রীঃ অঃ	লোকসংখ্যা
১৯০১	১৫,২৮,২৯০	১৯১১	১৫,৩৩,৮৭৪
১৯২১	১৪,৩৪,৭৭৬	১৯৩১	১৫,৭৫,৬৯৯
১৯৪১	১৮,৯০,৫৩২	১৯৫১	২১,৯১,৬৬৭
১৯৬১	৩০,৮৩,৫৬৪	১৯৭১	৩৯,১৬,২১৫
১৯৮১	৪৮,৩৫,৩৮৮		

জাতি ভিত্তিক লোকসংখ্যাব তুলনা

১৯৫১ খ্রীঃ অঃ		১৯৮১ খ্রীঃ অঃ	
হিন্দু :	১৮,৩৫,১০৬	হিন্দু :	৩৯,৩৬,৩৭৬
মুসলমান :	৩,৪১,৮৭৮	মুসলমান :	৮,৫০,৯৫১
শিখ :	৫,৩৭৫	শিখ :	১৪,১০৬
খ্রীষ্টান :	৬,১৩৫	খ্রীষ্টান :	২২,৯৭০
জৈন :	১,০০৩	জৈন :	১,৪৩২
বৌদ্ধ :	২৭১	বৌদ্ধ :	৭৬৭
অন্যান্য :	১,৮৯৯	অন্যান্য :	৬,৭৮৬

[দশ] মূল্য, শ্রমিকেব বেতন ও কৃষি উৎপাদন

বিষয় :	১৯১০	১৯৩০	১৯৫০	১৯৭০	১৯৯০
কৃষি মজুবী (দৈনিক)	।০আনা	।।০আনা	১ টাকা	২ টাকা	১৮ টাকা
মাহিন্দাব (বৎসবে)	৯ টাকা	৩০ টাকা	৬০ টাকা	২০০টাকা	৩০০০ থেকে ৪০০০ টাকা
ধানেব মূল্য (পূর্বেব প্রতি আড়াই মণ বর্তমানে কুইণ্টাল)	১০ টাকা	২৫টাকা	৮০ টাকা	১৩০ টাকা	১৫০ টাকা
সোনাব মূল্য(প্রতি দশ গ্রাম)	২০ টাকা	৪০ টাকা	৬৫ টাকা	১১০০ টাকা	৪৭০০টাকা
সবিষাব তেল (কিলো প্রতি)	।।০আনা	২ টাকা	৭ টাকা	১২ টাকা	৩৮ টাকা
ধান্যেব উৎপাদন (একবে)					
আমন (ঐ)	৯ মণ	১২ মণ	৩৮ মণ	৪৫ মণ	৫৫ মণ

আলু	(ঐ)	৩০ মণ	৫০ মণ	১৫০ মণ	১৮০ মণ	২০০ মণ
আখ	(ঐ)	৪০ মণ	৬০ মণ	৮০ মণ	১০০ মণ	১২০ মণ

গ্রন্থপঞ্জী

1. District Plan, Burdwan 1989-90– Govt. of W. Bengal.
2. List of Aided Secondary Institutions– Burdwan Dist (1987 88)- D. I. (S. E), office.
3. Census Report– 1981
4 Burdwan Dist Gazetteer– 1910.

পরিশিষ্ট—৩

'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের বহু পূর্ব হতেই বাংলায় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। বর্দ্ধমানেও তার অন্যথা হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ছিল জাতীয়-জাগরণের 'গীতা', 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র সেদিন মূক কে বাচাল ক'রেছিল, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘনের প্রেরণা দিয়েছিল, পরাধীন জাতির কাছে স্বাধীনতার ফুটন্ত সকাল ছিনিয়ে এনেছিল। ১৮৬৭ খ্রীঃ প্রথম যে হিন্দুমেলার অধিবেশন হয়—তা ছিল নামেই 'হিন্দু', আসলে এই অধিবেশনে জাতীয়-জাগরণের সুপ্ত বীজটি বপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য পত্রটিতে ছিল: Prospectus of Society for the promotion of National feeling among the educated Natives of bengal. ১২৮০ বঙ্গাব্দে চব্বিশ পরগণার বারইপুরে নাট্যকার মনোমোহন বসুর এই গানটি গাওয়া হয়: ছুঁচ সূতা পর্যন্ত আসে / তুঙ্গ হতে / দিয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে / প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে / কিছুতে লোক নয় স্বাধীন—"। এর প্রায় ১৮ বৎসর পর ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় বোম্বাইতে। সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী ছিলেন মেমারী থানার আমাদপুরের অধিবাসী মহেশ চন্দ্র চৌধুরী। 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনেব পর বর্দ্ধমানের গ্রামে গ্রামে স্বদেশী আন্দোলনের সভা হ'তে থাকে। বর্দ্ধমান, কালনা, কাটোয়া, মেমারী, সিঙ্গার কোণ, বৈদ্যপুর অকালপৌষ, দেয়াড়া, ধাত্রীগ্রাম, আনুখাল প্রভৃতি গ্রামে সভা হয়। কালনায় মহিষমর্দিনী প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার পর ইংরাজীতে তেজস্বী ভাষণ 'We feel that ours is a devine miss on, we feel this great work that we are humble instrument in devine hand' যুব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেদিন ঐ সভায় উপস্থিত কবিগণ গান গেয়েছিলেন:

"দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এসো চণ্ডী যুগান্তরে—"

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীতপতি কাব্যতীর্থ, ললিতমোহন ঘোষাল, উপেন্দ্রনাথ হাজরা, আব্দুল কাসেম প্রমুখ। আব্দুল কাসেমের নিবাস ছিল খণ্ডঘোষ, তিনি ছিলেন সুবক্তা ও সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী। লর্ড কার্জনের কুখ্যাত নীতি 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবটি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে জুলাই অবধারিত বা Settled fact ব'লে ঘোষিত হয় এবং ভারতবাসীকে 'মিথ্যাবাদী' বলে কটূক্তি করলে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আহ্বান জানান। এই সময়ই বাঘনাপাড়ায় উপরোক্ত পাঁচজন তরুণ এই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে বিলাতি বস্ত্রের স্তূপে অগ্নি সংযোগ করেন। আইনজীবি নলিনাক্ষ বসু ও শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় তরুণদের পক্ষে আদালতে সওয়াল ক'রেছিলেন। মানকরের হাটে বিলিতি বস্ত্রে আগুন লাগিয়ে ও লবণ বিক্রয় বন্ধ ক'রে কারাবরণ ক'রেছিলেন স্থানীয়

জমিদার রাজকৃষ্ণ রক্ষিত। লর্ড কার্জনের ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদ ক'রে কলকাতার টাউনহলে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন বর্দ্ধমানের সুসন্তান ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তোড়কোনার স্যার রাসবিহারী ঘোষ।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের তিনটি ধারা, একটি—অহিংস জাতীয় আন্দোলন, দ্বিতীয়টি ছিল বিপ্লববাদের মধ্য দিয়ে সহিংস আন্দোলন এবং তৃতীয় ধারাটি হ'ল জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন। প্রথম ধারার পথিক ছিলেন জেলার গুণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আব্দুল কাসেম প্রমুখ, দ্বিতীয় পথের পথিক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বটুকেশ্বর দত্ত, রাসবিহারী বসু, ফকিরচন্দ্র রায় প্রমুখ। যতীন্দ্রনাথকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'বিপ্লবের বড়দা' এবং অগ্নিযুগের ব্রহ্মা ব'লে অভিহিত করেন। তৃতীয় পথের পুরোহিত ছিলেন: অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, বলাই দেবশর্মা, বিজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। পরবর্তীকালে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন সুরেন্দ্রনাথ বড়াল (অধ্যাপক রাজ কলেজ), হরিনারায়ণ চন্দ্র, গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র, কালীকেশব ঘোষ, পঞ্চানন চৌধুরী, বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায়; হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিমল চন্দ্র কুণ্ডু, রাধাকান্ত দীক্ষিত, অজিত শরণ বসু (শাঁকারী), দুর্গাদাস হালদার (রানীগঞ্জ) প্রমুখ।

বর্দ্ধমানের সন্তান হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত স্বদেশী আন্দোলনের একটি গান প্রতি সভার প্রারম্ভে গাওয়া হত:-

—"এসো ভ্রাতৃগণ হয়ে একমন, মাতৃসেবা আজি কর যতনে
বঙ্গমাতা অঙ্গ করিয়াছে ভঙ্গ, পুত্র হয়ে সহ কেমনে?।"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় "বারুণী" স্নান উপলক্ষ্যে একখানি স্বদেশাত্মক গীতি পুস্তিকা প্রচারিত হয়েছিল। কবির নাম ছিল না, সেই গান বর্দ্ধমানের গ্রামে গ্রামে লোকের মুখে মুখে ফিরত:

অস্ত্র নাই? তাই দুঃখ! নাহি প্রহরণ?
পাইবে কি প্রহরণ সাধিলে কাঁদিলে?
বক্তৃতার উচ্চ কণ্ঠ কর সংবরণ
প্রস্তর গলিবে কি রে নয়ন সলিলে?
কোটি কোটি ক্ষীণ হস্ত জীবন সংগ্রামে
উঠে যদি এককালে, স্বাধীনতা তরে—
শুধু এই রিক্তমুষ্টি প্লাবন তাড়ণে
ভাসাইয়া লয়ে যাবে অরাতি নিকরে॥

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের কাছে বিপ্লববাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন কাটোয়ার মানবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুর পর তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদনা করতে থাকেন ও গ্রেপ্তার হ'য়ে কারাবরণ করেন। এই 'সন্ধ্যা' সম্পাদনা গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী, নরেন্দ্রনাথ শেঠ ও বলাই দেবশর্মা। জাতীয় আন্দোলনে সন্ধ্যার অবদান স্মরণীয়। বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর জন্মভূমি কালনার দত্ত দেড়িয়াটোনে। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্তর পিতৃভূমি আঝাপুর। বিপিনচন্দ্র পালের জন্মভূমি কাটোয়ায় এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃভূমি মেমারীব কাছে ডেঁয়েময়রা গ্রামে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের প্রথম ধর্মঘটে অংশ নেন সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ রায়। বর্দ্ধমানের চারুচন্দ্র দত্ত শ্রীঅরবিন্দের সহকারীরূপে কাজ করার সৌভাগ্য অর্জন ক'রেছিলেন।

গান্ধীজির আহ্বানে, সাড়া দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন শাটীনন্দীর যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, কলানবগ্রামের বিজয় ভট্টাচার্য (পূর্বতন ওযাঁড়ি গ্রামের), কাটোয়ার গুণেন্দ্রনাথ মুখার্জী, পার্কসরোডের মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন, কচি মিঞা ও গোলাম রহমান প্রমুখ। গুইর গ্রামের অনিলবরণ রায় (১৯২১ খ্রীঃ) অসহযোগ আন্দোলনে ও ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলে যোগদান করেন। তিনি বাঁকুড়া কেন্দ্র থেকে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। দেশবন্ধুর স্বরাজ্যভাণ্ডারে যাঁরা মুক্তহস্তে দান করেন তাঁদের মধ্যে বনোয়ারীলাল পাঁজা, রামদয়াল দে, রাজকৃষ্ণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়, ভামিনীরঞ্জন সেন উল্লেখযোগ্য। দেশাত্মবোধেব উদ্বোধন হয়েছিল এইসময় রানীগঞ্জ সরস্বতী কর্মমন্দিরে, তার পুরোহিত হলেন বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাদাস হালদার, ভীমপদ রায়, প্রমুখ। যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা লবণ সত্যাগ্রহের বার্তা গ্রামে গ্রামে প্রচার করেন। এই দলে ছিলেন ভক্তভূষণ সোম, ডঃ অরীণ গুপ্ত, নিরঞ্জন হাজরা, তড়িৎকুমার দে, চণ্ডীচরণ মিত্র, দাশরথি রায়, সরোজ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ মজুমদার প্রমুখ। এই প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল ঘরে ঘরে চরকায় সূতা কাটা, তাঁতের প্রচলন ও লবণ সত্যাগ্রহের তাৎপর্য গ্রামবাসীকে বোঝানো।

১৯৩৪-৩৫ খ্রীঃ বর্দ্ধমানে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, সেই সময় মুমূর্ষু আর্ত-পীড়িত মানুষের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন বর্দ্ধমানের রাজনৈতিক কর্মীগণ। মহারাজ উদয়চন্দ ছিলেন পৃষ্ঠপোষক এবং স্বামী কমলানন্দ পরিব্রাজক ছিলেন সভাপতি। পশুপতিনাথ মালিয়া ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন ফকিরচন্দ্র রায়, মানকরের রাধাকান্ত দীক্ষিত, নিতাই ঘোষ প্রমুখ।

বিপ্লবের 'ব্রহ্মা' যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্বস্বামী) পরবর্তীকালে সন্ন্যাস

জীবনে মগ্ন থাকেন ও চান্নায় খড়িনদীর তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমে ভারতবিখ্যাত মহাবিপ্লবীদের যাতায়াত ছিল। যতীন্দ্রনাথের প্রয়ানের পর তাঁর শিষ্য যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (স্বামী প্রজ্ঞানপাদ) এই আশ্রমের দায়িত্ব বহন করেন। জেলার তরুণ সম্প্রদায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে এগিয়ে এলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বিপ্লবী ফকিরচন্দ্র রায়, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, দাশরথিতা, সরোজ মুখোপাধ্যায়, শিবশংকর চৌধুরী, আমোদবিহারী বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার, আব্দুস সাত্তার, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন রায় প্রমুখ। এই তরুণদের অনেকেই পরবর্তীকালে কংগ্রেস ত্যাগ করে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। কালনা, বৈদ্যপুর, পুটশুড়ি, কাইগ্রাম, পূর্বস্থলীর, পাটুলি, রাণীগঞ্জ ও আসানসোলে আইন অমান্য আন্দোলন হয়। যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল, রাধাশ্যাম চোধুরী, ডঃ সন্তোষ কুমার ঘোষ, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। কালনা স্টেশনে মদের দোকানে পিকেটিং করতে গিয়ে নির্দয়ভাবে ইংরেজ পুলিশের হাতে প্রহৃত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল ও জগবন্ধু সাঁই। কাটোয়া ও মন্তেশ্বরে আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৪২ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে সমাজবাদের আদর্শে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার ও সরোজ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রজীবন শেষ করে কলকাতা থেকে এলেন মন্তেশ্বরের তরুণ শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করে কারাবরণ করেন ও জেলার রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় নূতন মাত্রা যোগ করেন।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে জেলায় ক্যানেল করের বিরুদ্ধে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই সময় বর্দ্ধমান জেলা কংগ্রেস কমিটি ও কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত কৃষক সমিতি পৃথক পৃথকভাবে আন্দোলন শুরু করেন। অস্বাভাবিক ক্যানেল কর ধার্যই কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ক্যানেল কর ধার্যের তদন্ত কমিটি একরে একমণ ধান ও এক পণ খড় কর হিসাবে দেওয়ার যৌক্তিকতা স্বীকার করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে দেশে আগুন জ্বলে ওঠে। ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে আইনসভার নির্বাচনে 'কৃষকপ্রজা পার্টির' নেতা ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। তখন কৃষক দরদী ফজলুল হক একরে পাঁচ টাকা ক্যানেল কর ধার্য করেন। ক্যানেল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জেলার রাজনৈতিক কর্মীদের রাষ্ট্রীয় চেতনার যে প্রকাশ ঘটে তার গুরুত্ব অসীম।

পরিশিষ্ট—৪

বর্দ্ধমানের গ্রাম নাম

বর্দ্ধমান জেলায় গ্রামের সংখ্যা ২৬৭৯। গ্রামের নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে অজানা ইতিহাস। নামের মধ্যে রয়েছে দেবদেবীর প্রভাব আর্য-অনার্য সংস্কৃতির ছাপ, জাতি-ধর্মের ছোঁয়া ও সভ্যতার বিবর্তনের প্রতিবিম্ব। বহু গ্রামের নাম হয়ত কোন তাৎপর্যই বহন করেন না, অর্থ খুজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেন বহু গ্রাম-নামের তাৎপর্য ও ব্যুৎপত্তিগত অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। বেশির ভাগ গ্রামের নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই এলাকার বৈচিত্র্য, স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনচর্যা ও এলাকার উত্থান-পতনের কাহিনী। হিন্দু সভ্যতা ও মুসলমান সভ্যতার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বহু গ্রাম নামের মধ্যে উঁকি দিয়ে জানিয়ে দেয় তাদের ঐতিহ্যের কথা। গ্রাম নামেব পিছনে যে অর্থ লুকিয়ে আছে তাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়:-

১) ঠাকুর দেবতার নামে গ্রাম নাম -যেমন বলরামবাট, শাঁকাবী, কাঁকসা, বোঁযাইচণ্ডী, বোড়ো বলরাম, গৌরবাড়ি ইত্যাদি।

২) জাতির নামে গ্রাম নাম, যেমন-বামুনপুকুর, বামুপাড়া, খণ্ডঘোষ ব্রাহ্মণডাঙ্গা, কাইতি (কায়স্থ), কামার গড়ে।

৩) বন-জঙ্গলের নামে গ্রাম নাম-যেমন বনসুজাপুর, সিমডাল, বননবগ্রাম, পলাশডাঙ্গা, পলাশন ইত্যাদি।

৪) পুকুরের নামে গ্রাম নাম; মল্লান দীঘি, চকদীঘি, বজরুক দীঘি।

৫) ফলমূলের নামে গ্রাম; অম্বিকা, বেগুনিয়া, সুপুর, আমরুল।

৬) ঋতু সংক্রান্ত গ্রাম নাম; বাদলা, চৈতপুর, পোষলা, চৈতখণ্ড, অকালপৌষ।

৭) ডাঙ্গা অর্থাৎ মাঠের নামে গ্রাম-নাম; মেটেগঙ্গা, ময়রাডাঙ্গা, মাঝিডাঙ্গা, সালডাঙ্গা।

৮) গঞ্জ বা বড় গ্রাম বোঝাতে-কেশবগঞ্জ, জিগত গঞ্জ, মোবারক গঞ্জ, নূতন গঞ্জ, আলম গঞ্জ।

৯) অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় অধ্যুষিত এলাকা বোঝাতে; আমড়া, বাউড়া, রাউতাড়া, কেঁজেড়া।

১০) পুর বা সুন্দর গ্রাম বোঝাতে; শিকারপুর, রামপুর, মসলন্দপুর, শ্রীবীজাপুর, পিরিজপুর, দেবপুর।

১১) বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের নামের শেষে গ্রাম যুক্ত হয়ে- কেতুগ্রাম, মশাগ্রাম, মশাই গ্রাম, পুন্যগ্রাম, মহুয়াগ্রাম, ফুল গ্রাম, নবগ্রাম।
১২) মাটি অর্থাৎ দেবস্থান বোঝাতে; শ্রীবাটি, বৈদ্যবাটি, রাজবাটি, শ্যামবাটি, শ্যামদাসবাটি।
১৩) ডিহি বা দ্বীপ বোঝাতে: শ্যামডি, মালাডি, কুমারডি, রায়ডি।
১৪) বেড় বা বেড়া অর্থাৎ আগল বোঝাতে: গোপালবেড়া, বোড়া সেকুলবেড়িয়া, মানবেড়িয়া, জগৎবেড়।
১৫) কুড় বা কুড়ি গাদা অর্থে: সোনাকুড়, গামারকুড়ি, পিচকুড়ি।
১৬) গড় বা দুর্গ শব্দ প্রাচীন ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়: শক্তিগড়, পানাগড়; শেরগড়, গড়তালিত, অমরার গড়, বেত্রাগড়।
১৭) বাস্তুজমি ও ভিটে বোঝাতে গ্রামের নাম: ভিটা, ভৈটা।
১৮) বাঁধ বা জলস্রোত ঠেকানোর অতীত স্মৃতি মহন করছে: লস্কর বাঁধ, রাজ বাঁধ।
১৯) প্রাচীন কালে সুন্দরনগর ছিল তার স্মৃতিবহনকারী: দিগনগর, রামনগর, শ্রীনগর, রায়নগর, মাদানগর।
২০) শালী বা শাল অর্থাৎ অধিষ্ঠানক্ষেত্র বোঝাতে: কাষ্ঠশালী, দেবশালা, ধাশালা।
২১) পাড়া বা প্রকৃতই পল্লী বোঝাতে: নপাড়া, পাইকপাড়া, আঁটপাড়া।
২২) কোন প্রিয়জনকে কবর দেওয়া হয়েছে বা পোঁতা হয়েছে তার স্মৃতিবাহী গ্রাম: ঊষাপোঁতা, জামাইপোতা, ভরপোঁতা।
২৩) মুসলিম সংস্কৃতিবাহী গ্রাম নাম: ফকিরপুর, হুসেনপুর, কাশেমনগর, মঙ্গলকোট, ফতেপুর, মসজিদপুর, শাহ্ হোসেনপুব, সেলিমাবাদ, করিমপুর।
২৪) পদবীর নামে গ্রামনামও দেখা যায়: দত্তপাড়া, দেপাড়া, শেখপাড়া।
২৫) হাট বা হাটি গ্রাম্য ছোট বাজার অর্থে: সীতাহাটি, মানিকহাটি, পাত্রহাটি, খানহাটি, নবাবহাট, কাজিরহাট।
২৬) খণ্ড বা অংশ অর্থাৎ প্রথমে গ্রামটি কোন বড় গ্রামের অংশ বা পত্তনেই ক্ষুদ্র বোঝাতে: শ্রীখণ্ড, নেত্রখণ্ড, ছত্রখণ্ড, নবখণ্ড, তাতখণ্ড।
২৭) চক অর্থাৎ ক্ষুদ্র স্থান বোঝাতে: চকভুরো, চক-কাইতি, চকচন্দন, কোরারচক, চকপুরোহিত।
২৮) গাছা বা গেছিয়া বোঝাতে: বামুনগাছি, সাতগেছিয়া, পাঁচগেছিয়া।
২৯) সোল অর্থাৎ ঘনসন্নিবদ্ধতা বোঝাতে যেমন: আসানসোল, মুর্গাসোল।
৩০) আড় বা আড়ি অর্থাৎ উঁচুমাটির বেড়া (বাঁধ) বোঝাতে: বামুনাড়ি, ভাতাড়, পালাড়, চেনাসোল।

৩১) বাজার ইংরাজী শব্দ যেখানে সবসময় কেনা-বেচা হয়: লালবাজার, বাজার-বনকাপাসী, গৌড়বাজার, ঠাকুরানী বাজার।

বৰ্দ্ধমানের গ্রামের নামগুলির মধ্যে কোন ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম, বস্তুতে সেই এলাকার সৃষ্টির ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে—যা মুখে মুখে চলে এসেছে। জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিও লুকিয়ে রয়েছে কোন কোন গ্রাম নামের মধ্যে। কোন কোন গ্রাম নামের মধ্যে বিষাদ, আনন্দ, দুঃখ ও বেদনার স্মৃতিও লুকিয়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে অজানা অজ্ঞাত ইতিহাসের অফুরন্ত অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডার রয়েছে গ্রাম নামের মধ্যে। কোন কোন গ্রামের নামের মধ্যে আউল, বাউল, ফকির, রাজকন্যা, বেগম, রানী, শাহজাদী ও সাধুসন্তের নামও জুড়ে রয়েছে। নীচে ২৬৭৯টি গ্রামের তালিকা সন্নিবিষ্ট করা হ'ল। বহু গ্রামের নাম আছে কিন্তু বর্তমানে জনবসতি নেই।

।। বৰ্দ্ধমানের গ্রাম-নাম ।।

থানা: চিত্তরঞ্জন

মোট গ্রামের সংখ্যা ৭। আমলাদহি, বারমুরি, দুগাডি, ফতেপুর, নামোকাশিয়া, সিমজুড়ি এবং উপর কাশিয়া।

মন্তব্য :এই সাতটি গ্রামের মধ্যে মাত্র দুটি গ্রামের গ্রামীণ অস্তিত্ব আছে—বারমুরি এবং নামোকাশিয়া। বাকিগুলি চিত্তরঞ্জন শহরের পেটের মধ্যে ঢুকেছে।

থানা: সালানপুর: মোট গ্রাম ৭৩টি, ১২টি লোকশূন্য। আছড়া, আলকুশ, আন্নাদি, আঙ্গরিয়া, বনবিরডি, বাঁশকাটিয়া, বরাবৈ, বাসুদেবপুর, বাথানবাড়ী, বেনাগড়িয়া, বোলকুণ্ডা, বৃন্দাবনী, ছায়েনপুর, দাবর, দামদহ, দাঁদুয়া, দামিনবেড়িয়া, ধানগুড়ি, ধানুদি, ধরাসপুর, ধুন্দাবাদ, এথোরা, ঘিয়াডোবা, হাদলা, হরিশহাদি, জেমারী, জিৎপুর, কালাদাবার, কালিপাথর, কালিসাঁকো, কল্যা, কাঁকুরকুণ্ডা, কেওহার্ডি, খুদকা, কীর্ত্তনশোলা, কুসুমকনালি, লাহাত, মাধাইচক, মহেশপুর, মহেশমুড়া, মাঝলাডি, মালিয়াকোলা, মালাডি, মনহরা, মোহনপুর, মুছিদি, নেকড়াজুরিয়া, পাহাড়গড়া, পাহাড়পুর, পর্বতপুর, পাতাল, ফুবেড়িয়া, পিঠাকিয়ারি, প্রতাপপুর, রাধাবল্লভপুর, রামচন্দ্রপুর, রামডি, রূপনারায়ণপুর, সাধনা, সিয়াকুল বেড়িয়া, সালানপুর, শ্রীশ্বেড়া, শ্যামডি, সিধাবাড়ি, শ্রীরামপুর, উত্তর রামপুর। লোকশূন্য: তালবেড়িয়া, সরকুড়ি, রাঙামেটা, মালবহাল, জোড়বাড়ি, গামারকুড়ি, ঘাটাকুল, ধরম্মা, বরবকপুর, বড়পাথরবাড়া ও আমঝরিয়া।

লোকসংখ্যা : ৮১র জনগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা: ৫১,৫৮৪ (৭১-এ ৪২,১২৯)

থানা : কুলটি। মোট গ্রাম ৬০। লোকশূন্য—১টি।

আলডিহি, আসানবানি, বদিরচক, বালিতাড়া, বামনডিহা, বরাকর, বারিরা, বেজাডিহি, বেলরুই, ভানরা, বোলদি, চলবলপুর, চাম্পতাড়িয়া, ছোটধেমুয়া, চিনাকুড়ি, চুঙ্গারি, ডামাগড়িয়া, দেবীপুর, দেদি, দিগরী, ডিসেরগড়, ডুবুরদি, গাঙ্গুটিয়া, হাতিনল, হেরালগড়িয়া, হঁদকাটা, জামালডি, জসাইডি, কালিকাপুর, কমলপুর, কান্দুয়া, কুলদি, কুলতাড়া, কুলটি, কুমারডিহা, লচ্ছিপুর, লছমনপুর, লালবাজার, মাহাতাডি, মাহুতডি, মানবেড়িয়া, মনোহরচক, মেথানি, নমআরারা, নারায়ণচক, নিয়ামতপুর, পাইডি পাবা, পেটানা, পুনুরি, রাধানগর, রামনগর, রামপুর, রায়ডি, সাবানপুব, সাঁকতোড়িয়া, শিপুর, শীতলপুর, সীতারামপুর, সোদপুর।

লোকসংখ্যা : ৮১র জনগণনা অনুযাযী ৫৫,১৩১।

থানা : হীরাপুর : মোট ২৭টি গ্রাম। লোকশূন্য ১টি, নামোবারা।

আলুথিয়া, বনগ্রাম, বড়দিগরী, বরাথল, ভালাডি, ভাবতচক, বিদ্যানন্দপুর, চাপরাডি, ছোটদিগরী, ধেনুয়া, ডিহিকা, হীরাপুর, ইসমাইল, জামডিহা, জুনুৎ, কালাঝরিয়া, কুলিয়াপুর, জাক্‌সতা, নবঘনডি, নামোবারা, নরসিং বাঁধ, পাটমোহনা, পুরুষোত্তমপুর, সান্‌তা, শ্যামরাণা, শ্যামডিহি, তালকুনাবি।

লোককসংখ্যা : ৮১র জনগণনা অনুযায়ী ২৩,৫৭৪।

থানা : আসানসোল : মোট গ্রাম ৩৮টি। লোকশূন্য—সরকডি।

আসানসোল, বনবিষ্ণুপুর, বনসরকড়ি, বরাবক, বড়ধেমো, বড়পুখরিয়া, বড়তারিয়া, চককেশবগঞ্জ, দক্ষিণ ধাধকা, দামড়া, গণরুই, গড়পাড়িয়া, ঘোষিক, গোবিন্দপুর, গোপালপুর, হাতগড়ুই, জগৎডি, কালিপাহাড়ি, কন্না, কল্ল্যা, কেশবগঞ্জ, কোটালডিহি, কুমারপুর, মহুজুরি, মরিচকাটা, মহিশীলা, ন'ডিহা, নরসমুডা, নিশ্চিন্ত, পলাশডিহা, ফতেপুর, রঘুনাথবাটি, রামজীবনপুর, সাতপুখরিয়া, শীতলা, সুড়ি, উত্তর ধাধকা।

জনসংখ্যা : ৮১র জনগণনা অনুযায়ী ৫৭,৫০৬।

থানা : বরাবনী। মোট ৫৩টি গ্রাম।

আলিগঞ্জ, আলিপুর, আমডিহা, আমনালা, আমুলিয়া, বলাইপুর, বরাবনী, বরাডাঙ্গা, ভানোয়ারা, ভাসকাজুরি, বিজরী, সিলা, চরণপুর, ছোটকরা, চিনচুরিয়া, দশকিয়ারী, দোমহানী, গোপালবৈদ, গৌড়বাজার, হোসেনপুর, ইটাগোড়া, জামগ্রাম, জনার্দ্দন সায়র, জয়রামডাঙ্গা, কাঁশকুলি, কাঁটাপাহাড়ী, কন্যাপুর, কব্যাবৈদ, কপিষ্ঠা, কেলেজোরা, খয়েরবাদ, খামরা, খোশনগর, লালগঞ্জ, মদনপুর, মাজিয়ারা,

মনোহরবলহাল, নপাড়া, নুনি, পাঁচগেছিয়া, পানিফলা, পানুরিয়া, পারুলবারিয়া, পুছড়া, পালুলিয়া, রঘুনাথচক, রাণীগঞ্জ, রসুনপুর, রোপনা, সর্ষলতি, শ্যামসুন্দরপুর, তালডাঙ্গা।

জনসংখ্যা: ৮১র জনগণনা অনুযায়ী—৬৭,৩৫৯।

থানা: জামুরিয়া। মোট গ্রাম ৭৪টি। জনশূন্য ৭টি।

আন্ধাইরা, বাগডিহা, বাগরা, বাগুলি, বাহাদুরপুর, বলানপুর, বামনাবাঁধ, বনালি, বারুল, বাতাসপুর, চেনাসোল, ভাতেরদহ, ভুরি, বিজয়নগর, বীজপুর, বীরকুলটি, চাকদলা, চাঁদা, ছত্রিশগণ্ডা, চিচুরবিল, চিচুরিয়া, চুরুলিয়া, ডাহুকা, দামোদরপুর, দরবারডাঙ্গা, দেশের মোহন, ধাশালা, ধাসনা, ডোবরাণা, হিজলগারা, ইকরা, জামসোল, জামুরিয়া, জয়ন্তিপুর, জয়নগর, ঝিলা, জোবা, জোতজানকি, কৈথি, কাটাগড়িয়া, কেদা, কামারশোল, খোসকুলা, কুমারডিহা, কুন্দলিয়া, কুনুস্তরা, লালবাজার, মাদানতোর, মাধবপুর, মধুডাঙ্গা, মামুদপুর, মণ্ডলপুর, মনপুর, মিঠাপুর, নন্দী, নায়কপুর, নিমসা, নিঙ্গা, পরযসিয়া, পরিহবপুর, পাথরচুর, বাথকুডা, সড়কডিহি, সার্থকপুর, সাতগ্রাম, সত্তর, শেখপুর, সেমালা, শাঁখাড়ি, শিবপুব, সিধপুব, শ্রীপুর, তালতোর, তপসি।

জনশূন্য: ঝিলা, কামারশোল, মনপুর, জয়ন্তিপুর, চেনাসোল, বাতাসপুর, বামনাবাঁধ।

লোকসংখ্যা: ৮১র জনগণনা অনুযায়ী ৯৫,৬৮৩।

থানা: রাণীগঞ্জ। মোটগ্রাম ৩২টি। লোকশূন্য ২টি।

আমকুলা, বক্তারনগর, বল্লভপুর, বাঁশরা, বেলেবাথান, চকজনাধরা, ছলবলপুর, চাপুই, চেলাদ, দামালিয়া, এগারো, হরভঙ্গ, জেমেরি, কুমারবাজার, কুমারডিহা, মঙ্গলপুর, মুর্গাশোল, নাপুর, নারানকুড়ি, নিমচা, রঘুনাথচক্, রাণীগঞ্জ, রতিবাটি, রোনাই, সোনাচোরা, তিরাট।

লোকশূন্য: চক জনার্দ্দনপুর, আমরাসোতা।

লোকসংখ্যা: ৮১র জনগণনা অনুযায়ী—৪৭,৪৫৯।

থানা: অণ্ডাল। মোট গ্রাম ৬০টি। লোকসংখ্যা ১টি টিয়ারমারা।

আমলৌকা, অণ্ডাল, আরতি, বাবুইশোল, বহুলা, বৈদ্যনাথপুর, বাজারি, বনগুড়ি, বনবহাল, বসকা, ভাদুড়, ভালুকা, ভাতমুড়া, বিলপাহাড়ী, চকবনবহাল, চক বাংকোলা, চক্ঝরিয়া, চক কারালা, চক রামবাটি, ছোড়া, দক্ষিণখণ্ড, ডালুরবাঁধ, দনিয়া, দেশলোপা, ধাণ্ডাডিহি, দিগনালা, ডুবচুরুরিয়া, গাইধোবা, গোবিন্দপুর, হাঁসডিহা, হরিপুর, হরিশপুর, জাবুনা, জোয়ালডাঙ্গা, কাজোরা, কেঁদবাখোট্রাম, খাঁদড়া, কোনারডিহি। কোণ্ডা, কুমারখালা, মদনপুর, মাধবপুর, মধুসূদনপুর, মহাল, মাহিরা, মুকুন্দপুর, নবগ্রাম, পলাশবন, পরাশকোল, গাঠসাওরা, রামনগর, রামপ্রসাদপুর, শংকরপুর, শ্যামসুন্দরপুর, সিঁদুলি, সোনপুর, শ্রীরামপুর, তামলা, উখরা।

লোকসংখ্যা : ৮১র জনগণনা অনুযায়ী ৯৭,২৭৫।

থানা : ফরিদপুর। মোট গ্রাম ৭২টি। লোকশূন্য ২টি কামারডাঙ্গা ও চক্‌লাউদহ।

আমদহি, আমলৌকা, আরতি, বৈদ্যনাথপুর, বাজারি, বালিঝুরি, বনবহাল, বনগ্রাম, বাঁশগড়া, বনগুড়ি, বাঁশিয়া, বনশোল, বরাগড়িয়া, বেনেবন্দী, ভাবুরিয়া, ভদ্রপুর, ভালুকা, ভাতমুড়া, বিলপাহাড়ী, চকঝরিয়া, চককরালা, চকলাউডোহা, চাপাবন্দী, দুলারবাঁধ, দন্যা, দেশলোপা, ধাবনী, গোবিন্দপুর, গোগলা, গোপীডাঙ্গা, হাঁসডিহ্‌, হরিপুর, হেটেডোবা, ইছাপুর, জাবুনা, জগন্নাথপুর, জামগড়া, ঝাঁঝরা, জোয়ালভাঙ্গা, জোত বলরাম, কালিকাপুর, কালিনগর, কাটাবেড়া, কোঁদড়া, কোট্রাডি, কেন্দুযা, কেন্দুলা, খাটগড়িয়া, কোনারডিহি, কোণ্ডা, কুমারখালা, লস্করবাঁধ, লাউডোহা, মাধাইগঞ্জ, মাধাইপুর, মহাল, মহেশপুর, মান্দারবনী, নবঘনপুর, নবগ্রাম, নাচন, নাকড়াকোন্ডা, নূতনডাঙ্গা, পানশিউলি, পাটিসাওডা, প্রতাপপুর, রামনগব, রাঙামাটিযা, সরপি, শ্যামপুর, শ্যামসুন্দরপুর (২), সিরপা।

জনসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ৬২,৬৯০।

থানা : দুর্গাপুর। বনসোল ধাবনী। ১৫১৫।

থানা : নিউ টাউনশিপ : জামুয়া, কালিগঞ্জ, পরাণগঞ্জ, শংকরপুর, তেতিখালা।

জনসংখ্যা : ৫,৯৭৬।

থানা : কাঁকসা। মোট গ্রাম ৯২টি, লোকশূন্য : ৫টি।

আকনদারা, আমলাজোরা, আনন্দপুর, আরা, আয়মন, বিশ্বনাথপুর, বাবনাবেডা, বামুনাড়া, বনগ্রাম, বাঁদরা, বনাটি, বাঁশকোপা, বাসুদেবপুর, বসুধা, বেহারপুব, বিনোদপুর, ধোবারাও, ভগবানপুর, বির্দবিহার, বিরুডিহা, বিষ্টুপুর, ব্রাহ্মণগ্রাম, বৃন্দাবনপুর, চক বিষ্ণুপুর, চকনারায়ণপুর, চুয়া, চুয়ামুডাগা, ধাঁধাশপুর, দেবীপুর, ডিহিবেটা, ডোমরা, দুবরাজপুর, গাগুবিল, গাড়াদহ, গড়কিন্না, খেওরবাড়ি, গোপালপুর, গৌরাঙ্গপুর, হারিকি, জিগতগঞ্জ, জামবন, জামডোবা, জাতগড়িয়া, কাজলাডিহি, কাঞ্চনপুর, কাঁদরকোনা, কাঁকসা, কেশবপুর, খাটপুকুর, কোটালপুকুর, কৃষ্ণপুব, কুলডিহা, মহলা চাঁদনী, মাঝিডাঙ্গা, মলানদিঘি, মণিকাড়া, মশনা, মোবারকগঞ্জ, নবগ্রাম, নপাড়া, নতুনগঞ্জ, নিমটিকরি, পানাগড়, পাঁচপুখরিয়া, পশ্চিমগঙ্গারামপুর, পাথরডিহা, ফুলঝুরি, পিওরিগঞ্জ, প্রয়াগপুর, রাধামোহনপুর, রাধানগর, রঘুনাথপুর, রাজহাট, রাজকুসুম, রক্ষিতপুর, রাণীপুর, রাউতপুর, রূপগঞ্জ, সাধুমারা, সরস্বতীগঞ্জ, শশীপুর, সাতকাহানিয়া, শ্যামবাজার, শিবপুর, শিলমপুর, সোকনা, শ্রীরামপুর, সুনদিয়ারা, সুন্ডিপুর, তালবাহারি, তেলিপাড়া, ঠাকুরাণী বাজার, তিলকচন্দ্রপুর।

জনশূন্য : রাণীপুর, চকবিষ্ণুপুর, ভগবানপুর, চুয়ামুডাগা, পাঁচপুখরিয়া।

লোকসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ৮৭,৫৫৯।

থানা : বুদবুদ। মোট গ্রাম ৬৬টি। লোকশূন্য ৪টি।

আমার, অর্জুনপুর, বলরামপুর, বলরামবাটি, বনগ্রাম, বড়চাতরা, বড়ডোবা, ভগবানপুর, ভাতকুণ্ডা, ভরতপুর, বিলাসপুর, বুদবুদ, চকপিয়ারীগঞ্জ, চক তেঁতুল, চাঁদরা, চন্দ্রচক, দক্ষিণখাঁড়া, দেবশালা, ডাহারানা, দুর্গাপুর, ফতেপুর, গোপালমাঠ, হাঁসোয়া, হাওড়া, জয়কৃষ্ণবাটি, জিঁজরা, কল্যাণপুর, কসবা, কেদুয়াটিকুরি, খান্ডারী, কোমারবন্দ, কোটাচণ্ডীপুর, কৃষ্ণরামপুর, লক্ষ্মীনারায়ণপুর চক, মল্লিকপাড়া, মানকর, মাড়ো, মৌগ্রাম, মোকাটা, নারাণপুর, নস্করবাঁধ, পাদুমা, পরডাবা, পরিযা, পশ্চিমচণ্ডীপুর, পতিহার, পন্ডালি, রঘুনাথপুর, রাইপুর, রামনগরচক, সালডাঙ্গা, সর্বমঙ্গপুর, সোদপুর, সোনাই, সোনাই আইমা, সোনাই আইমাপূর্ব, শুকডাল, শ্যামসুন্দরপুর, রাইপুর, মনগ্রাম, সোদপুর, দুর্গাপুর, আউয়ার, কাকরা।

লোকশূন্য : সোনাই, আইমাপূর্ব, রামনগরচক, বলরামবাটি, দক্ষিণখাঁড়া।

জনসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ৮৭, ০৪৬।

থানা : আউসগ্রাম। ১৬০টি গ্রাম। লোকশূন্য : ৭টি।

অভিরামপুর, আদুরিয়া, আকুলিয়া, আলেফনগর, আলিগ্রাম, আলুটিয়া, অমরাবপুর, অমরারগড়, আওগ্রাম, আরজুড়ি, আসিন্ডা, আউসগ্রাম, আঁশগ্রামচক, বাবুইশোল, বাবুরবাঁধ, বাঘবাটি, বাহাদুরপুর, বহমানপুর, বক্সীবাদ, পোগ্রাম, বাক্কারা, বাংকুল, বননবগ্রাম, বড় চাতড়া, বটগ্রাম, বেলাড়ি, বেলগ্রাম, বেলুটি, বেরান্ডা, ভাদা, ভালকি, ভাতগোন্না, ভেদিয়া, ভিটি, ভোত্রা, ভূয়েরা, বিজয়পুর, বিলযাণ্ডা, বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মণডিহি, ব্রজপুর, বুদরা, চকরাধামোহনপুর, চকতিলাগু, চণ্ডীপুর, চন্দ্রদ্বীপ, ছোড়া, ছোট রামচন্দ্রপুর, চোনারী, দেয়াশা, ধানতোর, ধরমপুর, ধোনকোড়া, দিঘা, দিগনগর, ডোমবন্দী, দোনাইপুর, দরিয়াপুর, এড়াল, গঙ্গারামপুর, গেনারী, গোয়ালপোতা, গোবিন্দপুর পূর্ব্ব, গোহালারা, গন্না, গোপালপুর, গোস্বামীখণ্ড, মল্লিকপুর, গুসকরা, হরিনারায়ণপুর, হরিনাথপুর, হরিশপুর, হেদোগয়রা, ইটাচাঁদা, যাদবগঞ্জ, জালালপুর, জালিকান্দর, জামতারা, জয়কৃষ্ণপুর, জয়রামপুর, কয়রাপুর, কলাইঝুটি, কল্যাণপুর, কমলনগর, কাঁটাটিকুরী, করঞ্জি, করাতিয়া, কেলেটি, খাটনগর, খোরদা, দরিয়াপুর, কুলডিহা, কুমারগঞ্জ, কুঞ্জনগর, কুরাল, কুড়ুম্বা, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ, মদনমোহনপুর, মাঝেরগ্রাম, মাজুরিয়া, মালচা, মালিয়ারা, মল্লিকপুর, নবগ্রাম, নওদা, নওপাড়া, নৃপতিগ্রাম, নৃসিনপুর, পঞ্চমহালী, পাণ্ডুক, পরশুরামপুর, ফাঁড়িজঙ্গল, পিচকুড়ি, প্রতাপপুর, প্রেমগঞ্জ, পূবার, গুন্নগড়, পর্ব্বতাতি, পুবচা, রাধাবল্লভপুর, রাধামোহনপুর, রামচন্দ্রপুর, রামহরিপুর, রামনগর, রামনগর উত্তর, রাঙাখিলা, বেওরা, সাহাপুর, সাঙ্কো, সামন্তপাড়া, সর, সাতলা, শিবদা, শিববাটি, শিলুট, শীতলগ্রাম, শিউলি, সোয়ারা, সোমাইপুর, শ্রীচন্দ্রপুর, শ্রীকৃষ্ণপুর, শ্রীনগর, সুয়াতা, সুন্দলপুর,

টাকিপুর, তেলাটা, তিলাগু, তুরুকডাঙ্গা, উক্তা, চন্দ্রদ্বীপ, গোপালপোতা, ডোমবন্দী, বাহামনপুর, ওয়ারিপুর, বনকটিরা, কুড়াল, গোস্বামীখানা, মল্লিকপুর, ধানকোড়া, রামাইপুর।

জনশূন্য: সাঙ্কো, হরিনারায়ণপুর, শ্রীনগর, আউসগ্রামচক, মদনমোহনপুর, কুঞ্জনগর, চন্দ্রদ্বীপ।

লোকসংখ্যা: ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ১,৬১,৫৯৬।

থানা: গলসী। ১২৬টি গ্রাম। জনশূন্য—১টি—জোত কোলকোল।

আদ্রা, অমরপুর, আসকরণ, আতুসি, বাবলা, বাহিরঘনিয়া, বক্তা, বলনা, বামুনাড়া, বনদুতিয়া, বনসুজাপুর, বেলান, ভারিচা, ভাসাপুর, ভীমসারা, ভুড়ি, বিক্রমপুর, বিরিংপুর, বোলপুর, বৃন্দাবনপুর, চকআলম, চকখণ্ডজুলি, চকমুড়িয়া, চন্দনপুর, চান্না, ছোটোমুড়ে, দাদপুর, দক্ষিণ ভাসাপুর, ডালটনগঞ্জ, ডালপুর, দরবারপুর, দয়ালপুর, ধরমপুর, ডুমুব, গলসী, গরম্বা, গরীববাটি, ঘাগরা, ঘোষকমলপুর, গোহগ্রাম, গোলগ্রাম, গোমাই, গোপালপুর, গোপডাল, হরিপুর, হিট্টা, ইরকোনা, ইটারু, জগুলপাড়া, জয়কৃষ্ণপুর, ঝারুল, জোতকোলকোল, জুজুটি, কইতাড়া, কালনা, করকডাল, করকোনা, কাশপুর, কেতনা, কামারগ্রাম, খানহাটি, খানো, খানপাড়া, খাড়ারজুলি, খেতুরা, খুরজ, কিশোরকোনা, কোলকোল, কোনারপুর, কোন্দাইপুর, কুরকুবা, কুড়মুনা, কুতরুকি, লোআ, লোহাপুর, মাহারা, মাহুলারা, মন্নসারুল, মন্নটিকুরি, মল্লিকপুর, মসজিদপুর, মৌরি, মেরুয়াল, মিঠাপুব, মোহনপুর, নবগ্রাম, নবখণ্ড, নলডাঙ্গা, নুরকোনা, ওমরপুর, পারাজ, পরশুরা, পাত্রহাটি, পিলগ্রাম, পোতনা, পূরণদরগার, পুরাঙ্গন, পুরষা, রাকোনা, রামগোপালপুর, রামপুর, রানাডি, সানোটা, সাঁকো, শাঁখারী, সারুল, সসঙ্গা, শাটীনন্দী, শিবিগ্রাম, শিকারপুর, শিন্ন্যা, সিমাসিপুর, সিমনাড়ী, শিররাই, সন্ডা, শ্রীধরপুর, শ্রীরামপুর, সুজাপুর, সুন্দলপুর, শ্যামসুন্দরপুর, তাহেরপুর, তারানগর, তেঁতুলমুরি, উচ্চগ্রাম, উড়া।

জনসংখ্যা: ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ১,৭৩,৫৯২।

থানা: খণ্ডঘোষ। ১১২টি। লোকশূন্য ৫টি—মালাধরপুর, জোত নিয়াজী, পারিয়াপুর, নারায়নপুর চক, আলমাখাগের, কামদেবপুর, পলাশডাঙ্গা, ওয়ানিয়া, উলকুণ্ডা, তরুল।

আইমাখেগের, আলাদিপুর, আলিপুর, আমবা, আমিলিয়া, আমড়া, আমড়াল, আনগ্রাম, আড়াডাঙ্গা, আরিণ, আটকুল্যা, বাদুলিয়া, বলাবাটি, বামনআড়ি, বনমালিপুর, বড় গোপীনাথপুব, বড়িশিয়ালি, বায়দা, বেলডাঙ্গা, বেরুগ্রাম, বিছখারা, বনোয়াই, চাগ্রাম, চক বাদুলিয়া, চকসুকডাল, চন্ডীপুর, চিন্তামণিপুর, দৈয়ার, ধরমপুর, দাওরগা, দুবরাজহাট, এনায়েতনগর, গৈতানপুর, গয়েশপুর, ঘরকুড়া, গোপালবেড়া, গোপালপুর,

গোপীনাথপুর, গুইর, হামিরপুর, হাড়িয়া, ইদুটি, জারুল, জোত ধর্মদাস, জুবিলা, কৈয়র, কালনা, কমলদেবপুর, কমলপুর, কাটাপুকুর, করিমপুর, কাপসিটি, কেলেটি, কেন্দুর, কেশবপুর, কেঁউড়িয়া, খন্ডঘোষ, ক্ষান্তিকর, খেজুরহাটি, খুদকুড়ি, কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণপুরকুকরা, কৃলচৌরা, কুলে, কুমিরকোলা, লোদনা, মালাধরপুর, মাসিলা, মৌর, মেটেডাঙ্গা, মুইধারা, মনসবপুর, নবগ্রাম, ন'পাড়া, নারায়ণপুর, নারায়ণপুর চক, নরিচা, নিকুঞ্জপুর, নিশ্চিন্তপুর, ওঁয়ারি, পদুয়া, পলাশডাঙ্গা, পিতাম্বরপুর, পুনিয়া, পুনসুর, পুরিহা, রাউতারা, রায়পুর, রূপসা, সাধনপুর, সগড়াই, সালুন, শাঁখারী, শংকরপুর, সরঙ্গা, শরিফপুর, সসঙ্গা, শিবরামবাটি, শিকারপুর, সুলতানপুর, শুনিয়া, শ্যামাডাঙ্গা, তারাপাশ, তারুই, তেলুয়া, তিলডাঙ্গা, তোরকোনা, উখরিদ, উলকুণ্ডা, ওয়ানিয়া।

লোকসংখ্যা: ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ১,২৩,৫৬৯।

থানা: রায়না। মোট গ্রাম—১৫৯টি।

আদমপুর, আগরপাড়া, আল্লাদিপুর, আখিনা, আলালপুর, আলমপুর, আনগুনা, আরুই, আন্তিপুর, আটাপুর, আউসারা, বারবকপুর, বাবলা, বহরামপুর, বৈদ্যপুর, বয়রা, বৈথারী, বাজে কয়ারপুর, বাজিতপুর, বলাগড়, বালিয়ারপুর, বল্লা, বামুনিয়া, বনগ্রাম, বাঁধগাছা, বনসা, বস্তির, বড়বৈনান, বরাটি, বরপুর, বাসুদেবপুর, বাতাসপুর, বেলার. বেলসর, বেলুড়, বেন্দুয়া, ভাডিয়ারা, ভগবতীপুর, ভঞ্জপুর, ভীমপুর, ভরকুন্ডা, বিদ্যানিধি, বিজিপুর, বিনোদপুর, বিরামপুর, বীরপুর, বিশ্বেশ্বরবাটি, বোকড়া, বোরা, বোরাজপোতা, ব্রাহ্মণগঙ্গা, বুজরুকদিঘী, বুলচন্দ্রপুর, বুরার, চাবুকপুর, চকবসন্তপুর, চকভুরুয়া, চকচন্দন, চক ফকিরপুর, চক কাইতি, চক কিয়ামপুর, চক মুস্তাফা, চক নরসিংপুর, চকপুরোহিত, চণ্ডীপুর, ছটাদিঘী, ছোট বৈনান, ছোট ফকিরপুর, ছোট কজরপুর, চৌডাঙ্গা, দক্ষিণগোপালপুর, দক্ষিণকূল, দক্ষিণ মোহনপুর, দামিন্যা, দরবেশপুর, দেবীবরপুর, দেনো, দেরিয়াপুর, ধামাস, ধামনারী, ধারান, দিশড়া, দুর্গাবাটি, একলক্ষী, ফকিরপুর, ফতেপুর, গোবিন্দপুর, গোলগ্রাম, নুরপুর, গোপালপুর, গোপীনাথপুর, গোতান, গুয়াগড়ে, গুনার, হরিকৃষ্ণপুর, হরিহরপুর, হরিপুর, হাটপুষ্করিণী, হিজলনা, ইবিদপুর, জগতপুর, যাত্তা, জামাইপোতা, জামনা, জামুই, জসাপুর, জোত রাঘব, জোত রাজারাম, জোতরাম, জোতসাদি, জোতসিলম, কাইতি, কালুই, কামারগাড়িয়া, কামারহাটি, কানাই, চাতরা, কাঁটনাবিল, কেউণ্টা, খালিনা, ক্ষেমটা, কোনা কৃষ্ণপুর, কোনারপুর, কোটশিমূল, কুকরা, কুলিয়া, কুড়চিগ্রাম, লোহাই, মাছখাড়া, মাদানগর, মাধবডিহি, মহেশবাটি, মকরকোলা, মন্দারপুর, মানিয়ারী, মসজিদপুর, মাঠনুরপুর, মেড়াল, মীরপুর, মীর্জাপুর, মোগলমারি, মোমরেজপুর, মুগুরা, মুক্তিপুর, নালে, নন্দাল, নন্দনপুর, নরসিংহপুর, নারায়ণপুর, নরোত্তমবাটী, নারুগ্রাম,

নসিপুর, নতু, নিওর, নেত্রখাঁড়া, নীলুট, নিজামপুর, পহলানপুর, পাঁইটা, পলাশন, পশ্চিমপাড়া, পাষণ্ডা, পসরা, পিপিলা, পিপুলদহ, পাঁইটা, পিরিজপুর, পুরশুনা, রামানন্দপুর, রামবাটি, রামচন্দ্রপুর, রামকৃষ্ণপুর, রামপুর, রসুইখাড়া, রসুলপুর, রায়না, রায়নগর, রূপসরা, রূপসোনা, সহজপুর, শাঁকিটা, শাকনাড়া, শালগাছা, সামাসপুর, শংকরপুর, সাঁকো, নারায়ণপুর, সেহারা, শেখপুর, শেরপুর, শিব্রামপুর, সিঙ্গারপুর, শিপটা, শ্রীপুর, শ্রীরামপুর, সুবলদহ, শুকুর, সুন্দরপুর, সন্ধিপুর, শ্যামদাসবাটী, তৈলাড়া, তেয়াগুল, উচালন, উচিতপুর, উদগাড়া, উজিরহাটি, উত্তর মোহনপুর, সোলগাছা, চটা কয়রাপুর, ভীমপুর, বউগ্রাম, ধামা, তৈন্দুল, সুরার, বালিয়ারপুর, উজিরহাটি, উদ্গনা, মাঠনুরপুর, মূর্ত্তিপুর, খলিনা, আস্তিকপুর, দরিয়াপুর, মুগুরা, সরিতা, সনার, রোশনী খাঁড়া, রুসোনা, জোত রোজারন, বেজিপুর, নিওর, নেত্রখাঁড়া, বনসাই, ধারান, আগরপাড়া, চুয়াডাঙ্গা, সুয়াগড়া, ভাণ্ডিরা, মোমরেজপুর, দিঘরা, নীলট, চাবুকপুর, যশপুর, নিজামপুর, আটপুর।

লোকশূন্য : চক্নরসিংপুর, জোত রাঘব, চক্ বসন্তবাটী, ছোট দিঘী, ছোট ফকিরপুর, গৌগাড়া, চক্ফকিরপুর, কানাই চাত্র, হাট্পাস করিনি, চক কাইতি, চক কিয়ামপুর।

লোকসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ২,২৭,১২০।

থানা : জামালপুর। মোট গ্রাম ১২২টি।

আবুজহাটি, আজাপুর, আঝাপুর, অমরপুর, আমরা, আঁটপাড়া, অভাই, বাগ কালাপাহাড়, বাহাদুরপুর, বলরামপুর, বল্লভহাটি, কড়টিকরা, বসন্তপুর, বশিষ্টপুর, বেরুগ্রাম, বেত্রাগড়, ভৈরবপুর, বিদ্যাবতীপুর, বিষ্ণুবাটী, বিশ্বম্ভরপুর, চকদিঘী, চক্ মুজফ্ফরপুর, চকখানজাদি, ছলালপুর, চৌবেড়িয়া, দাদপুর, দক্ষিণমোহনপুর, দাসপুর, দস্তানপুর, দত্তপাড়া, দত্তপুর, ধাপধাড়া, ধুলুক, দোগাছিয়া, ডুমো, কৈমপুর, গঙ্গারামবাটী, গোহালদহ, গোপালপুর, গোপীকান্তপুর, গুড়েঘর, হাবাসপুর, হৈবতপুর, হলারা, হরগোবিন্দপুর, হরেকৃষ্ণপুর, হিরণ্যগ্রাম, ইলামপুর, ইলসরা, ইঁটলা, যাজনপুর, জামদহ, জানকীবাটী, জারগ্রাম, জৌগ্রাম, জোতদক্ষিণ, জোত রাঘব, জোতশ্রীরাম, জোতসুকল, কালেরা, কালনা, কমলপুর, কনকপুর, কাঁশড়া, কেলিড়ি, কেওতাড়া, খাঁপুর, খোদপলাশী, কোরা, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, কৃষ্ণপুর, কুবজপুর, কুলীনগ্রাম, মাধবপুর, মহিন্দরা, মহিষগড়িয়া, ময়না, মশাগ্রাম, মথুরাপুর, মীরজাপুর, মুইদিপুর, নবগ্রাম, নন্দনপুর, নপাড়া, নারায়ণপুর, পাইকপাড়া, পাঁচশিমূল, পারাতল, পর্বতপুর, পিরিজপুর, পরাণবল্লভপুর, পূর্ব্বসাদিপুর, রাধাবল্লভবাটী, রাজারামপুর, রামচন্দপুর, রামকৃষ্ণপুর, রেসালতপুর, রুড়া, রূপপুর, সদরপুর, সাদিপুর, সাহাপুর, শাহ্হোসেনপুর, সাজিপুর, শালমূলা, শম্ভুপুর, সাঁচড়া, সরঙ্গপুর, সাতঘড়িয়া, সেলিমাবাদ, শিয়ালি, সিপটাই,

শিরোমণি, শীতলপুর, সোনারঘড়িয়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, শূকপুর, সুরা, তিনকুড়িয়া, উজিরহাট।

লোকসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ১,৭১,২২৩।

থানা : মেমারী—মোট গ্রাম ২২২টি।

আদিত্যপুর, আহিরা, আকালিয়া, আলিপুর, আমাদপুর, আমুদপুর, আনদুর, আশাপুর, আউসা, বাগিলা, বাহাবপুর, বাহারা, বহরামপুর, বৈদ্যডাঙ্গা, বাজে রসুলপুর, বালিডাঙ্গা, বামুনা, বামুনপুকুর, বনগ্রাম, বাণেশ্বরপুর, বাঁশিপুর, বড়গ্রাম, বড়পলাশন, বরার, বরারি, বারাসাত, বড়েয়া, বরকোনা, বড়শুয়া, বড়োয়াঁ, বসতপুর, বেগুনিয়া, বেগুট, বেলুই, বেলুট, বেনাপুর, ভগবানপুর, ভৈটা, ভগুল, ভরপোতা, বিজরা, বিজুর, বিলবাড়ি, বীরশিমূল, বিষ্ণুপুর, বিষকোপা, বিটরা, বোধপুর, বোহার, ব্রাহ্মণপাড়া, চক বলরাম, চকনাড়া, চকনারায়ণ, চকখুণ্ডি, চাঁচাই, চণ্ডীপুর, চানপিড়া, ছিলিন্ডা, ছোট ধামাস, চোতখন্ড, দাদপুর, দখলপুর, দক্ষিণরাধাকান্তপুর, দলুইবাজার, দান্দুর, দেবীপুর, দেবপুর, দেহা, দেউলে, ধর্ম শিমলা, ধুনাই, ডিহিপলাশন, দিলালপুর, দুর্গাডাঙ্গা, দুর্গাপুর, ফারাকপুর, গাগেশ্বর, গন্ধপুর, গন্তার, গস্তি, গৌরীপুর, গেনরাঘাটা, ঘোষ, ঘোষপুর, গোয়ালডিঙ্গি, গোবিন্দপুর, গোপীনাথপুর, গোরাপুর, হরিগ্রাম, হলধরপুর, হরিরামবাটী, হরকলা, হাটবস্ক, হিঙ্গলগড়িয়া, ইছাবাছা, ইছাপুর, ইলামডাঙ্গা, ঈশ্বমপুর, জাবুই, জাকরা, জয়রামপুর, ঝিকড়া, জোয়ানপুর, জোত চৈতন্য, জোতকানু, কবস্‌টিকরী, করীবপুর, কৈলাশপুর, কালেশ্বর, কালিবালে, কলসী, কল্যাণপুর, কমলপুর, কানপুর, কাঁটাবাড়ি, কাঁঠালগাছি, কান্তিপুর, করন্দা, কাশিয়ারা, কাশিপুর, কাঁটাপুর, কাঠালিয়া, কাটুয়া, কেজা, কেন্না, খানোরগ্রাম, খানরো, খয়েরপুর, কিষ্কিন্দা, কোল, কোনারপাড়া, কৃষ্ণজীবনপুর, কৃষ্ণপুর, কুচুট, মোবারকপুর, মধুপুর, মাগলামপুর, মগরা, মহেশডাঙ্গা, মহেশপুর, মহিষডাঙ্গা, মহিষপুর, মাকড়া, মালম্বা, মল্লিকপুর, মামুদপুর, মণ্ডলগ্রাম, মণ্ডলজানা, মশাগড়িয়া, মেলনা, মেমারী, মেরুয়া, মসরা, মুটরা, নবগ্রাম, নবস্থা, নগরকোনা, নলসরা, নন্দীয়ারা, নন্না, নাওহাটি, নাওপাড়া, নিশঙ্ক, নিমো, নিশিরগড়, নুদিপুর, পাইকরা, পান্না, পলসা, পালসিট, পলটা, পাঁচখেয়া, পারহাটি, পরতনা, পশ্চিমচণ্ডীপুর, পশ্চিমমেমারী, পশ্চিম শ্রীরামপুর, পশ্চিম তাজপুর, পটরা, পিঙ্গুর, পুণ্যগ্রাম, পূর্ব্বকাশিয়াড়, পূর্ব্বশ্রীরামপুর, রাণীহাটি, রসুলপুর, রায়বাটি, রিয়ান, রোকনপুর, রুকাশপুর, সাহানগর, সাহাপুর, সহজপুর, সালদা, শালিগ্রাম, শংকরপুর, সানুই, সরগাছি, সড়া, সাশীনাড়া, সাতগাছা, শেখপুর, সেনপুর, সিধরিয়া, শিকারপুর, সিমলা, সীতারামবাটী, সোনারা, শ্রীধরপুর, শ্রীহরিপুর, সুরা, শ্যামনগর, তাহেরপুর, তাজপুর, তালচিনি, তাঁতিবাকোয়া, তরলপুর, তাতারপুর, তেতসরা, উলারা, উল্টে, উত্তর রাধাকান্তপুর।

লোকশূন্য : পশ্চিমশ্রীপুর।

লোকসংখ্যা : বর্ধমান। মোটগ্রাম ১৬৬টি।

আলমগঞ্জ, আলমপুর, আলিসা, আমাড়, আমিরপুর, আমড়া, অশ্বত্থগড়িয়া. আটাগড়, বাবুরবাগ, বাঘার, বহরপুর, বাহির সর্ব্বমঙ্গলা, বৈকুণ্ঠপুর, বাজে সালেপুর, বাকসালা, বলগনা, বালিডাঙ্গা, বামনাসিরাজপুর, চন্দনদৈপুর, বনগ্রাম, বন্ডুল, বাঙপুর, বরারিচক, বারাসতি, বড়শুল, বসতপুর, বেচারহাটি, বেলকাশ, বেলনা, ভান্ডারডিহি, ভাতছালা, ভিটা, বিদছালা, বিরুটিকুরি, বর্ধমান, চৈতপুর, চকডালিয়া, চামারদিঘী, চান্ডুল, চান্দুটিয়া, ছোটাবেলুন, দক্ষিণ গোপালপুর, ডাঙ্গাছয়, দাসপুর, দেবগ্রাম, দিউড়ি, দুর্গাবাটী, একবালপুর, ফকিরপুর, ফরিদপুর, গাংপুর, ঘাটশিলা, গোদা, গোপালবাটি, গোপালনগর, গোপালপুর, হলদি, হরিহরপুরচক, হাটগোবিন্দপুর, হাটশিমূল, হাটকান্দা, ইছারামবাটি, ইছলাবাদ, ইদিলপুর, ইসুজাপুর, জগরাবাদ, জগদাবাদ, জগৎবেড়, জাবালপুর, জামার, জাতের, ঝিঙ্গুটি, জিয়ারা, জোতগোদা, জোতরাম, কড়িগাছা, কাদড়া, কলিগ্রাম, কালিনগর, কল্যাণপুর, কামারকিতা, কামনাড়া, কানাইনাটিশাল, কাঞ্চননগর, কান্দরসোনা, কাঁঠালগাছি, কানটিয়া, করোরি, কষ্টিকুড়ুম্বা, কাশিয়ারা, কাশিমপুর, কাটরাপোতা, খইড্যা, খাজাআনোয়ারবেড়, খড়গেশ্বর, খাড়জুলি, ক্ষেতিয়া, কোরার, কোরার চক, কৃষ্ণপুর, কুড়মুন, কুশ, লাকুর্ডি, মাহিনগব, মহিপাল, মালকিতা, মাণিকহাটি, মতিয়াল, মিরছোবা, মিরজাপুর, নবাবহাট, নবগ্রাম, নলা, নাঁদরা, নাদুর, নওপাড়া, নাড়ি, নাথপুর, নেড়াগোহালিয়া, নিত্যানন্দপুর, নতুনগ্রাম, পলাশী, পালিতপুর, প্যামড়া, পাড়ুই, পতিকৃষ্ণপুর, পিলখুরি, পূর্ব্ব কাশিয়ারা, পূর্ব্ব কৃষ্ণপুর, পূর্ব্ব মালকিতা, পূবে বালিসা, পুতুণ্ডা, রাধানগর, রাইপুর, রামাচন্দ্রপুর, রামনগর, রায়ান, রায়পুর, সাধনপুর, সড্যা, সাহাপুর, সৈয়দপুর চক, শক্তিগড়, সামন্তি, সামন্তিচক, শাঁখারীপুকুর, সাপুর, সেহারা, সরাইটিকর, শিয়ালদহ, সিমডালি, সিরাজপুর, সোনাকুড়, শোনপুর, শ্রীরামপুর, সুহারি, শুকুর, শ্যামসুন্দরপুর, তাজপুর, তালিত, তাতখণ্ড, তেনত্রাল, তেঁতুলিয়া, টোটপাড়া, টুবগ্রাম।

জনশূন্য : শাহাপুর, সৈয়দপুর চক, নাথপুর, হরিহরপুরচক, একবালপুর, চক ঢালিয়া, বরারি চক, আমিরপুর।

লোকসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী—১,৯৪,০৪৯।

থানা : ভাতার : মোট গ্রাম ১০৫টি।

আমারুন, আমবনা, আড়া, বলগনা, বলশিডাঙ্গা, বামশোর, বামুনাড়া, বনগ্রাম, বনপাশ, বড়বেলুন, বসতপুর, বসুদা, বাজার মহম্মদপুর, বেলেন্ডা, বেরানা, ভারতপুর, ভাটাকুল, ভাতার, বিগড়া, বিজয়পুর, বিজিপুর, চন্ডাই, চন্ডীবাটি, চাদিপুর, ছাতিনী, ডাঙ্গসরা, দাউরা, দেবপুর, ধাঁধলসা, ধেনরিয়া, এওড়া, এওড়াচক, এরাচ্যা, এরুয়ার, ঘোলাদা, ঘুসিয়া, গোপীনাথবাটি, গ্রামডিহি, হৈরগ্রাম, হরিবাটি, হরিপুর, জলদাগ্রাম,

ঝারুল, ঝিকরডাঙ্গা, কাচগড়িয়া, কালাপাহাড়ী, কানপুর, কানপুবহাট, কাপসর, কর্জ্জনা, কাশিগ্রাম, কাশিপুর, কাটারী, খেরুর, খুরুল, কুবাজপুর, কুলচন্ডা, কুলনগর, কুরুম্ব্যা, মাধপুর, মহাচান্দা, মাহাতা, মান্দারবাটি, মান্দারডিহি, মিত্রপুর, মোহনপুর, মুকুন্দপুর, মুরারিপুর, পুরাতিপুর, নবস্থা, নারায়ণপুর, নরদা, নাসিগ্রাম, নওয়ালা, নিত্যানন্দপুর, নৃসিংহপুর, নুনারী, নুরপুর, নুতা, নূতনগ্রাম, ওরগ্রাম, পালার, পলসনা, পানোয়া, পারহাট, পশলা, পূর্ব্ব রামাচন্দ্রপুর, রাজিপুর, রামচন্দ্রপুর, রামপুর রতনপুর, সুলকুনি, সালুন, সন্তোষপুর, সালেন্ডা, সেরুয়া, শিকারতোর, শিলাকোট, সোনাচালিদা, সাতখালি, শ্রীপুর, সুনুর, তুলসীডাঙ্গা, উযা।

লোকশূন্য : মিত্রপুর, গোপীনাথপুর।

লোকসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ১,৭৯,২৩৩।

থানা : মঙ্গলকোট। মোট গ্রাম—১৩৫টি।

আমডোব, আওগ্রাম, আটঘরা, বাবলাডিহি, বাকুলিয়া, বলরামপুর, বালিডাঙ্গা, বামুনাড়া, বামুনগ্রাম, বনকাপাসী, বনপাড়া, বারুইপাড়া, বাকলিয়া, বেবচা, বেলগ্রাম, ভালুগ্রাম, ভাটপাড়া, ভিনভিনা, ব্রহ্মপুর, বুঁইচি, চৈতন্যপুর, চাকদহ, চকখরিজা, ক্ষীরগ্রাম, চকপরাগ, চকপ্রতাপপুর, চাকুলিয়া, চানক, চাঁদরা, ছোটপসিয়া, দেবগ্রাম, দেউলিয়া, ধান্যরুখি, ধারসোনা, দুমুট, দ্বারসিনি, গোতিষ্ঠা, গোবর্ধনপুর, গোবিন্দপুর, গোহগ্রাম, গোপালবেড়া, হালিমপুর, হরিপুর, ইচ্ছাবরগ্রাম, ইটা, জবগ্রাম, জগদীশপুর, যজ্ঞেশ্বরডিহি, জলপড়া, জরথা, জয়কৃষ্ণপুর, জয়রামপুর, ঝিলেরা, ঝিলু, কৈচর, কালিয়াপাড়া, কল্যাণপুর, কানাইডাঙ্গা, কানকোরা, কাশিয়ারা, কেওতসা, কেশবপুর, ক্ষরিজা, ক্ষীরগ্রাম, খেরুয়া, খুদরুন, খুরতুবা, কোগ্রাম, কোনারপুর, কোটালঘোষ, কৃষ্ণবাটি, কৃষ্ণপুর, ক্ষীরগ্রাম, কুলসুনা, কুণ্ডা, লাখুরিয়া, লক্ষীপুর, মাধপুর, মহারুবা, মাজিগ্রাম, মাঝখাঁড়া, মালিয়াড়া, মল্লিকপুর, মঙ্গলকোট, মশারু, মাথরুন, মুখা, মুরুলিয়া, নবগ্রাম, নারায়ণপুর, ন'পাড়া, ইরশনদা, নয়াপাড়া, নিগন, নূতনহাট, পলাশী, পালিগ্রাম, পালিশগ্রাম, পালপাড়া, পলশোনা, পশ্চিমগোপালপুর, পশ্চিমবনাগ্রাম, পিলসোয়ান, পিন্ডিরা, পুরাতন কুড়গ্রাম, পূর্ব্বগোপালপুর, পূর্ব্বনয়াপাড়া, রাধানগর, রঘুনাথপুর, রামনগর, সাগিরা, সাকোনা, সালান্ডা, শংকরপুর, ষাঁড়ী, আওতা, সরঙ্গপুর, সারুলিয়া, শিমূলিয়া, সিঙ্গত, সিনুট, সীতাহাটি, শীতলগ্রাম, সিউর, সুখপুখরিয়া, শ্যামবাজার, তালডাঙ্গা, তাঁতবন্দী, ঠেঙ্গাপাড়া, টিকুড়ি, উজ্জিরপুর, উমাতাতারপুর, উত্তর বনপাড়া, উত্তর বেলগ্রাম, উত্তর ব্রহ্মপুর।

লোকশূন্য : তাঁতবন্দী, নবগ্রাম, জগদীশপুর।

লোকসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী—১,৭৭,১৪০।

থানা : কেতুগ্রাম : মোটগ্রাম ১২২টি।

আগরডাঙ্গা, আইয়াপুর চক, অম্বলগ্রাম, আমগড়িয়া, আমন্তপুর, আনখোনা, আর্গুন, বাহারা, বহগ্রাম, বকালসা, বালুটিয়া, বামুনদি, বাঙ্কুই, বেগুনকোলা, বেনীনগর, বেরুগ্রাম, ভাণ্ডারগরিয়া বিল্লেশ্বর রসুই, বীড়া, বীররহিমপুর, বিরুরী, বিষ্ণুপুর, ব্রাহ্মডাঙ্গা, চাকদহ, চক্কুরুলিয়া, চাকতা, চরখি, চরনারায়ণপুর, চর সুজাপুর, বেচুরিয়া, চিনিসপুর, চিতাহাটি, দাইয়া, দক্ষিণডিহি দত্তবাটি, এহিয়াপুর, এনায়েতপুর, গঞ্জুল, গঙ্গাটিকুরি, ঘাটকুড়িয়া, গোঁসাই, গোপালপুর, গুড়পাড়া, হলদি, হাটপারা, ইছাপুর, জামালপুর চক, ঝামাতপুর, কচুটিয়া, কল্যাণপুর, কমলাবাড়ি, কাঁচরা, কাঁদানাগ, কাঁদরা, কাকুরহাটি, কাঁটাডিহি, কাটান্দিডাঙ্গা, কোরি, কেচুনিয়া, কেতুগ্রাম, কেঁউগুড়ি, রহলিপুর, খাঁজি, খাশপুর, খাটুন্দি, খেনাইবাঁধা, কোজলসা, কোনারপুর, কোমডাঙ্গা, কোপা, কুলহি, কালুন, কুলুটিয়া, কুর্মডাঙ্গা, কুরুটিয়া, লোহারুন্তি, মহুলা, মাঝিনা, মলাগ্রাম, মালিহা, মাসুন্দি, মৌগ্রাম, মৌরী, মিত্রটিকুরি, মোরগ্রাম, মুরগ্রাম, মুরুন্দি, মুরুটিয়া, নবগ্রাম, নৈহাটি, নলিয়াপুর, নারায়ণপুর, নারেঙ্গা, নিরল, নোয়াপাড়া, নূতনগ্রাম, পাচণ্ডী, পালিটা, পাণ্ডুগ্রাম, পানপাড়া, পানপাড়াচক, পশ্চিম সুজাপুর, পুরুলিয়া, রঘুপুর, রায়খান, রাজুর, শঙ্খাই, সেনপাড়া, সবানডি, শিবলুন, শিরুলি, সীতাহাটি, শ্রীগ্রাম, শ্রীপুর, শ্রীবামপুর, সুজাপুর, তাজপুর, তালারি, তাজপুর, তালারি, তেওড়া, উদ্ধারণপুর, উজলপুর।

লোকশূন্য : পানপাড়া, পানপাড়াচক, অজয়পুচক, জামালপুরচক, চরনারায়ণপুর।

লোকসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ১,৮৫,৮৩৬।

থানা : মোটগ্রাম ১৪০টি।

অগ্রদ্বীপ, আখড়া, আলমপুর, আমগঙ্গা, আমূল, আরঙ্গাবাদ, অর্জনডিহি, অতুলহাট চক, আউরিয়া, বাঘটিকরি, বাঘটোনা, বৈকুণ্ঠপুর, বঁইচি, বাঁধমুরা, বাঁদরা, বড়খাঁজি, বড় কুলগাছি, বড় ফুলগাছি, বড় মেইগাছি, মরামপুর, বরুয়া, বেঙ্গা, বেররা, ভালসুনি, ভাতাশেকুয়া, ভাইসিং, বিকিহাট, বীরবেগুন, বিষ্ণুপুর, চাঁদপুর, চন্দ্রপুর, চান্দুলি, চর ব্রজনাথপুর, চর পটাইহাট, বেতঢাকা, ছোট কুলগাছি, ছোট মেইগাছি, চুরপুনি, দাঁইহাট, দেয়াসিন, দেবগ্রাম, দেবকুণ্ডা, দেপাড়া, দেরিয়াপুর, ডোনা, দুর্গা, একাইহাট, এলগ্রাম, গাফুলিয়া, গাড়াগাছিয়া, গৌরডাঙ্গা, গাজিপুর, ঘোড়ানাশ, ঘোষহাট, ঘুমুরিয়া, গোয়াই, গোপীখানাজ, গুসুন্দা, ইসলামপুর, জগদানন্দপুর, জাদিগ্রাম, জামরা. যমুনাপটাই, কবিরাজপুর, কৈথুন, কালিকাপুর, কালসা, কল্যাণবাটী, কামাল, করজগ্রাম, কড়ুই, কাশিগ্রাম, কাটারি, কাটোয়া, কেশিয়া, খাজুরডিহি, খানেরহাট, খাশপুর, ক্ষেতপুর, পলাশী, কুয়ারা, কুমরি, কুরচি, মাখালতোর, মালফ, মল্লিকপুর, মণ্ডহাট, মাঝিয়ারী, মেড়া, মোস্তাফাপুর, মুলগ্রাম, মুলটি, কৃষ্ণনগর, মুস্থলী,

মুস্থলীচক, নাহাতা, নলাহাটি, নউয়াগর, নন্দীগ্রাম, নারায়ণপুর, নরসনা, নসিপুর, নোয়াগাড়া, নুতনগ্রাম, ওকরসা, ওকিদওপুর, পাইকপাড়া, পলাসনী, পাঁচবেড়িয়া, পাঁচঘড়া, পাঁজোয়া, পামুহাট, পরশুরাম, পারুলিয়া, পশ্চিমবীজনগর, পাটাইহাটি, পেষ্টিগ্রাম, পুইনি পুর্ববীজনগর, রাধাকৃষ্ণপুর, রঘুনাথপুর, রামদাসপুর, রাউতারা, রম্ভা, সাগরপুর, সাহাপুর, সুরগ্রাম, শিলা, শিমুলগাছি, সিঙ্গি শ্রীবাটী, শ্রীখণ্ড, শ্রীরামপুর, শ্রীসুরুয়া, সুয়াগাছি, সুদপুর, শুনিয়া, তাতপুরা, তিতারখাজি, উলসাটিকরি।

লোকশূন্য : ওকাইদত্তপুর, তাঁতপাড়া, সাগরপুর, রঘুনাথপুর, মুস্থলীচক, চর ব্রজনাথপুর, বাঘটিকরি, পটাইহাট, বৈকুণ্ঠপুর, বেরা, রাউতারা।

থানা : মন্তেশ্বর। মোটগ্রাম ১৪৪

আকবরনগর, আসুরি, আতসপুর, আউসগ্রাম, বাঘাসন, বলরামপুর, বালিজুরি, বামুনিয়া, বামুনপাড়া, বন্ধুপুর, বনপুর, বনুই, বড়কলমি, বরণডালা, বরুশা, বসতপুর, বাসুদেবপুর, বেলেন্ডা, ভাদাই, ভাগরা, ভান্ডারহাটি, ভাণ্ডারপুর, ভারুচা, ভেলিয়া, ভেটি, ভোজপুর, ভূরকুণ্ডা, বিঘা, বিষ্ণুপুর চক, ব্রহ্মপুর, বুধপুর, চক বসুপুর, চক ব্রহ্মপুর, চক ধাবরী, চরকডাঙ্গা, ছোট ধেরিয়া, দলুইপুর, ডাউকডাঙ্গা, দেবপুর, দেনুর, দেওয়ানগদি, দেওয়ানি, ধান্যখেউর, ধেনুয়া, ধেউরচাঁদ, দ্বারী, ফজলপুর, গবরুপুর, গলাতুন, গনগনিয়া, গনগুরিয়া, গড় সোনাডাঙ্গা, ঘোড়াডাঙ্গা, গোয়ালডাঙ্গা, গোপালনগর, গুলিতা, দাসপুর, হাটডাঙ্গা, হাজরাপুর, হোসেনপুর, হুড়কোডাঙ্গা, ইব্রামবাদ, ইন্দ্রপুর, ইসমা বুজরুক, জামানা, জয়পুর, জয়রামপুর, ঝিকরা, কইগ্রাম, কালেশ্বর, কলুই, কামরা, কাঞ্চনডাঙ্গা, করন্দা, কাসা, কাটসিহি, খাদুঁরা, খানাপুর, খরমপুর, খোরাজ, খোরদা, ইসনা, কুলে, কুলি, কুলজোরা, কুলুট, কুসুমগ্রাম, লস্করপুর, লোহানা, লোহার, মাঝেরগ্রাম, মামুদপুর, মঙ্গলপুর, মন্তেশ্বর, মরাইপিড়ি, মশডাঙ্গা, মথুরা মউসা, মিরসাহর, মিঠানি, মুলগ্রাম, মুরুলিয়া, নবগ্রাম, নূতনগ্রাম, পাইকুর, মুড়ি, পানবেরিয়া, পারুলিয়া, পশ্চিম খরমপুর, পশ্চিমমামুদপুর, পাতিখালডাঙ্গা, পাতুন, ফুলগ্রাম, পাইগ্রাম, পিপলন, প্রসাদপুর, পূর্ব্ববলরামপুর, পূর্ব্ব খাঁপুর, পূর্ব্ব মিথানি, পুরশুনা, পুরুনিয়া, পুটসুরি, পুটসুরিচক, রাইগ্রাম, রাউতগ্রাম, রিপিচক রুইগড়িয়া, সফরদা, সাহাপুর, শাহজাদপুর, সেনহাটি, সামসপুর, সেলে, সিহিগ্রাম, সিনহলি, সিরাজপুর, সেনাগাছি, সিজনা, সুগুনা, শুশুনি, সুত্রা, তাজপুর, তেমোহানী, তেতুলিয়া তুম্না, উজনা, উত্তরডিহি।

লোকশূন্য : মিঠানি, পুটসুরিচক, চরকডাঙ্গা, সেনহাটী, রিপিচক, দলুইপুর, তেউহানী, প্রসাদপুর।

: ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ১, ৫৭, ০৭৭

: পূর্বস্থলী। মোটগ্রাম ১৯৩

আকবরপুর, অর্জুনপুর, আটকাডাঙ্গা, আটপাড়া, বাকপুর, বাগচরা, বাগিয়ারা, বাগিয়াচক, বাঘপুর, বাহারা, বৈদ্যপুর, বলরামপুর, বামনগড়িয়া, বাঁকি, বরাচক, বড়গাছি, বরারপাড়া, বারাটি, ধরিয়া, বেলগাছি, বেলগড়িয়া, বেতপুকুর, ভদ্রপাড়া, ভান্ডারটিকুরী, ভাতড়া, ভাতশালা, ভাবুরিয়া, বিদ্যানগর, বিশ্বরম্ভা, বড়শা, চক, বহাড়া, চক রাহাতপুর, চন্দনপুর, শিমুলডাঙ্গা, চাকিপুর, চাঁদপুর, কানপাহাটি চম্পাহাটী, চর চৌডাঙ্গা, চর ঝাউডাঙ্গা, ছাতনী, চুপি, দফরপোতা, দক্ষিণবাটী, দক্ষিণ চাঁদীপুর, দামোদরপাড়া, দামপাল, দস্তিপাড়া, দামচি, ধানাস, ধর্ম্মতলা, ধিৎপুর, ধোবা, দীর্ঘপাড়া, দোগাছিয়া, দোঘড়ি, দুবরাজপুর, একডালা, ফালিয়া, গাছা, গাগরা, গহক, গঙ্গানন্দপুর, ঘোলা, ঘুনি, গোয়ালপাড়া, গোবিন্দপুর, গোকর্ণ, গোলাহাট, গোপীনাথপুর, গোপীপুর, হলদিপাড়া, হাপনিয়া, হরিপুর, হরিশপুর, হাট সিমলা, হাট সিউরি, হৃষি, ইসবপুর, ইসলামপুর জাহান্নগর, জ্ঞানেশ্বরপুর, জাকর, জলাহাটি, জালুইডাঙ্গা, জামালপুর, জয়কৃষ্ণপুর, ঝাউডাঙ্গা, জিয়লগড়িয়া, কচুযা, কইবাটি, কমলাপুর, কমলনগর, কমলপুর, কঙ্কল, কাসাঁরিপুর, কবাইল, কাশিপুর, কাষ্ঠশালী, করশগ্রাম, খরদত্তপাড়া, খোর্দকইবাটী, কোলাচক, কোনরাপুর, কৃষ্ণবাটি, কুবজপুর, কুচসিমলা, কুমীরপাড়া, কুন্ডপাড়া, কুড়চা, কুশগড়িয়া, কুতুরিয়া, লক্ষণপুর, লক্ষ্মীপাড়া, লোহাচুর, মাধুপুর, মহাদেবপুর, মহাতাপুর, মহেশগড়িয়া, মাজিদা, মালতিপুর, মালগড়িয়া, মামুদপুর, মাদরা, মঙ্গলপুর, মারুইডাঙ্গা, মসগড়িয়া, মৌডাঙ্গা, মেড়তলা, মীনাপুর, মোআইল, মুদাফফর কলহরী, মুকসিমপাড়া, মড়াগাছা, নগদানঘাট, নালাডাহা, নম ভাণ্ডার টিকুরী, নাওপাড়া, নারায়ণপুর, নসরতপুর, নোয়াপাড়া, নিমদহ, নিত্ররা, পলাবেড়িয়া, পলাশপুলি, পাঁচলকি, পরাণপুর, পারুলডাঙ্গা, পারুলিয়া, পাঠানগ্রাম, পাটুলি, পোলগ্রাম, পূর্ব্বস্থলী, রাহাতপুর, রাজাপুর, রাজীবপুর, রাজ্যধরপুর, রামচন্দ্রপুর, রঞ্জাপুরপটি, রুকুসপুর, সাহাপুর, সন্তোষপাড়া, সার্কড়া, সন্তোষপুর, পিলা, সড়ঙ্গপুর, সরডাঙ্গা, সরিষা, সাতগাছি, সাতগড়িয়া, সাতপোতা, সেওড়াগড়িয়া, সিহিপাড়া, সিমলা, সিনহরি, সিনজুলি, সোনারুদ্র, শ্রীরামপুর, সুলসস্ত, সুমুরিয়া, শ্যামবাটী, শ্যামপুর, তেগাছা, তেলিনাওপাড়া, উখরা, উত্তর লক্ষ্মীপুর, উত্তর নাওপাড়া, উত্তর শ্রীরামপুর।

লোকশূন্য: বরাটি, চরঝাউডাঙ্গা, একডালা, কোবলচক, বাগিয়াড়োচক, রঞ্জাপুরপটি

লোকসংখ্যা: ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ২,৩৫,৩৪৫

থানা: কালনা মোটগ্রাম ২১৭

আগ্রাদহ, অকালপৌষ, আলাগড়ি, আমদাবাদ, আনাখাঁ, অঙ্গারসন, আনুখাল, আড়া, আনবেলিয়া, আরজুনা, আটাশহরিয়া, আটকটিয়া, বাধগাছি, বাদলা, বাঘাডাঙ্গা, বাহারা, বৈদ্যপুর, বৈঠিপাড়া, বাজিতপুর, বালিয়া, বালিন্দর, বনসাই, বড় বহরকুলি,

বড় ধামাস, বারাসত, বরডালিয়া, বরুহা, বাতাসপুর, বাজার কৃষ্ণপুর, বেগপুর, বেগুনী, বেলতলি, বেশবাটি, ভবানন্দপুর, ভবানীপর, ভাতড়া, ভেরুয়া, ভুরুয়া, ভুরকুণ্ডা বিজরা, বীরুহা,. বোয়ালিয়া, বৃদ্ধপাড়া, বুন্দেবাজ, বুরুমপাড়া, চাগ্রাম, চাকসিমলা, চৌঘড়িয়া, ছোট বহরকুলি, দাতারপুর, দক্ষিণদুর্গাপুর, দক্ষিণ গোয়ারা, দক্ষিণ কৃষ্ণপুর, দক্ষিণ নোয়াপাড়া, দমদমা, দমপাড়া, দিয়ারা, ধনেশ্বর, ধর্মডাঙ্গা, ধাত্রীগ্রাম, দীঘা, ধুপসা, দুর্গাপুর, দোয়ারিটোন, একচাকা, ফরিঙগাছি, ঘনশ্যামপুর, গোদা, গোবিন্দবাটী, গোপালদাসপুর, গোপালপুর, গ্রাম কালনা, গুপ্তিপাড়া, মানসপুকুর, হরগুনা, হাঁসহাটি, হাটবেলে, হাটগাছা, হাটযাছনা, হিজলি, হোসেনাবাগ, হৃদয়পুর, ইছাপুর, ইন্দ্রপুর, ইসবপুর, জয়পুর, জয়রামপুর, ঝাড়বাটি, ঝেরো জমিরতলা, ঝিকড়া, ঝিনধারা, জোতশ্যাম, জুড়েপাড়া, কদম্বা, কাদিপাড়া, কাদিপুর কাগড়িয়া, কাকুরিয়া, কালনা, কল্যাণপুর, কান্দরপাবটি, কানি, বামনী, কামারপুর, কর্পুরডাঙ্গা, কাশিমপুব, কাশীপুর, কেলেনাই, কেশবপুর, খাগড়াকুর, খলিশপুর, খানপুব ঘড়িনান, যাশপুর, খোদবিটরা, কোলা, কোয়ালডাঙ্গা (কোয়েল ডাঙ্গা?), কৃষ্ণদেবপুর, কৃষ্ণপুর, কুলারা, কুলাদহ,. কুলাপাড়া, কুলটি, কুমারপাড়া, কুশডাঙ্গা, কুতুবপুর, কুটিরডাঙ্গা, কুতুবপুর, মদনহাসা, মধুবন, মধুবাটী, মধুপুর, মহেশ্বরপুর, ময়নাগড়িয়া, মালতীপুর, মণিকহার, মসিদপুর, মসলন্দপুর, মেদগাছিয়া, মেদগাছি, পাইকপাড়া, মীরহাট, মীরপুর, মীর্জাবাটি, মোক্তারপুর, মীর্জাপুর, মুড়াগাছা, নগাগাছি, নন্দাই, নাওপাড়া, নারায়ণপুর, নারেঙ্গা, নারিকেলডাঙ্গা,. নোয়াপাড়া,. নেপাকুলি, নীরলগাছি, নিশ্চিনন্তপুর, নোয়ারা, পাহাড়পুর, পাঁচদেউলি, পাঁচরাখি,. পারদপসা, পারসহারা পশ্চিমসাহাপুর, পাথরডাঙ্গা, পাথরঘাটা, পাতিলপাড়া, পিয়ারীনগর, পিন্ডিরা, পোতানাই, পূর্ব্বসাহাপুর, রাধানগর, রাহাতপুর, রাজখাড়া, রামনন্দপুর, রামেশ্বর, রামেশ্বপুর, রামপুর, রাঙ্গাপাড়া, রাণীবাঁধ, রসুলপুর, রুকসপুর, রুস্তমপুর, সাবিদপুর, সাধ পুখরিয়া, সৈয়দপুর, শাকটি, শালঘড়া, সন্তোষপুর, সুগডিয়া, শাসপুর, সাতাবালী, সাতগাছি, সেহারা, শিবপুর, সিমলা, সিমলন, সিঙা, সিঙ্গারকোন, সিঙরাইল, সোন্দলপুর, শ্রীরামপুর, সুইপাড়া, সুলতানপুর, সূর্যপুর, শয়া, তেপাড়া, টালা, তামসপুর, তেহাটা, টোলা, উদয়পুর, উমরপুর, উপলতি, উসমানপুর, উটরা, উত্তরগোয়ারা, উত্তর রামেশ্বররপুর।

লোকশূন্য : সন্তোষপুর, কামারপুর, দীঘা, মধুবন।

লোকসংখ্যা : ৮১'র জনগণনা অনুযায়ী ২,২৬, ৪৮২।

[নামগুলি "বৰ্দ্ধমান চর্চা" থেকে সংকলিত]

তথ্যপঞ্জী

(১) বর্ধমান চর্চা (২য়)– শ্যামাপ্রসাদ কুণ্ডু
(২) পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম– জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স (১৯৮০)
(৩) বাংলা স্থাননাম– সুকুমার সেন শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
(৪) (Census Report 1981.

পরিশিষ্ট——৫

বৰ্দ্ধমানের কৃতী মানুষ

[নাম, (জন্মবর্ষ), জন্মস্থান, (পবিচয়) ও কীর্তি-কৃতিত্ব এই ক্রমে পড়তে হবে]

☐ **অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০) চুপী (প্রাবন্ধিক) :** চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক, তত্ত্ববোধিনী, পত্রিকার সম্পাদক, 'চারুপাঠ'—তিন খণ্ড, 'ভূগোল', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ' বিচার, ধর্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়– গ্রন্থরচনা।

☐ **অনিল বরণ রায় (১৮৯০) শুইর (বিপ্লবী-সাধক) :** অধ্যাপনা ত্যাগ কবে ১৯২১ এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান, ১৯২৩ এ দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলে যোগদান, সেণ্ট্রালজেলে কাবাবরণ, শ্রীঅরবিন্দেব নির্দেশমত জেলেই যোগাভ্যাস, সবকিছু ত্যাগ করে অরবিন্দের সহযোগী হতে পণ্ডিচেরী যাত্রা। শ্রীঅরবিন্দেব 'Essays on the Gita-র বাংলা ভাষ্য, 'Mother India', 'Indias mission in the world', 'Songs from the soul', Sri Aurobindo and the new age', পুরুষোত্তম শ্রীঅরবিন্দ, 'যোগে দীক্ষা', গীতার বাণী-গ্রন্থ রচনা।

☐ **অমূল্য চরণ সেন (১৮৯৭) সাতগড়িয়া (কবিরাজ) :** 'আরোগ্য মঞ্জরী'—মৌলিক গ্রন্থ রচনা, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ হাসপাতালের আর, এম, ও আয়ুর্বেদ গবেষক।

☐ **অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ (১৮৭০) অকাল পৌষ (অধ্যাপক) :** হিন্দুস্কুলের শিক্ষকতা পরিত্যাগ ও ১৯০৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগদান। 'ডন সোসাইটি' ও 'ডন' পত্রিকার সম্পাদনা, 'বৰ্দ্ধমান সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠাতা।

☐ **আব্দুল জব্বার খান বাহাদুর (১৮৩৭) কাশিয়াড়া-বৈরাগীতলা (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট) :** বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক, ভূপালের নবাব দরবারে প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভ, কলিকাতার টাউনহলে বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রিটিশ বিরোধী জনসভায় সভাপতিত্ব করেন।

☐ **আব্দুস সাত্তার (১৯১১) টোলা (জননায়ক স্বাধীনতা সংগ্রামী) :** ছাত্রাবস্থাতেই গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত, শিক্ষাগুরু জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, বহুবার কারাবরণ, স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক, বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রীসভার শ্রমমন্ত্রী, জনপ্রিয় শ্রম আইন প্রনয়ণ, ওয়াকফ এস্টেটের কমিশনার, জেলাকংগ্রেসের কর্ণধার।

☐ **আব্দুল গনি খান (১৯১৩) পুরাতন চক (কবি) :** 'শহিদের হার', 'মাটির সুর', 'মুখর প্রহর', 'ফেরারী, 'ধরার নবী'—কাব্যগ্রন্থ ও 'হজরত পীর বাহারাম ও নূরজাহান', 'বর্ধমান রাজ'—ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা।

☐ **ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯) গঙ্গাটিকুরি (ব্যবহারজীবি ও রসসাহিত্যিক) :** সাহিত্যে "পঞ্চানন্দ", ছদ্মনামে পরিচিত। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার লেখক, 'ভারত উদ্ধার' ও 'কল্পতরু' বিখ্যাত ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা, সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি Patriotic Satirist, প্রথম ব্যঙ্গ কাব্য—'উৎকৃষ্টং কাব্যং' অপর ছদ্মনাম—পাঁচুঠাকুর।

☐ **ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন (অষ্টাদশ শতক) বড়বেলুন (নৈয়ায়িক) :** সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পণ্ডিত, সংস্কৃতভাষায় 'গৌরচন্দ্রামৃত', 'মুক্তি-দীপিকা', 'মনোদূতম' গ্রন্থ রচনা করেন।

☐ **উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৩) সরডাঙ্গা (চিকিৎসক ও গবেষক) :** মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু কেশবভারতীর উত্তর পুরুষ, সার্জারীও মেডিসিনে প্রথম স্থান, ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের অধ্যাপনা ও গবেষণা—Brohmachari Research Institute স্থাপন, কালাজ্বরের ঔষধ—'ইউরিয়াষ্টিবামাইন' আবিষ্কার।

☐ **কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২) চান্নাগ্রাম (সাধক কবি) :** বর্ধমান রাজ প্রতাপ চন্দের শিক্ষাগুরু, কোটালহাটে পঞ্চমুণ্ডির আসন ও কমলাকান্ত কালী বিদ্যমান, এখানে বসেই সাধনা করতেন। উচ্চাঙ্গের শ্যামাসঙ্গীত রচনা ও গান বিখ্যাত।

☐ **কবি কর্ণপুর পরমারাধ্য সেন (ষোড়শ শতক) কুলীন গ্রাম (সংস্কৃত পণ্ডিত) :** সংস্কৃতে 'শ্রী চৈতন্যশতক', 'স্তবাবলী', 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক', 'কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকা', 'চৈতন্যচরিত কাব্য', 'আনন্দবৃন্দাবন চম্পু', 'গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা', এবং 'অলংকার কৌস্তভ'— উল্লেখযোগ্য রচনা।

☐ **কবীন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮শ শতক) তালিতনগর (সংস্কৃতে পণ্ডিত) :** ভাগবত অবলম্বনে 'উদ্ধবদূত' কাব্য রচনা।

☐ **কণাদ ভট্টাচার্য (১৮শ শতক) জৌগ্রাম (নৈয়ায়িক) :** ন্যায় ও তর্কশাস্ত্রের উপর মৌলিক গ্রন্থ রচনা।

☐ **কাশীরাম দাস (১৫৭৫) সিঙ্গি (কবি) :** প্রথম বাংলা 'মহাভারত' রচনা।

☐ **কালিদাস রায় (১৮৮৯) কড়ুই (শিক্ষক ও কবি) :** কবিশেখর উপাধিলাভ, ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষকতা, 'কুন্দ', 'বল্লরী', 'ব্রজরেণু', 'পর্ণপুট', 'বৈকালী', 'রসকদম্ব', 'ক্ষুদকুড়ো', 'আহরণ',– কাব্যগ্রন্থ রচনা।

☐ **কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (অষ্টাদশ শতক) কাটোয়ার সন্নিকট 'দুর্গা' গ্রামে, অধ্যাপক ঐতিহাসিক :** 'নবাবী আমলের ইতিহাস' প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

☐ **কালী কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৯) ভাগুল (লেখক ও প্রাবন্ধিক) :** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য, ভারতীয় দর্শন মহাসভার সহকারী সম্পাদক, Indian philosophical Quarter এর সহকারী সম্পাদক, বহু ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রাবন্ধিক।

☐ **কালীকিংকর সেনগুপ্ত (উনবিংশ শতাব্দী) পাতিলপাড়া (চিকিৎসক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী) :** কবি ও সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও কাব্য চর্চা।

☐ **কাশীনাথতর্কালঙ্কার (অষ্টাদশ শতকের শেষ) উপলতি (ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত) :** 'শব্দ-সন্দর্ভ-সিন্ধু' অভিধান রচনা, নবদ্বীপের ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের বিরোধিতা।

☐ **কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৪৯৬) ঝামটপুর (চৈতন্যভক্ত কবি) :** শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্য বাংলা রচনা, সংস্কৃত রচনা– 'গোবিন্দলীলামৃত', সারঙ্গরঙ্গদা'– কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা।

☐ **কুমারী রূপমঞ্জরী দাস (১৭৮০-৯০) কোটা :** কাশীতে শিক্ষা, ন্যায়, জ্যোতিষ, চরক, নিদান শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন, কাশী হ'তে 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি লাভ।

☐ **কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৩৩) কোগাম (শিক্ষক ও কবি) :** বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ :– 'শতদল', 'বনতুলসী', 'উজানী', 'একতারা', 'বীথি', 'বনমল্লিকা', 'রজনীগন্ধা', 'নুপুর', 'চূণকালি', 'তূণীর', 'অজয়', 'স্বর্ণসন্ধ্যা' প্রভৃতি।

☐ **কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (সপ্তদশ শতক) ক্ষেমানন্দ (মঙ্গলকবি) : বিখ্যাত কাব্য 'মনসামঙ্গল' রচনা।**

☐ **কেশবভারতী (পঞ্চদশ শতক) দেনুড় (আচার্য) :** মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দীক্ষা গুরু।

☐ **কৃষ্ণমোহন বিদ্যাভূষণ (অষ্টাদশ শতক) মাহাতা (আলংকারিক) :** সংস্কৃতে রচনা– 'অলংকার-কৌস্তব'-- অলংকার শাস্ত্রের টীকা।

☐ **কুড়ুনী দেবী (উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম) শাকনাড়া (সংস্কৃত সাহিত্যে পণ্ডিত) :**

চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের মাতা। স্বামীর অবর্তমানে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপনা করতেন।

☐ **কৈলাশ চন্দ্র শিরোমণি (১৮৩৯) ধাত্রীগ্রাম (নৈয়ায়িক) : কাশীর সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা।**

☐ **খোদাবক্স মল্লিক (অষ্টাদশ শতক) কুসুমগ্রাম (সঙ্গীত শিল্পী) :** বিখ্যাত 'গজল' গায়ক 'কে মল্লিক' নামে খ্যাত।

☐ **গণপতি পাঁজা (১৮৯৫) মাজিগ্রাম (চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক) :** চর্মরোগ চিকিৎসা ও গবেষণায় আন্তর্জার্তিক খ্যাতি, কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সান্নিধ্য লাভ ও অর্থানুকূল্যে পঠন, পাঠন। এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন, ১৯৪১ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মৌলিক গবেষণায় 'কোটস্' স্বর্ণপদক লাভ, বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন, এশিয়া মহাদেশে প্রথম চর্মরোগ গবেষণাগার স্থাপন।

☐ **গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য (অষ্টাদশ শতকের শেষ) বহড়া (মুদ্রণ কর্মী ও সাংবাদিক) :** ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'বঙ্গাল গেজেটি-র প্রকাশ ১৮১৮খ্রীঃ অব্দের ১৫মে।

☐ **গোবিন্দ দাস কর্মকার (পঞ্চদশ শতকের শেষ) কাঞ্চননগর (চৈতন্যসহচর কবি) :** মহাপ্রভুর দক্ষিণভারত ভ্রমণে নিত্যসঙ্গী, দৈনন্দিন রোজনামচা পদাবলী কাব্যে রচনা—'গোবিন্দ দাসের কড়চা' বিখ্যাত।

☐ **গোবিন্দ দাস (১৫৫০) শ্রীখণ্ড (পদাবলী কবি) :** বাংলায় পদাবলী রচনা, সংস্কৃতে— 'সঙ্গীত মাধব' নাটক, 'কর্ণামৃত' গ্রন্থ রচনা।

☐ **গিরিশ বসু (১৮৭০) বেড়ুগ্রাম (অধ্যাপক) : বঙ্গবাসী স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা।**

☐ **গোপাল ভট্টাচার্য (উনবিংশ শতাব্দী) মীরহাট (কবি) :** স্বদেশপ্রেম মূলক কবিতা, গান ও কাব্য রচনা।

☐ **গুরুচরণ তর্কপঞ্চানন (১৮৩১) সাতগেছিয়া (সংস্কৃত পণ্ডিত) :** 'শ্রীকৃষ্ণলীলাম্বুধি'— সংস্কৃতনাটক বিখ্যাত রচনা।

☐ **গুণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (উনবিংশ শতাব্দী) কাটোয়া (চিকিৎসক) :** স্বদেশী আন্দোলনে কারাবরণ, জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা।

☐ **জ্ঞান দাস (১৫৩০) কাঁদড়া (পদকর্তা) :** পদাবলী কাব্য রচনা।

☐ **গোবিন্দ অধিকারী (উনবিংশ শতাব্দী) কাটোয়া (নট ও পালাকার) :** যাত্রাগানের স্রষ্টা, পালাকার হিসেবে খ্যাতিলাভ।

- **গোপেন্দু ভূষণ সাংখ্যতীর্থ (উনবিংশ শতাব্দী) কালনা (পণ্ডিত ও সাংবাদিক) :** কালনার বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব, 'পল্লীবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে মফঃস্বল বাংলার প্রাচীনতম পত্রিকা যা আজও বর্তমান।
- **ঘনরাম চক্রবর্তী (১৭১১) কুকরো কৃষ্ণপুর (কবি) :** ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
- **ঘনশ্যাম দাস (সপ্তদশ শতক) শ্রীখণ্ড (বৈষ্ণব) :** শ্রেষ্ঠকাব্য 'গোবিন্দরতি মঞ্জরী'— সংকলন।
- **চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৭) তকীপুর (বিদ্যোৎসাহী সমাজসেবী) :** "চারু চন্দ্র কলেজ" প্রতিষ্ঠা।
- **চিত্ত ভট্টাচার্য (১৯৩১) বর্ধমান (কবি) :** শিক্ষক, কবিতা গ্রন্থ—পত্ররাগ, পাঁকেপদ্ম, উপন্যাস, কামমোহিতম, বম্যবচনা— মধ্যদিনের গান ও 'প্রতিবেশিনীর কাছে'।
- **জয়ানন্দ মিশ্র (১৫১১) আমাইপুর (পদকর্তা) :** চৈতন্য মঙ্গল কাব্যের স্রষ্টা।
- **জিতেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৯২) দাঁইহাট (প্রধান শিক্ষক-বিপ্লবী) :** বিজয় চাঁদ ইঞ্জিনীয়াবিং ইনষ্টিটিউটেব অন্যতম উদ্যোক্তা। স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ, কাবাবরণ, বৈদ্যপুর হাইস্কুলেব প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। বাগ্মী, জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ২৫ বৎসরের চেয়ারম্যান মনীন্দ্রলাল সিংহ রায়কে পরাজিত করে।
- **জীমূতবাহন (দ্বাদশ শতাব্দী) পালিগ্রাম (সমাজ সংস্কারক্) :** বিখ্যাত 'দায়ভাগ' আইনের প্রবর্তক।
- **দাশরথি রায় (১৮০৫) বাঁধমুড়া (পাঁচালীকার) :** বিখ্যাত পাঁচালী গানের স্রষ্টা, দাশুরায়ের পাঁচালী।
- **দাশরথি তা (বঙ্গাব্দ ১৩১৮) ধামাস (বিপ্লবী-সাংবাদিক) :** স্বদেশী আন্দোলনে কারাবরণ, কৃষিমন্ত্রী হিসাবে গ্রামে গ্রামে 'ধর্মগোলা' স্থাপন, 'দামোদর' পত্রিকা সম্পাদনা, সুরসিক বক্তা।
- **দেবকীকুমার বসু (১৮৯৪) অকালপৌষ (বিপ্লবী-চিত্রপরিচালক) :** ১৯২৭-২৮খ্রীঃ অব্দে গান্ধীজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান। নির্বাক চলচ্চিত্রের গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা, নিউথিয়েটার্সের প্রাণ পুরুষ, চলচ্চিত্রে প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার, শ্রেষ্ঠচিত্র— চণ্ডীদাস, পুরাণভকত, সীতা, সাগর সঙ্গমে (রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত / পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত।
- **দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৮০৩) চক-ব্রাহ্মণ গড়িয়া (বেদবিশারদ) :** চতুর্বেদের সম্পাদনা

ও ব্যাখ্যা, 'মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা'— বিখ্যাত গ্রন্থ, মণিপুর রাজদরবার কর্তৃক বেদাচার্য উপাধি ও ভারতধর্ম মহামণ্ডল কর্তৃক 'বেদবিশারদ' উপাধি দান।

☐ **ধরণীধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৯১) অগুাল্ (কবি) :** শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ 'জীবন খাতা'। অন্যান্য কাব্য— দৌপদীনিগ্রহ, আর্যসঙ্গীত বা জাতীয় নিগ্রহ, সিন্ধুদূত, বিনোদিনী পত্রিকা প্রকাশ।

☐ **নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩) কুড়মুন-বুড়ার (কবি) :** শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ 'ভুবন মোহিনী প্রতিভা"। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'দ্রৌপদী নিগ্রহ কাব্য", 'জাতীয় নিগ্রহ কাব্য", 'সিন্ধুদূত"। 'বিনোদিনী', পত্রিকার সম্পাদনা।

☐ **নরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৩) দত্ত দেড়িয়াটোন (স্বামী বিবেকানন্দ) :** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সুযোগ্য শিষ্য, 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা।

☐ **নজরুল ইসলাম (১৮৯৯) চুরুলিয়া (বিদ্রোহী কবি-গীতিকার-সুরকার) :** বিখ্যাত নিজস্ব ঘরানা নজরুল গীতির স্রষ্টা, প্রায় তিনহাজার গান রচনা ও সুরসংযোজনা, উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ- 'অগ্নিবীণা', 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট', 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'সিন্ধু-হিল্লোল', 'চিত্তনামা', ঝিঙেফুল', 'বুলবুল', 'জিঞ্জির', 'চক্রবাক', 'সন্ধ্যা' 'চোখের চাতক', 'চন্দ্রবিন্দু' প্রভৃতি।

☐ **নবাই ময়রা (অষ্টাদশ শতক) খেড়ুর (কবিয়াল) :** নিজস্ব ঘরানার কবিয়ালের দল গঠন ও দেশে-বিদেশে কবিগানের প্রশংসা অর্জন।

☐ **নারায়ণ চৌধুরী (৩.১০.১৯১৮) গুলিটা (স্বাধীনতা সংগ্রামী) :** জননায়ক, কারাবরণ, বর্ধমান পরিচিতি— গ্রন্থের লেখক। সুবক্তা, গান্ধীবাদী, রাজনীতিবিদ। জেলা পরিষদ ও জেলা স্কুল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি।

☐ **নরহরি সরকার (১৪৭৮) শ্রীখণ্ড (চৈতন্যভক্ত ও কবি) :** চৈতন্য পদাবলী, বাঙলা রচনা, সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত', ভক্তি চন্দ্রিকা পটল ও 'ভক্তামৃত অষ্টক' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

☐ **নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪২) ধোয়াবনী (কণ্ঠকবি নামে পরিচিত) :** কৃষ্ণযাত্রার স্রষ্টা ও ভক্তিমূলক গীতিকার। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নীল কণ্ঠের গান শুনে মুগ্ধ হন।

☐ **নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৯) বননবগ্রাম (বিচারপতি) :** ১৯২০ খ্রীঃঅব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি ও নাইট উপাধি লাভ, Bengal Sanskrit Association এবং Cow Preservation লীগের সভাপতিত্ব করেন।

☐ **নীলাম্বর চক্রবর্তী (উনবিংশ শতাব্দী) দেবীপুর (গীতিকার ও গায়ক) :** গীতিকাব্য ও গীতিসংকলন— উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

☐ **পঞ্চানন মণ্ডল (১৯১৬) ছোটবৈনান (গবেষক-প্রাবন্ধিক) :** বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক, পুরাতন পুঁথির সংগ্রাহক ও সংস্থাপক, রাঢ় গবেষণা পর্যদ স্থাপক, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "ভারত শিল্পী নন্দলাল" প্রামান্য ও উচ্চ প্রশংসিত।

☐ **প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪) নাখুদা (অধ্যাপক) :** ১৯১৭ সাল হ'তে ৩০ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপনা, সিনেট, সিণ্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক ও কাউন্সিলের সদস্য, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অবৈতনিক উপাচার্য, কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব, ১৯৩৭ সাল থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সুনামের অধিকারী আইনব্যবসায়েও।

☐ **প্রতাপ চন্দ্র রায় (১৮৫৬) সাঁকো (প্রকাশক ও গ্রন্থকার) :** মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করে যশ্বসী।

☐ **পশুপতিনাথ মালিয়া (১৯০৭) সিয়ারসোল (সিয়ারসোলরাজ) :** জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, স্কুল স্থাপনা, ভূদান যজ্ঞে ১৫০০ বিঘা ভূমিদান।

☐ **প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ (১৮০৬-১৮১৭) শাকনাড়া (বিদ্যাসাগরের শিক্ষা গুরু) :** সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, এগারোখানি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা, পুরুযোত্তম রাজাবলী'– কাব্য, 'নানার্থ সংগ্রহ' অভিধান ও 'অলংকার' গ্রন্থ সংস্কৃত রচনা।

☐ **প্রবোধ কুমার গুহ (১৯০৭) শাঁকটিয়া (বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক) :** ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মন্ত্রীসভার সদস্য।

☐ **প্রত্যাগাত্মানন্দ (১৮৮০) চাগুলী (প্রাজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ) :** বিশিষ্ট পণ্ডিত দর্শনে, প্রকৃত নাম : প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে যোগদান, কারাববণ, সাভেন্ট পত্রিকাব সম্পাদনা, অরবিন্দর সান্নিধ্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ, গ্রন্থ 'জপসূত্রম ; বেদ ও বিজ্ঞান, পুরাণ ও বিজ্ঞান, 'হিন্দুজড়দর্শন', 'ইতিহাস ও অভিব্যক্তি। ইংরাজী গ্রন্থ Approaches the truth, Patent wonders, Janatram, Metaphysics, Science and Sadhana, Introduction to vedanta Philosophy.

☐ **ফকির চন্দ্র রায় (১৯০৪) শিরোরাই (বিপ্লবী) :** স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ছাত্রাবস্থা থেকেই জেলায় গুপ্ত সমিতি গঠন, কারাবরণ, বিধনাসভার সদস্য, বহুজনহিতকর সেবায় আত্মনিয়োগ, রচনা : "স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় বর্ধমান" একটি প্রামাণ্য দলিল।

☐ **বটুকেশ্বর দত্ত (১৯০৮) ওঁয়াড়ি (বিপ্লবী) :** বিখ্যাত বিপ্লবী ভগবৎ সিং-এর শিষ্য, দিল্লীতে ট্রেডার্স ডিসপিউট বিলের প্রতিবাদ, কারাবরণ– আন্দামানে সেলুলর জেলে চরম নির্যাতন ভোগ।

☐ **বলাই দেবশর্মা (১৮৯২), বর্ধমান,:** বিপ্লবী সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয়ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে বাঘনাপাড়ায় ছাত্রাবস্থায় কারাবরণ। দৈনিক জ্যোতি, 'বসুমতি' ও সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীতে স্থান। ১৯৪৫ খ্রী হতে আর্য ও ১৯৪০ থেকে মাসিক 'স্ত্রী' পত্রিকার প্রকাশও সম্পাদনা। 'বৈশাখী বাঙলা', 'স্বাধীন বাংলা' ও স্বদেশী যুগের ত্রয়ী' গ্রন্থের লেখক।

☐ **বংশীবদন গোস্বামী (১৪৯৫) পাটুলী (বাঘনাপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা):** শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অপেক্ষা ৯ বৎসরের কনিষ্ঠ, চৈতন্য অনুচর, বংশীদাস-বংশী নামে উল্লেখযোগ্য পদ রচনা, সংকলিত পদকাব্য 'দীপ্তকোজ্জ্বল', 'গৌরলীলামৃত', 'পদকল্পতরু', 'পদামৃতমঞ্জরী', 'পদকল্পলতিকা', 'পদরসসার'—উল্লেখযোগ্য।

☐ **বৃন্দাবন দাস (১৫৩০) দেনুড় (চৈতন্য ভক্ত কবি): শ্রেষ্ঠকীর্তি শ্রীমদ্ভগবতের অনুরূপ 'চৈতন্য লীলা প্রসঙ্গ' 'চৈতন্য ভাগবত' জীবনী কাব্য।**

☐ **বাসুদেব ঘোষ (সপ্তদশশতক কূলুট (পদকর্তা):** 'গৌরচন্দ্রিকা' পদের স্রষ্টা।)

☐ **বুনো রামনাথ (পঞ্চদশ শতক) সমুদ্র গড় (নৈয়ায়িক):** সে যুগের আদর্শনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা দারিদ্র্য তাঁর অলংকার।

☐ **বিশালাক্ষ বসু (১৮৯৫) আহার বেলমা (জনসেবক):** দক্ষিণ দামোদরে আহার বেলমা নাম পরিবর্তন ও 'শ্যামসুন্দর' ঠাকুরেব নামে গ্রামের নামকরণ, বিশাল ঠাকুর বাড়ি, বিরাট রাজার মাযেব দীঘি ও শ্যামসুন্দর কলেজও স্কুল প্রতিষ্ঠা, দানবীর জনসেবক।

☐ **বৈকুণ্ঠ নাথ সেন (১৮৪৪) আলমপুর (আইনজীবি):** দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ, ১৯১৭ খ্রীঃ কলিকাতায় অ্যানিবেসান্তেব সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তার সভাপতিত্ব করেন।

☐ **বনোয়ারিলাল ভালোটিয়া (১৯০৪) রানীগঞ্জ (সমাজ সেবক):** দেশের স্বদেশী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ, জনহিতকর কর্মে উদার হস্তে দান, "বনোযারিলাল ভালোটিয়া কলেজ" স্থাপনা।

☐ **বিজয় কুমার ভট্টাচার্য (১৮৯৫) ওঁয়াড়ি (বিশিষ্ট গঠনমূলক কর্মী ও শিক্ষাবিদ):** গান্ধীজির আহ্বানে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান, পিকেটিং করার জন্য কারাবরণ [illegible]য়াদী শিক্ষার প্রচলনে কলানব গ্রামে 'শিক্ষা নিকেতনে'র প্রতিষ্ঠা।

☐ **বাসুদেব সার্বভৌম (চৌদ্দ দশ শতকের শেষ) বিদ্যানগর (অধ্যাপক): মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু,** বিদ্যানগরের চতুষ্পাঠিতে মহাপ্রভুকে শিক্ষাদান করেছিলেন। 'বিখ্যাত গ্রন্থ—'অনুমান খণ্ডের টীকা', 'তত্ত্বচিন্তামণি' ও 'বেদান্ত

প্রকরণ'।

☐ **ভবদেব ভট্ট (একাদশ শতকের প্রথম) সিদ্ধল (সন্ধিবিগ্রহিক) :** বঙ্গেশ্বর হরিবর্মার মহামন্ত্রী, আর্যধর্ম রক্ষায় বৌদ্ধদ্ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, হিন্দুধর্মের অনাচার রহিত ও পুনঃ প্রবর্তন, বৈদিক ধর্মের শ্রৌতসংস্কারে ও স্মৃতিশাসনে উল্লেখযোগ্য অবদান। রচিত গ্রন্থ মীমাংসা দর্শন—'কর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি' ও 'প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, অপর গ্রন্থ—সম্বন্ধবিবেক, ব্যবহারতিলক, 'নির্ণয়ামত্য, স্কুল-প্রশস্তি।

☐ **ভাস্করানন্দ সরস্বতী (১৮৯১) কোন্দা-গোবিন্দপুর (পণ্ডিত) :** দেশের কাজ আত্মনিয়োগ, স্বাধীনতা আন্দোলনে কারাবরণ, উল্লেখযোগ্য কীর্তি—''চৈতন্যচরিতামৃতের' সংস্কৃতে অনুবাদ।

☐ **ভবানী বেণে (অষ্টাদশ শতক) সাতগেছিয়া (কবিয়াল) :** সমসাময়িক কালে কবিদল নিয়ে দেশ-বিদেশে গাওনা ও সুখ্যাতি অর্জন।

☐ **ভরত মল্লিক (১৭ শ শতাব্দী) পাটুলী (সংস্কৃত পণ্ডিত) :** অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থরচনা—''একার্নবার্থ সংগ্রহ'', ''দ্বিরূপধ্বনি সংগ্রহ'', ''মুগ্ধবোধিত্রী'', ''অমবকোষ টীকা''।

☐ **ভোলানাথ রায় (১৮৯০) রায়ান (নাট্যকার) :** ি টিশ বিরোধী নাটক 'জরাসন্ধ' পুলিশ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়, এই নাটকের বার্ধন চরিত্রে যতীন্দ্রনাথের' ছাপ আছে। উল্লেখযোগ্য নাটক : (জগদ্ধাত্রী)

☐ **মতিলাল রায় (১৮৪৩) ভাতশালা (নট ও নাট্যকার) :** যাত্রাপালাগানের স্রষ্টা।

☐ **মৌলভী আবুল কাশেম (১৮৯০) কাশেমনগর (স্বাধীনতা সংগ্রামি) :** জেলাব মুসলিম সমাজে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথিকৃত, খিলাফত আন্দোলনে প্রতিনিধিত্ব, তাঁর নামেই গ্রামের নাম কাশেম নগর।

☐ **মৌলভী মহম্মদ ইয়াসিন (১৮৯৫) বর্ধমান শহর (আইনজীবি) :** জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রথম সভাপতি, দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে।

☐ **মহেশ চন্দ্র চৌধুরী (১৮৩১) আমাদপুরে (আইনজীবি) :** দেশবাসীকে স্বদেশীভাবাপন্ন করতে 'স্টীমার সার্ভিস' প্রবর্তন, ১৮৮৪ তে Bengal National League প্রতিষ্ঠা, উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় Indian National Congress প্রতিষ্ঠা।

☐ **মহাকবি দামোদর সেন (পঞ্চদশ শতক) শ্রীখণ্ড (কবি) :** পাণ্ডিত্যের জন্য যশোরাজ উপাধি লাভ।

☐ **মনোহর রায় ডঃ (১৯০০) নাসিগ্রাম (অধ্যাপক) :** আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষ,

গণিত শাখার বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন।

- **মানবেন্দ্র পাল (২৪.৪.১৯২৬) অম্বিকা কালনা (ঔপন্যাসিক) :** জেলার কীর্তিমান ছোট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। উপন্যাস—দূর থেকে কাছে, প্রতিলিপি, নিশিবিহঙ্গ, ছোটগল্প, কাছের পৃথিবী।
- **মালাধর বসু (পঞ্চদশ শতক) কুলীনগ্রাম (কবি) :** শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ— 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য।
- **মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৫৬০) দামুন্যা (কবি) : শ্রেষ্ঠকীর্তি— কবি কঙ্কণ চণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।**
- **মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (উনবিংশ শতক) মাথরুণ (কাশিমবাজারের মহারাজা) :** দেশহিত কর বহু কর্মে অকাতরে অর্থদান, যবগ্রামে কালিশ্বরী বিদ্যালয় ও মাথরুণ উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- **যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭) চান্নাগ্রাম (বিপ্লবতাপস) :** অনুশীলন সমিতিতে যোগদান, বিপ্লবীদেব অস্ত্রশিক্ষায় প্রশিক্ষণ দান, ছদ্মনামে উত্তর ভারতের সৈন্যদলে যোগদান, অরবিন্দের সঙ্গে বরোদায় যোগাযোগ, পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ, চান্না গ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা— নিরালম্ব স্বামী নামে খ্যাত। অগ্নিযুগে বিপ্লবের ব্রহ্মা নামে খ্যাত।
- **যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা (১৮৮৬) শাটিনন্দী (জননায়ক) :** গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে স্বাধীনতা আন্দোলনে আইনব্যবসা পরিত্যাগ পূর্বক যোগদান। গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের সভায় ভাষণ দান, গ্রেপ্তার বরণ, জেলা কংগ্রেসের প্রাণ স্বরূপ, ভারত-পাকিস্তান দেশ বিভাগের সময় সমগ্র বঙ্গদেশ পাকিস্তান ভুক্তির বিরোধিতা ও ক্যাবিনেট মিশনের কাছে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত ভুক্তির দাবি। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ তারই অবদান।
- **যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (অষ্টাদশ শতক) বেড়ুগ্রাম (গ্রন্থকার) :** বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা, বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীর' স্রষ্টা, অন্যান্য গ্রন্থ— 'মডেল ভগিনী', 'বাঙ্গালি চরিত্র', 'নেড়াহরিদাস', 'কালাচাঁদ'।
- **যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (উনবিংশ শতাব্দী) পাতিল পাড়া (আধুনিক কবি)।**
- **রামাই পণ্ডিত (দশম শতাব্দী) মেমারীর সন্নিকট বল্লুকানদীর তীরে (কবি) :** ধর্মপূজার প্রবর্তক, 'শূণ্য পুরাণ' উল্লেখযোগ্য কাব্য।
- **রামানন্দ বসু (ষোড়শ শতাব্দী) কুলীন গ্রাম (চৈতন্য পার্ষদ) : শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য প্রণেতা মালাধর বসুর পৌত্র সত্যরাজ খানের পুত্র, পদকর্তা, "রাধা কৃষ্ণলীলা" ও "গৌরাঙ্গলীলা" বিষয়ে সতেরোটি পদ রচনা।**

- ☐ **রঘুনাথ শিরোমণি (পঞ্চদশ শতকের শেষ) কোটা (নৈয়ায়িক) :** নিমাই পণ্ডিত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও সহপাঠী একই চতুষ্পাঠী বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র, অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী। ন্যায়শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতাও টীকাকার : রচিত সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থগুলি— 'প্রত্যক্ষমণি দীধিতি', 'গুণ কিরণাবলী', 'প্রকাশ দীধিতি', 'আত্মতত্ত্ববিবেক দীধিতি আখ্যাতপদ', 'পদার্থ খণ্ডন'।
- ☐ **রামচন্দ্র গোস্বামী (১৫৪৯) বাঘনাপাড়া (ভক্তকবি) :** বাঘনাপাড়া শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা বংশীবদনের পৌত্র। ১৫৮১-৮৩খ্রী: অব্দে খেতরী উৎসব আয়োজন, উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— 'কড়চা', 'পাযণ্ড দলন', 'অনঙ্গমঞ্জুরী সম্পুটিকা',।
- ☐ **রূপরাম চক্রবর্তী (১৬০০) কাইতি শ্রীরামপুর (কবি) :** 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' রচনা।
- ☐ **রামকান্ত রায় (১৭৭০) সেহারা (বেকার কবি) :** ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচযিতা 'বারমতি পুঁথি'।
- ☐ **রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭) বাকুলিয়া (কবি) :** উল্লেখযোগ্য কাব্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান', দেশাত্মবোধক কবিতা রচনায় কৃতিত্ব।
- ☐ **রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৪) তোড়কোনা (আইনজীবি) :** আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আইনজীবি, আইনের নূতন ব্যাখ্যাতা, দেশভক্ত— ১৯০৭ সালে সুবাট কংগ্রেসে সভাপতিত্ব, কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অকাতরে দান, গ্রামে অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।
- ☐ **রাসবিহারী বসু (১৮৮০) সুবলদহ (বিপ্লবী) :** চন্দননগরে 'সুহৃদ সম্মিলনী'তে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিপ্লবের দীক্ষা, দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বোমা নিক্ষেপ, ব্রিটিশের চোখে ধূলো দিয়ে জাপান পলায়ন, সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন।
- ☐ **রঘুনাথ রায় (অষ্টাদশ শতক) চুপী (বর্ধমান রাজের দেওয়ান) :** চর্যাপদের সংকলক ও ব্যাখ্যাতা এবং উচ্চাঙ্গ শ্যামাসঙ্গীতাবলী রচনা।
- ☐ **রমাপ্রসাদ মল্লিক (১৮৬৮) অগ্রদ্বীপ (ম্যাজিস্ট্রেট) :** বহু প্রতিষ্ঠানে অকাতরে মুক্ত হস্তে দান। 'বরেন্দ্র বিসার্চ সোসাইটিতে দান', অগ্রদ্বীপে সংস্কৃত 'চতুষ্পাঠী' স্থাপন, সারদাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, কাটোয়ার রমাপ্রসাদ টাউনহল স্থাপন, মালদায় হরিমোহন ইনষ্টিটিউট স্থাপন। রাজশাহী ও কাটোয়ার অনারারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। লাহোর কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান।
- ☐ **রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (উনবিংশ শতাব্দী) আমাদপুর (ঐতিহাসিক) :** 'Indian Shipping' বা ভারতে নৌশিল্পের ইতিহাস' প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ।
- ☐ **রঘুনন্দন গোস্বামী (অষ্টাদশ শতক) মাড়ো (কবি) :** বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ রামরসায়ন

কাব্য।

- ☐ **রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য (অষ্টাদশ মাজিদা (কবি) :** বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ 'রসিকরঞ্জন কাব্য'।
- ☐ **রূপগোস্বামী (১৪০৭) নৈহাটি (মহাপ্রভুর শিষ্য) :** পূর্বপুরুষ কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ। কয়েকপুরুষ নৈহাটিতে বাস, গৌড়ের সুলতান হুসেনশাহের রাজকর্মচারী, রামকেলিতে শ্রীচৈতন্য দর্শন ও চৈতন্যভক্ত, রাজকর্মত্যাগ ক'রে মহাপ্রভুর ভক্তসঙ্গী, ধর্ম-সাহিত্য-দর্শন চর্চা, কাব্য– 'হংসদূত', 'উদ্ধব', 'সন্দেশ', 'স্তবমালা', নাটক– 'বিদগ্ধ মাধব', 'ললিতমাধব', 'দানকেলিকৌমুদি' রূপতত্ত্ব ও অলংকার শাস্ত্র–'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু', 'উজ্জ্বলনীলমণি'।
- ☐ **রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (উনবিংশ শতাব্দী) আমাদপুর (প্রত্নতাত্ত্বিক)**
- ☐ **রামদুলাল তর্কবাগীশ (১৭৩১-১৮১৫) সাতগাছিয়া (নৈয়ায়িক) :** ন্যায় শাস্ত্রের উপর অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন, বহুগ্রন্থের রচযিতা।
- ☐ **রামকমল কবিভূষণ (অষ্টাদশ শতক) বর্ধমান শহর (সংস্কৃত পণ্ডিত) :** তেজচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে সংস্কৃত নাটক– 'নয়নানন্দ' রচান। ভাবার্থদর্শ–অন্য গ্রন্থ।
- ☐ **রমেশচন্দ্র দত্ত (উনবিংশ শতাব্দী) আঝাপুর (ঐতিহাসিক) :** নিখিল ভাবত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' ও মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'– উপন্যাস বিখ্যাত।
- ☐ **রাজশেখর বসু (১৮৮০) বামুনপাড়া (রসসাহিত্যিক) :** 'পরশুরাম' ছদ্ম নামে বিখ্যাত। বহুগ্রন্থের লেখক, কৌতুকরস সৃষ্টিতে দক্ষ।
- ☐ **রমাপদ চৌধুরী (   ) সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। :** 'প্রথম প্রহর' তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালবাঈ' উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এখনই উপন্যাসের জন্য অ্যাকাদমী পুরস্কার লাভ। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।
- ☐ **লালবিহারীকে (১৮২৪) সোনা পলাশী (অধ্যাপক) :** খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও রেভ: লালবিহারী দে নামে খ্যাত, ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, ১৮৭৪ সালে ইংরাজীতে লেখা গোবিন্দ সামন্ত পুস্তকের উপর পুরস্কার লাভ, ইংরেজী Bengal Magazine-এর সম্পাদক । Bengal Peasant life এবং Folk Tales of Bengal গ্রন্থ রচনা।
- ☐ **শ্যামাদাস বাচস্পতি (১৭৭১ শকাব্দ) (কবিরাজ) :** যোগক্রিয়ার দ্বারা অদ্বিতীয় নাড়ুজ্ঞান লাভ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন কাশীতে, 'শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ' স্থাপনা।
- ☐ **শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৭) ইলসোরা (চিকিৎসক) :** মেধাবী ছাত্র, জীবনে

সমস্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন, প্রেসিডেন্সী কলেজ হাসপাতালে প্রথম বাঙালি চিকিৎসক হিসাবে যোগদান, শল্যচিকিৎসায় প্রবাদপুরুষ, বিবেকানন্দ কলেজ, সেন্ট, জেভিয়ার্স কলেজ, অরবিন্দ ভবন, রেডক্রশে প্রভূত দান। ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ কর্তৃক মূক-বধির বিদ্যালয় স্থাপন, চারুকলার পূজারী ও চিত্রশিল্পী।

- **শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৯) কালনা (চৈতন্যভক্ত) :** 'চৈতন্যচরিতামৃতের' সংস্কৃতে অনুবাদ।
- **শ্যামাদাস আচার্য (পঞ্চদশ শতকের শেষ) পালসিট (ভাগবতার্য) :** ভাগবতে অসাধরণ পাণ্ডিত্য, দিগ্বিজয়ী অবশেযে অদ্বৈতাচার্যের কাছে পরাভূত ও শিয্যত্ব গ্রহণ। "অদ্বৈতমঙ্গল" কাব্য রচনা।
- **শৈলবালা ঘোষ জায়া (উনবিংশ শতাব্দী) মেমারী :** ঔপন্যাসিক ও গল্পকার।
- **শ্রীকুমার মিত্র (১৯০২) রামপুর (সমাজসেবক) :** স্পষ্টকথা পত্রিকা সম্পাদনা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, উদ্বাস্তুপুনর্বাসনে মহাবাজ উদয়চাঁদের আনুকূল্যে 'উদয়পল্লী' প্রতিষ্ঠা, 'সর্বমঙ্গলা'-ট্রাষ্ট কমিটির স্থাপনা।
- **শ্রীশ্চন্দ্র মজুমদার (উনবিংশ শতক নওপাড়া (লেখক ও দেশকর্মী) :** বঙ্গ দর্শনের তৃতীয় পযার্য়ের সম্পাদনা, প্রাবন্ধিক ও লেখক।
- **সত্যরাজ খান (পঞ্চদশ শতক) কুলীন গ্রাম (চৈতন্যভক্ত) :** মালাধর বসুর পুত্র ও রামানন্দ বসুর পিতা, কুলীন গ্রামেই অবস্থান, কুলীন গ্রামের মন্দির বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা।
- **সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২), চূপী (কবী) :** ছন্দের যাদুকর কবি, কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' 'সন্ধিক্ষণ', 'বেনু ও বীণা', 'হোমশিখা', তীর্থসলিল, তীর্থবেনু, 'ফুলের ফসল', 'কুহু ও কেকা', তুলির লিখন, মণিমঞ্জুষা, অভ্রআবীর, উপন্যাস-জন্মদুঃখী, বারোয়ারি।
- **সোমেশ্বর চৌধুরী (১৮৯৭) মণ্ডলগ্রাম (চিকিৎসক) :** অবিভক্ত বঙ্গের প্রথম নীলবিদ্রোহের নেতা।
- **সুকুমার সেন (১৯০০) গোতান (ভাষাচার্য) :** ডক্টরেট, ভাযাচার্য ও ভাযা গবেযক, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রামাণ্য গ্রন্থ, অন্যান্য গ্রন্থ: দিনের পর দিন যে গেল', 'নট, নাট ও নাটক', W. Carey's Itihasmala, ভাষাগবেষণায় প্রবাদপুরুষ।
- **সনাতন গোস্বামী (১৪০৪) নৈহাটি (মহাপ্রভুর শিষ্য) :** গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের রাজকর্মচারী, রামকেলিতে মহাপ্রভুর দর্শন ও ভক্তিলাভ, হুসেনশাহ কর্তৃক কারাগারে বন্দী। কিন্তু প্রভুর দর্শনলাভে পলায়ন, রাজকার্য পরিত্যাগ ও মহাপ্রভুর

সান্নিধ্য লাভ। সংস্কৃত রচনা— ভাগবতের দশম সস্কন্দের টীকা, বৈষ্ণবতোষিনী”।

☐ **সুধীরচন্দ্র দাঁ (১৯৩৫) মুইধাড়া (প্রধানশিক্ষক ও শিক্ষাবিদ):** বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক-সমাজ সচেতন কর্মী, গ্রন্থ— 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম' উপন্যাস, মনভাস-ছোটগল্প, 'বর্দ্ধমানের মনীষী', 'বিপ্লবীবাংলা', ও ঐতিহাসিক প্রামাণ্য গ্রন্থ- 'বর্দ্ধমান পরিক্রমা'।

☐ **হংসনারায়ণ ভট্টচার্য: (১৯৩৫ বঙ্গাব্দ) মীরহাট (অধ্যাপক), বঙ্গসাহিত্যাবিধান প্রণেতা।**

☐ **হটী-বিদ্যালঙ্কগর (১৫৭০) সোঁয়াই (শিক্ষাচার্যা):বিদূষী মহিলা, কাশীতে 'বিদ্যালংকার' উপাধিলাভ, নিজ চতুস্পাঠীতে অধ্যাপনা।**

“ নির্ঘন্ট ”

ব্যক্তি